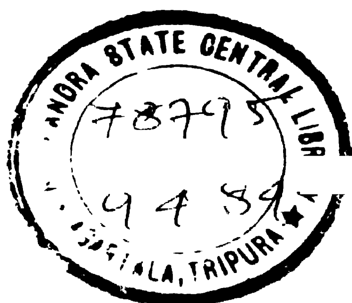

একত্রে রবীন্দ্রনাথ

একত্রে রবীন্দ্রনাথ

একত্রে রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ চৌধুরী



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
২৬শে বৈশাখ ১৩৬৭
৯ মে ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। মুদ্রক : পরিমলকুমার বসু, বসুশ্রী প্রেস ৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪

রবিঅনুরাগী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়কে

সব মিলিয়ে এক বই—একত্রে রবীন্দ্রনাথ। মূল কথাও একই—মানুষ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যের মত বিচিত্র রবীন্দ্রজীবন। শুধু ভূমা আর জীবনদেবতার অন্বেষক তিনি নন, কখনও পরলোকের সঙ্গে আলাপচারী, কখনও কোন বিদেশিনীর অনুরাগী, কখনও আলু কিংবা আখ চাষে আগ্রহী। কবি-দার্শনিকের বাইরে অন্য রবীন্দ্রনাথ। এই একত্র-নিবন্ধ গ্রন্থে এই অন্য রবীন্দ্রনাথই বারবার এসেছেন।

যেহেতু বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং যেহেতু একই বিষয় নানা প্রসঙ্গে এসেছে, তাই দু' একটি রচনার কিছু কিছু অংশে পুনরুক্তি আছে। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে তা বাদ দিই নি। তাছাড়া এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার তিনটি বই বাদ পড়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক' এবং 'হে বন্ধু হে প্রিয়' নামে ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুটি বই আমি ইচ্ছে করেই সংযুক্ত করি নি। 'রবির আলোয়' নামে আমার আর একখানি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। এই গ্রন্থে এটিও যুক্ত করা গেল না। ভবিষ্যতে আরও কিছু লেখার ইচ্ছে আছে। যদি পাঠকদের আনুকূল্য পাওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলিও একত্রিত করা যেতে পারে।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন আমার সহকর্মী সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাভাজন তিন রবীন্দ্রগবেষক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেনের কাছে আমার ঋণের কথা উল্লেখ করি। এই তিন শিক্ষাগুরুকে প্রণাম।

অ. চৌ.

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা

পিতৃলোক ও মাতৃলোকের
পরলোকগত পূর্বপুরুষদের
স্মরণে

নিবেদন

পূজাসংখ্যা আনন্দবাজারে রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা প্রকাশের পর চেনা অচেনা অসংখ্য লোক আমাকে চিঠি লিখেছেন, ফোন করেছেন। অনেকে বললেন, 'যাক, নিশ্চিন্তে মরতে পারব। পরলোক জায়গাটি দেখছি মন্দ না।' কেউ কেউ ধরে নিলেন প্ল্যানচেট মিডিয়ামে আমি বিশ্বাসী। আমাকে নিয়ে প্ল্যানচেটের আসর বসানোর প্রস্তাবও এল। দু'একজন প্ল্যানচেটে রবীন্দ্রনাথকে এনে জেনে নিলেন, আমি যা লিখেছি, সত্যি কিনা। প্ল্যানচেট যাঁরা করে থাকেন, যাঁরা পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁদের কেউ কেউ বললেন, 'আমাদের ধারণার পরলোকের সঙ্গে এই পরলোকও বেশ মিলে গেছে।'

মূল্যবান চিঠি ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী'র। ডঃ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার অন্যতম লিপিকর। (অন্যজন, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বর্তমানে পরলোকে।) ডঃ চক্রবর্তী সে সময় (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী নন। নিউ ইয়র্কের নিউ পল্জ্ স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি এখন অধ্যাপক। সেখান থেকে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা হল "মহাপৌরুষেয় ছেলেমানুষী"। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ডঃ চক্রবর্তী'র চিঠির বৃহদংশ তুলে দিলাম। তিনি লিখেছেন—

"মানুষের মননজাত নিছক কল্পনাকে ছলনা না বলে মায়ারচনা বলাই ভালো—স্মৃতিবিস্মৃতিকে নিয়ে খেলা—তার সঙ্গে ধ্রুব সত্যের যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা মহাপৌরুষেয় ছেলেমানুষী, অস্বীকৃতিকেই অন্যভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা, তিনি নিজেই যা গ্রহণ করেননি, তা যেন অতিশয়োক্তি দ্বারা ভুল বুঝতে চেয়েছেন। উত্তেজিত বিশেষ অবস্থায় পেন্সিল দ্রুত নড়া, এবং তারই যোগে দর্শক-শ্রোতাদের মনকে অন্যজগতের সঙ্গে বেঁধে দেয়া সম্ভব, কারণ প্রথমেই ধরে নেয়া হয়েছে সবই ভৌতিক সত্য। সেই ভৌতিক প্রকরণের দ্বারাই পরলোকের যাকে ইচ্ছা যখন তখন নামিয়ে আনা যায়, যুক্তিতর্কের কথাই ওঠে না। শ্রেষ্ঠতম কবিও যে এই সম্মোহন না মেনেও মেনেছেন, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদেরও নিজের খেয়ালি হৃদবন্ধন হতে মুক্তি দেননি, তা'ও মধ্যে মধ্যে পারলৌকিক অধিবেশনে দেখেছিলাম। কিন্তু জীবনমৃত্যুর চরম প্রসঙ্গে কৌতূহল বা কোন বিশেষ কৌশল প্রক্রিয়াকে সত্যের সম্মান দেয়াই সত্যের অসম্মান। এ কথাটা সত্যসন্ধ জ্ঞানী সাধক কবিকে বলার দরকার ছিল না, অথচ আমার মতো সামান্য লোকও তা বলেছি, তিনি সম্মতি জানিয়েছেন। তাঁর মনের স্বরূপ দ্বিধাকে উপলক্ষ্য করে নেতিবাচক প্রশ্ন জানিয়েছি—"এ তো বড়ো আশ্চর্য ঘটনা, ভাবতেই পারি না!" উত্তরে বলেছেন, "ঠাকুর-পরিবারে

সবই সম্ভব—দেখলে তো!" (অর্থাৎ বিশ্বাস করো না।) আবার উলটো জোর দিয়ে তর্ক করেছি,—"এ কিন্তু আসল নয়।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছি, "কেমন ক'রে জানলে?" (বুঝেছি, আমি সর্বজ্ঞতার দাবি করেছিলাম।)

"রবীন্দ্রনাথ জানতেন আমার এবং অন্যের সম্পূর্ণ অপ্রতীতির কথা। তাঁর চরিত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের উপর কোনো প্রভুত্ব প্রয়োগের চেষ্টা না করে। আমরাও তাঁর ঐ কিছুদিনের খেলায় বাধা দিইনি, কেননা জানতাম তিনিও যথার্থ বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আন্দোলনে তাঁর মনে নানা সূক্ষ্মচিন্তা, চৈতন্যের অনুভব জেগে উঠেছে, তাতেই তিনি তখনকার মতো তৃপ্ত ছিলেন। হয়তো বিরুদ্ধতা আরো দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা উচিত ছিল, তাহলে ঐ ধরনের নোট লেখার প্রহসন থেকে মুক্ত হতাম, যদিও অল্প বয়সের আস্পর্ধা দেখানো ভালো নয়। (এ রকম অবস্থা আমাদের আরো হয়েছে। তাঁর প্রদত্ত ওষুধ, পথ্য ইত্যাদি গ্রহণ করা নিয়ে। গেলাস গেলাস নিম-বাটা জল খেয়ে অসুখ করেছে। অন্য ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু শাদা গুঁড়ো ওষুধ (বায়োকেমিক) খেয়ে ফলও হয়নি, ক্ষতিও হয়নি—নিতান্ত স্নেহ ও হঠাৎ-বিশ্বাসের আতিশয্যে এই মহাকারুণিক মানুষ আমাদের জন্যে যা করতেন, তার মূল্য অন্যভাবে পেয়েছি।)

"কবি যা শুনতে চান, তাই শুনেছিলেন, নিজের কথারই প্রতিধ্বনি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই 'পরলোক' থেকেও তাঁর প্রিয় বৃক্ষলোকের সংবাদই এসেছে, নিজের বইয়ের নামোল্লেখসুদ্ধ "আত্মসৃষ্টির" সম্বন্ধে কণামাত্র নূতন সংবাদ আসেনি। অজানাকে স্বীকার করার দ্বারাই জানার পরিচয়—তাঁরই এই উক্তি, অথচ ভৌতিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা হঠাৎ সবকে জানা যায় এরকম ব্যবহার তিনি কেন করবেন। জানার পরিধি বিস্তৃত করার প্রথা অন্য, তাঁর অগণ্য রচনায় সেই উপলব্ধি আমরা পেয়েছি।

"সত্তার গভীরতম দর্শন এখানে আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কথা "পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি", অথচ তাকে "ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়াননি"—আপনার এই বর্ণনা সমীচীন। প্রবন্ধে সে কথা আপনি ব্যক্ত করেছেন।...একটা কথা আবার বলি। রবীন্দ্রনাথের পরিবারই এই আকাশ পৃথিবীর পরিবারকেই জুড়ে আছে, যখন তখন পরমাত্মীয়দের তিনি ডেকে পাঠাচ্ছেন, এই উদ্যোগের মধ্যে কী জানি একটা একান্ত নির্মমতা অনুভব করি। 'পারলৌকিক' ইতিবৃত্তে এ সম্বন্ধে কোনো চেতনা ধরা পড়েনি, অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব—যা তাঁর রচনায়, কথাবার্তায় কখনো ছিল না—লিপি সংগ্রহে গ্রথিত হল। যাঁরা কবির ইহলোকে ছিলেন ঘনিষ্ঠতম, তাঁরা সৃষ্টির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর এক একটি আত্মীয়রূপে, বিশেষ বয়সে গলার আওয়াজে আবদ্ধ এ রকম কথা ভাবতেও বাধা আছে। এর মধ্যে পারলৌকিকের ভৌতিক অসঙ্গতি এবং সম্বন্ধের অভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

"আমি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলাম উমা দেবীর আত্মসমাচ্ছন্ন তৎপরতায়— তিনি ছিলেন অসামান্য মহিলা। কিন্তু অবচেতনের বেগ এবং স্নায়বিক কোনো কোনো আশ্চর্য শক্তি পরলোকের প্রামাণিক নয়। মনস্তত্ত্ব এবং মানবিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সেই জানিত এবং অজানিত সূক্ষ্ম শক্তির মূল্য আমরা ক্রমেই আরো বুঝতে পারব।...রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং কথাবার্তা থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সমুজ্জ্বল, সেখানে তিনি দার্শনিক এবং কবির দৃষ্টিতেই প্রকাশিত। আপনি তাঁর অহংকারমুক্ত, নিয়ত সন্ধানী মর্মতম পরিচয় দিয়েছেন, আপনার প্রাঞ্জল, অনুশীলিত ভাষার যে উৎকর্ষ সমন্বয় ঘটেছে, আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাই।"

ডঃ চক্রবর্তী তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বলাই বাহুল্য, এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর 'পারলৌকিক সংযোগের' অনেক পরে নানা জনের কাছে নানা সময়ে অন্য রকম নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশকে ওই সময়েই লেখা চিঠিতে মিডিয়াম প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত।

এবারে ঋণ স্বীকারের কথা। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সর্বাগ্রে উৎসাহিত করেন পার্থ বসু। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আমাকে বহুবার বিস্মিত করেছে। নানা তথ্য দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী। আর ঋণী রমাপদ চৌধুরীর কাছে। তাঁর চেষ্টা ও আগ্রহেই পূজা সংখ্যা (১৩৮০) আনন্দ-বাজারে এত আড়ম্বরে আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে। তিনি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রাখা মূল্যবান নথিপত্র্যাদি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসদনের কর্মী শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পশুপতি শাসমল, চিত্তরঞ্জন দেব, গৌর সাহা ও অজিত পোদ্দার এবং পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও দেবী চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

অতিরিক্ত ছবি তুলে দিয়েছেন অলক মিত্র। স্বেচ্ছায় এ বইয়ের অঙ্গসজ্জার ভার নিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। আমি কৃতজ্ঞ। —অ. চৌ.

ভিন্নলোক থেকে নীরব নিরবয়ব আত্মারা আসেন? আসেন একদা-অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের একাগ্র আহ্বানে। তাঁদের চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না। তবু বোঝা যায় তিনি কে, কে এলেন। তাঁদের কথার বাহন এ-জগতেরই অন্য কেউ। সেই বাহনের হাত দিয়ে বেরোয় তাঁদের মনের ভাব, সুখ-দুঃখ, হাসি-আহ্লাদ।

একজন যান, আর একজন আসেন। যেন এক বিরাট নাট্যশালা। প্রবেশ আর প্রস্থান! কেউ নাম বলেন, কেউ বলেন না। রহস্যের জট কখনও খোলে, কখনও বাড়ে। তবে সব প্রশ্ন, সব জিজ্ঞাসা ছাড়িয়ে সবাই যেন একটি কথাই বলতে চান—'শেষ হয়ে যাইনি, আছি আছি আছি।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন হয়—কে তুমি, তুমি কে? সেই প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায় ঘরের চারপাশে, বাইরের উঠোনে, গাছের পাতায়; বহু দূর থেকে প্রতিধ্বনি হয়—কে, কে, কে?

> কে?
> —পাঠিয়ে দিলেন তোমার নতুন বৌঠান।
> জ্যোতিদাদা! সেদিন আপনার কথা শুনে আমার খুব উপকার হয়েছে। মনকে শান্ত করতে পেরেছি।
> —তুমি পারবে, আমি জানি।...

প্রশ্নকর্তা ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ আলাপ মুখোমুখি নয়, আকাশ থেকে আলাপ। হেমন্তের ম্লান সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়ির একটি ঘরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশরীরী আত্মা ওই একই ভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার আহ্বানে। এসেছিলেন পরলোকগত আরও অনেকে—সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়জন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, ছোট বৌ মৃণালিনী, নতুন বৌঠান কাদম্বরী, অজিত চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, সতীশ রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ মজুমদার—অসংখ্য বিদেহী আত্মা।

মৃত্যু সে তো মুছে যায়, তবু এঁরা এলেন কী করে? এলেন মিডিয়ামকে অবলম্বন করে। মিডিয়াম রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, 'কাব্যগ্রন্থাবলীর' সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা—যার ডাকনাম বুলা। সুন্দরী, কৃশকায়া, কবি। শয়নকক্ষের মেঝেতে গোল হয়ে বসেন তাঁরা দুজনে। রবীন্দ্রনাথ আর উমা

অর্থাৎ বুলা। বুলার হাতে লেখার খাতা আর পেনসিল। স্তব্ধ বিস্ময়ে পাশে বসে থাকেন অন্তরঙ্গ কেউ কেউ। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, প্রশান্ত মহলানবিশ, অমিয় চক্রবর্তী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা দেবী, অমিতা ঠাকুর এবং আরও অনেকে। আসর বসে কখনও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তেতলায়, কখনও শান্তিনিকেতনে উদয়নে। এক একবার এক এক দল।

অন্যরা দর্শক, প্রশ্ন করেন শুধু রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে আহ্বান, তারপর প্রার্থিত আত্মা ভর করেন উমা দেবীর দেহে। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে উমা দেবীর হাত দিয়ে কাছে রাখা খাতায় লেখা হয়ে যায় উত্তর। কোথাও কোন জড়তা নেই, নেই বক্তব্যের অসংলগ্নতা। তাছাড়া ইহজগতে যার যেমন মুখের ভাষা ছিল, সংলাপে যেন ঠিক তারই প্রকাশ এবং একজন যান তো আর একজন আসেন।

> কে তুমি?
> —বেলা।
> বেলা? ভালো আছিস?
> —হ্যাঁ, বেশ আছি।
> পৃথিবীর সব কথা মনে আছে? এখানের সঙ্গে তোর যোগ আছে?
> —আছে বই কি।
> শমীর সঙ্গে দেখা হয়? তাকে পাস কাছে?
> —হ্যাঁ, এই তো কাছে ছিল; এখনও আমার কাছে রয়েছে।...

জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা গেলেন, এলেন অন্য কেউ। প্রত্যেকের সঙ্গে চলে দীর্ঘ কথোপকথন। লোক বুঝে সেই রকম প্রশ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ। এবারে অজিতকুমার চক্রবর্তী।

> এসেছ কেউ? নাম কী?
> —অজিত।
> তোমাদের ওখানে যে মানবাত্মার সম্মিলন হয়, একটা কিছু Civiliza-tion তৈরী হচ্ছে? সকলের সমবেত চেষ্টায়?
> —সে তো গণ্ডীমাপা কিছু নয়, সে যে একটা বৃহৎ ব্যাপার।...

এইভাবে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকাল এবং সন্ধে দু' দফায়। রবীন্দ্র-নাথের প্রশ্নগুলো আলাদা একটি খাতায় কখনও লিখে রেখেছেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, কখনও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য আমাদের, পরম্পরা রক্ষা করে সব প্রশ্ন এবং সব উত্তর লিপিবদ্ধ হয়নি। ১৯২৯ সালের

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মাত্র চার দিনের সংলাপ সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাকি সংলাপের কিছু নিরুদ্দেশ, কিছু অসংলগ্ন অবস্থায় আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রানী মহলানবিশকে লেখা এক চিঠিতে আপশোস করে বলেছেন—"আমার দুঃখ, এই কথাগুলো কেউ লিখে রাখেনি।"

রানী মহলানবিশকে লেখা ওই চিঠির সূত্র ধরেই আমি রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার জগতে প্রবেশ করি। আমার কৌতূহল আমাকে টেনে নিয়ে যায় শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই আকাশ থেকে আত্মার আলাপের অনেক লিপিবদ্ধ কথোপকথন।

সব নেই, কিন্তু যা পেলাম তার তুলনাও নেই। আটখানা খাতা ভরতি সেই অলৌকিক সংলাপ। একটিতে উত্তর, অন্যটিতে প্রশ্ন। মিলিয়ে সাজানোর পর বেরিয়ে পড়লেন নতুন এক রবীন্দ্রনাথ। বহু দুঃখ, বহু শোক তাঁর ভিতরে জমা ছিল। অশরীরী প্রিয়জনদের সঙ্গে কথাবার্তায় কখনও বেরিয়ে পড়েছে স্নেহশীল পিতার রূপ, কখনও বা স্ত্রীবিয়োগবিরহী স্বামীর ছবি। আবার দেখি কখনও তিনি প্রিয়শিষ্যবিচ্ছেদে শোকাচ্ছন্ন কবি, কখনও বা পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছে রয়ে গেছেন সেই 'ছোট ভাই রবি'।

ওই দু' মাসেরই নানা দিনে বিভিন্ন আত্মাকে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসদনে রাখা লিপিবদ্ধ চার দিনের সংলাপ ছাড়া কয়েকটি চিঠি ও অন্তরঙ্গজনের সঙ্গে আলোচনায় আত্মা আনার উল্লেখ আছে। ১৯২৯ সালের পর রবীন্দ্রনাথ কোন আত্মাকে এনেছিলেন কিনা জানতে পারিনি। তবে অনেক আগে নানা সময়ে প্ল্যানচেটের সাহায্যে নানা জনের আত্মাকে যে রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন, তার দু-একটি কাহিনী রয়েছে।

প্ল্যানচেটে পরলোকচর্চা অবশ্য জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেকেই পরলোকতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতেন, বিদেহী আত্মাদের আনা হত। তার প্রথম উল্লেখ পাই জীবনস্মৃতিতে। ঠাকুরবাড়ির জনৈক খাজাঞ্চী কৈলাস মুখুজ্জেকে যখন প্ল্যানচেটে আনা হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। মুখুজ্জে-মশাই ইহলোকে রসিক ব্যক্তি ছিলেন। পরলোকে গিয়েও সেই রসিকতা তিনি বিস্মৃত হননি। প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁকে যখন ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় পরলোক জায়গাটি কেমন, তিনি উত্তর দেন, মরে গিয়ে অতি কষ্টে যা তিনি জেনেছেন, প্রশ্নকর্তারা না মরে তা জেনে নেবেন—সেটি হবে না।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্ল্যানচেট-কাহিনীর প্রমাণ তাঁরই একখানা চিঠি। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চান মাইকেল সম্বন্ধে কোন স্মৃতি তাঁর মনে আছে কিনা। কেননা এক সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাইকেলের যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন, "আমাদের বাড়িতে মাইকেলের গতিবিধির পরে আমার জন্ম। আমি তাঁকে দেখিনি।

একবার প্রেতবাণীবহ চক্রযানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা সাক্ষ্যরূপে আদালতে গ্রাহ্য হবে না। ইতি। ২১ শ্রাবণ ১৩৪৪।"

মাইকেলের মৃত্যু ১৮৭৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১২। অনুমান করি প্ল্যানচেট অর্থাৎ প্রেতবাণীবহ চক্রযানে-মাইকেলের আত্মাকে তিনি এনেছিলেন তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, বালক বয়সে। আরও অনুমান করা যায়, মাইকেলের মত অনাত্মীয় আরও অনেক গুণিজনই তাঁর প্রেতবাণীবহ চক্রযানে ধরা দিয়েছিলেন।

পরবর্তী আর একটি উল্লেখ পেয়েছি মালতী পুঁথিতে। বছর কয়েক আগে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই পুঁথিটি। মূল খাতায় রবীন্দ্রনাথের আদ্যিকালের বহু রচনার পান্ডুলিপির সঙ্গে থেকে গিয়েছে সেই প্ল্যানচেট-লিখন। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রাখা সেই মূল পুঁথিতেই দেখেছি অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে রয়েছে—

কি উপায়ে সাবধান কর্বেন ?
—করিবে।
তার জন্যে কি কল্লে ভাল হয় উপদেশ দিন।
—করিবে।
তিনি যে বিপদে পড়েছেন তাতে কি উদ্ধার পাবেন ?
—শীঘ্র না।
ন' বৌঠান কি যাবেন ?
—আমি তো বলিলাম।
(সনাতন মুখোপাধ্যায়)
আমি বসলেই কালীকুমার নন্দী কেন আসেন ?
—A fool.
তাঁকে তাড়ানো যাবে কী করে ?
—In the name of God.
তাঁর নাম কচ্চি, কিন্তু যাচ্ছে না—
—A certainty.
আর একবার লিখুন
—I meant to say, most solemnly.
আজ বড় গোলযোগ হচ্ছে
—আপনাকে প্রণাম করে বিদায় হই
...হাঁ
তুমি কোথায় থাক
—One one one

কোথায় থাক ?

– One one one

তুমি কে ! (জানকীবাবু ও ন' দিদি)

– Cally mohun

গুণদাদাকে এনেই তুমি যাবে কি ?

১৮৮০-৮১ সালের এই প্লানচেট-লিখনের প্রধান উদ্যোক্তা যে রবীন্দ্রনাথ, তাতে সন্দেহ নেই। ন' বৌঠান, ন' দিদি, জানকীবাবু, গুণদাদা ইত্যাদি সম্বোধন রবীন্দ্রনাথেরই। ন' বৌঠান—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী, ন' দিদি—স্বর্ণকুমারী দেবী, জানকীবাবু—ভগ্নিপতি জানকীনাথ ঘোষাল এবং গুণদাদা – অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু কালীকুমার নন্দী ও সনাতন মুখোপাধ্যায় কে, ঠিক জানতে পারিনি। সম্ভবত বাইরের লোক, ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত ছিল। তাছাড়া কার আত্মা সেদিন আনা হয়েছিল, তাও ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল, সেদিনের আগেও অনেকবার প্ল্যানচেট-চর্চা হয়েছে। নইলে 'আজ বড় গোলযোগ হচ্ছে' কথাটা বলা হত না। অন্যদিন নিশ্চয়ই গোলযোগ হয়নি।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধূ অমিতা ঠাকুরের কথায় আরও জানতে পারি, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ নাকি স্ত্রীকে অনেকবার এনেছিলেন। এমন কি প্ল্যানচেটে মৃণালিনী দেবীর সমর্থন না পাওয়ায় পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহের বহু সম্বন্ধ ভেঙে যায় এবং মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছানুসারেই অবনীন্দ্রনাথের বিধবা ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। প্ল্যানচেট ও মিডিয়াম নিয়ে শ্রীযুক্তা অমিতা ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি আমাকে বলেন, তাঁকে এই কথা বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী 'বড়মা' হেমলতা দেবী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, ১৩৫২ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে প্রকাশিত বিশ্বভারতী পত্রিকায় দেশবন্ধু-ভগ্নি ঊর্মিলা দেবীর একটি রচনার অংশ। তাতে তিনি লিখছেন যে, তাঁর মেজদিদি অমলা দাসকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে বলেন, "মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি (স্ত্রী) এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর

প্রিয় নতুন বৌঠানকে যে প্ল্যানচেটে অনেকবার এনেছেন, তার উল্লেখও আছে অনেক জায়গায়। কাদম্বরী দেবী এবং মৃণালিনী দেবীকে পরে মিডিয়ামের মাধ্যমেও রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এই দুই মহিলার সঙ্গে পারলৌকিক কথোপকথনের লিপিবন্ধ রূপ সম্পূর্ণভাবে আমি রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহশালায় পাইনি।

তবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তার কিছুটা নকল করে রেখেছিলেন। রানী মহলানবিশকে চিঠিতে লিখেছেন, কোন একটি দিনের কথোপকথন "কোন এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব।" কপি করে থাকলে হয় কারও কাছে আছে, নয় সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিংবা হয়ত করাই হয়নি।

রবীন্দ্রসদনের খাতায় নাম-না-বলা একটি আত্মার সংলাপ পেয়েছি। পড়লেই বোঝা যায়, তিনি কে। কাদম্বরী দেবী ও মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবির কথোপকথনের অনেক বিবরণ যে পারম্পর্য রক্ষা করে রাখা হয়নি বা রাখা হলেও পরে হারিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে রানী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলছেন—

"শেষের দিককার প্রশ্নোত্তরগুলো মোহনলাল লিখেছিল। ঠিক তাদের পরম্পরা রক্ষা করে লিখতে পারলুম। অন্যগুলো হিজিবিজি—কাটা কাগজের ভিতর থেকে উশ্ধার করেছি। কিন্তু তাদের পরম্পরা রাখতে পারিনি। আরও অনেক কথা লেখা হয়েছিল, খুঁজে পাওয়া গেল না।"

তবে খুঁজে খুঁজে অন্য অনেক জিনিস, যা আমি সম্প্রতি পেয়েছি, তা-ও আকারে বিরাট, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন আরও ভাল করে বোঝার পক্ষে অপরিহার্য। উত্তরগুলোর বিচার যাই হোক, প্রশ্নগুলোতো রবীন্দ্রনাথেরই, এবং তাতে তাঁকে নতুন করে জানা যায়। সেই আটখানি খাতা আটটি সোনার খনি। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, ভাগ্যিস তাঁরা ভৌতিক খাতাগুলি সযত্নে রেখেছেন।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে আমি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম খাতার খোঁজে। তখন গরমের ছুটি। রাস্তাঘাটে লোকজন কম। গেস্ট হাউস একদম ফাঁকা। বিরাট বাড়িতে একমাত্র অতিথি আমি। সকাল বিকাল দুইবেলা আত্মার সংলাপ নিয়ে আচ্ছন্ন থাকতাম। রাত্রে যখন একা গেস্ট হাউসে শুতে যেতাম, সেই আচ্ছন্নভাবের ঘোর কাটাতো না। মনে হতো বিনা আহ্বানেই ওরা ঘরে এসে গেছেন। জানালার গরাদে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শমী, ভিতরে চেয়ারে এসে বসেছেন কাদম্বরী দেবী, কিছু যেন বলতে চান মাধুরীলতা। আমার সারা গায়ে শিরশিরানি দেখা দিত। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জেবলে দিতাম। বাকি রাত কাটতো অনিদ্রায়। কিন্তু সকালবেলা হতো সুখের একটা অনুভূতি। যাঁদের কখনও দেখিনি, অথচ জানি নিবিড়-ভাবে—রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও চিঠিপত্রে—তাঁদের সঙ্গ পেতাম প্রতি রাত্রে, হঠাৎ

অলৌকিক হয়ে যাওয়া পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে আমার ছোট্ট ঘরটিতে। ইহলোক আর পরলোক কিছুদিনের জন্য আমার কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

দুই

এই খাতাগুলোয় পাওয়া সংলাপের পূর্ণ বিবরণ তুলে দেওয়ার আগে আলোচনা করা দরকার রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার সামগ্রিক দিক। প্ল্যানচেট বা মিডিয়াম প্রক্রিয়ায় পূর্ণ বিশ্বাস না রেখেই অনেকে পরলোকচর্চা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও কি তাই? বোধ হয় না। এই সম্পর্কে নানা চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার যতটুকু আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে বোঝা যায়. রবীন্দ্রনাথ এই সব পারলৌকিক আলাপ পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে থাকলেও কথাবার্তায় টের পাওয়া যায় তাঁর ঝোঁকটা যেন বিশ্বাসের দিকেই: তবে তিনি থিওসফিস্টদের মত পরলোকতত্ত্বকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়াননি।

আমেরিকায় মারগারি রেক্স নামে এক মহিলার সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই।" এই আশা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন তাঁর কবিতায় গানে প্রবন্ধে। জীবন আর মৃত্যুকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি এবং দেখেননি বলেই শোকের পর শোক—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যু—নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইহলোক থেকে পরলোকযাত্রা শিশুর মত স্তন থেকে স্তনান্তরে যাওয়া, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে প্রবেশ করা। দুই ঘরের মাঝখানে মৃত্যুর দুয়ার, সুতরাং "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?"

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে যে ফল ফলে, তার কথাও বার বার উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। শান্তিনিকেতন গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ, দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ।" সংশয় সন্তাপ শোকে ভরা এই ইহলোক মাঝে মাঝে তাঁর কাছে মনে হয়েছে প্রবাস। তিনি তাই বলেছেন, "এ পরবাসে রবে কে হায়।" কেননা এই পৃথিবী 'দুদিন দিয়ে ঘেরা' ঘর, মৃত্যুর পরেই মেলে 'চিরদিনের আবাস'। তারপর? তারপর 'আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে, দুঃখসুখের ঢেউখেলানো এই সাগরের তীরে।'

এত নিঃসংশয়ে এত সব মহৎ বাক্য উচ্চারণ করা সত্ত্বেও পরজীবন সম্পর্কে আরও জানতে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের অন্ত ছিল না, বার বার প্রশ্ন করেছেন,

'কী আছে শেষে ?' এই শ্যামল পৃথিবীকে এত ভালবেসেও, সুন্দর ভুবনে মরতে না চাওয়ার কথা বলেও রবীন্দ্রনাথ বার বার পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে শুধু ধরা নয়, প্ল্যানচেট ও মিডিয়ামের সাহায্যে পরলোকগত প্রিয়জনের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনাও করেছেন।

যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে প্ল্যানচেট বা মিডিয়াম বিশ্বাস করতেন ? এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট। ১৯৩৯ সালে তিনি কথাপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন—"পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব নেই ? কতটুকু জানো। জানাটা একটুকু, না-জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বই কি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়াটাই গোঁড়ামি।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)

এই 'খোলা মন' নিয়েই কবি প্ল্যানচেট ও মিডিয়ামের সাহায্যে তাঁর প্রিয়-জনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন। মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়েছেন উত্তরগুলো দেখে। অনেক সময় পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার উত্তরে বিশ্বাসও করেছেন।

এই প্রসঙ্গে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপের আর একটি অংশ তুলে ধরছি।

"যা সিস্টেমেটিক্যালি প্রুভড্ হবে না, তাতেই অবিশ্বাস। ক'টা বিষয় প্রমাণ হয়েছে সংসারে ? তাছাড়া এমন কিছু থাকা সম্ভব, যা প্রমাণ হয়নি, হতে পারে না। কারণ তা সব মানুষের কাজের গম্য হয়। সে গোপনে থাকবার জন্যই meant. দৈবাৎ কোন কোন মুহূর্তে কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির মনে তার এতটুকু প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোন স্থূল চিহ্ন রেখে যায় না। এই তো, (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো ? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা ?…ও কেন মিছে কথা বলবে ? কী লাভ ওর এ ছলনা করে ?…এমন সব কথা বলেছে যা ওর বিদ্যাবুদ্ধিতে কখনও সম্ভব নয়। যদি স্বীকার করবে, একটুও সময় না নিয়ে আমি প্রশ্ন করা মাত্র তার ভাল ভাল উত্তর, উপযুক্ত উত্তর, ও ফসফস করে লিখে যেতে পারে তাহলেও ওকে অসামান্য বলে মানতে হয়। আমি কী প্রশ্ন করব, তা তো আর ও আগে থেকে জানত না যে প্রস্তুত হয়ে আসবে ? এই ধর না, নতুন বৌঠান আমার সঙ্গে কী রকম ভাবে কথা বলতে পারেন, তা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত। তিনি বললেন—'বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।' একথা এমনি করে তিনিই আমায় বলতে পারতেন। ওর পক্ষে আন্দাজ করে বলা কি সম্ভব ? তা ছাড়া আরও অনেক কথা লিখেছিল, যা ও জানতে পারে না বা তেমন করে প্রকাশ করতে পারে না। একবার একটা

খাটি কথা লিখলে—'তোমরা আমাদের কাছে এত রকম প্রশ্ন কর কেন? মৃত্যু হয়েছে বলেই তো আমরা সবজান্তা হয়ে উঠিনি।' কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা সে লিখেছিল, অনেক বোঝাও গেল না। শমী বলছে—'আমি বৃক্ষলোকে আছি, সেখানে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করছি।' কে জানে কী তার মানে। যে রকম দ্রুত গতিতে লিখে যেত, আশ্চর্য লাগত। একটা কথা শুনে তার অর্থ বুঝে উত্তর লিখে যাওয়া এক মুহূর্ত বিরাম না করে, আমি তো মনে করি না যে সহজে সম্ভব। তাছাড়া এত মিথ্যা বলেই বা লাভ কী···খুব শক্ত সবল জোরালো মানুষ বোধ হয় ভাল মিডিয়াম হয় না। কিন্তু তারও বোধ হয় কারণ থাকতে পারে। কোন এক শ্রেণীর মনের পক্ষে হয়ত এর গ্রহণ সহজ হয়। আমি স্বপ্ন দেখিনে মোটে। এত কম স্বপ্ন দেখি। মাত্র একবার নতুন বৌঠানকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন তিনি নীরবে এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে, আমি বললুম, "তুমি কেন এলে, এখানে তো তোমাকে আর কেউ চায় না।"

মিডিয়াম বা প্ল্যানচেটে বিদেহী আত্মা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত পরিষ্কার। আর কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। আসলে রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম কৌতূহলই তাঁকে নিয়ে গিয়েছে পরলোকচর্চায়। ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অলীক বা আজগুবি বলে তিনি উড়িয়ে দেননি। এই বিষয়ে ১৯২৯ সালের ৯ নবেম্বর জোড়াসাঁকো থেকে রানী মহলানবিশকে লেখা তাঁর চিঠিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই চিঠি লেখার তিন দিন আগে, ৬ নবেম্বর, জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতলায় তিনি অনেক আত্মা আনেন। তাঁর চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ হল :

"···বুলা তার পরে আর একদিন এসে পেন্সিল ধরেছিল। এদিনও ভাববার মতো অনেক লেখা বেরিয়েছে। একটা বড় আশ্চর্য কথা পাওয়া গেছে। শমী এসেছিল। অন্য অনেক কথার মধ্যে সে বললে—'শান্তিনিকেতনের ধ্রুবকে আমার মনে পড়ে।' সে অনেক দিনের কথা। ধ্রুব এবং আর দুটি ছেলে শান্তিনিকেতনে আমারই বাড়িতে শমীর সঙ্গে একত্রে ছিল। বেলা তাদের দেখাশোনার ভার নিয়েছিল—তাদের পড়াশোনাতেও সাহায্য করত। ওর নাম যখন উঠল আমি কিছুতেই মনে আনতে পারলাম না। অপূর্ব (অপূর্বকুমার চন্দ) বললে, হাঁ, ধ্রুব বলে এক ছাত্র ছিল। রাত্রে বিছনায় শুয়ে হঠাৎ ওই তিনজনের কথা মনে পড়ল। ধ্রুবকে বেলা খুব স্নেহ করত। তার কথা শমীর মনে পড়বে এটাই সঙ্গত। কিন্তু বুলার হাত থেকে একথা বের হলো কী করে? শমীর কথাগুলি ভারি মজার রকমের। সুকুমারের কথাও খুব যেন তারই মতো। মোহনলাল এগুলো লিখে নিয়েছে, কোনো এক সময় দেখতে পারো।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাসী নন। গোড়ায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় তিনি ছিলেন না। সে সময়ে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, লেখাগুলো তাঁর নিজেরই অবচেতন মনের প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম তা একেবারেই উড়িয়েও

দেননি। উমা দেবীর হাতে মৃত মণিলাল গাঙ্গুলীর কথা বের হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি রানী মহলানবিশকে ওই একই সময়ে (৬ নবেম্বর, ১৯২৯) আর একখানা চিঠিতে লেখেন ঃ

"উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার নয়। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সব সময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে। আমি যখন বললুম মনে হচ্ছে যেন মণিলাল কথা কচ্ছে, তখন সেই মনে হওয়াটা সম্পূর্ণই আমার আত্মগত হতে পারে। তবু ধারণা হয়েছিল একথা মানতে হয়। মোট কথা আমাকে কতকটা ভাবিয়ে দিয়েছিল।"

এই ভাবনা পরবর্তী পর্যায়ে আরও বেড়েছিল এবং সম্ভবত ঝোঁকটা বেশি ছিল বিশ্বাসের দিকেই। উমা দেবীর হাতের লেখার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা যখন ওঠে, তখন তিনি তার চারদিন পর (১০।১১।২৯ রানী মহলানবিশকে আর একখানা চিঠিতে লেখেন ঃ

"...প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার হাত দিয়ে যে লেখাগুলো বেরোয় বিশেষ করে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এসব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাক্টস বলা যায়, তাই নিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নই। যে গান নিজে রচনা করেচি, পরীক্ষা দিতে গেলেও তার কথাও মনে পড়বে না, তার সুরও নয়। একবার জিজ্ঞাসা করেছিল চন্দননগরের বাগানে যখন ছিলাম তখন আমার বয়স কত। আমাক বলতে হয়েছিল, আমি জানিনে। বলা উচিত ছিল, প্রশান্ত জানে! আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলুম সে দু বছর হলো না তিন বছর না চার বছর, নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে। শমীর মৃত্যু হয়েছিল কবে, মনে নেই। বেলার বিয়ে হয়েছিল কোন বছরে কে জানে। অথচ টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণা মাত্র। তুমি জোর করে বলছ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গী। আর কেউ যদি বলে না ; তারপরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে তা না থাকতে পারে, কিম্বা অন্য রকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সবচেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা, এটাকে কেউ বানাতে পারে না। আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্য আমার চেয়ে প্রশান্ত বেশি জানে, কিন্তু জানার চেষ্টা করলেও আমার মোট ছবিটা সে নিজের মধ্যে ফোটাতে পারবে না। আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মীয়তায়।

"ইতিমধ্যে পর্শু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই।

তারপরে যেসব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোন এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাবো।"

আত্মার অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস কত প্রবল ছিল তার পরিচয় আছে নানা জনকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে। যৌবন বয়সেই তিনি হঠাৎ হঠাৎ নিজের দেহ এবং নিজের আত্মাকে আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারতেন। ১৮৯০ সালের ২৯শে আগস্ট বিলেতের পথে এডেন থেকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে এক চিঠিতে লেখেন—

"রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল, আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড় খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি (মাধুরীলতা) খোকা (রথীন্দ্রনাথ) শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বললুম—ছোটবৌ মনে রেখো, আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমায় দেখতে পেয়েছিলে কিনা।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারছেন প্রবল প্রতিভায়। চিঠিটি পরিহাসচ্ছলে লেখা নয় এবং অনুমান করতে পারি, তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর অশরীরী উপস্থিতি সেই বিশেষ রবিবারের রাত্রে তিনি অনুভব করেছিলেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই ব্যাপারে কত দৃঢ়মূল ছিল, তার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

এই বিশ্বাসপ্রবণতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাশ্চাত্ত্যের বহু বৈজ্ঞানিক বহু দার্শনিক বহু সাহিত্যিক প্রেততত্ত্বের অনুশীলনে মেতেছিলেন। স্যার অলিভার লজ, ইয়েটস, ইমানুয়েল কাণ্ট, কোনান ডয়েল, ব্রাউনিং, [illegible]কে—কত নাম বলব। স্যার আরথার কোনান ডয়েল তো তাঁর হিস্ট্রি অব স্পিরিচুয়ালিজম নামক বইয়ে পরিষ্কার লিখেছেন—

It founds our belief in life after death and in the existence of invisible world not upon ancient tradition or upon vague intuitions, but upon proven facts, so that a science of religion may be built up and may give a sure pathway amid the quagmire of the creeds".

থিয়সফিকেল সোসাইটির জারনালগুলো পড়লে (যা রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত পড়তেন) কিংবা স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইয়ের পাতা ওল্টালে পারলৌকিক কথোপকথনের বহু কাহিনী জানা যায়। এই প্রসঙ্গে দু'খানা বই—ব্রাড স্টাইগারের 'ভয়েসেস ফ্রম বিয়ণ্ড' এবং সুসী স্মিথের 'ট্রু এক্সপেরিয়েন্সেজ ইন কমিউনিকেটিং উইথ দি ডেড' (মারলিন এবন সম্পাদিত)—পড়লে বিস্ময়কর

বহু ঘটনায় চমৎকৃত হতে হয়। শোনা যায়, প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হলে মিডিয়ামের সাহায্যে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। ১৯২৯ সালে উমা দেবীর মাধ্যমে পারলৌকিক কথোপকথনের আগে এবং পরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের মধ্যে তারতম্য ঘটে। দশ বছর পর ১৯৩৯ সালে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে জোর গলায় তিনি মিডিয়াম প্রক্রিয়ার সমর্থন করেছেন। ১৯·৯ সালের আগে অন্য অনেকের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর গলার সুর কিন্তু একটু অন্য রকম ছিল।

মৈত্রেয়ী দেবীর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে পরলোক সম্বন্ধে সুন্দর একটি তথ্য আছে।

১৯২০ সালের নিউ ইয়র্ক সিটি কাগজে একটি খবর ছাপা হয়। খবরের উপর প্রকাণ্ড শিরোনামা—'স্যর অলিভার লজ ও তাঁর শিষ্যদের প্রমাণ ভারতীয় কর্তৃক বাতিল।'—এতে কবি বিরক্ত হন। অলিভার লজের মতামত এবং প্ল্যানচেটের সাহায্যে পরলোকগতের সঙ্গে আলাপ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে আলোচনা করতে যে আমেরিকানটি গিয়েছিলেন, অনুমান করা যায় যে, তিনি ভেবেছিলেন আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় কবির কাছে নিশ্চয়ই পারলৌকিক বিষয়ে অনুকূল তথ্য পাওয়াই যাবে। কিন্তু ফল বিপরীত হল। তিনি লিখলেন—'রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু পূর্বদেশ পশ্চিমের প্রতি মিডিয়ামের সাহায্যে টেবিলচলা প্রভৃতি ভৌতিক পরীক্ষার বিষয়ে এক বিন্দুও সহানুভূতির বাণী পাঠায়নি। আমাদের উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে ভারতের মহাকবি বললেন—"মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে লাভ কিছুই নেই। জীবনের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বোধ আছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে যে সে কী আকার নেবে সে সম্বধে কোনই ধারণা নেই। যেমন ডিমের ভিতরে বন্দী পাখীর ছানা জানে না তার খোলসের প্রাচীরের বাইরের জীবন কী রকম।...এ জীবন ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে এক মস্ত যবনিকার আড়াল। তার নিশ্চয় কোন বিশেষ অর্থ আছে। যেমন ডিমের খোলার ভিতর শাবককে রাখার মানে আছে। যদি সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা, বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় নেওয়া শাবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হত, তাহলে নিশ্চয় জানবেন তার কোন ব্যবস্থাও থাকত। কিন্তু সময় না হলে খোলস যে ভাঙা হয় না। পক্ষী-শাবকের জীবনের মধ্যে ডিম্বকালের পক্ষে সেটাই হিতকর।

"মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে একটা সঠিক স্থির ধারণা করে নেওয়া চলে না। সেটা করতে চেষ্টা করাই materialistic, সে শুধু অসীমকে সীমা দেবার চেষ্টা করা। লোকে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা পরকালের বিষয় সমস্ত খবরই রাখে। আত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধেও বিস্তারিত সবই জানা। এতে শুধু

সেই অসীম চিরপ্রশ্নগুলিকে সীমা দিয়ে কলঙ্কিত করা হয়। এ আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

"আত্মা পাখির মত আকাশচারী হতে চায়। এই সব অনুসন্ধান তর্ক ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা কল্পনা তার সেই মুক্ত পক্ষের শুধু বাধা সৃষ্টি করে। এর দ্বারা আমরা স্থান ও কালের ধারণার সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকি। তাতে অনন্ত বা অসীমের বোধ জন্মাতে বাধা হয়। আমাদের সাধনা হোক কালজয়ী হবার, পাওয়া চাই সেই আনন্দ যা পরমানন্দ। যে আনন্দবোধ আমাদের অতীত বা ভবিষ্যতের কোন খবর দেয় না, শুধু অনন্তের সংবাদ দেয়—যা অসীম শাশ্বত ও চিরবর্তমান।"

আগন্তুক একজন আমেরিকান কবির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে বলেন, "তা সত্ত্বেও আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মান্তরবাদের তত্ত্বে মোহিত হয়েছি এবং আমাদের চিন্তায় ও সাহিত্যে তার প্রভাব বেড়ে চলেছে।"

রবীন্দ্রনাথ: "হবে। আমার কোন মতবাদ নেই। আমি কোন বাদ-এ বিশ্বাস করি না।"

আগন্তুক আর একজন বললেন, "কিন্তু আপনার চেয়ে সুন্দর করে জন্মান্তরের গান তো কেউ গায়নি।" বলেই তিনি মৃদুস্বরে আবৃত্তি (ইংরেজী অনুবাদে) করলেন—তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তর দিলেন—"অসম্ভব নয় যে আমরা বারে বারে জন্মাই। কিন্তু সে কেবল আন্দাজী কথা। অনন্ত আমাদের বালকোচিত খুঁটিনাটি কৌতূহল মেটায় না।"

এই জন্মান্তর ও পরলোক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা হয় স্টপফোর্ড ব্রুকসের সঙ্গেও। তিনি 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে নিজেই লিখেছেন—

"কথায় কথায় তিনি (ব্রুকস) এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কিনা। আমি বলিলাম—আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি, তখন মনে হয়, এ কখনই হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস। ইহার আগেও এমন কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনও হইবে না, যে বিশেষ কারণবশতঃ জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীর জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে এইটাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পূর্বজন্মে কোন কোন মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে একথা আমি মনে করিতে পারি না। কেননা

প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়। সেই ধারায় হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসঙ্গত।

ব্রুকস বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরের বিশ্বাসটাকে সঙ্গত মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস নানা জন্মের মধ্য দিয়া আমরা যখন একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্ব জন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে।"

ব্রুকসের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ আছে শান্তিনিকেতন গ্রন্থে 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধে। প্রবন্ধে বলেছেন, "য়ুরোপের লোকেরা ধর্ম বিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।"

ব্রুকসের সঙ্গে আলোচনার প্রায় ১৮ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে লেখেন—

"জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারবে। প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে গেলে যেমন সমস্ত বাক্যটির অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপারের ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।"

পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মৃত আত্মার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, প্ল্যানচেট ইত্যাদিতে তাঁর বিশ্বাস লজ নানা প্রমাণ সহযোগে লিখেছিলেন। ১৯২৮ সালের 'স্ট্র্যাফোর্ডশায়ার সেন্টিনেল' কাগজে উভয়ের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে।

পরজীবন ও জন্মান্তর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ওই সব আলোচনা মারগারি রেক্স নামক মহিলার সঙ্গে আলোচনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী থেকেও রবীন্দ্রনাথ পরজীবন সম্পর্কে তাঁকে আরও একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়েছেন। 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের আর এক জায়গায় লেখা আছে :

১৯২০ সালে 'ওয়াশিংটন' নামক কাগজে এডিশনের মেশিন বলে একটি যন্ত্রের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ঐ যন্ত্র মৃত্যুর পরে সত্তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে, এই ছিল প্রতিপাদ্য। মারগারি রেক্স নামে এক মহিলা কবির সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এসে প্রশ্ন করেন—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকবে কিনা এবং এডিশনের মেশিন সম্বন্ধেই বা তাঁর মত কী।

কবি বললেন, "পরজীবন সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই মনে করতে পারি যে, যা ঘটবে, তাতে নি[illegible]। মৃত্যু আছে, তা সত্ত্বেও জীবন ফুরায় না। জীবনের সম্পূর্ণ অংশের মধ্যে সা[illegible]ই আছে, বিরোধ নেই। যে নূতন পৃথিবীতে এল, তার সঙ্গে যে-জীবন পৃথিবীতে ছিল, তাকে গ্রহণ করবার জন্য

তাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য আছে, তেমনি যে-জীবন শেষ হবার মুখে, সেও যে নূতন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আশা করা যায় সেখানেও বিরোধ থাকবে না, সামঞ্জস্যই থাকবে? আর এডিশনের যন্ত্র সম্বন্ধে আপনারা আমার মত জানতে চান। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যক্তিসত্তার মৃত্যুর পরও অস্তিত্ব থাকে কি না। কিন্তু আমরা এই লোক থেকে কখনই স্থির করতে পারবে না যে, মৃত কোন অবিনাশী সত্তার আমাদের তৈরি কোন যন্ত্রে সাড়া দেবার উপায় বা ইচ্ছা থাকবে কি না। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই। তবে মানুষের কাছে তার প্রমাণের জন্য আমি কোন যন্ত্রের প্রয়োজন দেখি না। ধরা যাক, মেশিন সেই সত্তার কাছে কোন খবর পৌঁছাতে পারল না, তা হলেই তার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয়ে যাবে না।"

স্বদেশেও রবীন্দ্রনাথ নানা জনের সঙ্গে জন্মান্তর ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা। ১৯২৬ সালে। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই 'আলাপ আলোচনা' নাম দিয়ে ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ বের হয়। তাতে পরলোক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"যেটাকে আমরা জগৎ বলি, যার সঙ্গে আমার ব্যবহার, সেটাকে আমরা বিশেষ বোধশক্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে কিছুই আন্দাজ করা যায় না। সবাই জানে আমার দেখবার দৌড়, আমার শোনবার দৌড় সীমাবদ্ধ। আলোকরশ্মি বা বায়ুতরঙ্গের কেবল অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ নিয়ে আমাদের কারবার। তাছাড়া আমার মন নামক যন্ত্রটা কেবল বিশেষ একটা সীমার মধ্যে বিশেষ এক রকম জানতে পারে। আমরা যে-জিনিসটাকে যা বলে বোধ করছি, আমাদের সীমাবদ্ধ বিশেষ প্রকৃতির বোধশক্তি গুণেই সেই জিনিসটা আমার কাছে বিশেষভাবে তাই। আলোকরশ্মির মস্তকটাকে আমার চোখ যদি এতটুকুমাত্র ছাড়িয়ে যায়, তাহলে যেটাকে যা দেখছি, সেটা একেবারে আরেক রকম হয়ে যাবে। আমাদের জগৎটাকে শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই সংসারটা যদি ডিম হয় তবে এর খোলটা কী দিয়ে তৈরি? আমাদের সীমাবদ্ধ বোধ দিয়ে। আমার বোধগম্য জ্ঞানগম্য এই বিপুল জগৎটা আমার এই সীমাবদ্ধ বিশেষ মনঃপ্রকৃতির মধ্যেই অবরুদ্ধ। সেই অবরোধের মধ্যে আমার যা সুখদুঃখ, যা চাওয়া-পাওয়া তাকে সকল অবস্থাতেই বলে মনে করতে পারিনে।"

দিলীপকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শুনে বলেন, "এক কথায় আপনি আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করেন না।"

রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "এটাও তুমি বেশি বললে। ডিমের মধ্যে শাবক থাকে। ডিমের বাইরে যা আছে, তা সে একেবারেই জানে না। ডিমের ভিতর যেটুকু, তা' তার খাদ্যে ভরা। তার মধ্যে দিন নেই, রাত্রি নেই।

মনে করা যাক, শাবকটি চিন্তাশীল এবং পরজন্মের কথা চিন্তা করে। আপন ডিমের ভিতরকার অবস্থাকেই চিরন্তন না মনে করলে অমরতা সম্বন্ধে যদি এই জীবটির রুচি না থাকে তাহলে আমরা ঈষদহাস্য সহকারে বলতে পারি—বাপু, বেরিয়ে এসো; তারপরে কোন্‌টা তোমার পছন্দ, কোন্‌টা অপছন্দ তা নিয়ে আলোচনা করো। আমাদের মর্ত্যজীবনের ডিমের মধ্যে যা দেখছি বা পাচ্ছি, সেইটেই যে অসীম কালের জন্য আমাদের শ্রেয় বা প্রেয়, মৃত্যুর পরে আমাদের 'রলস রইস' মোটরকারের প্রেতাত্মাকেও সঙ্গে না পেলে আমাদের যে ক্ষতি বা অসুবিধা আছে, এটা সেই চিন্তাশীল শাবকের মতোই কথা হলো।"

দিলীপ রায়ের অতঃপর প্রশ্ন—"আমাদের ইচ্ছা জিনিসকে অসীমতা দিতে চায়। এইটেই কি আমাদের কাছে আমাদের অমরতার প্রধান, এমন কি একমাত্র প্রমাণ নয়?

রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, "আমরা কী ইচ্ছা করি বা না করি, সেটা এ সম্বন্ধে প্রমাণ নয়। প্রমাণটা আছে আমাদের জন্মগত সংস্কারের মধ্যে। তাকে অন্ধ সংস্কার বলতে পারো—কারণ সেটা যে কেবল যুক্তির অনুকূল তা না, সেটা যুক্তির প্রতিকূলে। ডিমের ভিতরকার জগৎটাই যে চরম জগৎ নয়, এটা শাবকের পক্ষে নিতান্তই অযৌক্তিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক শাবক কথাটাকে এমনিভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়ের মধ্যে এই আলোচনা দীর্ঘ। পরলোক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝার জন্যে তার বক্তব্যের আরও কিছু কিছু অংশ আলাদা তুলে দিলাম—

—"দেহ থেকে মুক্তি হলেই যে আত্মার মুক্তি হয়, একথা আমি বলতে পারিনে।"

—"আমাদের শাস্ত্রে বলে মুক্তির অবস্থায় এসে না পৌঁছন পর্যন্ত আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে জন্ম নিতে থাকে।"

—"মুক্তি অনির্বচনীয়, মুক্তি প্রমাণের অতীত, কেননা সেই চরম সত্য।"

—"মৃত্যুর পরবর্তীকালে আমাদের এখনকার সব ইচ্ছা যে ইচ্ছারূপেই থাকবে, একথা মনে করতে পারিনে।"

নানা জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা প্ল্যানচেট বা মিডিয়াম সম্পর্কে তার বিশ্বাসের পাশাপাশি রাখলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সহজ হবে। নয়ত এমন কথা মনে হতে পারে যে তিনি যেন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী পৃথিবী-বিমুখ একজন অধ্যাত্মবাদী। সে ধারণা ভুল। মিডিয়ামের সাহায্যে যে সব আত্মার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছেন, তাতে তিনি ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার চেয়ে অসীম অনন্তে পরিব্যাপ্ত পরজীবনের রহস্য জানবার আগ্রহই বেশি প্রকাশ করেছেন। ইহজীবন ও পরজীবন সম্পর্কচ্যুত নয়, মৃত্যুর পরেও নূতন জগৎ আছে এবং কোন মৃত্যুতেই ইহসংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—এই বোধ তার সদা-জাগ্রত ছিল। শান্তিনিকেতন গ্রন্থে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

"বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী? যিনি গেলেন, তিনি গেলেন বটে, কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোন লক্ষণ দেখিনে। সূর্যালোকে তো কোন কালিমা পড়ে নি, অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগে চলেছে।"

এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই 'চিঠিপত্র' ৪র্থ খণ্ডের একটি চিঠিতে। দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কন্যা মীরা দেবীকে সান্ত্বনা দেবার সময় নিজ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় তাঁর শোককে তিনি কীভাবে সংহত করলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন চমৎকারভাবে। জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের মাধুরী চারদিকে ঠিক একইভাবে ঝরতে দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চাকা আকাশের নীল নির্মলতায় ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারেনি, বিশ্ব সংসারে কোথাও কিছু কম পড়েনি।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র হিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখা আর একখানা চিঠি (বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯)। তিনি বলছেন, "মৃত্যু দুঃখ পাপ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যার সম্বন্ধে প্রশ্নের অন্ত নেই— তার শেষ জবাব দিতে পারি এমন শক্তি আমাদের কারো দেখিনে। মোটের উপর কেবল এই কথায় বলা যায় যে, মৃত্যু যখন বিশ্বব্যাপী তখন ওকে জীবনের অঙ্গ বলেই স্বীকার করে নিতে হবে। ও যদি জীবনের বিরুদ্ধ হতো, তাহলে এতদিনে জগৎটা শূন্য হয়ে যেতো। অতএব যারা চলে গেল, জীবনের প্রবাহে তারা যে বাধা পেল একথা মনে করবার দরকার নেই। নদীর মতো সে এক বাঁক থেকে আর-এক বাঁকে গেল, কিন্তু তার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রইল। তা যদি না হয়, তবে জীবনের এত প্রচুর অপব্যয় জগতের তহবিলে সইবে কী করে? আর যাই হোক না কেন, বিশ্বব্যবস্থা তো উন্মত্তের প্রলাপ নয়। এর মধ্যে প্রতি ধূলিকণা সম্বন্ধে পাকা হিসাব দেখা যায়—কেবল কি প্রাণ সম্বন্ধেই সমস্ত উচ্ছৃংখল? কিন্তু তাই বলে যদি প্রশ্ন কেউ করে, তাহে যে প্রাণ আমাদের গোচর থেকে সরে যায় তার হয় কী, তবে সাফ জবাব দেওয়া উচিত যে, জানিনে। যারা বলে, জানি এবং পরলোকের ভূবৃত্তা ত ম্যাপে এঁকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করে তাদের কথা আমি একবর্ণও বিশ্বাস করিনে। অপেক্ষা করে থাকা ভাল, যখন জানবার সময় আসবে, তখন আপনি সব জানা যাবে। ডিমের ভিতরে বাচ্ছা কিছুই জানে না যে ডিম ফুটলে তার কী হবে—কিন্তু তাতে তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। ইতি ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।"

তবে, আগেই বলেছি, এত সব বলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ১৯২৯ সালের পর রবীন্দ্রনাথের পারলৌকিক চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সেই বছরই তিনি জানতে পারেন, তার বিশিষ্ট বন্ধু শান্তিনিকেতনের একদা-অধ্যাপক "কাব্যগ্রন্থাবলী"র সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দেবীর (বুলা) মিডিয়াম হবার যোগ্যতা আছে। তখন থেকে পরলোক

সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল শুধু বাড়েনি, পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বাসনাও বেড়েছে। ঠাকুর বাড়ির ধারা অনুযায়ী আগে যে সব পরলোকচর্চা করেছেন, সবই প্ল্যানচেট মারফত। ১৯২৯ সালেই সর্বপ্রথম মিডিয়ামের সাহায্য নিলেন। প্রথমে অবশ্য তিনি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ ছিলেন। ১৯২৯ সালের ৬ নবেম্বর রানী মহলানবিশকে সেই চিঠিতে লিখছেন—

"সেদিন বুলা এসেছিল। হঠাৎ কথায় কথায় প্রকাশ পেল তার হাতে প্রেতাত্মা ভর করে পেন্সিল চালিয়ে কথা কইতে পারে। বলা বাহুল্য শুনে মনে মনে হাসলুম। বললুম—আচ্ছা দেখা যাক। প্রথম নাম বেরোল মণিলাল গাঙ্গুলি। তার কথাগুলোর ভাষা এবং ভঙ্গীর বিশেষত্ব আছে। উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সেই কথা কইছে।"

প্রথমে সন্দেহ, পরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস জন্মেছে উত্তরগুলোর প্রকৃতি দেখে। এই মিডিয়াম সম্পর্কে কেউ সন্দিগ্ধ হলে, তিনি রাগই করতেন; বলতেন, নূতনকে জানার আগ্রহ কেন হবে না, জানতে দোষ কী!

তিন

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮/৬৯, কানাডা থেকে ফিরেছেন জুলাইয়ে। সঙ্গে ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিছু দিন হল রথীন্দ্রনাথ হয়েছেন শ্রীনিকেতনের সচিব। ছবি আঁকা চলছে পুরোদমে, ইউরোপে প্রদর্শনীর কথা ভাবছেন। যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও মহুয়া রচনা আগে পিছে শেষ। নূতন নাটক লিখলেন তপতী। শান্তিনিকেতনের পর জোড়াসাঁকোয় অভিনয় হল চার রাত্রি—২৬, ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর। কবি নিজে সাজলেন রাজা বিক্রম। মহিষী ভ্রাতুষ্পৌত্রবধূ এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অমিতা ঠাকুর: অভিনয়ের পর আবার ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে।

তখন পুজোর ছুটি। ছুটি কাটাতে রথীন্দ্রনাথ গেছেন সপরিবারে রাঁচি। উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ একা। ইন্দিরা দেবীকে সে সময় এক চিঠিতে লেখেন —"আজকাল সঙ্গীর অভাব সবচেয়ে অনুভব করি।"

পুজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন, মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে বুলা বা উমা সেন—পরে গুপ্তা, শ্রীশিশিরকুমার গুপ্তের স্ত্রী। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। উমা গুপ্তার লেখা দুটি কবিতার বই আছে, তার একটির নাম 'ঘুমের আগে'। অন্য কবিতার বই বের হয় তাঁর মৃত্যুর পর। নাম 'বাতায়ন'। ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যে-ই জানতে পারলেন বুলার মধ্যে আছে অতি প্রাকৃত মিডিয়ামের শক্তি, নিঃসঙ্গ কবি তৎক্ষণাৎ বুলার সেই শক্তিতে আকৃষ্ট হলেন। রবীন্দ্রজীবনীগ্রন্থে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখছেন:

"বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে। বৃদ্ধবয়সে এতকাল পর এই পরিচিতা মিডিয়ামের সাহায্যে অতি প্রাকৃত তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বুলার অসামান্যতা ছিল। কবির মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করিয়াছেন, মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়া আপন ঘোরে অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে বুলা উত্তর লিখিয়া যাইতেছে। প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিয়া কবি স্তম্ভিত হইতেন।"

উমা দেবীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অনেক আত্মা এনেছেন। আগেই বলেছি, সব আলাপের লিপিবদ্ধ বিবরণ নেই। সম্ভবত গোড়ায় প্রশ্ন ও উত্তরগুলো এক সঙ্গে মিলিয়ে রাখার প্রয়োজন কেউ মনে করেননি কিংবা হয়ত উমা দেবীর হাতের লেখা যত্নে তুলে রাখার কথাও কেউ ভাবেননি। তাই পুজোর ছুটিতে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে যে সব আলাপ হয়েছিল তার কোন বিবরণ নেই।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ আত্মা আনেন ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮, ২৯ নভেম্বর ও ১৬ ডিসেম্বর। তার মধ্যে ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের লিপিবদ্ধ বিবরণ নেই, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তার উল্লেখ আছে এবং আলাপের কিছু কিছু অংশ তাতে তিনি তুলেও দিয়েছেন। রবীন্দ্রসদনে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর ও ১৫ ডিসেম্বর তারিখে আলাপের। সেই বিবরণের কোন কোন অংশের উল্লেখ আছে রানী মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে।

যাঁদের রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ করে ডেকেছেন এবং যাঁরা মিডিয়ামকে ভর করে এসেছেনও, তাঁদের মধ্যে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতা (বেলা), কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়, বন্ধু লোকেন পালিত, বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক কবি-শিষ্য সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়জন।

তাছাড়া না ডাকতেই চলে এসেছেন কবির স্নেহধন্য অপূর্বকুমার চন্দের স্ত্রী ও কবিবন্ধু চারুচন্দ্র দত্তের কন্যা লোপামুদ্রা, মা সারদা দেবীর সখী সর্বজয়া, সরিৎবাসিনী, রসিমণি দাসী, হালদার মশাই আরতী মল্লিক, শান্তি মিত্র, চণ্ডীবালা প্রমুখ। লোপামুদ্রা চন্দ বাদ দিলে এরা কেউই রবীন্দ্রনাথের পরিচিত নন। এই রকম অযাচিত আগন্তুকদের মধ্যে একজন নিজের নাম বলেছেন 'মালাকর' বলে। আর একজন বলেছেন তিনি 'কায়াহীন বিদেহী আত্মা'।

দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, তাঁদের কাজ অন্য আত্মাকে পেঁাছে দেওয়া। আর একটি আত্মা নাম বলেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম জানতে না চাওয়াতে তিনি বিস্মিত হন, বলেন, 'আপনার কৌতূহল তো বড় কম!'

এ ছাড়াও, বার বার আর একজন এসেছেন স্বল্পক্ষণের জন্যে এবং নিজের নাম কিছুতেই ঘোষণা করেননি। রবীন্দ্রনাথও পীড়াপীড়ি করেননি। কিন্তু তিনি বুঝেছেন কে, এবং আমরাও বুঝেছি, নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ছাড়া তিনি আর কেউ নন। এই ভদ্রমহিলার কথাবার্তাও সব সময় রহস্যময়। বেশিক্ষণ থাকেন না। কিন্তু বার বার আসেন।

রবীন্দ্রনাথ নতুন বৌঠানকে বার বার তো এনেছেনই, একমাত্র ওই নতুন বৌঠানকে দেখতেও চেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"নতুন বৌঠানকে বলেছিলুম দেখা দিতে, চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। পারবেন?" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জবাবে বলেন, "তার ইচ্ছাশক্তি যে কত দূর, তা তো জানিনে। তবে খুব একটা ইচ্ছাশক্তি তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে।"

নতুন বৌঠান ছাড়া বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন শমীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। বার বার তাঁর আত্মাকে এনেছেন, জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলাকে বলেছেন, চঞ্চল শমীকে যেন তিনি কাছে কাছে রাখেন। অন্য যে সব আত্মা এনেছেন, তাদের প্রায় সবাইকে জিজ্ঞেস করেছেন, শমী কেমন আছে, তার সঙ্গে ওদের দেখা হয় কিনা। তাছাড়া শমীকেই বার বার জিজ্ঞেস করেছেন লৌকিক পৃথিবীর সব কথা তাঁর মনে আছে কিনা। শিলাইদার চর, শান্তিনিকেতনের আশ্রম, বীরপুরুষ কবিতা, মীরাদিদি, রথীদাদার কথা। নানা প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বেঁচে থাকলে তাঁর বৌঠান প্রতিমা দেবী শমীকে যে কত ভালবাসতেন, সে কথাও জানাতে ভুলে যায়নি।

একমাত্র শমীর আত্মাই তাঁর বাবার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছেন, মনে হয়েছে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে তার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে এবং একমাত্র শমীই একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছেন, তার বাবার কোন একটা কবিতা তাঁর ভালো লাগেনি, বলছেন "বিশ্রী"। জীবিত পিতা রবীন্দ্রনাথ যখন কোন একটি বিষয়ে মৃত পুত্রকে সাহায্য করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, শমী তখন বাবার অসাধারণ ক্ষমতায় আস্থা রেখে বলেন—"তুমি আবার পারো না!"

শমী জানান, তিনি পরলোকে গড়ে তুলছেন একটা নতুন পৃথিবী। বাবাকে বলেন, "শমীর পৃথিবী" নাম দিয়ে তিনি যেন একটি রচনা লেখেন। রবীন্দ্রনাথ জানান, তিনি যখন পরলোকে যাবেন, তখন সেই পৃথিবী গড়তে পুত্রকে সাহায্য করবেন। এই "শমীর পৃথিবী" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের অন্ত নেই। অন্য আত্মাদের জিজ্ঞাসা করেন, সেই পৃথিবীটা কী রকম।

শমীকে বলেন, তাঁর চরিত্র কবির নিজের মত, দুজনেই ভাবুক। শমী সব সময় বলেন, তাঁর অনেক কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাতে বিস্মিত হন, প্রশ্ন করেন, "কী তোর এত কাজ ?" আবার পরক্ষণেই এমনভাবে কথা বলেন, যেন ছাড়তে চাইছেন না, যতক্ষণ কাছে থাকেন, ততক্ষণ তৃপ্তি, ততক্ষণ আনন্দ। অল্প বয়সে শমীর মৃত্যু তাঁর স্বাভাবিক চারিত্রিক দৃঢ়তায় সহ্য করেছিলেন বটে, কিন্তু পুত্র-শোকাতুর পিতার ভিতরে দুঃখের আগুন সেই বৃদ্ধবয়সেও যে জ্বলছিল, সব স্নেহ সব ভালোবাসা যে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য জমা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শমীন্দ্রনাথের আত্মার সঙ্গে কথাবার্তায়। অন্য একটি আত্মা জানান, পরলোকে শমীও নাকি বাবাকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় যে, আত্মার উত্তরগুলো ভুয়া, তাহলেও প্রশ্নগুলো তো মিথ্যে নয়। এই প্রশ্ন দিয়েই আরও ভালভাবে জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে। কে তাঁর অন্তরঙ্গ, কার প্রতি কী রকম সম্পর্ক, কী তার জিজ্ঞাস্য, সব কিছুই ধরা পড়ে গেছে আত্মার সঙ্গে আলাপের সময় তাঁর প্রশ্নাবলীতে। রবীন্দ্রনাথকে আরও ভাল করে জানতে, আরও ভাল করে বুঝতে তাই এই ভৌতিক সংলাপগুলি একান্ত দরকার। যেমন রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গাঙ্গুলির একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁর সত্তা নারী ও পুরুষ চরিত্র দিয়ে তৈরী এবং তার মধ্যে নারীত্বের ভাগ বেশী। সেই কারণেই মেয়েদের মন তিনি এত ভাল বোঝেন। এ ধরনের স্বীকারোক্তি আরও অনেক ছড়িয়ে আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল। অন্য কোন আত্মা এলেই বলেছেন, "সত্যেন্দ্রকে একটু পাঠিয়ে দাও।" সুকুমার রায়ের আত্মার সঙ্গে আলাপের জন্যও তিনি উৎসুক ছিলেন। পিয়ারসন সাহেবকে পাওয়ার আগ্রহও দেখিয়েছেন, কিন্তু পিয়ারসন আসেননি, অন্য বার্তাবহ আত্মাকে দিয়ে তিনি খবর পাঠান, এখন আসতে পারছেন না, পরে আসবেন।

রবীন্দ্রনাথ মা'র আত্মাকেও আনার চেষ্টা করেছিলেন তবে আমার সংগৃহীত লিপিবদ্ধ বিবরণে মায়ের আসার কোন উল্লেখ নেই। শুধু মায়ের এক সখীকে বলেন, "মা কি একবার আসতে পারেন না ?"

পিতা দেবেন্দ্রনাথ, বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বা মধ্যম কন্যা রেণুকা এই তিন-জনকেও আনেননি। বাবার কোন উল্লেখ নেই, তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে জিজ্ঞেস করেছেন, "বড়দাদার সঙ্গে দেখা হয় ?" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরে বলেন, "তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন, সম্বোধন করে বলা চলে না।" সন্তোষ মজুমদারের আত্মাও একই উত্তর। ইহলোকে ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের পরলোকেও তন্ময় থাকাটাই স্বাভাবিক। শমীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনায় মেজ মেয়ে রেণুকা বা রানীর কথা ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জানতে চান, রানীদিদির সঙ্গে শমীর দেখা হয় কিনা। তবে আলাদাভাবে মেজ মেয়েকে আনার কোন বিবরণ আমি পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তিন ভাইয়ের সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই কারণেই ওদের সঙ্গেই পারলৌকিক কথোপকথনে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তার মধ্যে দু'জনকে ডেকে এনেছেন, শুধু বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে পাননি। ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে সব চেয়ে কাছের ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। তাঁকেও এনেছেন।

সন্তোষকুমার মজুমদার ছিলেন তাঁর পুত্রসম। মণিলাল গাঙ্গুলি, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশ রায়, সুকুমার রায়, সত্যেন দত্ত এঁরা সবাই ঘনিষ্ঠ শিষ্য। বন্ধুদের মধ্যে লোকেন পালিত ও মোহিতচন্দ্র সেন। এঁরা সবাই এসেছেন রবীন্দ্রনাথের ডাকে।

রবীন্দ্রনাথ পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-বৌঠান ছাড়া বিদেহী আত্মার প্রায় সবাইকেই তিনটি প্রশ্ন করেছেন। (এক) আপনার বা তোমার ধর্মবিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি-না (দুই) পরলোকে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক কী রকম এবং উভয়ের মধ্যে সম্ভোগ বাসনা আছে কি-না এবং (তিন) নূতন জন্ম নিতে ইচ্ছে হয় কিনা।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করাটা স্বাভাবিক। সমসাময়িক উপন্যাস যোগাযোগ ও শেষের কবিতার মূল বিষয় ওই স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্কই। সম্ভবত সেই সময় রবীন্দ্রনাথের মাথায় ওই বিষয়টি ঘুরছিল। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অন্তরঙ্গদের বার বার প্রশ্ন করাতে সন্দেহ হয়, রবীন্দ্রনাথের নিজ ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও হয়ত সে সময় নানা প্রশ্ন এসেছিল। দীর্ঘ কাল লালিত বিশ্বাস থেকে সরে আসার সময় মৃত অন্তরঙ্গদের কাছ থেকে সম্ভবত সায় আদায় করে নিতে তিনি চাইছিলেন। তখনই রবীন্দ্রনাথ লেখেন হিবার্ট লেকচার—মানুষের ধর্ম। জন্ম নিতে ইচ্ছা করে কিনা, সেই প্রশ্নও অনেককে করেছেন। কেউ বলেছেন করে, কেউ বলেছেন করে না। অজিত চক্রবর্তী জানান, শান্তিনিকেতনে জায়গা পেলে তিনি রাজী।

অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশ রায় দু'জনে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন। এই দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তায় শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ এসেছে এবং এই দু'জনের সঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের মান অনেক উঁচুতে বেঁধে রেখেছিলেন। অকালমৃত সতীশ রায়কে বলেছেন, তিনি বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি হতেন। এতে সতীশ রায় লজ্জা পান, বলেন, "তখন ছিলেন সরস্বতীর গলার হার, এখন তাঁর মাথার মুকুট।" রবীন্দ্রনাথ সতীশ রায়ের কাছে অজিত চক্রবর্তী সম্পর্কে বলেন, "পৃথিবীতে যেমন করত বিচার বিশ্লেষণ, এখনও কি তাই?" সতীশ রায়ের উত্তর—"ভারি বিচার ভালবাসে, কিন্তু এখানে কি বিচার চলে?"

রবীন্দ্রনাথ অনেকের কাছে জানতে চেয়েছেন, তাঁর ইহজীবনের আর কত বাকি। এই প্রসঙ্গে মণিলাল গাঙ্গুলির আত্মাকে তিনি বলেছেন, আমি এত

ভালবাসি এই পৃথিবীকে। মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য কি পাব না ? আবার অনেককে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজন কাউকে কোন খবর দিতে হবে কিনা। সন্তোষ মজুমদারকে বলেছেন, তাঁর স্ত্রী শৈলদেবীকে কোন খবর দিতে হবে কিনা, তার বন্ধু রথীন্দ্রনাথকে কিছু বলতে হবে কিনা। এই সন্তোষ মজুমদার জীবিত থাকতে বাগান করতে ভালবাসতেন, মৃত্যুর পরও তিনি বাগান নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর স্ত্রী শৈলদেবীকেও রবীন্দ্রনাথ মারফত উপদেশ তিনি দেন, বলেন—যেন বাগান করেন।

অপূর্বকুমার চন্দের স্ত্রী লোপামুদ্রা এলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "অপূর্বকে কিছু বলবার আছে তোমার ?" তার উত্তরে লোপামুদ্রা বলেন, "ও সুখে থাক" এবং তারপর বড় মেয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। লোপামুদ্রার মুখে "আমার বড়ো মেয়ের মন ভালো থাকে না"—এই কথাটা যে সত্য তার সমর্থন পেয়েছি অপূর্বকুমার চন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের কাছে।

বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গও উঠেছে মিডিয়ামে। সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তার একমাত্র ছেলেকে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে ভরতি করে নিতে।

—আচ্ছা, আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন ?

তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।

—তাকেও বলুন না।

তাকে পেলে আমিও খুব খুশি হব।

পরের খবর, রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের স্ত্রী ও সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায়কে এই অনুরোধের কথা বলেন। সত্যজিৎ রায়ের বয়স তখন মাত্র আট। ছোট বলে একমাত্র সন্তানের মা তাতে রাজী হননি, কিন্তু কথা দেন, বড় হলে পাঠাবেন। সেই জন্য ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায়। তবে ওই অনুরোধের অব্যবহিত পরে মা ও ছেলে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে থেকেছিলেন।

ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্পর্কে নানা আত্মা, নানা রকম উত্তর দিয়েছেন। সুকুমার রায়ের উত্তরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম সমাজের উপর শ্রদ্ধা আছে কিনা রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে সুকুমার রায় উত্তর দেন—"না, ও পথ ঠিক নয়।"

সত্যেন দত্ত যখন আসেন, রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন প্রশান্ত মহলানবিশ। অনুরোধমত সত্যেন দত্তের আত্মা দু লাইন কবিতা লিখে দেন। প্রশান্ত মহলানবিশও সত্যেন দত্তকে কিছু প্রশ্ন করেন। কোন কোন আত্মাকে দিয়ে ছবি আঁকানোর চেষ্টাও হয়েছে। যেমন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সেই সময়েই "তপতী" অভিনয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেককে জিগ্যেস

করেছেন, তপতী নাটক ও অভিনয় কেমন লাগল। বড় মেয়ে বেলাকে যখন বলেন, উত্তর আসে—

—বাঃ ছিলুম যে সেদিন!

ভালো লেগেছিল?

—বড়ো সুন্দর। শুধু দেখা নয়, পাওয়া, জানা, অনুভব করা। আমি যুবা সেজেছিলুম। আমাকে দেখেছিলি?

—মানিয়েছিল সুন্দর।

শুধু অভিনয় নয়, নিজের নতুন কবিতা সম্পর্কেও মতামত জানার আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। সত্যেন দত্তর কাছে প্রশ্ন, সাম্প্রতিক কোন্ বই তাঁর ভালো লাগে। জবাব—'পলাতকা' এবং তার মধ্যে 'মুক্তি' কবিতাটি। নতুন লেখা মহুয়া সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন অনেককে। আধুনিক কবিদের কবিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে সতীশ রায় বলেন, 'আপনার কবিতার সমুদ্রে ভাসছি, পানাপুকুরে কেন ডুবে মরব।'

আত্মার অনুরোধে গানও গেয়েছেন দু-একটি ক্ষেত্রে। সুকুমার রায় অনুরোধ করেন 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ শুরুও করেন। কিন্তু খানিক পরে কথা ও সুর ভুলে গিয়ে বলেন—"সুকুমার, তুমি আমায় বড় শক্ত ফরমাশ করেছ, সব কথা মনে থাকে না।" তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজের পছন্দমত গেয়ে শোনান 'অন্ধজনে দেহ আলো'। শুনে সুকুমার রায় বলেন—"বড় ভাল লাগল।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুকুমার রায়ের অনুরোধেই তাঁর মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ গান শুনিয়ে এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের নানা প্রশ্ন ছিল। সন্তোষ মজুমদার, অজিত চক্রবর্তী ও সতীশ রায়কে এই ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করেছেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে তাঁর মনে কত দুশ্চিন্তা ছিল, আত্মার সঙ্গে আলাপের সময়ও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আত্মার সবাই উত্তর দিয়েছেন বাংলায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একবার শুধু মাঝে মাঝে ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করেছেন। লোকেন পালিতের উত্তরগুলো অন্য রকমের—সবই সাধু ভাষায়। দু-একজন আত্মা বক্তব্যে জোর দেওয়ার জন্য কোন কোন শব্দের চার ধারে চৌকো লাইন টেনে দিয়েছেন। বড় বড় অক্ষরেও লেখা হয়েছে দু-চার জায়গায়।

আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রায় সব আত্মাই পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হবার কথা বলেন এবং যত প্রিয়জনই হোন না কেন, বেশিক্ষণ থাকতে চান না, আসার খানিক বাদেই বলেন—'যাই যাই যাই।'

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে যে আটখানা খাতা আছে তার ক্রমিক সংখ্যা ৭। নাম দেওয়া আছে 'ভৌতিক প্রসঙ্গ'। একখানা খাতা খুচরো কাগজে

লেখা। মোট ২৪ পৃষ্ঠা। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নকল। ওটা রবীন্দ্রসদনে আনা হয় ১৯৫৭ সালের ১৭ অক্টোবর। তাছাড়া সাতখানার একটি গেরুয়া রঙের মলাটের লাইনটানা খাতা। ডঃ অমিয় চক্রবর্তী ও অন্য একজনের নকল। অনা ৬টি খাতা ইস্কুলের এক্সারসাইজ বুক। প্রথম মলাটে ইংরেজিতে লেখা—দি ইউনিভার্সাল বুক, এ সি পাল ৩৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, ক্যালকাটা। পিছনের মলাটে লেখা 'ক্যালেন্ডার ফর ১৯২৬'। একখানি খাতায় ভৌতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা-ভাষণের পেন্সিলে লেখা নোট আছে। নোট নিয়েছেন ডঃ অমিয় চক্রবর্তী। তাতে—কেমন করিয়া জানাবে, আমারে দিই তোমার হাতে, একটি নমস্কারে, হে চিরনূতন ও তুমি যে এসেছ মোর দ্বারে গানগুলির রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা রয়েছে। এগুলো কোথাও ছাপা হয়নি এবং অতি দ্রুত লেখা বলে পড়তে কষ্ট হয়। এই একই খাতাতেই অমিয় চক্রবর্তীর হাতের লেখায় অনেক ছোট ছোট জার্মান কবিতাও আছে।

আর একখানা খাতার পিছনে মলাটে লেখা আছে 'ক্যালেন্ডার ফর ১৯২৮'। উপরে হাতে লেখা 'নোটস অব কনভারসেসন'। তিন নম্বর খাতার উপরে লেখা—বেঙ্গল এক্সারসাইজ বুক, ১৩৪-১৩৫ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রিট, ক্যালকাটা।

অন্য একটি খাতায় ভৌতিক সংলাপ তো আছেই, আর আছে কলাভবনে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার নোট, তাঁও সম্ভবত ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর নেওয়া। এই আলোচনায় নন্দলাল বসুও যোগ দিয়েছিলেন। তারিখ দেওয়া আছে ২৪-৪-৩১ ইং। এই আলোচনাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

এই খাতাগুলোয়, আগেই বলেছি, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী প্রশ্নগুলি টুকে রাখেন, অন্য দু-একজনের হাতের লেখাও আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশ্ন এবং উত্তর একসঙ্গে মিলিয়ে রাখা আছে। আত্মার উত্তরগুলো সবই পেন্সিলে লেখা।

দু-একটি জায়গায় প্রশ্ন এবং উত্তরে গরমিল দেখা দিয়েছে কয়েকটি শব্দও বোঝা যায়নি। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে কথোপকথনের উত্তরগুলোই শুধু আছে, প্রশ্নগুলো কোথাও নেই। কিন্তু উত্তরগুলো এমনই, প্রশ্ন না থাকলেও সব বোঝা যায়। আমি অনুমানে প্রশ্নের ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছি।

ভৌতিক সংলাপের পূর্ণ বিবরণ তুলে দেবার আগে আর একটি কথা বলা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সন্তোষ মজুমদার, পিয়ারসন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকলেই পরলোকগমন করেছেন মিডিয়ামে আত্মা আনার অল্প কয়েক বছর আগে।

যে ক'জন আত্মা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু অপঘাতে। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছিলেন। অন্যজন অপরিচিতা। অপমৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা মত ছিল। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি বলেছেন—

"অপমৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথা কী মনে হয় জানো? হঠাৎ যে বন্ধন ছিন্ন হয়, হয়ত তা সুসমঞ্জসভাবে ছিন্ন হয় না। যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে তার পুরানো বন্ধন মুক্ত হয়ে নতুন অস্তিত্বে প্রবেশ করবার জন্য হয়ত একটা পথ পার হবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, সে ছেদ হয়ত ভালোভাবে হয় না। এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবেশ তাই বিলম্বিত আর অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। জানিনে অবশ্য এসব কী হতে পারে বা না পারে। সমস্তই অনিশ্চিত। তবে মনে হয় অপমৃত্যু অস্বাভাবিক বলেই তার মধ্যে একটা যন্ত্রণা থাকা সম্ভব—তার যে ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল না। সেজন্যে আরও একটা কথা মনে হয়, যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে তখন শোকাকুল হয়ে তাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে, যখন দেখেছি কোন আশাই নেই, তখন আমি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র করে মনে করেছি—"তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি তোমার নির্দিষ্ট পথে। নিজের সন্তানকে আঁকড়ে রাখতে চাইনি। যেতে যখন হবেই, তখন যেন আমার আসক্তি, আমার বেদনা তাকে মর্ত্যের সঙ্গে বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে যেন কষ্ট পেতে না হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল, সেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করাই উচিত। ঘটনা প্রবাহ আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি তো আমার হাতে আছি।"

নিজেও তিনি এই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রশান্তচিত্তে, পিছন ফিরে তাকাননি। মৃত্যুর পর অসংখ্য প্রিয়জনের মাঝখানে পরলোকেও নিশ্চয় তিনি তাঁর ইহলোকের মতামতে আরও নিশ্চিত হয়েছেন।

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় নেমেছিলেন। আমরা এ-পারের লোকেরা পরলোক সম্বন্ধে যদি এখন কোন সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলি, তাহলে ঠাকুরদাদা যেমন অমলের পিসেমশাই মাধব দত্তকে বলেছিলেন, অনুমান করি ঠিক তেমনি হয়ত দূর থেকে আমাদেরও রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"চুপ করো অবিশ্বাসী।"

চার

নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। ঠাকুরবাড়িতে বালিকাবধূরূপে তিনি যখন এলেন, তাঁর বয়স ৯, রবীন্দ্রনাথের ৭। নিঃসঙ্গ বালকের তিনিই ছিলেন সঙ্গী, তাঁর সাহিত্য জীবনের বিকাশে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত্রী।

বহু গানে, বহু কবিতায় এই নতুন বৌঠান জড়িয়ে আছেন। তাঁকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। দাদাদের

মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সুখের দিন। তাঁদের সঙ্গেই বেড়াতে গেছেন দার্জিলিং, গেছেন চন্দননগর। বহু কবিতার বই কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গ করা। 'ছবি ও গান' বইয়ের উৎসর্গে লিখলেন—

"গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ-বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিত, তাঁহারি চরণে উৎসর্গ করিলাম।"

'ছেলেবেলা, বইয়ে লিখেছেন: দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটিতে ছাঁচিপান। বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা।

সেই নতুন বৌঠান আত্মহত্যা করলেন ১৮৮৪ সালে, মাত্র ২৫ বছর বয়সে। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ভুলতে পারেননি, জীবন সায়াহ্নে এসেও বার বার স্মরণ করেছেন স্নেহময়ী মমতাময়ী নতুন বৌঠানকে। শৈশব সংগীত বইয়ের উৎসর্গে লিখেছেন—"বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়া লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। এই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।" আবার পরিণত বয়সে এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বৌঠাকুরাণীর একখানা আলোকচিত্র দেখেই তিনি লেখেন সেই বিখ্যাত কবিতা 'ছবি'। বলেছেন, 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' ১৯৩১ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লেখেন, "আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন, শিশুকাল থেকে আমার জীবন পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।"

এই মৃত্যুবিচ্ছেদ কবির মনে কী প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, তার পরিচয় অসংখ্য রচনায়। 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক গদ্য কবিতাগুচ্ছে লিখছেন—"হে জগতের বিস্মৃত আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এসব লেখা যে তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তপথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না। এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না। কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না। যেসব লেখা তুমি এতো ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছে বলিয়াই তোমার

সঙ্গে আর কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর এক দেশে আর এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?"

'লিপিকা' গ্রন্থের নানা রচনায় নতুন বৌঠানের শোক উথলে উঠেছে। লেখক বলেছেন, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ?" উত্তর পাই—"আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।" এবং তাঁর ভাষায় "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

অন্য এক জায়গায় কবি বলেন, "মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানকে। মজা এই দেখ না কেন, যারা মরে যায়, তাদের আর বয়স বাড়ে না। আমার নতুন বৌঠান, তার আর বয়স হলো না কোনদিন।"

এই পরমাত্মীয় মৃত্যুর পরেও বার বার ঘুরে ফিরে এসেছেন কবির জীবনে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে স্বপ্ন দেখেছেন অল্প কয়েকবার, দেখেন নতুন বৌঠানের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, 'তুমি কেন এলে, এখানে তো তোমাকে আর কেউ চায় না।'

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন মিডিয়ামে কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ আনেন, কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

—"বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।"

রবীন্দ্রনাথ সেই পুরাতন সম্বোধনে বৃদ্ধ বয়সেও খুশি হয়েছিলেন।

এই কাদম্বরী দেবী যখন মিডিয়ামে আসতেন, কদাচিৎ নাম বলতেন, কিন্তু কথার ধরনে রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন তিনি কে?

১৯২৯ সালের ৪ নভেম্বর। কাদম্বরী দেবী এলেন।

কে?

—নাম জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি মনে যা ভাবছ, আমি তাই।

তারপর মিডিয়ামে কাদম্বরী যা বললেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য।—"যে সব কথা বেরোলো সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ জানে না।"—(রানী মহলানবিশকে চিঠি)

আর একটি দিন। ১৯২৯ সালের ২৮ নভেম্বর। আবার নতুন বৌঠান।

কে?

—এখন তো সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন তো আসবো না জানো।

না, এখন কাজ নেই।

সেই নভেম্বরেরই ঊনত্রিশে। বিকেল। শান্তিনিকেতন।

কে? কী নাম?
—আমি একটি কথা বলে চলে যাব। জানি কিছুকাল তোমার কাছে আসা সম্ভব হবে না।...
আমার কাছে আসার দরুন কোন ক্ষতি হয়েছে তোমার এখন?
—না, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি কার ভিতর দিয়ে আসব।
ঐখানে যে মিডিয়াম আছে, তাকে অবলম্বন করে তো আসতে পারো।
—তিনি যদি না থাকেন?
তিনি থাকবেন না, তা তো জানি।
—সেই কথাই বলছি।
হাঁ, অনেকদিন হয়ত পাবো না। আবার কলকাতায় যখন ডাকবো, তখন আসবে?
—বেশ, যাই।

খানিক বিরতি। আবার আত্মার আবির্ভাব। আবার রবীন্দ্রনাথ নড়েচড়ে বসেন

কে? কী নাম?
—যাইনি।
ভালো। তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা করেছি, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হয়নি?
—না, ভাল লেগেছে।
কাল রাতে কি এসেছিলে?
—বলবো না।
কাল রাতে কি কাছে এসেছিলে?
—কথা বলব কী করে?
হয়ত এসেছিলে আমার মনে হয়। মিডিয়াম না থাকলে আসতে পারো না? এখানে আর কোন মিডিয়াম আছে বলতে পার?
—না, কেমন করে বলব, ঠিক কে যে ডেকে নেয়, তা তো আগে থেকে বোঝা যায় না। তুমি মুশকিলে পড়েছ, আমি যাই।

এবারেও নাম নেই। কিন্তু অনুমান করা যায় কাদম্বরী দেবী। তারপর আর একদিন। ১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর। রাত।

কে ?

—কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

তুমি নাম বলবে না ?

—না।

একটা কবিতা লিখে দেবে ?

—আমার বিদ্যে কি অজানা ?

আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভাল ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি। তুমি জানতে ?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম। কেমন করে বা বোঝাব।

আমি তোমাদের কিছু বুঝতে পারিনি। কী করে আস, কী করে যাও, থাক—কিছু বুঝতে পারিনে।

—শেষ রাত্রে শিরশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে, আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলেছিলুম একদিন যে, আমার অসুখ করেছে। তুমি যদি এসে থাক আমায় একটু সেবা করে দাও।

—তুমি চাও, কিন্তু ভুল করে দেবার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কী মুশকিলে ফেলেছি।

কিছু মুশকিলে ফেলে নি। তোমার এখন যে রূপ আছে, সে কি আগের মতো—তোমায় আমরা যেমন দেখেছিলুম ?

—শমীর ভাষায় বলা যায়, কারো বা ঝড়ের হাওয়ার মত, কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।

তোমরা পরস্পরকে দেখ যে, জানো যে, সেটা কেমন করে হয় ?

—হাওয়ার কি রূপ নেই ?

আমাদের কাছে তো হাওয়ার রূপ নেই।

—ভাব আছে, গতি আছে, বেগ আছে।

তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কি ঐরকম প্রভেদ—যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার প্রভেদ ?

—না না, অন্য রকম। বোঝানো যায় না। তুমি আমায় দেখলে ঠিক চিনবে। আমার ছায়াটা আজও আছে, প্রাণ আছে, দেহ নেই শুধু।

কোন নাম নেই, ইনিও সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী।

বৌঠান গেলেন, এলেন ছোটবৌ। কল্যাণী বধূরূপে ১৮৮২ সালে ঠাকুর-বাড়িতে যাঁর আবির্ভাব, সেই মৃণালিনী দেবী ইহজগত থেকে বিদায় নিলেন ১৯০২ সালে—মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে। সাধারণ বাড়ির মেয়ে, কেউ কেউ বললেন, বিশ্বকবির উপযুক্ত না। কিন্তু সেই গ্রামের মেয়েটিই পরে হলেন রবীন্দ্রনাথের গৃহলক্ষ্মী। জোড়াসাঁকোয় তিনি কর্ত্রী, শিলাইদহে সুখী সংসারী, শান্তি-নিকেতনে আশ্রমজননী। নিজের গয়না বিক্রি করে স্বামীর সাধের শান্তি-নিকেতনের খরচ জুগিয়েছিলেন তিনি।

মৃণালিনী দেবী হঠাৎ আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। "স্বল্প আয়ু এ-জীবনে যে কয়টি আনন্দের দিন" ছিল, তা ফুরিয়ে এল, "এ সংসারে একদিন নববধূ বেশে" পাশে এসে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বিদায় নিলেন। রবীন্দ্র-নাথের বয়স তখন একচল্লিশ।

শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোয় এনে রাতের পর রাত দিনের পর দিন সহধর্মিণীর সেবা করলেন রবীন্দ্রনাথ, নার্স রাখতে দিলেন না। কিন্তু সব শেষ। পাঁচটি সন্তান আর স্বামীকে ফেলে মৃণালিনী দেবী শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। দৃঢ়চিত্ত রবীন্দ্রনাথ শোকের আঘাত সামলে নিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে রচনা করলেন অনবদ্য কবিতাগুচ্ছ—স্মরণ। বললেন, "তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।"

বাড়ির সবচেয়ে ছোট বৌ। আদর করে স্বামী ডাকতেন—'ছুটি'। সেই 'ছুটি' যখন ছুটি নিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর অভাব সম্পর্কে অনেকদিন পর মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন: "সবচেয়ে কী কষ্ট হতো জানো? এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে। ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়—সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না।"

নিজের মনের মত করে স্ত্রীকে দিন দিন তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লরেটোতে পাঠিয়ে শেখালেন ইংরেজি, পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত। বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদও করেছিলেন মৃণালিনী।

স্বামীর জলখাবার নিজের হাতে রোজ তৈরি করতেন তিনি। রান্নাঘরে মোড়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ ফরমাশ করতেন, এটা বানাও, ওটা বানাও। মৃণালিনী দেবীর হাতের চিড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মেঠাই যে একবার খেয়েছেন, কোনদিন ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথও না। স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক বছর পর শান্তিনিকেতনে হেমলতা দেবী ঘরে-তৈরি খাবারের থালা নিয়ে এলে রবীন্দ্রনাথের মন স্ত্রীর জন্যে হু-হু করে ওঠে, হঠাৎ বলে ফেলেন, "ঘরের মিষ্টিতে আর আমার দরকার নেই।"

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় যখন রোজ বাড়ি ফিরতেন, জোর গলায় হাঁক দিতেন, 'ছোট বৌ, ছোট বৌ'। সেই 'ছোটবৌ' যখন শেষশয্যা নিলেন,

রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণ শিয়রে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্নী তখন কেবল বলেন, "আমাকে বলছ 'ঘুমোও ঘুমোও'। শমীকে রেখে এলে শান্তিনিকেতনে। আমি কি ঘুমোতে পারি তাকে ছেড়ে। বোঝো না সেটা ?"

মৃণালিনী দেবী, কবির আদরের ছোটবৌ, অবশেষে বিদায় নিলেন স্বামীর কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ শেষকৃত্য সেরে চলে গেলেন বাড়ির ছাদে। একা। বারণ করে গেলেন কেউ যেন উপরে না ওঠে। সারারাত পায়চারি করেছিলেন কবি। উনিশ বছরের দাম্পত্য-সুখের অবসান হঠাৎ হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই কি সব কিছুর অবসান ? না, ফুরাতে গিয়েও সব ফুরায় না। ঘুরে ফিরে ছোটবৌ বার বার এসেছেন, গৃহলক্ষ্মীর অদৃশ্য হাত সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে কবির জীবন।

ছোটবৌকে রবীন্দ্রনাথ মিডিয়ামে আনলেন ৫ নভেম্বর, ১৯২৯। স্থান জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘর।

কে ?

—না, বলব না, আমার নাম তুমি বল ?

ছোটবৌ নাকি ?

—হ্যাঁ।

কেমন আছ ?

—যাদের ভালবাসি তারা তো একে একে আমার কাছে এল।

(যাদের ভালবাসি বলতে মৃণালিনী দেবী নিজের ছেলে-মেয়েদের কথা বোঝাচ্ছেন। তখন মাধুরীলতা,রেণুকা, শমীন্দ্রনাথ তিনজনই তাঁর মৃত্যুর পর একে একে পরলোক-গমন করেছেন।)

পৃথিবীর সঙ্গে তোমার বন্ধন কি প্রবল আছে ?

—আছে বৈ কি। একথা জিজ্ঞেস করো কেন ? জানো না কি ?

আমার কাজকর্ম, সাধনার প্রতি তোমার interest আছে ?

—আছে। ··আমার মন সমস্ত অন্তর থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করে।

রথীর কাজে তোমার সম্মতি আছে ?

—সে কি আমায় জিজ্ঞাসা করবার। তার কাছে যিনি আছেন, তিনি দেবতার মতো আলো দেখাবেন।

স্ত্রীর বিদায়ের পর এলেন 'বলু'। মৃণালিনী দেবীর মতই মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা গেলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাকনাম 'বলু'। রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা ছিলেন তাঁর রবিকাকার মতই। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঠিক সেইভাবে তাঁকে তৈরিও করছিলেন, ভেবেছিলেন

এককালে তাঁর আদরের বলু গদ্যরচনায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠবে।

ওড়িশায় যখন নৌকোয় জমিদারী দেখতে যান সঙ্গে যান বলু, শিলাইদহে যখন সংসার পাতেন নিয়মিত আসেন বলু। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম খসড়াও করেন বলু। পিতা বীরেন্দ্রনাথ উন্মাদরোগগ্রস্ত। অভিভাবক, শিক্ষক, সাহিত্য-গুরু সবই 'রবিকাকা'। রবীন্দ্রনাথও পুত্রবৎ স্নেহ করেন তাঁকে। দিব্যদর্শন গৌরকান্তি সেই বলু এক অঘটনে হঠাৎ মারা গেলেন যৌবন অতিক্রম করার অনেক আগে। ১৮৯৯ সালে।

৫ নভেম্বর। জোড়াসাঁকো। সেই ঘটনার ঠিক ত্রিশ বছর পর বলেন্দ্রনাথ এলেন।

কেমন আছ? সুখে আছ?

—বেশ।

দেহহীন আত্মা নিয়ে আনন্দ পাও?

—আনন্দ? যদি পাই তো সে আমারই সৃষ্টি।

আমার নতুন রচনার সঙ্গে পরিচয় আছে?

—আছে। ভালো লাগে খুব। যুগের পর যুগ যেন নব নব ধারায় চলেছে।

তপতী দেখেছ?

—ছিলাম।

কী রকম লাগল?

—কী আশ্চর্য!

তোমার এখানকার রচনার কোন অনুবৃত্তি কি সেখানে আছে?

—চলবে না চলবে না। সে যে কী ছেলেখেলা ছিল আমার।

রচনার কাজে তোমার মন আছে কি?

—ভাবি খুব। মনের ভিতর যেন রচনা গড়ে ওঠে।

তোমার কোন একটা মনের সৃষ্টি এখনি আমাদের ভাষায় বলতে পারো?

—আজ মনে হচ্ছে আজ সকালে পৃথিবীতে যে রোদ উঠেছে, সে যেন আমারই প্রাণের আনন্দের রূপ।

শরৎকালেরএই রোদের সঙ্গে তোমার শরৎকালের স্মৃতি কি দেখা দেয়?

—দেয়। তাই তো ছুটে এসেছি।

পৃথিবীর সুখদুঃখের রেশ তোমার অন্তরে আছে কি?

—কতক ভুলে গেছি। কতক এখনো ছায়ার মতো আমার সঙ্গে আছে। আমার যা বন্ধন, তা থেকে আমাকে তো এখনো মুক্তি দিল না।

বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করো?

—করি। কিন্তু আমি যে অনেক পিছনে পড়ে আছি। সে যেন আমার।

আমি মুক্তি চাই। সিদ্ধিলাভ করব কি?

—মুক্তি তো আপনার অন্তরের আর একটি রূপ? সে যে 'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ।'

দেহান্তর ধারণ করবার ইচ্ছে আছে কি?

—যদি আপনার জীবদ্দশায় যেতে পারতেম, তাহলে ইচ্ছা করি।

কত যে পরিবর্তন?

—পুনর্বার দেহধারণ কি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে?

বলেন্দ্রনাথের আত্মা তার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। ইহজীবনে তার সঙ্গে বড় ভাব ছিল মৃণালিনী দেবীর। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃণালিনী দেবীর মন এত ভেঙে যায় যে স্বামীকে বলেন, শিলাইদহে আর ভাল লাগছে না।

বলেন্দ্রনাথের আত্মাই খবর দিলেন মৃণালিনী দেবীর আত্মা উপস্থিত; রবীন্দ্রনাথকে বলেন—"এখানে সে এসেছেন জানেন?" সেই কথোপকথন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

জোড়াসাঁকোয় পাঁচ নভেম্বরের আসরে মৃণালিনী দেবী ও বলেন্দ্রনাথ ছাড়া এসেছিলেন মণিলাল গাঙ্গুলি, সত্যেন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী এবং বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা দেবী। আসরে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এঁদের সঙ্গে আলাপের বিবরণ পাই ৬-১১-২৯ তারিখে রানী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে। সেখানে পরম্পরা রক্ষা করা হয়নি বলে চিঠির নির্বাচিত অংশ সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

"বুলাকে আর একদিন আসতে বললুম। কাল এল। প্রথমে নাম বেরোল মণিলালের—সে বললে, সত্যেন আসতে চায়। আমার দুঃখ এই, কথাগুলো কেউ লিখে রাখেনি। ওর সব উত্তরগুলোই বেশ সুসংবদ্ধ। পশ্চিম মহাদেশে আমার কর্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এল, পশ্চিমে আপনার আরো অনেক কাজ আছে, সেখানে আপনার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকবে। —মণিলাল তার আগের দিন বলেছিল আমেরিকায় একবার আপনাকে যেতেই হবে, সেখানে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিলাল বলেছিল, পৃথিবীতে থাকতে পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এখানে কোনো মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার ধর্মমতের কি কিছু বদল হয়েছে? সে বললে, পৃথিবীতে আমি নাস্তিক ছিলুম, কিন্তু এখানে আমি ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করি।

"সত্যেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, এখানে কোনো দেবতাকে খুঁজতে হয় না, এই যা পরিবর্তন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কি অন্তরের মধ্যেই তাঁকে অনুভব করো ? উত্তর এল, খুব ভালো করেই করি, তাই তো এত শান্তি। তখন হিবার্ট লেকচারে ধর্ম সম্বন্ধে আমি যে মত ব্যক্ত করতে চাই সেটা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর পেলুম—"একেবারে ঠিক, কিন্তু কী আশ্চর্য। এখনো তো আপনি পৃথিবীতে ?"

"মণিলালকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তার পরে অজিতকে, তারা বলেছিল খুব সত্য। অজিত বললে, "ইমাজিনেশন সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন সেটা যে কত সত্য তা আমাদের এখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি।" অমিতা আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল, অজিত তা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলল, "জানি, জানি, সে তো আপনারই সৃষ্টি।" সত্যেন্দ্র বললে, "জানি, সেদিন খুব কাছেই ছিলুম, আমার মধুর অবসর ছিল।" আমার আধুনিক লেখা পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলুম, সত্যেন্দ্র বললে, "পড়েছি কেমন করে বলি, কিন্তু প্রত্যেক লাইনটা জানি। আশ্চর্য !" "শরৎ চাটুজ্জের লেখার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে ?" উত্তর, "পূর্বে ছিল, কিন্তু এখন ঠিক ধরতে পারিনে। হয়তো সে আমার দেহহীন আত্মারই দুর্ভাগ্য।"

"সত্যেন্দ্রর সব কথাই কারো লিখে রাখা উচিত ছিল, থাকলে দেখতে পেতে ভাববার কথা খুবই আছে। আমার লক্ষ্মীছাড়া স্মৃতিশক্তি—মনে আনতে পারছিনে।

"সত্যেন্দ্রর পালা শেষ হবার মুখে সে বললে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি। উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারতে তার একটা ব্যক্তিগত বাস্তবতা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম যেসব রচনা প্রভৃতি নিয়ে পৃথিবীতে লিপ্ত ছিলেন, এখনও কি তার কোনো অনুবৃত্তি আছে ? তিনি বললেন, "ঠিক তেমন নয়, এখানে কেবল আত্মসৃষ্টিতেই আনন্দ।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সৃষ্টির কোনো উপকরণ নেই ?" তিনি বললেন, "আত্মাই তো আমাদের সব—তাকে গঠন করে পরিপূর্ণ করাই আনন্দ।" অবন (অবনীন্দ্রনাথ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা ছবি আঁকা প্রভৃতি নিয়ে যেসব কাজ করছি, তা কি খেলা মাত্র ?" তিনি বললেন, "তুমি আর্টিস্ট হয়ে একথা কেমন করে জিজ্ঞাসা করলে ?" জ্যোতিদাদা একটা ভারি নতুন রকমের কথা বলেছিলেন—"পৃথিবীতে থাকতে বার বার কেবল শান্তি চেয়েছিলুম, এখানে এসে ভাবছি সুখই বা মন্দ কি ."

"এর একটা অর্থ আমি এই ঠাউরেছি যে, সুখ জিনিসটা সীমাবদ্ধ দেহে এবং ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন—বস্তুর সঙ্গে ভাবের সঙ্গে সে জড়িত, তাকে ধরবার জন্যে ভোগ করবার জন্যে বাস্তব উপকরণের দরকার। মণিলাল অজিত সত্যেন সবাইকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি আনন্দ ভোগ কর ? সত্যেন্দ্র

একটা প্রশ্নের চিহ্ন দিয়ে লিখলে, আনন্দ? —তারপর বললে, আনন্দ নিজের অন্তরেই সৃষ্টি করি। মণিলালও লিখেছিল সুখ নয়, কিন্তু শান্তি।

"জ্যোতিদাদাকে প্রশ্ন করেছিলুম, দেহ নিতে ইচ্ছা হয়? তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা করিনে, যারা সুখ চায় তারাই ইচ্ছা করে।" আনন্দর কথায় তিনি বলেছিলেন, "অসীম শান্তি। কিন্তু আনন্দ?" এসব কথা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলুম, "কোনো বিশেষ স্থানে বাস করেন?" তিনি বললেন, "শূন্য আকাশে।" প্রশ্ন—'সে কি সীমাবদ্ধ আকাশ?' তিনি বললেন, "এখনো তো সীমারেখা দেখতে পাইতেন।" ওখানকার সত্তাটা যে ঠিক কী সেটা যেন বুঝিয়ে বলা যায় না, এমনি একটা ভাব দেখা গেল।

"সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, পৃথিবীতে স্বদেশ সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তোমার যে উৎসাহ ছিল, ওখানেও কি তেমন কিছু আছে? সত্যেন উত্তর করলে, "এখানে ঠিক সেই জিনিসটাই নেই—পৃথিবীর সে উত্তেজনা নেই—অথচ অনেক সময় তারো অভাব অনুভব করি। প্রথমটা যখন আসি, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বেদনা যেন বুকের ভিতর অনুভব করেছি। ক্রমেই বেগ কমে আসছে।"

"মণিলাল বলছিল, "সম্বন্ধ থাকলেও তার আকর্ষণ ক্ষয় হয়ে আসে, নইলে মুক্তি হবে কেমন করে?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, পৃথিবীতে আমরা যে সব অধ্যবসায়ে প্রবল ইচ্ছায় ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তাতে কি পরলোকগত আত্মার যোগ থাকে?

"জ্যোতিদাদা বললেন, "ঠিক আমাদের মনে সে বাসনা থাকে না। কিন্তু পৃথিবীতে যদি কেউ কিছু সৃষ্টি করে অথবা কিছু একটা ভালো কাজ হয় সে আমরা অনুভব করি।" জন্মান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "জন্মান্তর আছে, কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে আমরা যে রকম বুঝতেম সে রকম নয়।" আমার মুক্তির কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললেন, "পাবে। কিন্তু আরো সাধনা চাই। কত যে ভুল ঘটে।" আমার রচনা সম্বন্ধে বললেন,—"তোমার রচনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চরম সার্থকতার পথে চলছে। তুমি সকল অবস্থায় শান্ত হয়ে থেকো।" জ্যোতিদাদা বার বার আমাকে বলেছেন, "শান্ত হও, শান্ত হও।" আমি বললুম, শান্ত হতেই চাই। আপনার এই উপদেশে আমি বিশেষ বল পেয়েছি। তিনি বললেন, "জানি, সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।" আমার ছবির কথা সেদিন মণিলালকে প্রশ্ন করেছিলুম, সে বলেছিল, আপনার ছবি য়ুরোপে আদর পাবে। জ্যোতিদাদা বললেন, "আশঙ্কা করো না। তোমার ছবি জগতে একটা নতুন আলো দেখাবে।" আশ্চর্য লাগল এই জন্যে যে, আমার মনে সত্যই এ সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। পৃথিবীতে যাদের ভালোবাসি পরলোকে তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্বন্ধ—তার উত্তরে বললেন, "যাদের ভালোবাসি তারা অন্তরের দেবতার সঙ্গে

এক হয়ে যায়। আর তো হারাবার ভয় নেই।" হিবার্ট লেকচারে আমি যে মত ব্যক্ত করতে চেয়েছি তার সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করতে তিনি চারবার চৌকো গণ্ডী দিয়ে লিখলেন "সত্য সত্য"—খুব জোরের সঙ্গে। এক সময়ে আপনিই লিখলেন, "ওই গোলাপ ফুলটি আমার কাছে আনো।" তখন হঠাৎ দেখি ঘরের অন্য অংশে একটা ছোট টেবিলে ফুলদানিতে তোড়ার মধ্যে গোলাপ ফুল। আমাদের টেবিলে আনতেই বললেন, "কী সুন্দর!" তারপরে বললেন, "আমাকে একটা গান শোনাও।" আমি চারিদিকে চেয়ে দেখছি, কে গান গাইতে পারে। তিনি লিখলেন, তুমি গান গাও। আমি তো ভেবেই পাইনে কী গান গাব। লিখে দিলেন, "রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি।" গান শুরু করে একটু পরেই কথা বেধে গেল। তখন তিনি গানের মাঝখানের থেকে দুটো লাইন লিখে দিলেন—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথা নিত্য বাজে—
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

"এইটুকু গাইতেই বললেন, খুব ঠিক। বড়ো ভাল লাগল।" যে কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন বোধ হয় এর মধ্যেই বলা হয়ে গেল। আমার আর মনে ছিল না—আমি আর গাইওনি। সুরেনের (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কথা জিজ্ঞাসা করলুম 'সে নিষ্কৃতি পাবে কি?' উত্তর, 'পাবে বইকি? সে কি উত্তেজিত হয়?' আমি বললুম—"উত্তেজনার কারণ আছে, সে ঋণে জড়িত।" তিনি বললেন, "কর্মফল। মাঝে মাঝে ও যে হঠকারিতা প্রকাশ করে।" নতুন বোঠানের সঙ্গে দেখা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, 'তোমার নতুন বোঠান সমভাবেই আছেন।' আমি শুধালাম, 'পৃথিবীর প্রতি তাঁর কি আকর্ষণ আছে?' তিনি বললেন, "আছে, সেই জন্যেই তো দেখা হয় না।" আমি বললুম, "আমি এখনো তাঁকে ভুলতে পারিনে—বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে।" তিনি বললেন. "জানি, তোমার নতুন বোঠানকে আমি বলব।"

"জ্যোতিদাদা চলে গেলে নাম উঠল সাহানা। হঠাৎ কিছুতে মনে পড়ল না, কে সাহানা। বুলা জিজ্ঞাসা করলে, সাহানা কার নাম? সে জানত না। অবন বললেন. বলুর স্ত্রী। সাহানার মৃত্যুর খবরটা আমার মনে স্পষ্ট ছিল না বলেই তাঁর কথাটা ভাবতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলুম, বলুর সঙ্গে দেখা হয় কি? বললে, মৃত্যুর পর একবার দেখা হয়েছিল অনেকের মাঝখানে।

তাকে ডেকে দিতে পারবে কি?

—দিচ্ছি।

বলু এল।···

"আরো অনেক কথা লেখা হয়েছিল—খুঁজে পাওয়া গেল না। সত্যেনের একটা কথা লিখতে ভুলেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাংলার আধুনিক

কবিদের সম্বন্ধে তোমার মত কী? সত্যেন্দ্র উত্তর করেছিল, "অনেকেরই ভিতর পদার্থ আছে, কিন্তু জানি ঠিক সেই সুর নেই!"

"ব্যাপারখানা ঠিক কী তা জোর করে বলতে পারিনে। মনে হল যেন ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গেই কথা কওয়া হলো। সন্দেহমাত্র নেই যে, বুলার ভাষা নয়, ভাবও নয়। আমারও নয়, যেহেতু আমি যা ভাবি ও ভাবতে পারতুম তার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মন যদি জবাব দিত তবে সে অন্য রকম হত। অবশ্য একথা যদি বলো আমার অবচেতন চিত্ত কী বিশ্বাস করে, কী বলে তা আমি জানিইনে, তাহলে তর্কই চলে না। দেহহীন আত্মা কী রকম এবং তার চিত্তবৃত্তি কী ভাবের, কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞান মানলে দেহটাই যে কোন বস্তুর মত প্রতীত হয় সে রহস্য ভেদ করা যায় না।—বস্তুর মূলে অবস্তু অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় পদার্থ। এসব মায়াকে যদি মানতে পারি তবে দেহহীন সত্তাকেও মানতে দোষ নেই, অবশ্য যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল প্রমাণ সংগ্রহ চলছে, এখনো সর্বজন-সম্মত বিশ্বাসে পৌঁছয়নি।

"যাই লোক, জ্যোতিদাদা—যাকে বলছি বা কল্পনা করছি, তাঁর কথাগুলো আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমি না মনে করে থাকতে পারছিনে, তিনি আমাকে বলবার সুযোগ খুঁজছিলেন যে, "তুমি শান্ত হও।" এই কথাটাই আমার জীবনে সকলের চেয়ে দরকারী কথা। সেই থেকেই ঐ কথাটার প্রতিধ্বনি-ক্ষণে ক্ষণে মনে বাজছে। তোমার চিঠিতে অনেকবার তোমাকে এই কথা লিখেছি। আমার মন অতিরিক্ত বেদনাকাতর বলেই মানুষের সংস্রবে আমি অনেক সময় শান্তিরক্ষা করতে পারিনে। কিন্তু তার অনতিকাল পরেই এর আত্মাবমাননা আমার মনকে পীড়িত করে।"

পাঁচ

৬ নভেম্বর। জোড়াসাঁকোর তেতলা। লিপিকর মোহনলাল গাঙ্গুলি তাঁর নকলের খাতায় লিখছেন: "মিডিয়াম উমা দেবীর ডান হাত, প্রশ্নকর্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" অন্যান্যদের সঙ্গে আসরে আছেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র অলোকেন্দ্র-নাথ। সকাল ৮-৩০ মিঃ থেকে সকাল ১০-৩০ মিঃ।

একটু চেষ্টা করতেই এলেন রবীন্দ্রনাথের এক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে—অভিজ্ঞা। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'তে যাঁর সম্পর্কে বলেন,'পাখির মত গলা ছিল অভির।' অসাধারণ ভালো গানের গলা ছিল অভিজ্ঞার। ইন্দিরা দেবীর সমবয়সী—১৮৭৩ সালে জন্ম। ১৮৮৮ সালে বাল্মীকি প্রতিভা যেবার হয়, অভিজ্ঞা সেজেছিলেন বালিকা। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে এই অভিদিদির কথা অনেক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজে গান শিখিয়েছিলেন

এবং তাঁর আশা ছিল, অভিজ্ঞা পরে বড় গাইয়ে হবেন। কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য সেই আশা পূর্ণ হয়নি।

তোমার নাম কী?
—অভি।
তুই কি অভি? আমাদের মনে আছে? কেমন আছিস?
—ভাল।
পৃথিবীর কথা মনে পড়ে?
—পড়ে।
পৃথিবীর সঙ্গে তোর হৃদয়ের যোগ আছে?
—ভুলতে পারি না।
ওখানে পৃথিবীর লোকেদের সঙ্গে যোগ আছে?
—ইচ্ছা যদি করি। আচ্ছা, আমার কথা কি ভাবছিলেন?
মনে আছে, তোর জন্যে বোটে কী গান লিখেছিলুম?
—ভালো মনে পড়ে না। সুর করুন—
বেহাগে একটা গান তৈরি করেছিলুম—
—তুমি রবে নীরবে। যাই।

অভি চলে গেলেন। জানা গেল পদ্মায় বোটে তাঁর জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বেহাগে গান লিখেছিলেন, 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।'

খানিক বাদে আবার আত্মাকে ডাকাডাকি। এবার এমন একজন এলেন যাঁকে রবীন্দ্রনাথ চেনেন না।—'হালদারমশাই' বলে পরিচয় দিলেন তিনি এবং ইংরেজিতে নিজের নাম সই করলেন।

কে?
—হালদারমশাই।
নাম কী?
(ইংরাজি নাম সই করলেন)
তুমি আমাদের পরিচিত?
—আপনাকে কে না জানে?
আমাদের সঙ্গে কী রকম পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি।
—দেখেছি, জেনেছি—যেমন সংসারের আর পাঁচজনে জানে।
আমাদের বাড়িতে দেখেছেন?
—একবার এসেছিলুম। তখন ডাকঘর অভিনয় হয়।
আমার লেখা সম্বন্ধে কোন 'ইন্টারেস্ট' ছিল পৃথিবীতে থাকতে?

—ছিল। আমি নিজে পদ্য রচনা করতুম। কিন্তু সে কি বলবার।
এখনকার লেখার সঙ্গে পরিচয় আছে?
—আছে।
কোন্ বই ভাল?
—মনে হচ্ছে যোগাযোগ।
নাটক দেখেছেন? তপতী?
—শুনেছি।
সুকুমারকে পাঠিয়ে দিতে পারেন?

'দেখছি' বলে একটি আত্মা চলে গেল। সুকুমার অর্থাৎ সুকুমার রায়ের অপেক্ষায় বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আর একটি আত্মা এল। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন বুঝিবা সুকুমার রায়। কিন্তু না, অপরিচিত আত্মা। নাম বললেন আরতি মল্লিক।

কী নাম তোমার?
—আরতি।
আমাদের পরিচিত কেউ?
—আমায় ভুলে গেছেন?
আমি চিনতুম তোমাকে পৃথিবীতে?
—চিনতেন। অনেকদিন আগে একবার দার্জিলিঙে।
অন্য কোন পরিচয় দিতে পার?
—আমার স্বামীর নাম এম কে মল্লিক।
কলকাতায় তোমাদের বাড়ি?
—দিল্লি অঞ্চলে থাকতাম। আমার স্বামী সেক্রেটারির কাজ করতেন।
সুকুমার রায়কে চেন?
—দেখেছি।
তাকে ডেকে দিতে পার?
—অপেক্ষা করুন। —যাই।

আরতি মল্লিক চলে গেলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলেন সুকুমার রায়। আর একজন রবীন্দ্রভক্ত—আর একটি প্রতিভা। সুকুমার রায় যেমন শ্রদ্ধা করতেন রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি স্নেহ করতেন সুকুমার রায়কে। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে সুকুমার রায় যখন মৃত্যুশয্যায়, শান্তিনিকেতন থেকে তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন, রোগীর অনুরোধে তাঁর পাশে বসে গেয়েছেন দুখানি গান।—আছে দুঃখ আছে মৃত্যু এবং দুঃখ এ নয় সুখ নহে গো, গভীর

শান্তি এ যে। শেষের গানটি শোনান দু'বার, মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমার রায়ের অনুরোধেই।

১৯২৩ সালে মৃত্যু হল সুকুমার রায়ের। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপাসনায় বললেন—"আমার পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি, এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে, জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে। যে কোন মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে স্পস্ট করে তোলেন, অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ু নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগ-শয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।"

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর ছয় বছর পার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহভাজন সুকুমারের আত্মাকে আনলেন। শুরু হল দীর্ঘ সংলাপ। তবে দু'একটি জায়গায় লেখা অস্পষ্ট, আমি ফাঁক ভরাট না করে বাদ দিয়েছি। তাতে মোটামুটি অর্থ বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয় না।

—এসেছি।

সুকুমার! কেমন আছ তুমি?

—অন্য কথা বলুন।

তোমার পৃথিবীর সঙ্গে এখন যোগ আছে?

—আছে, খুব।

আমাদের এখানকার রচনার কাজ, অন্য কাজ—তাতে তোমার মন আছে?

—আছে বৈ কি—এখনও তো তাই নিয়েই আছি।

তোমার এখানকার রচনার প্রতি অনুরক্তি আছে?

—রচনা তো কাগজে হয় না, মনের মধ্যে আছে।

আমাদের কাউকে অবলম্বন করে করতে পার রচনা?

—শক্ত। কার হাতে?

বুলার হাত দিয়ে ছবি আঁকো কিংবা লেখ।

—বড় শক্তির প্রয়োজন। আমার ব যেন এক সৃষ্টি ও বিনাশের মাঝখান দিয়ে চলেছে।

আমাদের কাছে কিছু বলবার আছে?

—আছে। বলুন আপনি, কতদিন, কতদিন আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন—।

ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে।

—শুনুন, আমি যেন কী মহান আলোকের মধ্যে রয়েছি। আমার চোখ সেই আলোয় ডুবতে চায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কী অন্ধকার—

আলো কি মনকে আশ্রয় করে, না দেহকে ?

—আমার মন এখানে সর্বস্ব। আমার মন—।

ওটা আর একবার বল।

—আমাদের মনকে পূর্ণ করতে পারলে, অর্থাৎ দেবতাকে···, কিন্তু আমার ধর্মবিশ্বাস আলাদা।

আমার নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটা লেকচার (হিবার্ট লেকচারের মানুষের ধর্ম") লিখেছি, জান ?

—সে ঠিকই করেছেন। আমার মনও ঐ চায়।

আমাদের সাধনায় সাহায্য করতে পার ?

—সাধনায় ?

আমরা যেটা ইচ্ছা করি, কামনা aspire করি, তাতে সহায়তা করতে পার ?

—আপনাকে আমার দরকার। আমার নিজের সাধনা আজও শেষ হল না।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলবে ?

—কিছু না।

ব্রাহ্মসমাজের উপর শ্রদ্ধা আছে ?

—না, ওপথ ঠিক নয়।

ব্যক্তিগত সাধনা, এই তোমার বলবার কথা ?

—হাঁ, কতকটা তাই।

প্রশান্ত (সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) এখন যে কাজে নিযুক্ত, তাকে তুমি অনুসরণ করছ ?

—সমস্তই।

এই পথে সে সার্থকতা লাভ করবে ?

—জানেন, যখন এলাম, মনে হল পৃথিবীতে আমার মনের ধারা পূর্ণ বিকাশের পথে চলেছে।

বাণীর আরোগ্য ?

—বলতে পারি না।

আমি যে ছবি আঁকি, সে কি ভালো ?

—হাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, অপূর্ব।

ইউরোপে তার সমাদর হবে?

—হবে।

(এই 'হবে' শব্দটি মিডিয়াম খুব বড় হরফে লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় ছবি আঁকার নেশায় মত্ত ছিলেন এবং সেই সময়ই ভাবছিলেন ইউরোপে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা যায় কিনা। মৃত অন্তরঙ্গদের কাছ থেকে সমর্থন তিনি চাইছিলেন। আবার সংলাপ।)

আমি মনে করছি পশ্চিমে যাব। কোথায় যেতে পরামর্শ দাও?

—ইয়োরোপে প্রায় সব জায়গায় আপনার যশের স্তম্ভ প্রস্তুত।

তুমি যে বললে, আমার দরকার আছে। আমি কীভাবে সহায়তা করতে পারি।

—আমি আজও পৃথিবীর সেই দুঃখসুখের অজানা দেবতাকে খুঁজে মরছি। আজও তো তাঁকে পেলাম না।

আমার কোন রচনা দ্বারা তোমার সহায়তা হবে?

—তা আমাকে প্রবুদ্ধ করবে।

আমার একান্ত ইচ্ছা আমার সাধনার ফল লাভ করি ও বললাভ করি।

—আপনি মোক্ষপথে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন।

(এই বাক্য লেখার সময় মিডিয়াম মারফত সুকুমার রায় প্রথমে লেখেন 'মুক্তিপথে' তারপর শব্দটি কেটে করেন 'মোক্ষপথে'।)

দেহান্তর ধারণ করবার ইচ্ছা আছে?

—ভারি ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঠিক জায়গা তো পাব না।

দেহান্তর ধারণ কি করতেই হবে?

—সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসা করবার মতো শক্তি তিনি এখনও আমাকে দেননি।

পরলোকগত আত্মা—যাঁরা তোমার চেয়ে অগ্রসর, তাঁরা তোমার সাহায্য করেন?

—এখানে কেউ কারো নয়, অথচ কী নিবিড় যোগ।

ভালোবাসা সম্বন্ধে পরিণাম ওখানে কী রকম?

—আমার পৃথিবীর নেশা আজও কাটেনি। তাই এখানকার কোন সুর আজও মনে লাগে না।

এখানকার সৌন্দর্য তোমার উপলব্ধির মধ্যে আছে?

—আছে বৈ কি। কিন্তু ঠিক তেমনি করে যদি আপনার পায়ে বসতে পারতুম।

এখানে আমি গান রচনা করি। সেটাতে তোমাদের উপভোগ আছে?

—করি। অন্তরের একান্তে তাকে পাই।

ইহলোক পরলোক—দুইকে একত্র করে কি মানবলোক?

—আবার বলুন।

দুইকে সম্মিলিত করে কি কোন জগৎ আছে, না উভয়ের বিচ্ছেদ আছে?

—বিচ্ছেদ নেই। ওখানকার কাজ এখানে শেষ করতে হয়। যারা কাজ শেষ করে এসেছে, তাদেরই মুক্তি।

এখানে যারা ইন্দ্রিয় সেবা বিষয়কর্মে নিযুক্ত, তাদের কী?

—তাদের পরীক্ষা প্রবল।

যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করবেন, তাঁদের সফলতা পরলোকে আছে?

—ঐ পথেই মুক্তির সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎ হয় না কি?

তুমি চলে গেলে। তোমাদের অভাব অনুভব করেছি। সত্যেন্দ্র, তুমি গেছ, অভাব অনুভব করি। তুমি বোধ হয় তা জান।

—জানি। আচ্ছা, আমার ছেলেকে (সত্যজিৎ রায়) আপনার আশ্রমে নিতে পারেন?

তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।

—তাঁকেও বলুন না।

তাকে পেলে আমিও খুব খুশি হব। ও কিছুকাল ধরে শান্তি খুঁজছিল।

—জানি, কর্মহীন মন বড় অশান্ত হয়। কাজ তো কতই করবার আছে।

আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।

—আচ্ছা।

প্রশান্তকে (প্রশান্ত মহলানবিশ) কিছু বলবার আছে? আমি বলতে পারি।

—না, বলে কী হবে? না, সে আমার ভাল লাগে না।

তোমার আত্মীয়ের সঙ্গে মিলন হয়?

—হয়। কবিতা পড়ুন, নয় গান করুন, নয় ঘরের সকলে সোরগোল (হাস্য ইত্যাদি) করে উঠুন।

কী গান করবো বল?

—'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।'

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করলেন। তারপর খানিক গুনগুন করে সুর ভাঁজলেন এবং গলাটা ঠিক করে নিয়ে ফরমাশ মত গাইতে শুরু করলেন—

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্‌খানে রে কোন্‌ পাষাণের ঘায় ॥
নবীন তরী নতুন চলে
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে
বাহি তারে খেলার ছলে
কিনার-কিনারায় ॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে—

এইটুকু গেয়েই রবীন্দ্রনাথ থেমে গেলেন। কথা ভুলে গেছেন, সুরও ঠিক মনে নেই। অপ্রস্তুত হয়ে আবার কথা বলতে লাগলেন।—

সুকুমার, তুমি আমায় বড় শক্ত ফরমাশ করেছ, সব কথা মনে থাকে না।

—জানি সে কথা।

'অন্ধজনে দেহ আলো' শুনবে?

—করুন। ওটা একদিন আমায় শুনিয়েছিলেন, মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ আবার গান ধরলেন। এই গানের সবটা তাঁর মুখস্থ আছে। সুতরাং একটু সুর ভেঁজেই আপন মনে একটানা গেয়ে চললেন।—

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ—
তুমি করুণামৃত সিন্ধু, করো করুণাকণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ॥
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগর তীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে, সুধা করাও হে পান ॥
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে
কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়, হেরি নি প্রেমবয়ান
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥

গান শেষ হতেই নিস্তব্ধতা। রেশ তখনও সবার কানে বাজছে। খানিক বাদে মিডিয়ামের আবার অস্থিরতা। সুকুমার রায় আবার কথা শুরু করলেন।

—বড় ভাল লাগল।

এখান থেকে ছোট ছেলেরা যারা চলে গিয়েছে, তাদের কী রকম বিকাশ? তারা কি আত্মা নিয়ে যেতে পেরেছে, না পরিপূর্ণ হতে পারেনি বলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে?

—সে যেন পথ চলতে যেমন ফুল পায়ে ঠেকে, তুলে নিয়ে মনটা ভরে ওঠে, তেমনি করে হঠাৎ শিশুদের পথের মাঝখানে পাই। এখানে শিশুর একটা জগৎ আছে। যারা বড় হয়েছে, সংসারের তাপে যারা মলিন, তারা কি পারে সেখানে যেতে?

আমরা তো দেখতে পাইনে। সেটা কি তোমার গোচরে আছে?

—সব কথা বলতে পারি না। চেষ্টা করতে পারি।

পাশে ছিলেন অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি হঠাৎ আত্মাকে অন্য রকম একটি প্রশ্ন করেন। সেবার প্রতিমা দেবীরা রাজগীরে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁর একটি দামী ঘড়ি হারিয়ে যায়। অলোকেন্দ্রনাথের প্রশ্ন সেই ঘড়ি নিয়ে।

প্রতিমার একটা ঘড়ি হারিয়ে গেছে রাজগীরে। কোথায় আছে?

—সে কুড়িয়ে নিয়েছে একজন।

কিন্তু শুধু তাই কি হারিয়েছে?

—আরো কি হারিয়েছে?

খুব সামান্য, অথচ ভারি দরকারী।

—কী জিনিস বলে দাও।

কাপড়চোপড় সংক্রান্ত—

—ঘড়িটা কোথায় রেখেছিলেন?

আয়নার কাছে?

—সেখান থেকে পড়ে যায়। কিন্তু আমার ভুল হতে পারে।

কোন্ সময়?

—স্নানের পূর্বে।

সেকি পাবার উপায় আছে?

—আমি কি দেবতা?

অলোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমার রায়ের আত্মার কথাবার্তা শেষ। আবার প্রশ্নকর্তা রবীন্দ্রনাথ।

অপূর্ব-র স্ত্রীকে (অপূর্বকুমার চন্দের স্ত্রী লোপামুদ্রা) জানো? তাঁকে ডেকে দিতে পারো?

—দূরে আছেন। তিনি এখনও খুব আকর্ষণের মধ্যে আছেন। আমার ভাগ্য ভাল, আমি একটু দূরে যেতে পেরেছি।

তোমাদের থাকবার ভিন্ন ভিন্ন স্থান আছে ?

—সীমাহীন আকাশে বন্ধনবিহীন।

তোমার চেয়ে যাঁরা মুক্তিপথে অগ্রসর, তাঁরা কি অন্য কোন সীমাবদ্ধ আকাশে আছেন ?

—সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সেও অসীম…। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে দূরে আছেন, কিন্তু সে একই আকাশে।

তাদের সঙ্গে যোগের কোন বাধা আছে ?

—তা নয়, বেশীর ভাগ মায়ের আকর্ষণই বেশী—স্ত্রীর চেয়েও।

যাঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, তাঁরা কি তেমনি থাকেন একত্র হয়ে ?

—সব জায়গায় সমান নয়। ইচ্ছা করলেই পাওয়া যেতে পারে। আমি এখান থেকে আমার প্রপিতামহকে দেখতে পাচ্ছি।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্নটি করেন, মোহনলাল গাঙ্গুলির হাতের লেখায় তা' স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। রবীন্দ্রসদনে রাখা খাতা থেকে তা উদ্ধার করা শক্ত হয়। সুকুমার রায়ের উত্তরটা হল—

—বড় মধুর সে সম্বন্ধ। কিন্তু আমি কি আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝেছি ?

যারা দেহে আসক্ত, তারা কি সেখানে ভোগ ইচ্ছা করে ?

—কোন প্রয়োজন হয় না। হাওয়ায় যেমন ফুল ওড়ে, শুধু গন্ধটুকু থাকে। মধুরতা আছে, কিন্তু মাদকতা নেই।

পরবর্তী প্রশ্নকর্তা অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু তার দুটো প্রশ্নই রবীন্দ্রসদনে রাখা খাতা থেকে উদ্ধার করতে পারিনি। উত্তরগুলো ঠিক আছে।

প্রশ্ন :…

উত্তর : মন পিছিয়ে পড়ে থাকে ?

প্রশ্ন : …

উত্তর : আধ্যাত্মিক ভাবে।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মার আবার আলাপ।

তুমি তো জানো, কোনান ডয়েল পরলোক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন,

সে কি সত্য ?

—সত্য আছে, কল্পনা মিশ্রিত সত্য।

পরলোক থেকে কেউ কি মিথ্যা বলে ভোলায় ?

—আছে বৈকি! এখনও অনেক সময় দেখা যায়, যারা পৃথিবীতে কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে এলেন, তাঁরা এখানে এসে অনেক মন্দ কাজে··· দুষ্ট লোকের · তাদের আর একটা পৃথিবী···।

তারা কি পৃথিবীতে জন্ম নেবে ?

—তারা তাই ইচ্ছা করে। এত উন্মত্ত আনন্দ আর কোথাও নেই।

জন্তুরূপে না মানবরূপে ?

—যা ইচ্ছে। কিন্তু কী ভুলই যে হয়! আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন—আমার মনে এত কথা এল কেমন ক'রে—

পরের চারটি প্রশ্ন এবং উত্তর হাতের লেখায় অস্পষ্ট। কিছুই বোঝা যায় না। শুধু আন্দাজ করা যায় 'অনুগ্রহ', 'সীমাবদ্ধ জগৎ', 'সৌরজগৎ', ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন—

তোমার এখানকার Personality সীমায় এখনও তুমি আছ ? এখনও কি তারই অনুসরণ করে চিন্তা কর, সুখ দুঃখ অনুভব কর ?

—না, ব্যক্তিত্বে তেমন প্রয়োজন বোধ করি না। এখানে যে হাওয়ায় ভাসি।

অন্যলোকে মানুষ আছে ?

—না, মানুষ নয়।

প্রাণী ?

—জল আছে, পাথর আছে, কোন কোন স্থানে সবুজও দেখা যায়।

অন্য লোকের সঙ্গে তোমাদের কোন Communication নেই ?

—যদি ইচ্ছা করি, পারি। কিন্তু যে-লোকের আকর্ষণ কাটাতে এখানে আসা, আবার একটা অন্য লোকের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক ?

Racial পার্থক্য ?

—না, খুব কাছাকাছি আছি। অন্তরে অন্তরে আত্মায় আত্মায় কী প্রবল যোগ।

পিয়ারসনকে (শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ডবলু ডবলু পিয়ারসন) জানো ? আনতে পারো ?

—চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আরো একজন তো সম্মুখেই রয়েছেন।

কে আছেন ?

—তার নাম শমী।

অকালে, মাত্র এগারো বছর বয়সে মারা গেছেন শমী—রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬—১৯০৭)। দাদা রথীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বড় হলে সে যে কবি হবে, বাবার প্রতিভা তার মধ্যেই প্রকাশ পাবে, আমার সন্দেহ ছিল না।" (—'পিতৃস্মৃতি')।

রবীন্দ্রনাথের বড় আদরের ছেলে শমী—পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি—আকৃতি ও প্রকৃতিতে বাবার মতো। জোড়াসাঁকো, শিলাইদা, শান্তিনিকেতন—সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ বুকের কাছে আগলে রাখেন ছেলেকে। মা মারা যাবার পর শমী বাবার আরও কাছের মানুষ। মা-মরা এই ছেলেটির জন্যেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শিশু' গ্রন্থের কবিতা।

সেই শমী বন্ধু ভোলার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন মুঙ্গের। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হলেন কলেরায়। খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে ছুটলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। গিয়ে দেখলেন অবস্থা শোচনীয়। চিকিৎসা ও সেবার ভার নিজের হাতে নিলেন তিনি নিজে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে রইলেন মুমূর্ষু বালক-পুত্রের শিয়রে কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা।

কিন্তু সব সেবা, সব চেষ্টা বৃথা, শমী চিরবিদায় নিলেন। গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে প্রিয়তম পুত্রের শেষকৃত্য নিজে করলেন রবীন্দ্রনাথ।

চোখে মুখে শোকের প্রকাশ নেই, শুধু চক্ষু আরও স্থির, মুখে আরও অবিচলতা। কাজ সারা হওয়া মাত্র ভূপেন সান্যাল মশাইকে বললেন—'ভূপেন্দ্রবাবু, আমাদের কাজ শেষ, এবার শান্তিনিকেতনে ফেরার ব্যবস্থা করুন।'

ট্রেনে সারা রাস্তা মুখে কোন কথা নেই, শুধু একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। ভূপেন সান্যাল মশাই রবীন্দ্রনাথের ওই অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে অন্যলোকে আছেন।

ফিরে এলেন শান্তিনিকেতন, এলেন দেহলি বাড়িতে, যেখানে শমী থাকতেন। স্নান সেরে পূর্বাস্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ বসলেন উপাসনায়। পুবের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পরম পিতার কথাই ভাবছেন। এমন সময় নিচু বাংলো থেকে ছুটে এলেন বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। ছোট ভাইয়ের পুত্রবিয়োগের সংবাদ পেয়ে স্থির থাকতে পারেননি, সান্ত্বনা জানাতে এসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্ত সমাহিত রূপে তিনিও বিস্মিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের পিঠে আদরের সঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে কেবল বলতে লাগলেন—'রবি রবি রবি'। রবীন্দ্রনাথ

চোখ খুলে দেখেন, বড়দাদা। বড়দাদার চোখ জলে ভরতি। রবীন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

কিন্তু যত শোকই হোক না কেন, দুঃখের যত আঘাত পড়ুক না কেন, চোখের জল ফেলার সময় কোথায় রবীন্দ্রনাথের? কাজ, চারদিকে কাজ। তিনি নিজেই বলছেন—শমী যে রাত্রে চলে গেল, তার পরের রাতে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি, সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে।

তবে মুখে যতই বলুন না কেন, ভেতরে ভেতরে রবীন্দ্রনাথের মন যে শমীর জন্য অনবরত ছটফট করেছিল, তার প্রমাণ বার বার পাই মিডিয়াম মারফত আলোচনায়। শমীর নাম ধরে যখনই ডাকেন, পুত্রশোকাতুর পিতার হাহাকার শোনা যায়।

সেই একই দিন। ৬ নবেম্বরের সকাল। সুকুমার রায় বিদায় নিলেন। ঘরে এলেন শমী। শমীর আত্মা।

শমী, তুই?

—বল না কে?

শমীর মা?

—না, শমী শমী শমী।

কেমন আছিস?

—আমি ছুটে এসেছি। খুব দূরে ছিলাম। যেন আর একটা জগতে। কে যেন ডাকল।

আমাদের সঙ্গে তোর যোগ আছে?

—ভুলে যাই মাঝে মাঝে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, সে এক মজা।

তোর মা তোর কাছে থাকেন?

—ইচ্ছে করলেই ছুটে আসি। কিন্তু দূরে থাকলে বড় ভাল লাগে।

বেলাদিদি (কবির বড় মেয়ে মাধুরীলতা। ডাকনাম বেলা), রাণীদিদি (কবির মেজ মেয়ে রেণুকা। ডাকনাম রাণী) তাদের দেখতে পাস?

—বেলাদিদি আর আমি অনেকক্ষণ থাকি।

বেলাদিদির সঙ্গে ভালবাসা আছে?

—খুব। কিন্তু আমি ভারি চঞ্চল, তাই তিনি রাগ করেন।

এখানকার দাদাকে (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মনে আছে?

—সব মনে আছে। মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যেদিন মনে পড়ে, সেদিন আমার ছুটির বেলা।

শান্তিনিকেতন মনে পড়ে?

—পড়ে। ভারি মজার। ধ্রুবকে (শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, শমীর সমবয়সী) মনে পড়ে।

ভোলা (শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। এর সঙ্গে শমী মুঙ্গেরে যান) তোর কাছে যায়?

—আমি গিয়েছিলুম, কিন্তু সে কেমন যেন।

তোর জ্বর হলে আমি কবিতা পড়তুম, মনে আছে?

—সব মনে আছে। যখন মনে করতে বসি, মনে হয় যেন ছবি দেওয়া গল্পের মতো।

কোন কবিতা মনে পড়ে?

—'মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।'

'পঞ্চনদীর তীরে' মনে আছে?

—খুব সুন্দর, কিন্তু আমার মুখস্থ ভুল হয়ে যায়। আগেও কি হত?

শিলাইদার বোট মনে পড়ে?

—পড়ে। এখানে জল আছে তেমনি। কিন্তু শান্তিনিকেতন নেই—কোথাও নেই।

শান্তিনিকেতন মনে আছে?

—সব মনে নেই। আমায় একটা খবর দিতে পার?

কী খবর?

—বেলাদিদি কি আসবেন?

ডেকে দে।

—আচ্ছা থাক, আমি যাচ্ছি।

শমী চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন জ্যেষ্ঠা মাধুরীলতা বা বেলার জন্যে। কিন্তু বেলা আর আসেন না। এল অন্য এক আত্মা—যাকে রবীন্দ্রনাথ ডাকেননি।

কে?

—রাসমণি।

কে তুমি?

—দাসী, বাড়ির।

কোন্ বাড়ির?

—ঝোলা বারান্দাওয়ালা বাড়িতে।

মনিব কে ছিলেন ?

—আমি যাই, অপরাধ হয়েছে।

দাসী রাসমণির আত্মা ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। সাধারণ মেয়ে, বাবু-মশায়দের আসরে আসা যে অপরাধ, সেটা পরলোকেও বুঝতে পেরেছে। তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। এবার এলেন অন্য আত্মা।

এলেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, রথীন্দ্রনাথের বন্ধু, শান্তিনিকেতনের আদি ছাত্র। সন্তোষ মজুমদারকে ছেলের মত ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। পুত্র রথীন্দ্রনাথের একই সঙ্গে আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা পড়তে পাঠান সন্তোষ মজুমদারকে। ১৯০৯ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজেই লাগলেন সন্তোষ মজুমদার।

প্রথমে ছিলেন শিশু বিভাগের তত্ত্বাবধানে, যার জন্যে আজও শান্তি-নিকেতনের শিশু বিভাগের বাড়ির নাম 'সন্তোষালয়'। ১৯২৩ সাল থেকে মৃত্যু অবধি ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। ১৯২৬ সালে মৃত্যু। শান্তিনিকেতনে তার শখ ছিল অতিথি সেবা ও বাগান করা। বহু গাছপালা তারই পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ রবীন্দ্রনাথ পান সুয়েজে—ইউরোপ থেকে ফেরার পথে। প্রচন্ড আঘাত পান তিনি। একটি চিঠিতে লিখছেন—মনে পড়ছে এই সেইদিন এল আমেরিকায় শিক্ষা শেষ করে। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা করে নিলে। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল। কেননা, আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত। আমার প্রতি কোন আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড় আঘাত ছিল। যে-একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত, সে রইল না।"

সেই সন্তোষ মজুমদার সেদিন পারলৌকিক আসরে এসে উপস্থিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি।

আর কেউ এসেছ ?

—সন্তোষ।

তুমি সন্তোষ ?

—বলুন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মনের যোগ আছে ?

—আছে।

(এই 'আছে' কথাটা বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় এবং তার দু'ধারে দুটো করে লম্বা লম্বা দাঁড়ি টানা হয়। দেখলেই বোঝা যায় শব্দটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে)।

আমাদের এখানকার কাজ যা চলছে জান ?

—জানি। আমার খুব ভাল লাগে। বোধ করি মতভেদ হবে।

কলেজ সম্বন্ধে কী মত ?

—চলবে।

ভাল হবে ?

—সকলের একতা চাই। কিন্তু পৃথিবীতে কী ছাড়া ছাড়া চিন্তার প্রণালী।

মেয়েদের যা ব্যবস্থা করেছি, তাতে তোমার সম্মতি আছে ?

—চলুক। ওটা খুব সফল হবে,—গান এবং কলার দিকটা।

শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কী ভাবছ ?

—ওটা তো একেবারে তৈরি।

বৌমারা (প্রতিমা দেবীরা) কারুকলা সৃষ্টি করছেন। কেমন লাগে ?

—বেশ বেশ।

রেখার (সন্তোষ মজুমদারের ভগ্নি) খবর জানো ?

—পাই।

কী রকম আছে সে ?

—বলতে পারি না।

বড়দাদাকে (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) দেখেছ ?

—তিনি বেশির ভাগ সময় ধ্যানের ভাবে থাকেন।

তুমি ওখানে কোন্ কাজে প্রবৃত্ত আছ ?

—আমি একটা বাগান তদারক করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেই রকম ?

—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে।

ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—ঠিক মানুষের যেমন, গাছেরও অনেকটা সেই রকম। আমাদের ফুল ধরে না, কিন্তু ওদের মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়।

তোমাদের দেহ আছে ?

—দেহ কই ? একটা বিশেষ রূপ আছে।

গাছের রূপ আছে ?

—হাঁ।

দেহহীন গাছের যত্ন করার প্রয়োজন আছে ?

—যত্ন ? না, যত্ন নয়, কিন্তু একটা হৃদয়ে হৃদয়ে জানাজানি।

এখানে যেমন জল খাদ্য দিতে হয়, ওখানেও কি তেমনি ?

—আমাদের তা প্রয়োজন হয় না।

আমরা যেমন গাছের সৌন্দর্য ভোগ করি, আনন্দ পাই, তোমরাও কি তাই পাও ?

—আনন্দ ? না, এ আমার কাজ ।

সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই কাজের সঙ্গে ?

—যদি ওই শুকনো ফুলটি ফুটে ওঠে তাহলে বুঝব আমার আর একটি কাজ করতে হবে—তখন নূতনের আনন্দ পাব ।

আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ আছে ?

—স্নেহ নেই, প্রেম নেই, আছে মায়া ।

(এই উত্তরটি লেখার পর চারদিকে রুল টেনে দেওয়া হয় মোটা রেখায়) ।

অজিত (অজিতকুমার চক্রবর্তী) যে-লোকে আছে, তুমি কি সেই লোকে ?

—জানি আছেন, কিন্তু দেখা পাই না। আমি তো জানি না, এ কোন্ লোক।

দেহান্তর ধারণে ইচ্ছা করে ?

—যদি হই, তবে অরণ্যলোকে আমার স্থান ।

আমাদের পরিষ্কার করে দেখতে পাচ্ছ ?

—আপনাকে পাচ্ছি ও মিডিয়মকে পাচ্ছি। আর সকলে ঝাপ্‌সা ।

অরণ্যলোকে গাছপালার সত্তাকে অনুভব কর তোমার সত্তা দিয়ে ?

—করি। মানুষের চেয়ে তারা বেশি পরিচিত ।

এখানে ছেলেরা যারা আছে, তাদের কথা চিন্তা কর ?

—না, না, আমার কাজ আছে ।

শৈল (সন্তোষ মজুমদারের পত্নী) সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে ?

—সে একটা উদ্যান রচনা করুক। প্রত্যেকটি ফুলকে ভালবাসুক ।

শৈলর গাছপালার ভালবাসা না থাকলে মুক্তি পাবে কী করে ?

—তার মুক্তি ঐখানেই। কাজ আরম্ভ করুক ।

কী রকম করে কাজ করবে ?

—একটা গাছ, না হয় একটি বিশেষ গাছ—না'ইবা হল বাগান। যাই ।

ছয়

২৮ নবেম্বর। সকাল। শান্তিনিকেতন। আসরে আছেন নন্দলাল বসু, মীরা দেবী প্রমুখ। প্রশ্নকর্তা রবীন্দ্রনাথ, মিডিয়াম উমা দেবী। প্রশ্নের নকল রাখছেন ডঃ অমিয় চক্রবর্তী ।

এলেন মণিলাল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথের জামাতা, ঠাকুরবাড়িতেই থাকতেন। সেকালের খ্যাতনামা গল্পকার। সাহিত্য, নৃত্য, অভিনয়, সংগীত—সর্ব বিষয়ে পারদর্শী, ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান। তদুপরি রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন নাতজামাই মণিলালকে।

মণিলালের আর একটি শখ ছিল প্রেতচর্চা। জীবিতাবস্থায়, বিশেষ করে শেষ জীবনে প্ল্যানচেট-মিডিয়াম নিয়ে মেতে থাকতেন। মণিলাল মারা যান ১৯২৯ সালে। সেই বছরই মিডিয়াম মারফত এলেন শান্তিনিকেতনের উদয়নে।

কে ?

—মণিলাল।

কী করে জানলে যে, বুলা এখানে বসেছে ? খবর পাও কী করে ?

—ভাবছিল কেউ।

ভাবনা কী করে পৌঁছালো ?

—হাওয়ার ভিতর দিয়ে। এ এক রকমের wireless।

যখন পেনসিল ধরেনি, তখন আমাদের অনুভব কর ?

—অনুভব করতে পারি, সাড়া দিতে পারি না।

বুলার কাছে কেন লেখা সহজ হয় ? আমি ধরলে তো হয় না ?

—আপনি ধরলে হয় না তা নয়, তবে ওঁর কাছে লেখা সহজ, ওঁর ভাবপ্রবণতা আমাদের আহ্বান করে আনে।

বুলাকে কথা কওয়াতে পার, সে যদি pencil না ধরে ?

—সে সহজ নয়, কথা বলে ভরসা কম, মুখের কথার উপর আমাদের Control নেই। কল্পনা তাতে মিশবে। সে ক্লান্ত করছে না তো ?

বুলার সাধ্যাতীত তাকে দিয়ে করাতে পার ? ছবি আঁকা ?

—তাতেও একটা limit আছে। ওঁর জ্ঞানবুদ্ধিকে ছাড়াতে পারি, নতুন শক্তি দিতে পারিনে।

এখানে থাকতে অনেক অসম্ভব ভৌতিক কাণ্ড তুমি দেখেছ—

—না, ওর ভেতর বুজরুকি ঢের, আমি নিজেও অনেক ছলনা করেছি।

তোমার প্রভাব বাইরের জিনিসের উপর কি আমাদের চেয়ে বেশি ?

—আমাদের শক্তিটা খুব powerful, কিন্তু প্রয়োগ করতে পারি অন্যের দ্বারা।

আজ এই শরৎ-প্রভাতের ছবি অনুভব করতে পারছ ?

—জানি যে, তাই পারি। বিদেশী আত্মার পক্ষে কঠিন।

মেয়ে-পুরুষের আত্মার মধ্যে প্রভেদ আছে ?

—আছে, ভাবে ও রূপে।

সেই ভেদের মধ্য দিয়ে আকর্ষণ আছে পৃথিবীর মতন ?

—আছে, কিন্তু দৈহিক তো নয়। অত্যন্ত প্রবল।

এখানে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে কামনা করে, তার সফলতায় আনন্দ আছে, ওখানে কি তাই ?

—কামনার ধারা অন্য রকম। এখানে যাকে চাই নিজের মধ্যে তাকে পেতে হয়। নিজের দেবতার মধ্যে তাকে পেতে হয়। বস্তুর সার্থকতা নেই, আত্মরচনাতেই সার্থকতা।

এখানে আত্মরচনার সঙ্গে বিশ্বে যোগ আছে। তোমাদের কি সে রকম বাহিরে প্রতিফলিত করার সাধ্য নেই ?

—বাহির নেই, সব অন্তর।

বাহির ও অন্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব কিছুতে কল্পনা করতে পারি না আমরা।

—এটা এখানে অভাব বোধ করবার সময় নেই। ভিতর এত পরিপূর্ণ সরঞ্জামে ভরা, তাকে সাজিয়ে তুললেই হয়।

আমাদের বাহির এবং অন্তর। তোমাদের কেবল অন্তর। আমাদের কি বেশি সার্থকতা নয় ? আমাদের দুই-ই আছে।

—আমাদের অন্তরের ভিতরই সমস্ত। সেখানে কি বাহিরের লীলা নেই ? সে আমাদেরই সৃষ্টি।

তার মানে অন্তরের মধ্যে তোমাদের দুই ভাগ আছে—একজন দ্রষ্টা, একজন ভোক্তা।

—হাঁ, ঠিক ধরেছেন।

বুলার কাগজে সেদিন কবিতা লিখেছিলে, সে তোমার পুরানো লেখা ?

—হবে, ঐ কবিতাই মনে আসছিল। কেন, পাওয়া গেছে নাকি ? আমার আবার কবিতা। ছি। ছি।

সে কবিতা তুমি পূর্বে দেখিয়েছিলে, না নূতন এল তার হাতে ?

—না, আমার তো মনে পড়ছে না। বুলা প্রকাশ করে লজ্জা দিচ্ছে। ছি ! ছি !

আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সন্তোষের। সেখানে বাগান আবার কি ! বুঝতে পারছি না।

—গাছের কি আত্মা নেই ? আছে। শিশুলোক ও পুষ্পলোক পাশে পাশে রয়েছে। এ ওকে শক্তি দেয়। এ ওকে ফোটায়। খেলা করে। বৃক্ষলোক, পুষ্পলোক ! সেখানে কি বিশেষ মানুষের গতি, না তোমাদের সকলের কাছে প্রকাশিত ?

—প্রকাশিত, কিন্তু আমাকে যেতে হয়নি। ইচ্ছে করলে যে যাওয়া যায় না, তা নয়। কৌতূহল এখন তেমন নেই।
যে লোকে তুমি বাস করছ, তার কি নাম বলতে পার?
—শূন্যলোক নাম আমারই রচনা।
শূন্যলোক কি মানবসম্বন্ধবর্জিত? একেবারে শূন্য?
—মানব আত্মায় পরিপূর্ণ। সেই শূন্যলোকে নক্ষত্র ফুটে আছে।
যে ভাষা এখানে তোমাদের ছিল, সেই ভাষা কি তোমার ব্যবহার করতে হয় পরস্পরের সঙ্গে কথা ক'বার জন্যে?
—ভাষার প্রয়োজন কম। ইঙ্গিত আছে ও ব্যবহার আছে। কিন্তু এ মধুর বাক্যালাপের সময় কই, কই?
ভাষার একটা আনন্দ আছে, তাকে সৃজন করবার আনন্দ। ভাষা না থাকলে ভাবের কি সৌন্দর্য থাকে?
—ভাষা নেই, ভাব নেই, তা নয়। সে এক ব্যাপার। বলা যায় না।
এখানকার যাদের সঙ্গে তোমার প্রীতির সম্বন্ধ তা কি পৃথিবীর সম্বন্ধের মতো নয়? এই সম্বন্ধের কি কোনো পরিণতি হয়েছে? স্নেহ প্রেম দয়ার?
—প্রেম আছে, দয়া আছে, মমতা আছে। সবই আছে, কিন্তু তার প্রকাশ সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ আমি যাঁকে ভালোবাসছি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার সাধনাই বড়ো সাধনা। ঠিক সেই আপনার কবিতার মতো—সবার হতে কাছে আসা, সবার হতে দূর, বড়ো কঠিন সাধনা যার বড়ো সহজ সুর।
সত্যেন্দ্র (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রভৃতির স্মৃতি নিয়ে আলোচনা হয়?
—করি মধ্যে মধ্যে। সে এক উল্লাস। তাও rare—সবাইকে সব সময় পাওয়া যায় না। পৃথিবীর মজলিশের মতো সে নয় যে!
নতুন বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হয়েছে ওখানে? যাকে পৃথিবীতে জানতে না?
—এখানে সকলের সঙ্গে যোগ ও বন্ধুত্ব। চির পরিচিত সবাই। যেন ছোট একটি গ্রামের লোক সবাই।
যাদের সঙ্গে পৃথিবীতে অসদ্ভাব ছিল, এখন কি আছে?
—না। যদি থাকে সে আমার প্রচন্ড শাস্তিভোগের সূচনা।
তোমরা এই সব শাস্তিভোগ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছ?
—এ মুক্তি এখানে অতি সহজ। সবাই হেসে চায়, সবাই ভালোবাসে। তবু আপনাকে বলি সে কি ভালোবাসা? বিচ্ছেদহীন যে-ভালোবাসা, সে কি ভালোবাসা?
যারা দুষ্টপ্রবৃত্তি—যাদের পশুবৃত্তির অন্ত নেই, তাদের কী হয় ওখানে?

—তারা ঠিক আর এক পৃথিবীর আবর্তে ডোবে। কিন্তু তফাৎ এই, পৃথিবীতে অনেকেরই যে ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, ন্যায় অন্যায়ের ভয় নেই। তা এখানে চলে না।

আচ্ছা, পৃথিবীতে অনেক যে সব রিপু দূষণীয় - স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ প্রভৃতি নিয়ে—সেখানে কি সে সব সম্বন্ধে লজ্জা আছে ?

—না, লজ্জা নেই। দেহ যার আছে, তার কি advantagc থাকবে না। ঐ বড়ো অন্যায়।

সব মানুষের আত্মা কি স্থায়ী হয়, কোনো মানুষই কি লুপ্ত হয় না ?

—অবশেষে একদিন হয়।

সেই বিলুপ্তিকে তুমি মুক্তি বলো ? একেবারে সম্পূর্ণ বিলোপ ?

—না, মুক্তি তা নয়। বিলোপ হতে পৃথিবীর গণনায় লক্ষ বছর কেটে যায়। যেমন রামলক্ষ্মণকে আমরা দেখি না।

তোমাদের কি লোকান্তর বলে কোন পদার্থ আছে ? তোমাদের অবস্থান্তর, না লোকান্তর ?

—জন্মান্তর।

জন্মান্তর বলতে বুঝি মায়ের গর্ভে যে জন্ম, তার কথা বলছ ?

—হ্যাঁ, আমি যদি জন্ম নিই কোথাও—কার ঘরে পড়ব জানি না—তখন আর আমায় পাবেন না। কিন্তু একটা মজা আমি আবিষ্কার করেছি যে, মণিলাল হয়ে আমি যতদিন এখানে থেকে যাব, সেটুকু এখানে থেকে যাবে। কারণ এখনকার মণিলালের আত্মা হারাবে না আপনাদের কাছে।

তুমি আমাদের কাছে যে সমস্ত Communications করছ, তার মধ্যেও ভুল থাকতে পারে ?

—হ্যাঁ, এ তো আবিষ্কারের মতো ? কৌতূহল প্রকাশের স্থান তো এ নয় যে, কারও কাছ থেকে জেনে নেবো।

তোমাদের পরস্পরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা কর না ? সত্য সম্বন্ধে সংবাদ নাও না, যে বেশি জানে তার কাছ থেকে ?

—রূপান্তর কি অবস্থান্তর সম্বন্ধে নয়। তিনি যদি বড় হয়ে থাকেন আমার চেয়ে, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিই। মুক্তিতত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করি।—যাই যাই, যাই।

যাও। আর কাউকে পাঠিয়ে দিয়ো—সত্যেন্দ্রকে।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্যে। তাঁর প্রিয়শিষ্য সত্যেন্দ্র। কিন্তু এল অন্য আত্মা।

কে ? কী নাম তোমার ?

—মালাকর।

তোমার আসল নাম কী বলো ? সে তো তোমার নাম নয়।

—কাউকে ডাকবো ?

সত্যেন্দ্র দত্তকে ডাকতে পার।

—দেখছি।

মালাকর নিরুদ্দেশ। কিন্তু সত্যেন দত্তের দেখা নেই। যিনি এবার এলেন, তিনি রবীন্দ্রশিষ্য অপূর্বকুমার চন্দের স্ত্রী—লোপামুদ্রা। ইনি আবার রবীন্দ্রনাথের বন্ধু চারুচন্দ্র দত্তের কন্যা। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে রেখে লোপামুদ্রা চন্দ মারা গিয়েছেন ১৯২৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের তিনি পরিচিতা, তাই তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর।

কে তুমি ?

—লোপামুদ্রা।

তুমি কিছু জানাতে চাও ? অপূর্বকে কিছু বলার আছে তোমার ? কোন ইচ্ছা ?

—না। তিনি আপনাকে কত শ্রদ্ধা করেন, তাই কথা শুনতে এলাম।

আমি তাকে খুব স্নেহ করি। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন আমার সঙ্গে। তুমি তখন কাছে ছিলে ?

—আমি ছেলেদের কাছেই বেশি থাকি। ও সুখে থাক।

তোমার ছেলেমেয়েরা নানা জায়গায় ছড়ানো আছে। তাতে তোমার মনে বুঝি দুঃখ হয় ?

—সবাই সুখে নেই। আমার বড় মেয়ের মন ভালো থাকে না।

পৃথিবীর সুখদুঃখ এখনো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে !

—সুখের স্মৃতি আছে, দুঃখের বোঝা আছে।

পৃথিবীর আকর্ষণ তোমাকে বেদনা দিচ্ছে ?

—মুক্তির বাধা হয়। আমি জানি ক্রমেই আমি উপরে উঠব।

তুমি মুক্তি কামনা করছ ?

—সকলেই, ঐ এক লক্ষ্য।

তুমি মুক্তি সাধনায় কারো কাছে সাহায্য পাও ?

—আচ্ছা, আমি যাই।

বড় মেয়ে মাধুরীলতা, ডাক নাম বেলা, আদর করে বাবা ডাকেন বেলি।

যেমন সুন্দরী, তেমনি তেজী। প্রথম সন্তান, তাই সবকিছুতেই তিনি প্রথম।

'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে ছোট ভাই রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আর সব ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাবা দিদিকে বেশি ভালবাসতেন। আমরা সেটা খুবই জানতুম, কিন্তু তার জন্যে কোনদিন ঈর্ষা বোধ করিনি কেননা আমরাও সকলে দিদিকে অত্যন্ত ভালোবাসতুম এবং মানতুম। দিদির বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তা মানতে আমাদের লজ্জাবোধ হত না। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সেইজন্য বাড়ির সকলের কাছ থেকে প্রচুর আদর পেতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন। শিলাইদহে আমাদের যখন পড়াশোনা আরম্ভ হল, দিদি আমাদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যেতে লাগলেন। বাবা তাঁকে নিজে পৃথক করে পড়াতে শুরু করলেন। তখন থেকেই বুঝেছিলেন দিদির লেখবার বেশ ক্ষমতা আছে। বাবা তাঁকে উৎসাহ দেওয়াতে পরে তিনি কয়েকটা গল্প লিখেছিলেন।"

বড় মেয়ে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে স্ত্রী মৃণালিনীকে এক চিঠিতে লিখছেন—"কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কী রকম দৌরাত্ম্য করত, সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কী রকম হুংকার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত, কী রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল। আমি ওকে নিজে পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম, দারজিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম।"

সেই বেলার বিয়ে হল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। মজঃফরপুরে উকিল। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ নিজে মজঃফরপুর গিয়ে মেয়েকে সংসারে বসিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর জামাইকে পাঠালেন বিলেত। ব্যারিস্টারি পড়তে। মেয়ে-জামাই তার কিছুদিন পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই মেয়ে-জামাই কলকাতার ডিহি শ্রীরামপুরে এক বাড়িতে কয়েক বছর পর চলে গেলেন। সেখানেই হল বেলার অসুখ। অসুস্থতার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে এলেন কলকাতায়। রোজ মেয়ের কাছে যান, সারা দুপুর তার সঙ্গে গল্প করেন, নতুন গল্পের প্লট বলে দেন, লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন।

কোন একটি কাজে ওই সময় তাঁকে শান্তিনিকেতন যেতে হয়। সেখান থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন—"কাল থেকে কলকাতায় যাবার জন্যে মনটা দ্বিধা করছে। কিন্তু আজকাল আমার হৃদয় ভারি দুর্বল আছে। জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবনমৃত্যুর উপর মনকে রাখতে পারি,

কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখানে থেকে বেলার জন্য যাত্রা-কালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।”

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ বইয়ে তারপরেই লিখছেন: কিন্তু কলকাতায় না এসেও পারলেন না। শেষদিন পর্যন্ত রোজ দুপুরে দিদির কাছে যেতে লাগলেন। সেদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ—যখন ডিহি-শ্রীরামপুর রোডের বাড়ি পেঁছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বিচিত্রার বৈঠক ছিল। বাবা সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্পসল্প যেমন করেন, সেদিনও তাই করলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে একজনও কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারল না যে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, মনের কী অবস্থা নিয়ে বাবা তাঁদের সঙ্গে সদালাপ করছেন।

বেলা যখন মারা গেলেন তাঁর বয়স বত্রিশ। মৃত্যু সন ১৯১৮। তার ঠিক এগারো বছর পর—

কে তুমি ?

—বেলা।

বেলা? ভালো আছিস ?

—হাঁ, বেশ আছি।

পৃথিবীর সব কথা মনে আছে ? এখানের সঙ্গে তোর যোগ আছে ?

—আছে বৈকি।

শমীর (কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ) সঙ্গে দেখা হয় ? তাকে পাস কাছে ?

—হ্যাঁ, এইতো কাছে ছিল। এখনও আমার কাছেই রয়েছে।

সে ভারী চঞ্চল, না ? শমী ?

—হ্যাঁ, বড় চঞ্চল।

এখানো সে কি বড় হয়নি ? তার চঞ্চলতা কি ঘুচল ?

—না, এখনও কেউ ওকে সামলাতে পারে না, সবারই প্রিয় ও।

আগে মনে আছে তো, কবিতা শুনতে ভালবাসত— পঞ্চনদীর তীরে— এখনও সেই ভাব আছে ওর ?

—কবিতা যখনই পড়, ও ছুটে যায়, আমাদেরও টেনে আনে।

ভালো লাগে ? আমার কবিতা শুনিস ?

—বেশ সুন্দর। পড়া না, জানা।

সেদিন যে অভিনয় হয়েছিল তপতী, শুনেছিলি ?

—বাঃ, ছিলুম যে সেইদিন।

ভালো লেগেছিল ?

—বড়ো সুন্দর। শুধু দেখা নয়, পাওয়া জানা অনুভব করা।

আমি যুবা সেজেছিলুম। আমাকে দেখেছিলি ?

—মানিয়েছিল সুন্দর।
অমিতাকে (অমিতা ঠাকুর) কেমন লাগল ?
—ভাল।
শান্তিনিকেতনকে মনে পড়ে ?
—পড়ে বৈ কি।
এই যে এখন এখানে আছি—সব জানতে পারছিস, বুঝতে পারছিস ?
—জানি সব, আর এত বেশি জানি। যখন বিদেশে থাকতুন, তখন এত কি সম্ভব হতো ?
শমী তোর কাছেই আছে এখন ?
—হ্যাঁ।

বড় মেয়ে চলে যেতেই ছোট ছেলে এলেন। এলেন শমীন্দ্রনাথ! শমী সব সময় রবীন্দ্রনাথের মন জুড়ে রয়েছেন। বাইরের নানা কাজে যা ছিল চাপা, পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের সময় ঘুরেফিরে বার বার তা এসেছে, বার বার এসেছেন শমী—রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে আদরের শমী, যিনি অকালে চলে যান রবীন্দ্রনাথের বুক খালি করে। তার আগে আর একবার শমী এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়—৬ নভেম্বর।

কে ?
—শমী।
শমী ? এসেছিস ?
—রাগ করছ ?
কেন রে, রাগ করব কেন ?
—তুমি যে বললে আমি চঞ্চল!
চঞ্চল, ভালোই তো। কী চঞ্চলতা করিস ? ঘুরে বেড়াস ?
—আমি সব দেখতে জানতে চাই। আমি নিজে একটা পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই।
সে পৃথিবী গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিস ?
—হ্যাঁ, হচ্ছে খুব, সবার ভালো লাগছে, সে বেশ মজা।
আমিও যখন তোদের কাছে যাব, আমারও নতুন পৃথিবী তৈরি করার শখ হচ্ছে।
—বেশ, বেশ হবে। সত্যি ?
আমি তো আমার লেখা দিয়ে একটা জগৎ সৃষ্টি করছি—সেখানে বিনা কবিতায় এই কাজ করতে পারব ?
—কী মজা!

তোর সন্তোষদাদাকে (সন্তোষ মজুমদার) দেখতে পাস ?

—কী জানি। আমার তো কত কাজ। বিশ্বাস করছ না বুঝি ?

আমার কিচ্ছু বিশ্বাস হয় না। কী রকম কাজ তোর ? পৃথিবী কী রকমে তৈরি করছিস ?

—দেখো'খন, অবাক হয়ে যাবে, শুনেই সবাই চমকে যায়।

সে কি চোখে দেখা যায় ? আমাকে দেখতে পারিস ?

—চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়।

ছবি আঁক্ দেখি, সে বেশ হবে।

—আনন্দ থাকবে, তার কী রকম রূপ তোমার মনে আসে ?

আনন্দের কত রকম রূপ—একটা তো নয়—কীরকম করে বলব ?

—আচ্ছা, তুমি একটা ছবি এঁকো, 'শমীর পৃথিবী' নাম দিয়ো।

আমি কি এঁকে দেখাব, না লিখে দেখাব ?

—লিখবে আঁকবে যা খুশি—সে বেশ একটা সহজ হয় যেন।

খুব সহজ করে লিখব। কিন্তু সব সময়ে শক্তি তো থাকে না। সব সময়ে তো পারি না।

—তুমি আবার পারো না !

এখনকার আমার সব কবিতা শুনতে পাস ?

—কবিতা রোজই শুনি, কালও শুনেছি। সেই যে কে লিখে দিয়েছিল।

তার মানে বুঝতে পেরেছিলি ?

—বিশ্রী।

আমি তোর অসুখের সময় যে সব কবিতা শুনিয়েছিলাম মনে আছে ?

—মুখস্থ থাকে না, কিন্তু জানি সব। সব মনে আছে। বড় ভালো লাগে। সেই ভালো লাগা দিয়ে পৃথিবী গড়ব।

মৃত্যুর পর প্রথম কে তোকে আহ্বান করে নিলেন ?

—আমি একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, কে একজন আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন, ভালো মনে পড়ে না।

যেখানে তোর মৃত্যু হল—সেই মুঙ্গেরে, নদীর ধারে—সেইখানকার দৃশ্য কি তোর চোখের সামনে ছিল ?

—তাই ঠিক বলেছ বাবা, আমি ভাবছিলাম, নদীটা আবার কী !

আমি এখন শান্তিনিকেতনে আছি, দেখতে পাচ্ছিস ?

—বাঃ রে, পাব না ?

কী রকম লাগছে এই এখনকার শান্তিনিকেতন ?

—আমি একটা শান্তিনিকেতন করব, বলে দেবে ?

গড়িস যদি শান্তিনিকেতন তো খুশি হব। অনেক বদলে গেছে,

না ? এখনকার এই শান্তিনিকেতন ?

—অনেক বদলে গেছে।

আগেরটা ভালো ছিল, না এখনকার শান্তিনিকেতন ?

—এখন বড় হয়ে গেছে, আগে ছোট ছিল, জানার মধ্যে ছিল, তাই বড় আপন লাগত।

আচ্ছা, তোর মীরাদিকে (কনিষ্ঠা কন্যা মীরা গাঙ্গুলি) মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ।

তাকে দেখতে পাচ্ছিস এখানে ?

—তোমাকে ভালো করে, ও'কে অস্পষ্ট।

এখানে বসে আছে। তোর মীরাদিদিকে বলব পেন্সিলটা ছুঁতে—তাকে দেখতে পাবি ?

—তোমাকে ছুঁলেই হবে।

দেখতে পাচ্ছিস ? অনেক বদল হয়ে গেছে, যা জানতিস তার থেকে ?

(এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। জবাবের বদলে অন্য কথা)

—আচ্ছা, আমার কাজ সেরে আসি। আর একদিন আসব ছবি ও লেখা শেষ করে।

আটাশে নভেম্বর বিকেল। আবার বসেছে আসর। প্রথম আহ্বানে এলেন অনামী এক আত্মা, রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন নতুন বৌঠান। এই আসরের কথোপকথন আলাদাভাবে আগেই দেওয়া হয়েছে।

খানিক অপেক্ষা করতেই তারপর যিনি এলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের একেবারে অপরিচিত। নাম বললেন—শান্তি মিত্র। কিন্তু কে এই শান্তি মিত্র ? ছেলে না মেয়ে ? পরিচয় জানার জন্যে আমি যখন নানা জনের সাহায্য নিচ্ছি, তখন ঝাড়গ্রাম থেকে ১৭।৯।৭৩ তারিখে লেখা শ্রীযুক্তা স্নেহসুধা গুপ্তের একখানা চিঠি পেলাম। তাতে তিনি লিখছেন—"ইনি মনে হচ্ছে আমার পরিচিতা, ঢাকার ট্রেনিং কলেজের একদা প্রিন্সিপাল ৺মনোরঞ্জন মিত্রের কন্যা, মাত্র ২২।২৩ বৎসর বয়সে ১৯২৭ সালে পরলোকে চলে যান ; 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' গানটি শান্তির খুব প্রিয় ছিল। গাইবার গলাও ভাল ছিল, গাইতেনও খুব সুন্দর করে। আর কবির খুব ভক্ত ছিলেন। সে রবীন্দ্র সংগীত গায়িকা শ্রীলা সেনের মাসিমা।"

আমারও মনে হ'ল, এই শান্তি মিত্র তিনিই। এসেই তাঁর প্রিয় গান শুনতে চাইলেন—'আমার বেলা যে যায়'।

কে তুমি ?

—শান্তি মিত্র।

শান্তি কে ? আমি চিনি ?

—মিত্র।

আমি তোমাকে চিনতাম পৃথিবীতে ?

—একটি গান শুনতে এসেছি। 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে।'

আমার তো সুর মনে নেই ? জানো তো, আমার গান আমার নিজেরই মনে থাকে না। বলবো বুলাকে গাইতে ?

—আপনার গান শোনবার লোভ ছিল। আচ্ছা, যাই।

এলেন জ্যোতিদাদা—জ্যোরিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে প্রিয় ভ্রাতা। জ্যোতিদাদা জোড়াসাঁকোয় আর একবার এসেছিলেন, আবার এলেন শান্তিনিকেতনে।

এলেন সেই জ্যোতিদাদা, রবীন্দ্রনাথের কথায়—"যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম। বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককে শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেছেন।"

এলেন সেই জ্যোতিদাদা, যিনি "পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরী করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।"

এলেন সেই জ্যোতিদাদা, যিনি রবীন্দ্রনাথের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ—এই তিনকাল জুড়ে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু শেষ বয়সে দুজনের ছাড়াছাড়ি। একজন গেলেন শান্তিনিকেতন, অন্যজন রাঁচির শান্তিধাম। সেই রাঁচিতেই পরিণত বয়সে মারা গেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালে। তার ঠিক চার বছর পর—

কে ?

—পাঠিয়ে দিলেন তোমার নতুন বৌঠান।

জ্যোতিদাদা। সেদিন আপনার কথা শুনে আমার খুব উপকার হয়েছে—মনকে শান্ত করতে পেরেছি।

—তুমি পারবে আমি জানি।

মৃত্যুর পরমুহূর্তে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ কী উপায়ে হয় ?

—সে একটা আচ্ছন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে আসি। ঠিক যেন ঘুম থেকে জাগি। সমস্ত জীবনটাই গত রাত্রের স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমাকে এইমাত্র শমী বলল, একটা পৃথিবী তৈরি করছে। খুব মজা লাগছে তার। সেটা কী ?

—করছে বটে, কিন্তু ও বলতে নিষেধ করেছে।

আমাকে বলছে, 'শমীর পৃথিবী' বলে কিছু একটা রচনা করতে।

—বেশ তো, লিখে দাও না। ওর মনে সত্যই অনেক কিছু খেলছে। ও যেন নতুন আলোক দেখতে পেয়েছে। আমাদের বুড়ো চোখে তা ধরা পড়ে না।

আচ্ছা, সন্তোষ বললে গাছ নিয়ে পড়েছে—অরণ্যলোক সৃষ্টি করছে, সেটা কী?

—সে ওর পরীক্ষা। ও যেন কেমন করে ছিটকে পড়েছে, একটি বৃন্তচ্যুত শুষ্ক ডালের মতো, অরণ্যের মধ্যে।

কিন্তু সে অরণ্য কি ওর অন্তরে না বাহিরে?

—বাইরেটা অন্তরের ভিতর, ছাদের উপর যেন হোগলা খাটানো হয়েছে।

আপনি অন্তরলোকে কিছু সৃষ্টি করছেন?

—চেষ্টা করছি।

সে সৃষ্টির স্থায়ী মূল্য আছে?

—মূল্য এই যে, এই লোকের স্তরের পরের স্তরে উঠব, অধোগতি হবে না।

আমাদের যে সব রচনা এই পৃথিবীতে—প্রধানত তার মূল্য অন্য লোকজনের কাছে। আপনাদের রচনা কি নিজেরই জন্য?

—আমার রচনা তো তেমন নয় যে সবাইকে আলো দেবে—তুমি এখানে এলে সবাইকে অনেক জাগাতে পারবে। অর্থাৎ তোমা হতে অনেকে সাহায্য ও শক্তি পাবে, এই আমার বিশ্বাস হয়।

বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে কি দেখা হয়?

—তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন। সম্বোধন করে বলা চলে না।

আপনারা কি রূপধারণ করে দেখা দিতে পারেন?

—পারি। ওতে আমাদের শক্তিরও প্রয়োজন অর্থাৎ একটা মিডিয়ামের আত্মা যত সহজে দেখা যাবে, তা পারি না।

নতুন বৌঠানকে বলেছিলুম দেখা দিতে। চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। পারবেন?

—তার শক্তি যে কতদূর, তা তো জানিনে। তবে খুব একটা ইচ্ছাশক্তি তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে।

এই যে এখানে আছি, আমার অন্তরে আপনার অন্তরে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে?

—কার অন্তরে?

শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে আমার অন্তরে আপনার অন্তরে।

—আছে। তুমি প্রশ্ন করছ বলেই উত্তর দেওয়া সহজ হয়েছে।

আপনি এখানে আসার দরুণ আমি বিশেষ কিছু অন্তরে পাচ্ছি কি ?

—আমি তোমায় কী দেব ? আমি এসেছি আমার সমস্ত শুভকামনা নিয়ে। সে কি তুমি পাবে না ?

আমার নিজের মধ্যে যখন শক্তির অভাব অনুভব করি, যখন ভুল করি, আপনি তখন কি তার প্রতিকার করতে পারেন ?

— তুমি কেন ভুল করবে ?

আমি যখন ছবি আঁকি, আপনাকে চিন্তা করলে আপনার শক্তির কোনো প্রতিক্রিয়া কি হতে পারবে ?

—সাহায্য হতে পারে, তেমন করে তুমি যদি ডাকো। তুমি যদি তেমন ভাল মিডিয়ম হতে, তবে হতে পারে।

বুলার ভিতর দিয়ে এখন আপনি কি একটি ছবি আঁকতে পারেন ?

—নতুন শক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, তবে যাই। ভালো থেকো।

জ্যোতিদাদার পর অপরিচিত আর এক আত্মার আবির্ভাব। নাম সর্বজয়া, বয়স্কা। বললেন, তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবীর সখী।

কে তুমি ? কী নাম ?

—সর্বজয়া।

তোমাকে কি জানি ?

— তুমি ছোট ছিলে যখন, আমার মরণ হল।

আমাদের আত্মীয় বুঝি ?

—তোমার মা'র সখী।

আমাদের বাড়িতে থাকতেন ?

—অনেকবার গিয়েছি। সবাই বলেন, তুমি মস্ত কবি হয়েছ। তাই একবার দেখতে এলুম।

আমার মাকে ওখানে দেখতে পান ?

—কিছুকাল আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তিনি কি আজ আসতে পারবেন ?

—তা তো জানিনে। আমি কেমন করে ঢুকে পড়েছি। সেকালের বুড়ি, অত শত জানিনে।

আপনি কোন্‌ লোকে আছেন ?

—আমি যে লোকে আছি বাছা, সে তো মৃত্যু না হলে বুঝবে না। তবে যাই।

সর্বজয়ার পর এলেন রবীন্দ্রনাথের আর এক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র—সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের ছেলে হিতেন্দ্রনাথ। গুরুজনরা বলতেন 'হিতু', ছোট ভাইবোনদের 'হিন্দা'। এই 'হিন্দা'ই তাঁদের পারিবারিক খাতায় রথীন্দ্রনাথের জন্মের আগে লিখেছিলেন—"রবিকাকার একটি মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না, রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে।"

হিতেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন খুব। তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার। একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের উপাসনায় তাঁকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিতেন্দ্রনাথ মারা যান, ১৯০৮ সালে, মাত্র ৪১ বছর বয়সে।

কে ?
—হিতেন্দ্র—
হিতু, কেমন আছ তুমি ?
—ভালোই আছি।
কোন্ লোকে আছ তুমি ?
—মানব আত্মার সব যেখানে এসে মিলিত হচ্ছে।
পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ?
—তত বেশি নয়, তবু সব কথাই মনে পড়ে। কতদিন হল, সে কতদিন !
পৃথিবীতে লোকের পরে স্নেহপ্রেম সেই রকম আছে ?
—তাদের সুখেই আমার সুখ।
কোন নতুন সম্বন্ধ সেখানে হয়েছে ?
—এত পরিচিত বিদেহী সব চারিপাশে রয়েছে যে সব সময়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনে।
তুমি সংগীত ভালবাসতে, তার চর্চা আছে ?
—সংগীত এখনও ভালবাসি। চর্চা ? এখনও নিজের মধ্যেই তার সুর শুনি। আমি কি কাউকে ডাকব ?
পিয়ারসনকে ডাকতে পারো ?
—চেষ্টা করছি।

না, পিয়ারসন সাহেব আসেননি। পিয়ারসন সাহেব মারা যান এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়, ১৯২৩ সালে। তাঁর জন্যে রবীন্দ্রনাথের মন সব সময় ছটফট করছিল।

পিয়ারসনের বদলে এলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম

ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক। কাব্য পরিক্রমা, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বই তাঁরই। পন্ডিত, সংগীতজ্ঞ। দারুণ গানের গলা ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তী'র অন্তরঙ্গ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন গুণগ্রাহী।

দার্শনিক প্রসন্নকুমার রায়কে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"অজিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইহার দর্শন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিস্ময়বোধ করিয়াছেন। সেবার মোহিতবাবু (মোহিতচন্দ্র সেন) চরিত্র-নীতি সম্বন্ধে পরীক্ষা-কর্তা ছিলেন। তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ইহাকে বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধবশতই আমি অজিতকে আমার বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়াছি।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী আর সতীশ রায় ছিলেন দুই বন্ধু, সতীশ রায় আগে শান্তিনিকেতন যান, বি-এ পাশ না করেই ; অজিতকুমার যান, বি-এ পাশ করে। অজিতকুমারের 'কাব্য পরিক্রমা' এখনও রবীন্দ্রচর্চার তুলনাহীন বই।

অজিতকুমার চক্রবর্তী'র মৃত্যু ১৯১৮ সালে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে।

এসেছ কেউ? নাম কী?

—অজিত।

তোমাদের ওখানে যে মানবাত্মার সম্মিলন হয়, একটা কিছু সিভিলাইজেশন তৈরি হচ্ছে সকলের সমবেত চেষ্টায়?

—সে তো একটা গন্ডীমাপা কিছু নয়, সে যে একটা বৃহৎ ব্যাপার।

আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা যে চেষ্টা করো, সেটা কি ব্যক্তিগত, না সমষ্টিগত সাধনা?

—ব্যক্তিগত। আগে নিজেকে সিদ্ধ করে নিই, পরে যদি কাউকে উদ্ধার করতে পারি, সে তো মহৎ কাজ।

যাঁরা এখানে থাকতেই কতকটা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা কী করেন?

—তাঁদের স্বর্গ তো প্রস্তুত। তাঁরা ক্রমেই বলবান হন।

সমস্ত মানুষ মিলে যে একটা বিরাট সৃষ্টি, তোমাদের কি তার মধ্যে গণনা করব? ইহলোক পরলোক মিলিয়ে?

—তার মধ্যেই আছি বৈ কি! সেই অদেহী ক্ষেত্র তো অসীম। কোন একটা জায়গায় তার শেষ আছে, সেই সীমারেখায় আমাদের স্থান।

তোমরা পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা করো?

—আমাদের চিন্তা তো কোন কাজে লাগবে না। তাই শুভকামনা জানাই। সমস্ত পৃথিবী এখন আমাদের আদরের ধন।

আমি জানতে চাই যে, য়ুরোপ বা ভারতবর্ষ যে পথে চলেছে, সেটা ভালো কি মন্দ, তা চিন্তা করো ?

—পৃথিবী অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। তার পরিবর্তন ভালো কি মন্দ তা তো জানিনে। আমরা যখন এ-লোকে এসেছিলাম, তার পরে কত যে change

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে য়ুরোপে যে সামাজিক বিপ্লব হচ্ছে, সে সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিমত আছে ?

—খানিকটা স্বাভাবিক। তবে প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেহ এমনিই জিনিস যে তাকে এড়ানো চলে না, বহু স্থলেই চলে না। আমরা নিয়ত সেই অভাবই অনুভব করি।

তোমরা কি দেহের অভাব অনুভব করো ?

—দেহ নেই, একথা ভোলা চলে না।

এ কি সূক্ষ্ম দেহ ?

—রূপ আছে, একটা নিজস্ব ভঙ্গিমার রূপ।

সেই দেহকে পালন ধারণ করতে আমাদের যে-আয়োজন, তোমাদের কি তা নেই ?

—না। আমাদের তাকে সুন্দর করাই কাজ। বাহির ও ভিতর যেন পশমের বোনা জিনিসের মতো না হয়।

দেহহীন রূপকে সুন্দর করা বলতে কী বুঝবো ?

—তাকে পূর্ণ করা, তাকে জাগিয়ে রাখা। সে যেন একটা নূতন আলোকের মধ্যে ডুবে থাকে, অন্ধকার তাকে যেন স্পর্শ না করে।

তোমাদের রূপের এবং দেহের কি পরিণাম আছে ?

—না।

ক্ষয় বৃদ্ধি পরিণতি—কিছু নেই ?

—অবনতি আছে কি না জানিনে। তাকে পূর্ণ করাই পরিণতি—চরম পরিণতি।

তুমি ওখানে শমীকে দেখতে পাও ?

—দেখেছি।

দেখেছো ? সেখানে সে কী করে ? কী তার কাজ ?

—আমাদের ওদিকে মন দিতে মানা করেছে। বলেছে সময় হলে ডাকবে। ও অনেককে জাগিয়ে রেখেছে।

ও একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করছে ?

—ঠিক।

তোমরা কি কোন নূতন জগৎ তোমাদের মনের ভিতর সৃষ্টি করছ ?

—আমাদের মনে এই ইচ্ছে যে, যে সব আত্মা পিছনে পড়ে আছেন,

তাদের স্বদলভুক্ত করে একটা আনন্দের কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। এখানে তার প্রয়োজন কম জানি, কিন্তু পৃথিবীর সে আনন্দ যে আজো ভুলতে পারিনে।

দেহান্তর গ্রহণে ইচ্ছে করে?

—ইচ্ছা? শান্তিনিকেতনে যদি জায়গা পাই।

তার মানে তোমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে?

—না, ঠিক জানি না। আমি তো মুক্তির পথই খুঁজছি।

তুমি আমাদের ভাবীকালকে আমাদের চেয়ে উজ্জ্বলতর করে দেখতে পাও?

– Fortune-teller-এর মতো নয়, তবে আমাদের অনুভূতি হয়তো দেহী মানবদের চেয়ে বেশি।

শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছ?

– আপনার অবর্তমানে?

হাঁ।

—থাকবে।

উন্নতি হবে?

—উন্নতি হবে।

কোন্ বিভাগের 'পরে তোমার শ্রদ্ধা?

—কলা বিভাগ।

তুমি তার কাজ দেখতে পাও?

—পাই।

শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কী মনে করো?

—বেশ গড়ে উঠছে।

সেটার দ্বারা উপকার হবে দেশের?

—খুব।

এবার আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জিজ্ঞাস করুন। আমার জীবনে কি আর কিছু কাজ বাকি আছে, না কিনারায় এসেছি?

—জানি না।

বলতে ইচ্ছা করছে না?

—আমি তো জ্যোতিষী নই।

অমি এই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি, আমি জানতে চাই, কোন্ ধারায় চললে ভালো হবে আমার।

—আরো কাজ শেষ করে আসুন। এখানে আপনার সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত।—যাই

অজিত চক্রবর্তী বিদায় নিতেই অন্য আত্মা এসে একটি মাত্র কথা বলে চলে গেলেন। নাম বলেননি, তবে অনুমান—কাদম্বরী দেবী।

তারপর আর একটি আত্মা এলেন। সেই মালাকর, যিনি আগে একবার এসেছিলেন এবং যাঁর কাজ আত্মাদের এগিয়ে দিয়ে যাওয়া।

কে ?

—মালাকার।

আপনি কে ?

—আমি এখানে সকলকে এগিয়ে আনবার কাজ নিয়েছি। কাউকে ডাকব ?

সন্তোষকে চেন ?

—আচ্ছা দেখছি, যাই।

মালাকর চলে গেলেন। নিয়ে এলেন সন্তোষ মজুমদারকে। সন্তোষ মজুমদার মশাই আগেও এসেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি অন্তরঙ্গদের একজন।

কে ?

—সন্তোষ।

তুমি এখনও সেই গাছের সাধনায় আছ ?

—আমার মন আজ বড়ো ভালো আছে, তাই আজ জানতে এলুম।

তুমি নতুন কিছু পেয়েছ তোমার সাধনায় ?

—আমার যে-সাধনা, তাতে আনন্দ না থাক, মুক্তি আছে জানি। আমি একটু অগ্রসর হয়েছি।

তুমি যে-লোকে আছ, সেটাকে কি বৃক্ষলোক বলব ?

—নাম জানি না, বলতে পারি না। তা হবে। এখানে বৃক্ষের আত্মায় আমি দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করি।

তোমাদের সাধনায় কোনো সহায়তা করতে পারি ?

—আপনি যে গাছ ভালোবাসেন, ফুল ভালোবাসেন তা মনে করে আমি খুব আনন্দ পাই।

আমি খুব ভালোবাসি গাছ। প্রায়ই গাছের সেবা করি।

—আমি যে কাজ নিয়েছি, সে আমার পথকে সুগম করবে, সে কি আপনি বিশ্বাস করেন না ?

নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

—আমায় কিছু বললেন ? কোনো ভালো উপদেশ ? এখানে আমি

দূরে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন লোভ হয়। জানি, আমার ডাক আসবে।

তুমি মানবাত্মার কোন সেবাতে নিযুক্ত হতে পারো ?

—পারবো। কিন্তু এখন আমার এই কাজটি শেষ হোক। এই আশীর্বাদই চাই। আমার প্রণাম নিন।—আমি যাই।

এলেন মোহিতচন্দ্র সেন। নববিধান ব্রাহ্ম, কৃতী ছাত্র, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরম রবীন্দ্রভক্ত। তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংগ্রহ—কাব্য-গ্রন্থাবলী। মোহিতচন্দ্র সেন ১৯০৪ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেন হেডমাস্টার হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—"আপনি কবে আসবেন, আমি তার জন্য পথ চেয়ে আছি। আমার চিত্ত ক্ষুধাতুর।"—রবীন্দ্রনাথের "আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু" মোহিতচন্দ্র সেন অবশ্য শান্তিনিকেতনে বেশীদিন থাকেননি। মোহিতচন্দ্র সেনের নামে এখনও শান্তিনিকেতনে আছে একটা বাড়ি—'মোহিত কুটির।' মোহিতচন্দ্র সেনের আর একটি পরিচয়, তিনি মিডিয়াম উমাদেবীর বাবা। মোহিতচন্দ্র সেনের মৃত্যু সন ১৯০৬।

কে আপনি ?

—বাবা।

কার পিতা ?

—বুলার। মোহিতচন্দ্র সেন।

কেমন আছেন সেখানে ?

—ভালো আছি, চমৎকার।

সেখানে আনন্দ পান ?

—আনন্দের আয়োজন প্রচুর আছে। আত্মার [illegible] তার প্রকাশ।

সেখানে বাহ্যবিষয় নিয়ে সুখ-দুঃখ নেই ?

—দরকারই বা কী। আত্মসৃষ্টিতেই আনন্দ। আত্মলাভ ?—সে বহু সাধনার ফল।

আত্মসৃষ্টি কি বিশ্বের জন্য, না নিজের জন্য ?

—আগে নিজেকে সৃষ্টি করি, পূর্ণ করি, তারপরে বিশ্ব আমার কাছে পূর্ণ হয়।

যে-সৃষ্টি করছেন, সে কি থেকে যাবে, না নিজের সঙ্গে চলে যাবে ?

—সৃষ্টির শেষ আছে কি ? ক্রমে তা সূর্যের জ্যোতির মতো চারিপাশে ছড়িয়ে পড়বে। মানবাত্মা কি অপদার্থ বস্তু ভাবেন ?

পৃথিবীতে আমরা যে-অপরাধ আপনাদের প্রতি করি, আপনারা কি তা ক্ষমা করেন ?

—ক্ষমা? ক্ষমার কোন কিছু নেই। সমস্তই ক্ষমা করে যাবো। তার মতো আনন্দ কিছুতেই নেই।

পৃথিবীতে কত অপরাধ করে থাকি, সে কি আপনাদের কাছে পৌঁছয়?

—তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। মুক্তির পথ অতি বিরাট। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। কোথায় হারিয়ে যায় প্রতিদিনের ক্ষুদ্র অপরাধের ধূলিমা।

ধর্মমত সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন হয়েছে কি?

—আমি যে-দেবতাকে একান্ত করে নিজের মধ্যে পেয়েছিলেম, এখানেও তাঁকে পেলেম।

যে সাধনা আমি করি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

—আপনার যে-পথ, সে তো সুন্দর। নিয়তি সহজে আপনার কাছে এগিয়ে আসছেন। উপদেশ দেবো? না, তার তো কোন প্রয়োজন নেই। মন শান্ত করে সমস্ত কাজের সমাপ্তি করে আসুন। ফাঁকি দিয়ে তো আপনি ছুটি নিচ্ছেন না। বুলাকে আমার আশীর্বাদ।

—যাই।

সাত

১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর। সকাল। শান্তিনিকেতন। এদিনের প্রথম আহ্বান।

এলেন সতীশচন্দ্র রায়। মোহিতচন্দ্র সেনেরই সমসাময়িক—শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। শান্তিনিকেতনেও পাশাপাশি দুটি বাড়ি—'সতীশ কুটির' আর 'মোহিত কুটির'।

এই সতীশ রায়কে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাঁর কবি-প্রতিভার জন্যে। বরিশালের এই তরুণ কবি ও আদর্শবাদী শিক্ষকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সাধকের চেহারা দেখেছিলেন। তিনি লিখছেন—"আশ্রমের যাঁরা শিক্ষক হবে, তারা মুখ্যত হবে সাধক। এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।"

সেই সতীশ রায় মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা গেলেন, শান্তিনিকেতনে, বসন্ত রোগের আক্রমণে। ১৯০৪ সালে। মৃত্যুর পর তাঁর লেখা 'গুরুদক্ষিণা' বইটি প্রকাশিত হয়। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধে সতীশ রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা আছে। আর 'বনবাণী'র শাল কবিতায়ও কবি স্মরণ করেছেন সতীশচন্দ্র রায়কে। সেই সতীশচন্দ্র রায়ের আত্মা এলেন।

কে?

—সতীশ।

সতীশ রায় ?
—নিশ্চয়।
মনে আছে আমাদের ?
—খুব।
(এই খুব কথাটা বড় বড় হরফে লেখা হয়)
তখনকার সংগে এখনকার তফাৎ জান আমাদের এখানে ?
—ভালো কথা। যা হওয়া উচিত এই, তাই হয়েছে।
তুমি কবিতা লিখতে। এখনও তাতে অনুরাগ আছে ?
—অনুরাগ আছে, কিন্তু ভরসা কমে গেছে।
একটা কবিতা আমায় লিখে দাও।
—সর্বনাশ !
(এই 'সর্বনাশ' শব্দটি বড় অক্ষরে লেখা হয় এবং চারপাশে রুল টেনে দেওয়া হয়)
কত সহজে লিখতে তখন, নিশ্চয় সে শক্তি আছে।
—চেষ্টা করতেই ভয় করছে। তখনকার আপনি আর এখনকার আপনিতে অনেক তফাৎ। তখন ছিলেন সরস্বতীর গলার হার, এখন তাঁর মাথার মুকুট।
আমাদের ভাষায় বলতে পার, কী রকম আছ তুমি ?
—ঠিক আপনার যোগ্যই কৌতূহল। চেষ্টা করতে পারি. বোঝাতে পারব কি ?
তোমাদের সত্তাটা কী রকমের ?
—যেন একটা (অনেক ইতস্তত করে) পোড়ো বাড়ির মত।
পোড়ো বাড়ি কি মেরামত হবে না ?
—তার কলি ফেরাচ্ছি, রং লাগাচ্ছি, সে রং আমাদের আত্মার রঙে রঙিন।
সেই রঙে যখন রঙিনতা পূর্ণ হবে তখন কি তা পৃথিবীর থেকে সুন্দর হবে ?
—বড় মনে পড়েছে শান্তিনিকেতনের দিনগুলি।
মনে কি পড়ে শালবাগানে রাত্তিরে কত গল্প বলেছি ?
—খুব। আর মনে পড়ে আপনার সেই গভীর প্রীতি স্নেহ যা আমায় কত সম্মান দিয়েছে। আমি কি তার যোগ্য ?
তুমি চলে যাবার পর তোমার মত সহায় আমি আর পাইনি।
—আমি তো কাছেই থাকি, কতবার এসেছি কাছে। দেবার মত থাকলে ঢেলে দিতাম।
আমি যখন লিখি, তুমি আমাকে ভাব দাও না কেন ?

—আমার ভাব, সর্বনাশ !
(এই পুরো বাক্যটি সতীশ রায়ের আত্মা মোটা হরফে লেখেন)
যদি বেঁচে থাকতে, তবে প্রকাণ্ড কবি হতে, আমাকে ছাড়িয়ে যেতে।
—আপনার কবিতায় যেন বেশী কিছু দিলেন। আগের আমার আভাস পেলাম। ভাল লাগল।
আমার এখনকার কবিতা পাও ?
—জানি (বড় হরফে লেখা বেরোয়)।
বিশেষ করে কোন কবিতা ভাল লাগে ?
—শাল, আম্রবন, সাগরিকা, মহুয়ার সব কবিতা আর তাজমহল।
(তাজমহলের চারদিকে দাগ দেওয়া হয়)।
আমার উপন্যাসের কোন খবর পেয়েছ ?
—খুব সুন্দর, চমৎকার (বড় অক্ষর, তলায় লাইন)।
এখনকার আধুনিক কোন কবিকে পড়েছ ?
—আপনার কবিতায় ডুবে আছি, সমুদ্র পেলে পানাপুকুরে ডুবব কেন ?
তোমাদের আনন্দের কোন বাহ্য উপকরণ নেই ?
—আজ খুব আনন্দ (মোটা অক্ষর, তলায় লাইন)।
উপকরণ তোমাদের কী ? মনের ভাবকে নিয়ে তোমরা সাজাও ?
—হ্যাঁ, তাই নিজেকে সাজাই। সে শোভা যে পায়, সেই তো হল মুক্ত। তার আনন্দ যে স্তরে উঠেছে, পৃথিবীর আনন্দ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আনন্দের কতই না প্রভেদ।
তোমার দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করে ?
—কী জানি !
(আত্মা প্রথমে লেখে 'না', তারপর 'না' কেটে আবার লেখে 'না'। সেই দ্বিতীয় 'না' কেটে আবার লেখা হল 'হাঁ'। সেই 'হাঁ' কেটে পরে বেরোল 'কী জানি।')
আমাদের অন্তর বাহির দুই-ই আছে। তোমাদের কেবলই অন্তর ?
—অন্তরে সমস্ত পাই। সে তো ফাঁকি দেয় না। গ্রহণ করবার শক্তি চাই।
পৃথিবীর থেকে যখন যাব, তখন এর চেয়ে ভাল কিছু পাব, না হারাব ?
—প্রথমটা হয়ত দেখবেন, অবশ্য আপনার কথা ভাবতে পারি না, আপনি তো ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমি প্রথম এসে দেখি, মন মানতে চায় না, অভাব যেন মেটে না। পরে দেখি শান্তির সাগরে ডুবে আছি। সে যেন 'জলের মাঝারে বাস করি, তৃষায় শুকায়ে মরিগো।'

আমি তোমাদের কি বিশেষ কিছু দিতে পারব ?
—নিশ্চয় নিশ্চয় (বড় হরফে)
শমীকে কি দেখতে পাও ?
—মধ্যে মধ্যে। ওঁর আনন্দ ওঁকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে হিংসে করা চলে না। পৃথিবীর মন হলে হিংসে করতুম বোধহয়।
ও যে বলে ও একটা পৃথিবী তৈরী করছে। আমাকে বলছে শমীর পৃথিবীর বই বানাতে। কী করছে বুঝিয়ে বল তো।
—লিখুন না, সে চমৎকার হবে। কিন্তু এখনই তার ইঙ্গিত পেলাম। সে বলতে বারণ করছে।
সে বুঝি তোমার পাশে আছে ?
—পাশে না, কিন্তু তার ইঙ্গিত এসে পেঁছাল।
শমী বোধহয় ভাবে, তার বাবা তার ভাব চুরি করে নেবে।
—শমী আপনাকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে।
—তুমি কি কবিতার মত কিছু রচনা করছ. না নিজেকে সৃষ্টি করছ ?
—রচনার মধ্য দিয়ে।
তোমাদের কালের বিভাগ আছে ? দিন রাত্রি ?
—একটা আলোকের মধ্যে আছি। যখনই অন্ধকার দেখি মনে বুঝতে পারি, ভুল হল। আলোক যখন উজ্জ্বল হয়, তখন বুঝি মুক্তি শুরু হল।
তুমি যে এখান থেকে চলে গেছ, সে দীর্ঘকালের অনুভূতি কি তোমার নেই ?
—দীর্ঘকাল বলে জানি, কিন্তু তবু মনে হয় সেদিন সকাল।
অল্পবয়সে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গেছ বলে কোন ক্ষতি হয় ?
—কতকটা হয়। তবে যে কাজ শেষ করে আসে, সে এখানে এলে সেই কর্মের ফল ভোগ করে। মুক্তির পথ খানিকটা প্রস্তুত। কিন্তু অতৃপ্ত আত্মা তার অসমাপ্ত কাজের হিসাব মেটাতে গিয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে।
অজিত (অজিত চক্রবর্তী) ওখানে আছে ? পৃথিবীতে যেমন করত বিচার বিশ্লেষণ, এখনও কি তাই ?
—ভারী বিচার ভালবাসে। এখানে কি বিচার চলে ? এ তো সমস্ত পাওয়ার শেষ। এখানে দ্বিধা নেই। ভয় নেই। বিচার করবার দিন, সে তো পৃথিবীতে শেষ করে আসা যায়।
কিন্তু তোমাদের সত্য মিথ্যা বিচার করতে হবে নাকি ?
—সত্য (চারদিকে রুল পড়ল)। এখানে মিথ্যা কাজের ফল তখনি

পাই। তক্ষুনি ভুল ভাঙে। সত্য নিজের রূপ যেন সোনার আলোয় সাজিয়ে রেখেছে। মিথ্যা তাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য।

যাদের অত্যন্ত ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়াসক্তি, ওখানে তারা কেমন ভাবে থাকে?

—তারা একটু দূরে থাকে। যারা নিজেকে চিনতে পারে, তাদের তখনই মহান আত্মা নিজের কাছে টেনে নেয়। এখানে শাস্তি নেই, কিন্তু একটা নিয়ম আছে! প্রেম তাকে চালনা করে।

কিন্তু ভোগের আসক্তি কি তাদের পৃথিবীর দিকে টানে?

—যাদের টানে তারা ছুটি পায় না। সময় হলে তারা ছোটে সেই মাটির কোলে। আমি তো খানিকটা এগিয়েছি, তবু মাটির কোলের প্রতি আমার লোভ কম ভাবছেন?

যাঁরা তোমার চেয়ে মুক্ত, তাঁদের কাছে কি তুমি জ্ঞান পাও?

—তাঁরা শিক্ষা দেন না। কিন্তু আমাদের কাছে টেনে নেন। তাঁদের মধ্যে একদিন—অবশ্য পৃথিবীর হিসাবে দিন বলছি—একবার যেতে পারি, তাহলে পাওয়া যায়। জোর করে দেন না বলেই সেবার মন সদাই হাত পেতে থাকে।

পৃথিবীতে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা জাতিগত সাধনার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বুদ্ধিতে ও ইউরোপের বুদ্ধিতে কোন ভেদ হয় না?

—সব এক। (চারদিকে গোল দাগ ও রুল)

কিন্তু ধর, আফ্রিকার Cannibals, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রভেদ থাকবে না?.

—নিশ্চয় থাকবে। ঐ যে বললাম তারা দূরে থাকে। যাদের দিন আসে তারা বড় হলে আসতে পায়। একটা বড় দল একটা ছোট দল আছে। কিন্তু দলাদলি নেই।

আমি ভারতবর্ষের লোক বলে আমার কি বিশেষ গতি আছে?

—ভারতবর্ষ বললে ছোট করে বলা হয়। সৌরজগতও এ মহাশূন্যে স্থান পেয়েছে।

চন্দ্রলোক সূর্যলোকের খবর রাখ?

—জানতে পারি, কিন্তু কৌতূহল নেই।

যাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাদের কি এ কৌতূহল থাকে না?

—তারা ঐ নিয়ে থাকে। ওর ভিতর মুক্তির সন্ধান খোঁজে। যদি ভুল হয়, তবে আবার ঘুরে আসে অন্য পথে। পথ তো একটি নয়। কৌতূহল প্রবৃত্তির যে একটি চরিতার্থতা তার থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে কেন?

—কৌতূহল আছে পৃথিবী সম্বন্ধে, জীবিত আত্মা সম্বন্ধে, কিন্তু এ লোকে পরস্পরের কাজ সম্বন্ধে কৌতূহল বা interference নেই। তুমি আমাকে কিছু বল, প্রশ্নের উত্তর না।

—আচ্ছা।

(এই 'আচ্ছা' লেখার আগে অনেক আঁকিবুকি টেনে আত্মা লেখেন 'মিডিয়ামের মন', তারপর কেটে দিয়ে লেখেন 'আচ্ছা'।)

যারা ছবি আঁকছে কবিতা লিখছে তাদের কাজ কি সেখানে সেভাবে অগ্রসর হবে?

—সব কাজের লিমিট, একটা সীমানির্দেশ নিজের অন্তরে এসে আমরা উপলব্ধি করি। যদি দেখি আমাদের কামনা আজও অতৃপ্ত, তাহলে সেটার আরও একটু বিকাশ বা রচনা চলে। ধীরে ধীরে দেখি ঐ পথে আমাদের মুক্তির খেয়া অপেক্ষা করছে। একবার উঠলেই হয়। ভয় হয়, তবু হার মানলে চলে না। তখন দেখি আমার সমস্ত কৃতকর্মের আনন্দ, এখন মুক্তির আনন্দের সঙ্গে একসুরে মিলেছে। সেই হল আসল মুক্তি।

তোমাকে মনে হচ্ছে ঠিক সেই আগেকার সতীশ। সেই সতীশ কি এ সতীশ থেকে আলাদা? আমি কি শুধু আমার সেই চেনা সতীশকে দেখছি!

—আমি আপনার কাছে সেই সাবেক কালের সতীশ। একটু পালিশ করা। সেই পোড়োবাড়ির মত মন নিয়ে এসেছিলেম। তাকে একটু রং ফেরাচ্ছি। জানেন, সে কিসের রং? সে আমার মুক্তির রং। কী করে সেই রং পাই জানেন? আমার অন্তরে যে একটা কাব্য ছিল, যা কেবলই আপনার কাব্যের হাওয়ায় • ়া পেয়েছে, সেই মহান কাব্য মুক্তির আলো।

আজ এই সকালবেলা, এই শীতের হাওয়া গাছের পাতার মধ্যে এই যে আলো দেখছি, ঐ দূরে ছাতিম গাছের পরে, তুমিও কি এমনি শীতের সকালটিকে দেখতে পাচ্ছ?

—আপনি বলছেন, আপনার চোখের ভিতর দিয়ে দেখছি। যিনি আমার কথা বলতে সাহায্য করছেন, তার মনের ভিতর দিয়ে দেখছি।

আমি যদি জানতেম তুমি সঙ্গে চলেছ, কত খুশি হতেম বলতে পারিনে। আজ মনে হচ্ছে তুমি কাছে এসেছ। তোমাকে হারিয়ে বড় কষ্ট পেয়েছি।

—আজ সকালে যখন বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, আমি এসেছিলাম কাছে একবার। মনে ঠিক করেছিলাম, আজ আমাদের ডাক

পড়লে আমি আগেই আসব। তখন সেই ভোরবেলাতে মনে হল, ঐ কাঁকর বিছানো পথে যেখান দিয়ে চলেছেন, আমি যেন তারি বুকে লুকিয়ে আছি।

সতীশ রায় চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ আনমনা। বহু স্মৃতি, শান্তি-নিকেতনের স্মৃতি ভিড় করে আসছে। এমন সময় আবার ঘুরে এল শমীর আত্মা—এই তৃতীয় বার। শমী এসেছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ খুশি।

কে, কে তুমি ?
—শমী।
তুই ভারি দুষ্টু।
—কয়েকটা প্রশ্ন আছে।
হাঁ, বল্ কী প্রশ্ন।
—দেহ বড় না মন বড়। ছবি বড় না ছায়া বড়। মোহ বড় না সত্য বড়। সুখ বড় না আনন্দ বড়। ভাব বড় না ভাষা বড়।
প্রশ্নগুলো শক্ত প্রশ্ন। দেহ মন কোনটাকে বড় ছোট করবো না। এখানে তো মনকে পূর্ণতা দেবার জন্যে দেহ চাই। ওখানে কি তার দরকার নেই ? ভাবের জন্যে এখানে ভাষা না হলে চলে না। দু'য়ের যোগে এখানে আমাদের সৃষ্টি।
—আরে আমিই তো জিজ্ঞেস করতে এলুম।
আমার তো মনে হয় মনের জন্য দেহকে দরকার। তোর কী মনে হয় বল্ না ?
—ঠিক বলেছ। পরে আমি বলব কী ভাবছি।

শমী আবার উধাও। বেশিক্ষণ না থাকার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অতৃপ্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে উনত্রিশে নভেম্বর সকালের তৃতীয় আহ্বানে এসে পড়েছেন এক বিদেহী বার্তাবহ আত্মা।

কে, কী নাম ?
—আমি কায়াহীন বিদেহী আত্মা—
তোমার তো একসময়ে কায়া ছিল।
—আমি এসেছি খবর দিতে !
বলো কী খবর ?
—পিয়ারসন সাহেব আপনাকে তার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, বিশেষ বাধায় তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারলেন না। শীঘ্রই একদিন

এসে আপনার মধুর বাক্য ও সদুপদেশ গ্রহণে ইচ্ছা করেন। তাঁকে ক্ষমা করবেন।—যাই।

শমী কাছেই ছিলেন। বার্তাবহ আত্মা নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়ামের আঙুল আবার নড়ে উঠল। শমী তাঁর বাবার কাছে এসে বসলেন। সেদিন সকালের চতুর্থ আহ্বান—'ফোর্থ কল।'

কে ?

—শমী।

কী, বল্ বল্ ?

—তুমি যে উপনিষদের ব্যাখ্যা করলে তা শুনেছি। আমারও এই মত। কী মজা।

তুই বুঝতে পেরেছিস আমার উপনিষদের ব্যাখ্যা ?

—তুমি খুব সহজ করে বলেছিলে। তুমি বুঝি ভাবো আমি বোকা খুব ?

তুই যে পৃথিবী তৈরি করছিস,—ভাবেতে ভাষাতে, দেহেতে মনেতে মিলিয়ে কি তাই তৈরি করছিস ?

—বলব না এখন। ছবি এঁকে না হয় লিখে—

ভয় করিস তুই ? পাছে আমি তোর ভাব চুরি করি, না ?

—যাও।

তুই ভারি চঞ্চল।

—রাগ করছ ?

তোর দাদাকে (রথীন্দ্রনাথ) দেখতে পাস এখা ?

—উনি যা ভাবেন, তাতে আগ্রহ নেই। তোমার ভাবে আগ্রহ বেশি—।

তোর দাদা তো practical, আমার মত তোর মত ভাবুক নয়। তাকে না হলে কাজ চলবে কী করে ?

—কাজের মানুষের দুঃখ নেই।

তা নেই, ভাবের মানুষকে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

—যাই তা হলে ?

একটা ছবি এঁকে দে না।

—আমার অনেক কাজ।

শমী মুহূর্তে উধাও। এবং অতঃপর উনত্রিশে সকালের পঞ্চম আহ্বান। সাড়া দিলেন লোকেন পালিত, যাঁর সঙ্গে কবির বন্ধুত্বের সূত্রপাত প্রথম যৌবনে, বিলেতে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের ভাষায় স্যার তারকনাথ পালিতের ছেলে লোকেন

"রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু, যৌবনের সুহৃদ, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক।" চরিত্রে ও দৈনন্দিন জীবনে দুই বিপরীত কোটির মানুষ হয়েও তাঁদের বন্ধুত্বে কখনও চিড় ধরেনি। সাধনা পত্রিকায় দুই বন্ধুতে চালাতেন সাহিত্যের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ 'ক্ষণিকা' লোকেন পালিতকে উৎসর্গ করা।

লোকেন পালিত এলেন। কী আশ্চর্য, একমাত্র তাঁর কথাই সাধু ভাষাতে।

কী নাম?

—লো—কে—ন।

লোকেন নাকি?

—হাঁ।

আচ্ছা, তোমাদের ওখানকার খবর দাও, বুঝিয়ে বলতে পারো, তোমাদের কী অবস্থা, আমাদের সঙ্গে ঠিক কী রকম তফাত?

—আমি বহুদিন একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম?

এখন তার কোন পরিবর্তন হয়েছে?

—আমি যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। প্রখর দিনের আলোয় চক্ষু মেলিয়া রাখিতে পারি না।

ভালো লাগছে তোমার স্বপ্ন হতে এই জাগরণ? না, বেদনা আছে?

—আমি সত্যের সন্ধানে বহু মিথ্যার দুয়ারে অন্বেষণ করিয়াছি। মিথ্যা আমায় যত সুখ দিয়াছে, বেদনা তাহা অপেক্ষা শতাধিক বেশী। যেন লোহা পুড়াইয়া সোনা করা, তবু মেকি হইলাম কি খাঁটি হইলাম, কে বলিবে?

তোমার ধর্মমত যা ছিল, এখন কি তার পরিবর্তন হয়েছে?

—আমার বিশ্বাসের জোর ছিল না। একটা আড়ম্বরপূর্ণ ভক্তি ছিল, যাহার মূল্য কম।

এখন কি অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছ, কোন আশ্বাস পাচ্ছ, সত্যের জোর অনুভব করছ?

—কী আশ্বাস? কথাটি আমি এমন করিয়া বলিতে পারিতাম না।

পৃথিবীতে আমাদের কোন কাজকর্মে তোমার যে যোগ, সে সম্বন্ধে কোন উপলব্ধি আছে?

—আমি যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু ঠিক সত্যের মধ্যে ছিলাম না বলিয়া যোগসূত্র বহুবার ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু মিথ্যা বলিতে অন্যায় ভাবিবে না। ভ্রম কথাটাও ঠিক নহে।

আমার কাছে তোমার কিছু বলবার জানাবার ইচ্ছা আছে?

—না, আমি যেন আর পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। যতই আমি পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হইব (আকর্ষণ নয়), ততই আমি সত্যকে ভাল করিয়া পাইব।

তুমি আজকের এই পৃথিবীকে অনুভব করছ, এই আমি যা দেখছি, পাচ্ছি ?

—আমি খুব একটা নূতন আনন্দের ভিতর আছি। একদা মনে যে দ্বিধা ও প্রশ্ন আমাকে নানা পথে ঘুরাইয়াছে. তাহা ক্রমেই বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইতেছে।

আমি যে কাজে এখন নিযুক্ত আছি. শান্তিনিকেতনের কাজে, তুমি তা অনুসরণ করতে পারছ ?

—কিছুকাল করি নাই, এখন করিতেছি। এই লোকেই আমার জন্মান্তর হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা নূতন রকম।

আমার এখনকার কাজ তুমি অনুমোদন কর, আমার শান্তিনিকেতনের এই কর্মের বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে ?

—নিশ্চয়। আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই। সে পথ তোমার কণ্টকাকীর্ণ নয়, পুষ্পপল্লবে পরিপূর্ণ।

আমার কবিতার সঙ্গে পরিচয় আছে ?

—যথেষ্ট।

ভালো লাগে ? আগে তো তোমার ভালো লাগত।

—নিশ্চয়। কবিতাকে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কবিতা আমাকে খুঁজিয়া আনিয়াছে।

লোকেন পালিত চলে গেলেন। উনত্রিশে নভেম্বরের বিকেল রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবছেন নতুন বৌঠানের কথা। ভাবতেই এলেন। সেই আসার বিবরণ গোড়ায় দিয়েছি। তারপরেই আগমন এমন এক আত্মার, যার মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে, পুকুরের জলে ডুবে। আত্মা পরিচয় দিলেন তার নাম সরিৎবাসিনী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে চেনেন না।

সব নামটা বলো ?

—সরিৎবাসিনী।

তোমাকে কি চিনি ?

—আপনাকে না চেনে কে ?

পৃথিবীতে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল !

—দূর থেকে দেখেছি, ভক্তি করেছি, পূজা করেছি।

আমার এখানকার কাজের কথা জানো ? কী লিখছি, কী করছি ?

—আমি সবেমাত্র অল্পদিন এসেছি। বোধ করি দুই বৎসর—তারপর কত যে জানলাম।

আচ্ছা, পৃথিবীর পরিচয় তোমার আমাকে দেবে, দিতে পারো?

—আমি কুলবধূ।

তোমার বলতে সংকোচ হয়?

—আমি জলে ডুবে মারা যাই, জানেন? আমাদের গ্রামের দীঘির জলে।

এই অপঘাত মৃত্যুর জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হয়েছে?

—কী রকম অকস্মাৎ—

তাতে পরলোকে তোমার অসুবিধা হয়েছে?

—কিন্তু যখন বুঝেছি এবার ডুবব, তখন মনে মনে আবৃত্তি করেছি—'দীঘির সেই জল শীতল কালো, তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভালো।' যাই।

কবিতা আবৃত্তি করে আত্মহত্যা? আসরে উপস্থিত সকলে আশ্চর্য। অপরিচিতা একজনের আত্মবিনাশের কাহিনীতে কিছু বিমর্ষও। এমন সময় সন্তোষ মজুমদার না ডাকতেই আবার এলেন। অপরিচিতা 'সরিৎবাসিনী' সরতে না সরতেই তিনি আসরের অতিথি। সন্তোষ মজুমদার তার আগে আরও দু'বার এসেছেন।

কে তুমি, কী নাম?

—সন্তোষ।

সন্তোষ?

—আজ ছুটি পেয়েছি অল্পক্ষণ, তাই ছুটির আনন্দভোগ করতে এলাম।

তোমার কাজে তুমি অগ্রসর হচ্ছ না? আমাদের সঙ্গে কথা কয়ে উপকার হয়?

—ভাল হয়। আমি কী রকম শীঘ্র অগ্রসর হলাম, আজ বহু বৎসরের চেষ্টায় তা পারিনি। জানি না আপনাদের সঙ্গে কথা বলার ফলে কি না—অন্তর ভারি শান্ত হল।

তুমি অন্তরে যে একটি বাগান রচনা করেছিলে, তার থেকেই কি মানবাত্মার দিকে অগ্রসর হচ্ছ?

—আঃ, যেদিন আমার মনের সেই বাগানটি সম্পূর্ণ শেষ হবে, তার প্রত্যেকটি শুকনো ডাল সজীব হয়ে উঠবে, সেদিন আমি মানবাত্মার আহ্বান শুনবো। এখন শুনছি কেবলই গাছের ডাল, ঝড়ের দিনে যেমন গাছপালা শন্‌শন্‌ করে ওঠে, তেমনি শুনছি অহরহ।

তুমি যে ছুটির কথা বললে, কার কাছ থেকে ছুটি ? কে তোমাকে কাজ করাচ্ছে ?
—সেই যে সন্তোষ, যে ছন্নছাড়া হয়ে এসেছিল এখানে। কিন্তু গাছের সঙ্গে বন্ধুত্বে আমার আনন্দ নেই—একথা ভাববেন না। ওরা একমাত্র সহচর আমার। জানি না, বেশি কথা তো জানি না।
এখানে কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে তোমার যোগ ছিল, মানবপ্রীতি তোমার তো কম ছিল না ? এখনও আছে ?
—আছে বৈ কি ? আমি গাছের ভিতর তার সাড়া পাই। সেও কম পাওয়া নয়।
তুমি এখানে অতিথি সেবা ও কর্মে আমাদের কত সহায়তা করেছ।
—সেবা ? সেবা আজও করি। সেই তো কাজ।
এখন সেবার কাজে তেমন লোক পাইনে।
—রথী (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমায় মনে করে ?
আমি বলতে পারিনে। রথীর সঙ্গে সে কথা হয়নি। তাকে কিছু বলবার আছে ?
—সে কি বাগান ভালোবাসে না ?
হাঁ, রথী এখানে তাঁর বাগান তৈরি করছেন।
—বেশ হবে, সুন্দর হবে।
তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই বাগান ?
—পাই।
এই যে বাড়ি (উদয়ন) রথীর সৃষ্টি, একে দেখতে পাচ্ছ ?
—অপেক্ষা করুন। দেখি, হাঁ।
ভাল লাগছে ?
—হাঁ। খুব।
আমার কাঁকর বিছানো বাগান তোমার চোখে পড়ছে ? আমি নিজে কাঁকর বিছিয়ে আস্তে আস্তে তৈরি করিয়েছি।
—বেশ বুদ্ধি বার করেছেন।
খুব সজীব হচ্ছে। ওর তলায় moisture অনেকদিন থাকবে। গাছে প্রাণ পাবে।
—ভাল হবে। আপনার যে সব দিকে মন। এতেই তো আপনি সব থেকে বড় হয়েছেন।
আমি বাগান খুব ভালবাসি। আর কিছু না হলে আমি ঐ নিয়েই থাকতুম। আমি ইদানীং শাল গাছ, আম গাছের উপর কবিতা ('বনবাণী') লিখেছি, পড়েছ।
—সব জানি

তোমার ভাল লেগেছে সেগুলো ?

—নিশ্চয় ।

বৃক্ষবন্দনা প্রভৃতি ? আমি ভারী ভালবাসি গাছকে ।

—সে আমি জানি ।

(এইবারের প্রশ্নটি উদ্ধার করা যায়নি ।)

—আমি কতদূর সহানুভূতি পেলাম ।—আচ্ছা, যাচ্ছি ?

সন্ধ্যার অন্ধকার। হেমন্তের দিন, কুহেলি বিলীন। ২৯ নভেম্বর, বিকেল ৬টা। শান্তিনিকেতন। আত্মার সন্ধানে এখনও বসে আছেন কয়েকজন, উদয়নের একটি ঘরে। আবার অনামী এক আত্মা উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেন—কে তুমি, উত্তর মেলেনি। শুধু বোঝা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণ তাঁর কমেনি। এবং এই কথোপকথন কাব্যসুষমামণ্ডিত।

কে ? কী নাম ?

—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মনে পড়ছে পৃথিবীর কোণটি। আপনার চোখ দিয়ে দেখতে এলুম।

কে তুমি বলতে পারো ? কে তুমি ?

—নাম আমি বলতে ইচ্ছে করিনে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

তুমি যে সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা-আলোকিত আকাশ দেখতে চেয়েছ সে কি আমার মধ্য দিয়ে দেখা সম্ভব ?

—সহজে পাই আপনাদের উভয়ের মধ্যে। তাছাড়া যে পাই না তা নয়, ছায়া দেখি, ছবি দেখি না।

তোমরা যে-আকাশে আছো, সে আকাশে কি গ্রহতারা দেখছ না ?

—এই আকাশ আমাদের নীড়। পাখি সারাদিন আকাশে উড়ে সন্ধ্যেবেলায় তার নীড়ে এসে আশ্রয় নেয়, তেমনি আমরা স্বর্গকে আশ্রয় করি।

সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ওখানে নেই ?

—দিবারাত্র নেই।

সূর্যালোক আছে ?

—আলো আছে।

তোমরা তো সৌরজগতেই আছো ?

—হাঁ, তাই হবে।

সৌরলোকের বাইরে যে সব নক্ষত্রলোক আছে, সেখানে কি তোমাদের গতিবিধি সম্ভব ?

—চেষ্টা করিনি। অনেকদিন অনেক ঘুরে এসে বিশ্রাম লাভের আশায় এসেছি।
সৌরজগতের অন্য গ্রহ—বুধ শুক্র প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় আছে ?
—আপনাদের যেমন আছে, আমাদেরও কতকটা তাই। বৈজ্ঞানিক দলে বোধ করি এ আলোচনা হয়ে থাকে।
তোমরা দূরের থেকে আন্দাজ করতে পার মঙ্গলগ্রহে প্রাণী আছে কি নেই—এ সম্বন্ধে এখানে যা আলোচনা হয় ?
—পৃথিবী আমাদের চোখের উপর একটা পর্দা টেনে রেখেছে। যেদিন ঐ পৃথিবীর বাধা দূরে সরবে, সেদিন পাব দেখতে দূর দূরান্তের গ্রহ নক্ষত্রকে।
তোমরা যে আকাশে নীড় বেঁধেছ, সে কি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ? বায়ু আছে সেখানে ?
—হাওয়া ?
হাওয়া নেই ?
—হাওয়া অথবা বাষ্প বলা যেতে পারে।
জল ?
—আছে।
সে জল-হাওয়া-বাষ্পে তোমাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজন আছে ?
—বুঝতে পারি না, এখানকার গাছপালা জল সকলই যেন নিজের প্রয়োজনে আছে। বলুন—
আমি জানতে চাই তোমরা যে জগতে আছ, সে কি দৃশ্যজগৎ ? গাছ জল এদের দেখতে পাও ?
—আপনারা গাছকে দেখেন তৃপ্তির জন্য, আমরা গাছকে দেখি স্বজন বলে।
আমিও গাছকে স্বজন বলেই দেখি, আপনার মত করে জানি।
—তবে তো আপনি আমাদের দলে !
সেই গাছ প্রভৃতির সঙ্গে তোমাদের সেবার যোগ আছে ?
—আচ্ছা, আপনার কৌতূহল তো বড় কম ! আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আপনি যে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন না, তার জন্যে কৃতজ্ঞ।
আমি নাম জিজ্ঞেস করেছিলেম, মনে হলো তুমি চাও না, তাই পীড়াপীড়ি করলেম না।
—সেই কথাই বলছি, অন্য লোকে ছাড়ত না।
আমার সঙ্গে তোমার পার্থিব সম্বন্ধ আছে ?
—যোগ আছে।

পার্থিব সম্বন্ধ ছিল ?

—বলিতে পারিব না।—(এই একটিমাত্র বাক্যে সাধুভাষা)

আমাদের কর্মে কোন সহায়তা করতে পারো, আমি যে কাজ করছি ?

—আমাদের নিজেদের সহায়তা করবার শক্তি যে সকলের আছে, তা নয়। যদি কেউ আমাদের আকর্ষণ করে, তবে নিশ্চয়ই তার মঙ্গল (কামনা) করি।

আচ্ছা, এই যে কথাবার্তা করছি, মানবকণ্ঠস্বর ভালো লাগছে ? পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ?

—বড় ভাল লাগছে (আত্মা এই সময় বাক্যটির চারদিকে গোল দাগ টেনে যেন ছোট ছোট ছবি আঁকতে চায়, অক্ষরগুলোও বড় বড় হরফে আসে)।

এই পুরাতন পরিচিত ভাষার, কোন ভাষার ব্যবহার কি ওখানে আছে ?

—ভাব আছে, ইসারা আছে, একটি আত্মার বিশেষ ভাষা আছে, সে তো বোঝানো যায় না।

আমি এমন ভাবে কথা ক'য়ে অপরাধ করছি না তো ? তুমি কি আমার গুরুস্থানীয় ?

—না, না, না। খুব সুখী হয়েছি। এবার তবে যাই। আবার আসব। বিদায় বিদায়।

অনামী আত্মাটি রহস্যময় এক পরিবেশ সৃষ্টি করে চলে গেলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন আবার আসার, কিন্তু কেউ বুঝতে পারলেন না, তিনি কে ? না, কাদম্বরীদেবী ইনি নন।

সেই একই সন্ধ্যাবেলা। অন্ধকার একটু গাঢ়। দ্বিতীয় আহ্বানে এলেন আর এক অপরিচিতা।

কে ? কী নাম ?

—চণ্ডীবালা।

আমি তোমাকে চিনি ? তুমি আমাকে চিনতে ?

—এখানে একজনকে চিনতাম। কিন্তু তার যদি মনে না থাকে, তবে যাই।

যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে ?

—হাঁ, বহু বহু কাল পূর্বে গ্রামে পরিচয় হয়েছে।

সে কি আমাদের নন্দলাল ? (নন্দলাল বসু)

—বলব না।

বলতে দোষ কী ?

—যাই।

চণ্ডীবালা চলে গেলেন। এসেছিলেন না ডাকতেই। এইভাবে অনেকেই আসছেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যার তৃতীয় আহ্বানে যিনি এলেন, তিনি পরলোক থেকে আসা-যাওয়া করেছেন অনেকবার। তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কে ?
—মণিলাল।
বেশ হয়েছে,একটা পরীক্ষা করতে চাই। নন্দলালকে দিয়ে ছবিআঁকাব।
—নন্দবাবু কি মিডিয়াম ?
পরীক্ষা হয়নি। বলব তাঁকে ছবি আঁকতে ?
—চেষ্টা করুন। কিন্তু ছবিটা কে আঁকছে ? আমি নয়তো ?
তুমি যা ছবি আঁকবে, জানি। বলো যদি নন্দলালকে ছুঁয়ে থাকে, তুমি তাকে (দিয়ে) ছবি আঁকতে পারো ?
—বলতে পারি না। এখানে বড় শক্তি নন্দবাবুর থাকা চাই।
নন্দবাবুর তো ছবির শক্তি খুব আছে।
—চেষ্টা করুন। না, সে শক্তি নয়, মিডিয়ামের শক্তি।
আচ্ছা, একবার দেখি, দুজনে মিলে ধরুক।

একটা ছবি আঁকা হল। মুগ্ধবিস্ময়ে উপস্থিত সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন মোটামুটি একটা ছবি দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন—

মণিলাল, ছবিটা তোমারই আঁকা মনে হচ্ছে, নন্দলালের মতো নয়।
—ওসব হবে টবে না।
এ কী ? হল কী তোমার ?
—এমন কেউ কি নেই যিনি ছবি আঁকতেন পৃথিবীতে ?
তোমার দ্বারা হবে না ?
—তা হতে পারে, কিন্তু মিডিয়াম কে ?
এ মিডিয়াম কবিতা লিখতে পারে, ছবি আঁকতে তো পারে না !
—বলেন কি, লজ্জার কথা !
তুমি ভাল কবিতা লিখেছ মণিলাল, কেন লুকিয়েছিলে ?
– ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।
এই পৃথিবীতে শীতের সন্ধ্যা ভালো লাগছে তোমার ?
—আজকাল খুব ঘন ঘন আপনার উপর উৎপাত করছি। ভাল লাগে বলেই আসি।

আমি তোমাদের উপর উৎপাত করছি। ডাকলে অসুবিধা হয় তোমার।

—না। বুলা কি রাগ করেন?

বুলা রাগ করে না, ক্লান্ত হয়। তোমরা অনুভব করছ না এই পৃথিবীকে?

—আপনাদের ভিতর দিয়ে করছি।

আমি এত ভালবাসি এই পৃথিবীকে—মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য কি পাব না?

—প্যাবেন। যা পাবেন, তারও বদল করতে চাইবেন না।

আরো ভালো কিছু পাব? তা বলে আমি এটা ছাড়তে চাই না।

—আপনার লোভ তো বড় কম নয়?

আমার খুব লোভ। আজ দুপুরে উজ্জ্বল রোদে যখন বাতাসে পাতা কাঁপছিল আমি দেখছিলাম, ভাবছিলাম এ কি এমন আর কোথাও পাওয়া যায়।

—নাঃ, কিছু উত্তর দেবার শক্তি নেই। এমন করে কথা কইলে কি জবাব দিতে পারি। আমাদের আত্মায় যেন প্রলয়কাণ্ড লেগে যায়।

আচ্ছা, আর এক প্রশ্ন। এখানে মেয়েপুরুষের যে আনন্দের সম্বন্ধ, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ওখানে কি সেরকম তোমরা অনুভব কর?

—সেকথা তো কাল বলেছি। এখানে আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ভোগের বাসনা নেই। সুগভীর ত্যাগের ভিতর তার আনন্দ। আপনি কতকটা বুঝতে পারবেন। সে আনন্দের বেগ বড় কম নয়।

তুমি বলছ, মেয়েপুরুষের সম্বন্ধ। এ কি স্থায়ী, না ভেদ ঘুচে যায়? আত্মার মধ্যে এই সম্বন্ধ কি চিরদিন থাকে?

—স্ত্রীপুরুষ যতদিন থাকবে।

পৃথিবীতে মেয়ে-পুরুষের যে-প্রভেদ গর্ভে হয় তা আকস্মিক। তা কি চিরদিন থাকবে?

—তারা কোন পর্যায়ে পড়বে, না পুরুষ না স্ত্রী? না সব পুরুষ সব স্ত্রী?

স্ত্রী এবং পুরুষ একত্র সম্মিলিত—দুই শক্তি একই অন্তরে সম্মিলিত।

—দুই শক্তি তো এক নয়।

কিন্তু দুয়ের মিলনে কি পূর্ণতা হয় না? যেমন অর্ধনারীশ্বর?

—বলতে পারিনে। আমিও ভাবছি। হয়তো পরে জানব।

আমার নিজের সাইকোলজি সম্বন্ধে বিশ্বাস, আমার মধ্যে নারী ও পুরুষ দুই শক্তি আছে। তাই মেয়েদের আমি অনেকটা স্পষ্ট বুঝি। যেহেতু আমার মধ্যে নারীও আছে।

—ঠিক। সে তো সত্যি। এখানে যে মেয়ে-পুরুষের ভিতর একটা প্রচণ্ড ভেদ আছে, তা নয়। এখানে আলাদা ঘর নির্দেশ। সবাইয়ের ভিতর সবাই আছে এক হয়ে।

আজকাল পৃথিবীতে সর্বত্র স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ শিথিল হয়ে আসছে। তার সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী?

—আবার বলুন।

য়ুরোপে যেমন, এর পরিণাম কী, বিবাহ কি চলে যাবে?

—আমি পৃথিবীতে থাকতে এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। এটা সম্পূর্ণ লোকগত জিনিস। আমাদের ধারণা করা মুশকিল। কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধ যত সহজ হতে থাকবে, ততই পুরুষ ও নারী উভয়ত ও নিজেকে জানতে পারবে, হাওয়া যেমন করে ফুলকে ফোটায়।

আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করছি বলে কি তোমার উত্তর করা সহজ হচ্ছে? তুমি কি নিজে কিছু বলতে পার না? আমার প্রশ্নের অপেক্ষা করতে হয়?

—আমি হয়ত চেষ্টা করলে কিছু বলতে পারি। কিন্তু অনেক মিডিয়াম আছেন, যাঁরা ঠিক প্রশ্নের উত্তরটি ছাড়া নিজে থেকে কথা বলবার শক্তি পান না।

আমি তর্জমা কি ভালো করতে পারি মনে করো?

—আমি তর্জমার কথাটা বলতে পারছি না কিছুতেই। কারণ ওসবের চেয়ে আপনাকে বড় বলে জানি এবং এমন একটা নতুন সৃষ্টি করুন না—আমাদের সাবেক কালের কোন ভাল কবি থেকে—এই যেমন মেঘদূত, গীতগোবিন্দ।

আমি তো সৃষ্টি করবারই চেষ্টা করি আমার রচনার মধ্য দিয়ে।

—সৃষ্টি করবেন।

আচ্ছা, আমাকে শমী বলেছে, 'শমীর পৃথিবী' রচনা করছে। 'শমীর পৃথিবী' বলতে কী বোঝায়? সে ঠিক কী করছে বলতে পারো?

—আমি এ প্রশ্নের জবাব দেবো এমন করে যে, কোন সংশয় থাকবে না। সে বড় দুরন্ত করে লেখে। কাগজ ছেড়ে পেন্সিলের ডগায় নৃত্য করে। ভারি মিষ্টি লাগে তাকে।

—আপনি পারবেন। যাচ্ছি।

মণিলাল চলে যেতেই শমী এলেন। ঘুরে ফিরে সেই শমী, যিনি পরলোকেও নিজের বাবাকে নিয়ে 'বিভোর হয়ে থাকেন'। এবং সেই শমী যাঁকে পাওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ আকুল, যাঁর আত্মা এলে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে খুশি হন।

আস্তে আস্তে লেখ্ না বাছা। তুই বড্ডো দুরন্ত।

—তুমি কেন মণিদার কাছে জিজ্ঞেস করলে। আমার কাছে বুঝি জিজ্ঞেস করবে না ?

তুই যে জবাব দিস্ না তাই।

—বলব, আগে তোমার হোক সৃষ্টি।

আগে আমার হবে ? আমি কি তোর পৃথিবী ভাবতে পারি ? বলুই না কেমন করে জানব তোর পৃথিবী ?

—আচ্ছা, শান্ত হবো। রাগ করছো ?

আমি রাগ করিনে। তুই কাছে এলে খুব খুশি হই।

—মজা লাগে আসতে, তাই ছুটে আসি।

আচ্ছা লক্ষ্মী ছেলে, ধীরে ধীরে একটা ছবি আঁক না! নন্দবাবু (নন্দলাল বসু) এখানে আছেন।

—না সে হবে না। আমার যে কত কাজ!

তোর তো কাজের অন্ত নেই। তোর কী কাজ ?

—তুমিই তো ডাকলে ?

তুই এখানে কাজ করছিলি ?

—আর মণিদাকে কেন জিজ্ঞেস করলে ? যাও—

আচ্ছা, আর জিজ্ঞাসা করবো না। তোদের কি বিশ্রাম নেই ? তোদের ঘুম নেই ?

—বিশ্রামে কী মজা!

খুব মজা ? বিশ্রাম কি করিসনে ?

—করি, ক্লান্ত হলে।

নিয়ম মত বিশ্রাম করিস ?

—আমাদের তো বাতি নিবে যায় না।

যেমন আমাদের নিবে রাত্তিরে কাজের পর, তোদের কি তেমনি আছে ?

—তা নেবে। অনেকে বসে বসে ঘুমোয়, ভাল লাগে না।

মনের বাতি তো নেবে, শক্তির বাতি কি নেবে ?

—আমরা দুজন ঘুমোব, তাই জেগে আছি।

কারা দুজন ঘুমোবি ? বেলা আর তুই ?

কতদিন জেগে থাকব ?

তুই কি আমার সঙ্গে ঘুমোবি ?

—যাচ্ছি।

—কতদিনে আমার ঘুম আসবে ? তোর সঙ্গে কবে দেখা হবে ?

—মিডিয়ামকে একটু দয়া কর।

আমার হাত দিয়ে বলতে পারবি ? আমার হাত তো বেশ ঠাণ্ডা।

—ডাকছ, (তবে) পারবো না আসতে এখন।

আট

আর একটি আসর। তারিখ নেই, তবে নবেম্বরের বা ডিসেম্বরেরই একটি দিন। ১৯২৯ সাল। স্থান? সম্ভবত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। নইলে একটি প্রশ্নে 'বোলপুরে তুমি এসেছিলে' বলবেন কেন? আত্মা যিনি এলেন, তার উত্তরে কেবল হেঁয়ালি।

কে?

—জানি না, বলব না।

বোধহয় তোমায় চিনি।

—হাঁ।

বোলপুরে তুমি এসেছিলে?

—না।

শমী নাকি?

—না।

সন্তোষ?

—কোন দিন নাম বলিনি। আর একদিন এসেছিলাম, সেদিনও বলিনি।

তুমি কে, বলবে না?

—কাউকে ডাকব?

খানিক বিরতি। আবার মিডিয়ামের হাত নড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝতে পারেন না, কে?

—তুমি কি কবিতা লিখছিলে?

তোমার কাছাকাছি কে আছেন?

—সরোজিনী।

সরোজিনী? আমি তাকে চিনি?

—কী জানি। এখানে এসেছেন।

আচ্ছা, তাকে ডাকো।

আবার বিরতি। মনে হল নতুন আত্মা এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠাহর করতে পারেন না কে, পরে বুঝলেন তার "দুরন্ত ছেলে" শমী।

কে তুমি ? সরোজিনী ?
—ডাকনি, কেন ভাবনি শমী ?
শমী ! বুঝেছি । আমি ভেবেছিলুম, না ভাবলেও তুই আসতিস ।
—ইচ্ছা করে এসেছি । বলো, কিছু বলো ।
আচ্ছা, আমি বলছি । তুই যে কাজ করছিলি, সে কাজ তোর এগোচ্ছে ?
—খুব । যেন ঝড়ের হাওয়ার মতো বেগ আমার কাজের ।
আমার কাজের বেগ যদি ঝড়ের হাওয়ার মতো হতো, তবে কত কাজ হতো । 'শমীর পৃথিবী' আমি লিখব, যখন ছুটি পাবো ।
—কে বললে ? তোমার কাজ দক্ষিণ হাওয়ার মতো ।
আমার কাজ দক্ষিণ হাওয়ার মতো ? তোর ঝড়ের হাওয়ার মতো না ?
—বাবা, শোন ।
আস্তে আস্তে লেখ্ । এখন কার কাছে ছিলি ? একলা ? কেবল একা থাকিস ?
—একা থাকিনে । ভেবেছিলাম ডাকবে, তাই বসেছিলাম ।
তুই সব সময় কাজেতেই থাকিস, ঝড়ের মতো বেগে ?
—খুব মজা ।
তোদের তো দিন রাত্রি নেই, বিশ্রাম নেই কি ?
—বিশ্রাম করি ক্লান্ত হলে ।
ক্লান্ত কী করে হোস ? তোর তো শরীর নেই ।
—আমার মন নেই বুঝি ?
আচ্ছা, তোদের রূপ আছে ।
—আমি যদি বেঁচে থাকতুম, বলতে খুব ভালমনওয়ালা ছেলে ।
নিশ্চয়, তুই যখন বেঁচেছিলি, আমার মত ছিলি ! আমার মত একলা বসে বসে ভাবতিস । যখন জন্মেছিলি তখন কি জানতুম, তুই স্বপ্নকুমার ।
—কেন নাম রাখোনি স্বপ্নকুমার ? আমার কাজে ছন্দ আছে ।
তোর কাজে ছন্দ আছে, আমার বুঝি নেই ?
—পেন্সিল তো কাটা যায়, আমার মজা তো মাপা যায় না ?
আমি বলছিলুম, তোর কাছে গল্প করতে ইচ্ছে করে । সেই শিলাইদহের চরে—
—কী করে জানাব আসতে বাধা হয় । রাগ হয় । ইচ্ছে করে উড়তে । কিন্তু কোথায় পাই ডানা ?
আমি খুব ভেবেছিলাম । আমি জানতুম তুই নিশ্চয় আসবি ।
—জানি । বেশ ।

আচ্ছা, তুই অন্য সময় আসিস, যখন মিডিয়াম থাকে না? জোর এখানকার বৌদিদিকে (প্রতিমা দেবী) জানিস? কী রকম লাগে? তিনি বিশ্বাস করেন না, তুই এসেছিলি?

—মিথ্যা কথা। বিশ্বাস করেন মনে মনে।

আমি বলে দেব তাঁকে।

—রাগ করেন যদি?

তুই বেঁচে থাকতিস যদি, তবে তোকে কত যত্ন করতেন। খুব ভাব হতো।

—জানি। আর তোমার সঙ্গে রোজ রোজ আমাদের খেলা পড়া মজা হতো।

খুব ভাল হতো। আমার কত কাজে তোকে লাগাতে পারতুম!

—আমি কেবল তোমারই কাছে পড়তুম। তুমি সব জান।

সে তো আমি জানি। তোকে কত কবিতা মুখস্থ করিয়েছি। তুই সব ভুলে গেছিস।

—রাগ করছ? সুর মনে আছে, ছন্দ মনে আছে, ভাব মনে আছে, ভাষা মনে আছে, কেবল মুখস্থ নেই।

কী রকম করে তোরা ভাবিস, কিছু ভেবে পাইনে। আচ্ছা, তোরা হাসিস সেখানে আমাদের মতো?

—তোমাদের হাসি ভালো লাগে। আমাদের যে একটা নতুন পৃথিবী হবে, তাতে থাকবে হাসির আনন্দ, খুশির মজা।

তোর পৃথিবী তৈরি হচ্ছে? তাতে গিয়ে আমি থাকতে পারবো?

—তুমি থাকবে না?

তোর পৃথিবী যদি শেষ না হয়, আমি তৈরি করব।

—মা আসবে না বলে বলেছে। কিন্তু আর একজন আসবেন।

আর একজন কে বল্‌ তো?

—বলতে মানা। নাম বলতে বারণ করেছেন। যাব।

তোর পৃথিবীতে যে আসতে চায় না, তাকে ডেকে দে।

—ডাকবো না। আমার কথা আগে খানিক ভাব। যাই।

আমি তোর কথা রোজ ভাবি।

—মজা লাগছে। যাই।

শমীর বিদায়। ঊনত্রিশে নবেম্বরের রাত। এলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা। সেই মেজদাদা, যিনি 'স্নেহের ভাই রবি'-কে কৈশোরেই নিয়ে যান নিজের কর্মস্থল আমেদাবাদ, সতেরো বছর বয়সে বিলেত—লণ্ডনে ব্রাইটনে। সেখানে ছিলেন মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীদেবী,

আদরের ভাইপো ভাইঝি সুরেন আর বিবি—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী।

কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতলাওয়ে, পার্ক স্ট্রিটে কিংবা স্টোর রোডের বাড়িতে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের বহু আনন্দের দিন। গান বাজনা হইচই, নাটকের রিহার্সাল। রথীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতিতে লিখছেন—"বাবার সেই সময়ে একটি পার্টাকলে রঙের বুড়ো ঘোড়া ও পালকি গাড়ি ছিল। বিকেল হলেই তিনি আমাদের নিয়ে রওনা দিতেন তাঁর মেজদাদার বাড়ি। জোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জ বুড়ো ঘোড়া ঠুকঠুক করে যেতে সময় নিত অনেক।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে উনিশ বছরের বড়। স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসায় সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বৃদ্ধ বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও যাতায়াত ছিল। তিনি মারা যান ৮১ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালে।

সত্যেন্দ্রনাথের আত্মার সঙ্গে আলাপের যে বিবরণ রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায় পেয়েছি, তাতে শুধু সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরই লিপিবদ্ধ আছে, রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা নেই। সম্ভবত লিপিবদ্ধ হয়নি বা হারিয়ে গিয়েছে। সঙ্গতি রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথের সম্ভাব্য কথাগুলো বন্ধনীর মধ্যে দিলাম। বলা বাহুল্য, এই সংযোজন নিতান্তই অনুমাননির্ভর।

(কে?)

—মেজদাদা।

(মেজদাদা? ভালো আছেন?)

—ভাল আছি। তুমি সুখে আছ তো?

(আমাদের কথা মনে পড়ে?)

—নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমার জন্যে আমাদের সকলের স্নেহ ভালবাসা রয়েছে। তুমি সুখে থাকো।

(আমি যে সাধনায় নিযুক্ত আছি, তা কি সম্পূর্ণ করে যেতে পারবো?)

—পারবে, পারবে। তোমার কবিহৃদয়ের একটা advantage থাকবে না?

(পরলোকেও কি আমার প্রতি আপনার স্নেহদৃষ্টি রয়েছে?)

—নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি আমাদের সকলের স্নেহের রবি।

(আমি নূতন একটি নাটক লিখেছি। সেই আপনার বাড়িতে যার রিহার্সাল হতো, রাজা ও রানী, তাকে অন্য রূপ দিয়ে। নাম দিয়েছি 'তপতী'।)

—বেশ বেশ।

(তপতীর আইডিয়া কি আপনার পছন্দ হয়েছে?)

—চমৎকার কল্পনা, সুন্দর আইডিয়া।

(সুরেনকে কিছু বলবেন ?)

—সুরেন সুখে থাক।

(ও ব্যবসায় ও ঋণ নিয়ে নানা ঝামেলায় আছে।)

—মন স্থির রাখুক, সব বিপদ কেটে যাবে। সুরেনকে তুমি উপদেশ দেবে।

(বিবিকে কিছু জানাবেন ?)

—বিবি সুখে থাক্‌। তুমি তাকে এখনও স্নেহ করো তো ?

(করি।)

—বেশ। বড় ভাল লাগলো।

(অন্য কাউকে কিছু বলার আছে ?)

—যত আপন, আদরের তোমরা রয়েছ—নিয়ত তোমারেদ কথা মনে করে আশীর্বাদ করি।

(আপনার কথা আমার সব সময় মনে হয়।)

—আমি এতদিন আসতে পারিনি বলে দুঃখ পাওনি তো ?

(না আসার কারণ কী ?)

—বিশেষ কাজ ছিল। তবু জ্যোতি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) যেদিন এসেছিল, আমি আসতে ইচ্ছে করেছিলাম।

(আপনি এলে আমি খুশি হতাম।)

—সুরেনকে আমার আশীর্বাদ। সবলকে আমার আশীর্বাদ। যাই, যাই।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের পর সে রাত্রের আসর শেষ। ??ন্দ্রসদনে রাখা সেই খাতাতেই দেখছি একটি পাতায় কয়েকটি উত্তর লেখা আছে। তারিখ নেই, রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নাবলী নেই, কে এসেছিলেন তারও উল্লেখ নেই। উত্তরের ধরন দেখে মনে হয় শমীন্দ্রনাথ। এই অসংলগ্ন ও অসমাপ্ত সংলাপের উত্তর-অংশ নিম্নরূপ—

—আমার বাবা তুমি।

—সে কথা জানি, আজ খুব শান্ত হয়ে কথা কব কি ?

—খুব পারবে। তোমার ভাব আর আমার ভাব মিলে যাবে।

শেষ উত্তরটি দেখে মনে হয় আলোচনাটি 'শমীর পৃথিবী' নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পর সেই পৃথিবী গড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে শমী বলেছিলেন "খুব পারবে…" ইত্যাদি।

পরবর্তী আসর জোড়াসাঁকোয়। রাত্রিবেলা। সঙ্গে আছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। প্রশান্ত মহলানবিশকে আসরে আনার কারণ তাঁর অবিশ্বাস। বিজ্ঞানীশিষ্যকে এই অলৌকিক কথোপকথনে উপস্থিত রেখে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত দেখাতে চেয়েছেন, আজগুবি বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই আসরে মিডিয়াম কি বুলা নন? রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছেন, "আমি শান্তিনিকেতনে গেলে বুলাকে ডাকব, সে থাকলে হয়ত তোমার শোনার সুবিধা হবে।" কিংবা হয়ত বুলাকে শান্তিনিকেতনে আবার নিয়ে যাওয়ার কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

যাঁর আত্মা এলেন তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম নন, জীবিতাবস্থায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরিচিত ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র তাই নিজেও এবার প্রশ্ন করলেন অনেক।

এলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—যাঁর আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই আনতে চাইছিলেন। সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি এবং অজিত চক্রবর্তী ও সতীশ রায় তিন বন্ধু ছিলেন। এঁরা তিনজনই রবীন্দ্রনাথের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিলেন।

সত্যেন দত্ত মারা যান অতি অল্প বয়সে—১৯২২ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর যে-শোকসভা হয়, তাতে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সেই সভাতেই তিনি পড়েন বিখ্যাত সেই কবিতা—যা 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। 'সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত' শীর্ষক কবিতায় তিনি একাংশে লিখেছিলেন—

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ অন্ধকারে?
মৃত্যু তরঙ্গিনীধারা মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই, আজি বাধা কিগো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে।...

সত্যেন দত্তের আত্মা আসতেই প্রথম দুটি প্রশ্ন করেন প্রশান্ত মহলানবিশ, তারপর রবীন্দ্রনাথ।

প্রশান্ত: আপনি কি কবিতা অনুসরণ করেন?
—করি, ওতেই আমার আনন্দ।

প্রশান্ত ঃ আজকালকার কবিদের মধ্যে কার লেখা পছন্দ করেন?
—আমাদের পুরানো কবিতা বেশী ভাল লাগে। নতুন ভাব আমায় স্পর্শ করে না।
রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রশান্ত, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে। আর তুমি যে সত্যি সত্যেন, তা প্রমাণ করতে হবে। আমার প্রয়োজন নেই, প্রশান্তর প্রয়োজন আছে।
—(প্রশান্ত মহলানবিশকে) আমার দেহ নেই, আমি আছি। কী করে বোঝাব? যখন আমার কথা ভাব, তখনই আমি যাই। আমায় যদি বুঝতে চাও তো তবে feel কর। তোমার বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে এর তত্ত্ব বের হবে না।
রবীন্দ্রনাথ ঃ তুমি যদি একটা কবিতা—দুটো লাইন লিখতে পারো, হয়ত ওর বিশ্বাস হতে পারে।

(সত্যেন দত্তের আত্মা তৎক্ষণাৎ লিখতে শুরু করল কবিতা, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল চার লাইন।)

আমার আজও কিরে সেই
আবরণ আছে রে,
এ যে কোন অজানা পথ
শেষ নাহি রে।

—কবিতা রচনা করবার ইচ্ছে নেই। শক্তি নেই নতুন লেখা লিখতে। এখন নতুন কিছু শিখছি। আলোর পথে এগিয়ে চলেছি। সে যে কী সুন্দর! এত সুখ কখনও পাইনি। প্রশান্ত, তোমার ধাঁধা লাগছে? বুঝ, ফিল করতে শেখ। এসব জিনিস তত্ত্ব দিয়ে বুঝতে পারবে না।
প্রশান্ত ঃ নতুন বাংলা নাটক কিছু দেখেছেন?
—সবই তো দেখতে পাই।
রবীন্দ্রনাথ ঃ শমীর কথা কিছু জানো?
—এখনও তার দেখা পাইনি।
সে কোন্ কাজে নিযুক্ত জানো?
—মোদের সাতে উন্নতি হয়।
ওখানে কাজের ধারা কী?
—ফোটাবার অবকাশ হয়, তারই চেষ্টা করি। কেবল বলতে পারি না, আমার বন্ধুদের জানাতে পারি না।
ওখানে তার সঙ্গে দেখা হয়?
—দেখা? ইচ্ছে না করলে মোটেই হয় না। আমার এখন একলা *ভাল লাগে।*

তোমার ধর্মমত কী? কোন পরিবর্তন হয়েছে?
—এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবতা নেই।
তাঁকে তুমি কীরকম করে জানো?
—উপলব্ধি করি।
মৃত্যু হওয়ামাত্র কী পরিবর্তন হলো, যাতে যাঁকে আগে উপলব্ধি করোনি, তাঁকে উপলব্ধি করলে?
—দেহান্তরের পর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মুক্তি পেয়েছি।
এখানকার সঙ্গে বন্ধনবিচ্ছেদের যন্ত্রণা?
—বিচ্ছেদের কষ্ট তার কাছে তুচ্ছ।
সে কষ্ট কি অভাববশতঃ?
—মনের দিকে ফাঁকি ছিল।
ইচ্ছাকৃত ফাঁকি, না অজ্ঞানতাবশতঃ ফাঁকি?
—অজ্ঞানতাবশতঃই বলতে ইচ্ছে করছে? তখন যদি আমার মত কেউ ফেরাতে পারত, তবে এত কষ্ট পেতে হত না। আপনাদের হাতে সেই অস্ত্র ভগবান দিয়েছেন, তার সদ্‌ব্যবহার হচ্ছে না। দৈন্য সব দিকে। আজ যদি একবার কেউ এ জগতে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন—ঈশ্বর এক এবং ত্রিশ কোটি লোক মাথা হেঁট করে, তবে বুঝব। দুনিয়ায় সত্যি এমন দিন কবে আসবে?
যার শক্তি জাগ্রত হয় সে সত্যকে লাভ করে। সত্যকে লাভ না করলে কী করে সত্য প্রচার করবে?
—সত্য প্রকাশিত। আমাদের চোখ নেই, তাই দেখতে পাই না। এই যে ফুলের রং গন্ধ—এ সব আপনিই তো আমাদের পথ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আগে কবিতাগুলো পড়েছি, ভালো লেগেছে; কিন্তু সেই মন ছিল না। একদিন তাই সেই কবিতা শুনতে ইচ্ছা করি।
তুমি কবিতা শুনতে ইচ্ছা করো?
—আপনি যখন নির্জনে কবিতা বলেন, তখন আমি উপস্থিত থাকি। কোন অনিষ্ট করবো না।
তুমি বলছ, আমি কোন সময় নির্জনে কবিতা পড়ব, তুমি থাকবে। কেমন করে জানব, তুমি আছ?
—আমার কথা মনে ভাববেন।
আচ্ছা ভাবব। কিন্তু কোন বিশেষ কবিতা শুনতে চাও? যদি বলো তো সহজ হয়।
—পলাতকা।
'পলাতকা'-র কোন্ কবিতা?

—মুক্তি।
প্রশান্ত ঃ মহুয়া'র কোন কবিতা দেখেছেন ?
—কোথা থেকে দেখব ? অন্তরে ডাক না পেলে যেতে পারি না।
রবীন্দ্রনাথ ঃ তোমাকে মনে মনে ডেকে পড়লে শুনতে পাবে ?
……(উত্তর লিপিবদ্ধ নেই)
আচ্ছা ডাকব, বইয়ের লেখা থেকে উপলব্ধি করতে পার ? শ্রবণশক্তি আছে ?
—আছে।
শ্রবণেন্দ্রিয় তো নেই, কেমন করে শোনো ?
—মন আছে।
দেখার শক্তি নেই, শোনার শক্তি আছে ?
—না, চোখ নেই।
আমি শান্তিনিকেতনে গেলে বুলাকে ডাকব, সে থাকলে হয়ত তোমার শোনার সুবিধা হবে। নতুন কবিতা শোনাব, না পুরানো ?
—সেই শোনে, অন্তরে ডাকে—কবে আমায় শোনাবেন ? ১০ই পৌষ, রাত্রি সাড়ে সাতটা।
আচ্ছা, ১০ই পৌষ, রাত্রি সাড়ে সাতটায়, আচ্ছা। তপতীর অভিনয় দেখেছো, জানো তার কথা ?
—'তপতী' নামটা নতুন লাগছে।
তপতী-র অভিনয় অনুভব করেছিলে ?
—আমার বড় ইচ্ছে করছিল। আমায় তেমন করে তো ডাকেননি। পারলাম না, বারে বারে গিয়ে ফিরে এসেছি।
তোমরা ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ামের ভিতর যদি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দাও তো কী করে তার সামঞ্জস্য করবে ?
—আমবা যার তার কাছে যাইনে।
হয়ত অন্য সময়ে তোমাদের নাম করে অন্য কেউ এসেছিল, তাই কি বুঝব ?
—আমরা সব সময় চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। যখন আমাদের ডাকা হয়, তখন যাই। আজ এখুনি আমায় ডেকেছেন, তাই এসেছি। যখন ডাকবেন, তখন আসব। মিডিয়াম যে-সে হয় না জানি। যাদের feel করবার শক্তি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি, তাদের কাছে আমরা যাই।
অন্য কোন মিডিয়ামের কাছে প্রকাশ দেখলে কি বিশ্বাস করব ?
—করুন না কেন, দুনিয়ায় কি হৃদয়বানের অভাব !
এর আগে আমার কাছে এসেছিলে মনে আছে ?—কোন মিডিয়ামের ভিতর দিয়ে ?

—হাঁ, আমাদের অতীতের কথা অবিশ্যি মনে থাকে না। আমরা এগিয়ে চলেছি।

প্রশান্ত : পৃথিবীর কথা বেশি মনে থাকে না ?

—অতীতের কথা ভাবলে বিঘ্ন ঘটে। অতীতের কথা মনে করতে চাই না। একবার ছেড়ে এসেছি, আবার বন্ধন কেন ? মুক্তির কথা তাই শুনতে চাই বেশি করে।

প্রশান্ত : মুক্তির কথা কি শুধু ভারতবাসীর কাছে শুনব, না সকলের কাছেই ?

—সকলেই বোধহয় এক।

প্রশান্ত : পৃথিবীতে সকলের বিচিত্র মনোভাব। ইংরেজের, বাঙালীর ইত্যাদির। মৃত্যুর পরে কি সব মুহূর্তকালে পরিবর্তন হয় ?

—তা' নয়। নানা ভাব, নানা চিন্তা নানা পথ দিয়ে আসে। জানতে পায় না কোন্‌টা আসল। পার্থক্য নেই।

প্রশান্ত : এই ভিন্নতা—যা পৃথিবী থেকে নিয়ে যাই, তা কি সেখানে গিয়ে বিলুপ্ত হয় ?

—যে-পৃথিবীতে সত্যকে জেনেছেন, মৃত্যুর পর নতুন কিছু জানতে হয় না। যাঁরা নাস্তিকতাপ্রচার করেছেন, তাঁদের জন্য একটা কঠিনব্যবস্থা।

প্রশান্ত : সেটা কি শাস্তি ? ঈশ্বর কি শাস্তি দিয়েছেন ?

—নিশ্চয়ই।

প্রশান্ত : তাঁরা আপনার ভুল স্মরণ করে কষ্ট পান ?

(উত্তর অস্পষ্ট)

প্রশান্ত : 'মনডে ক্লাব'-এর (এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন সত্যেন দত্ত, প্রশান্ত মহলানবিশ, সুকুমার রায় প্রমুখ। প্রতি সোমবার বৈঠক বসত।) কথা মনে পড়ে ?

—আবার কেন সেই পুরোনো দিনের কথা। জিজ্ঞেস করলে তাই বলছি, আছে। তোমরা এখন কত নতুন তর্কের সন্ধান পেয়েছ, সেগুলো ছেড়ে ছোটদের মধ্যে ভাল কিছু সৃষ্টি করবার উৎসাহ নেই কেন ? তুমি বুড়ো নাকি ?

রবীন্দ্রনাথ : তোমরা কি মিডিয়ামের মন ব্যবহার করে তার ভাষায় কথা বলো, না নিজের ?

—আমরা নিজেদের মত নিজেদের ভাষায় বলি। মিডিয়াম আমাদের কথা বলে না।

মিডিয়ামের যেমনই মনের অবস্থা হোক, তাতে আসে যায় না ?

—আমরা মনে নিরক্ষর চাষার হাতেও আসি, তার মধ্যে যদি পদার্থ থাকে।

বিনি ইংরেজি জানেন না, তাঁর হাতে ইংরেজি বলতে পারো ?
—ইংরেজিতে বলতে পারি।
ফরাসি তো তুমি জানতে, এক লাইন লিখতে পার ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
ভাষার পার্থক্য আছে ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
মণিলালকে ডেকে দিতে পার ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটু পরেই এলেন। তিনি আগেও এসেছেন অনেকবার। এবারকার বৈশিষ্ট্য হল, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা ইংরেজিতে অনেক জবাব লিখেছেন। জানি না কেন ? তাছাড়া কথাবার্তাও অসংলগ্ন।

কে ?
— I am Manilal.
পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে থিয়োরি সেদিন বলেছিলে, মনে আছে ?
—পরলোকেই তো রয়েছি।
About the other world ? I remember it quite well. No separate world beyond this region which you say. The other world is a chamber of the vast universe.
সেদিন যে থিয়োরি আবিষ্কার করার কথা বলেছিলে, তা মনে আছে ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
(প্রশ্ন লিপিবন্ধ নেই)
—এ জগতে স্থূলদেহধারী লোকেরা বাস করে, কিন্তু এখানে সেসব নেই, আছে চিৎ।
কোন্ জগতে ? Can you repeat it ?
—I do not say anything.
Do you mean that there is no other world beyond this.
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
What is it ? I do not quite follow you.
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
তাহলে সূক্ষ্মদেহ আছে ?
—হাঁ।
আর কী আছে ?
—আত্মা বলতে কী ভাবেন ?

প্রশান্ত ঃ আপনাদের মনে জাগে এগুলো ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
তাহলে দেহ কী করে হয় ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, সূক্ষ্মদেহ বলতে কী বোঝো ?
(উত্তর লিপিবন্ধ নেই)
প্রশান্ত ঃ মহুয়ার কোন কবিতা জানেন কি ?

এই সংলাপটি অসম্পূর্ণ। অন্তত যা লিপিবন্ধ আছে, তাতে তাই মনে হয়। কিন্তু হয়ত সব কথা লিপিকর দ্রুত টুকে নিতে পারেননি বলে প্রশ্নোত্তর খাপছাড়া থেকে গেছে। তাছাড়া সেই আসরেই সর্বশেষ যিনি এলেন, তিনিও অপরিচিত।

আপনার নাম কী ?
—আমার নাম জানবার দরকার নেই।
একটু আভাস দিতে পার ?
— আমি এবার যাই।
তাহলে প্রশ্ন করতে পারি ? বাঙালী ?
—এ পথে সকলে আসছে। শুধু আমি কেন ? আমায় চিনবেন না।
নাম জেনে কী হবে ?
তুমি আমাকে চেন ? পৃথিবীতে আমাকে দেখেছো ?
—আপনাকে দেখেছি। আর কোন কথা বলতে চাইনে।

অপরিচিত আত্মার প্রস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারলৌকিক সংলাপের অবসান। এর পরে তিনি হয়ত মিডিয়াম বা প্ল্যানচেটে আত্মা এনেছেন, কিন্তু কোথাও তার কোন উল্লেখ পাইনি। তেমনি উল্লেখ পাইনি, সর্বশেষ আসরের পর শান্তিনিকেতনে ফিরে ১০ পৌষ (২৫ ডিসেম্বর) রাত ৭-৩০ মিঃ সত্যেন দত্তকে রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতা শুনিয়েছিলেন কিনা।

অর্থাৎ ১৯২৯ সালেই রবীন্দ্রনাথের এই মিডিয়াম-কাহিনীর সমাপ্তি। তারপর পৌষ উৎসব। উৎসবের শেষে বক্তৃতা দিতে বরোদা যাত্রা এবং ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে নিজের আঁকা ছবি নিয়ে সদলবলে ইউরোপ পাড়ি। আত্মা এনে কথা বলা রবীন্দ্রনাথকে নেশার মত ধরেছিল। বিলেতে নানা কর্মব্যস্ততায় সেই নেশা ঘুচল।

আর মিডিয়াম উমা ? রবীন্দ্রজীবনের রহস্যময় অংশের এই রহস্যময়ী রমণী, যাঁর হাতছানিতে চুম্বকের মতো নেমে আসতেন পরলোক জগতের বাসিন্দারা, আচ্ছন্নের মতো যিনি কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, সেই কৃশা-সুন্দরী উমা দেবীর জীবনে হঠাৎ অঘটন, এল পরলোকের ডাক। এ যুগের সর্বজ্যেষ্ঠ কবির পারলৌকিক যোগাযোগের সেতু কনিষ্ঠা কবি এই উমা নিজেই যোগ দিলেন পরলোকগতদের আসরে। ১৯৩১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মাত্র সাতাশ বছর বয়সে উমা দেবী বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে।

সেই সঙ্গে এই অকালমৃত্যু জিজ্ঞাসুদের কাছে রেখে গেল অনেকগুলি প্রশ্ন। প্রার্থিত আত্মার অবলম্বন এই অসাধারণ মহিলা ভিতরে ভিতরে পরলোকের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন বলেই কি মৃত-মৃতারা ছিলেন তাঁর নাগালের মধ্যে ? নাকি মিডিয়াম হওয়ার কায়-ক্লেশই তাঁকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে ? অনেকে বলেন তাই ; বলেন, এ মৃত্যুর পিছনেও আছে রহস্যময়তা। কে জানে !

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, এই পারলৌকিক সংযোগের এক যুগ পর, ১৯৪১ সালে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যে পরলোকের সঙ্গে দিনের পর দিন সংযোগ স্থাপন করেছেন, সেই পরলোকেই তিনি পাড়ি দিলেন পরিণত বয়সে। অনুমান করতে পারি, অসংখ্য প্রিয়জনের মাঝখানে এই মধুময় পৃথিবীর ধূলির দুঃখ তিনি কিঞ্চিৎ ভুলতে পেরেছিলেন। মণিলাল গাঙ্গুলির আত্মাকে বলে-ছিলেন, "আমি এত ভালবাসি এই পৃথিবীকে, মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীর সৌহার্দ্য কি পাব না।" হয়ত আরও অসীম, আরও গভীর সৌহার্দ্যের সমুদ্রে তিনি এখন মগ্ন আছেন। কে জানে।

কিংবা হয়ত 'আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে' বসেও 'ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন' তাঁর বারবার মনে পড়ছে। তাঁর চারপাশেই রয়েছেন নতুন বোঠান, ছোটবৌ, বেলা, শমী, রানী, বলু, জ্যোতিদাদা, লোকেন, সুকুমার, সত্যেন, অজিত, সতীশ, মণিলালেরা। মিডিয়াম বা প্লানচেট ছাড়াই এখন তাঁদের পাওয়া যায়, কথা শোনা যায়। তাছাড়া ইতিমধ্যে এসে গেছেন রথী, বৌমা, মীরা, অবন, বিবি, সুরেন—রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক প্রিয়জন।

আর শমী ? এতদিন "বাবাকে নিয়ে বিভোর" ছিলেন তিনি, এখন সেই বাবা—যাঁর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে মিল স্বভাবে—এসে হাত লাগিয়েছেন তাঁর কাজে। পিতাপুত্রের ভাব নিয়ে 'শমীর পৃথিবী' রচনাও হয়ত এতদিনে শেষ। নাকি মহাবিশ্বে মহাকাশে অনন্তকাল ধরে চলবে সেই অন্য ভুবন রচনার কাজ ? কে জানে ?

কুশীলব

মৃণালিনী দেবী

জন্ম ১৮৭৩ ॥ মৃত্যু ১৯০২

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী, যশোরের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা। তিন কন্যা ও দুই পুত্র—মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা, রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। বিবাহ ১৮৮৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ। মৃণালিনী দেবী জোড়াসাঁকোয় ছিলেন গৃহকর্ত্রী, শান্তিনিকেতনে আশ্রমজননী। মৃণালিনী দেবীর আত্মা আসে ৫ নবেম্বর।

মাধুরীলতা

জন্ম ১৮৮৬ ॥ মৃত্যু ১৯১৮

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিবাহ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। অসাধারণ সুন্দরী ও ঠাকুরবাড়ির সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রচনার হাতও ভাল ছিল। ডাকনাম বেলা। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মাধুরীলতার আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর।

শমীন্দ্রনাথ

জন্ম ১৮৯৬ ॥ মৃত্যু ১৯০৭

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র, পিতার অত্যন্ত প্রিয় সন্তান। শিক্ষা শান্তি-নিকেতনের বিদ্যালয়ে। বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় মারা যান। চরিত্রে ও চেহারায় পিতার নিকটতম ছিলেন। মিডিয়ামে একাধিকবার এসেছেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে। প্রথম আসেন ১৯২৯ সালের ৬ নবেম্বর। তারপর ২৮ ও ২৯ নবেম্বর এসেছেন আরও ছয় বার। তাঁর আত্মার আসাই সংখ্যায় সর্বাধিক।

কাদম্বরী দেবী

জন্ম ১৮৫৯ ॥ মৃত্যু ১৮৮৪

স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু গানে, বহু কবিতায় তিনি আছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু বই এঁকে উৎসর্গ করা। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দুই বৎসর পর তিনি আত্মঘাতী হন। কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। ৪, ২৮ ও ২৯ নবেম্বর কাদম্বরী দেবীর আত্মা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে আসে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

জন্ম ১৮৪৯ ॥ মৃত্যু ১৯২৫

রবীন্দ্রনাথের নতুন দাদা, দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম প্রতিভাধর পুরুষ। সংগীত সাহিত্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাতা, কাছের মানুষ। মৃত্যু রাঁচিতে। তাঁর আত্মা প্রথম আসে ৫ নবেম্বর। পরে আসে ২৮ নবেম্বর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৪২ ॥ মৃত্যু ১৯২৩

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা, দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র, ভারতের প্রথম আই সি এস। রবীন্দ্রনাথ যে কয়জন দাদার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বিলেত নিয়ে যান। স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কন্যা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। তাঁর আত্মা আসে ২৯ নবেম্বর।

হিতেন্দ্রনাথ

জন্ম ১৮৬৭ ॥ মৃত্যু ১৯০৮

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের পুত্র। স্ত্রীর নাম সরোজিনী। একমাত্র পুত্র হৃদ্যেন্দ্রনাথ। হিতেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন। তাঁর আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর।

বলেন্দ্রনাথ

জন্ম ১৮৭০ ॥ মৃত্যু ১৮৯৯

রবীন্দ্রনাথের ন'দাদা বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। দিব্যদর্শন গৌরকান্তি এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার দীক্ষাও রবীন্দ্রনাথের কাছে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে এক আকস্মিক ঘটনার পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি রেখে গিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা দেবী, মা প্রফুল্লময়ী দেবী। বলেন্দ্রনাথের আত্মা আসে ৫ নবেম্বর।

অভিজ্ঞা দেবী

জন্ম ১৮৭৩ সাল

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর চেয়ে মাত্র কয়েক মাসের বড়, তাই তিনি অভিজ্ঞাকে ডাকতেন 'বোনদিদি' বলে। ভাল গান গাইতে পারতেন অভিজ্ঞা। তাঁরই জন্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'তুমি রবে নীরবে' গানটি। অভিজ্ঞা দেবীর আত্মা আসে ৬ নবেম্বর।

সাহানা ঠাকুর

জন্ম ১৮৮৫ সাল

বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ভাল গান গাইতে পারতেন। তাঁর আত্মা আসে ৫ নবেম্বর।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

জন্ম ১৮৮৮ ॥ মৃত্যু ১৯২৬

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আদি ছাত্রদের একজন। বন্ধু রথীন্দ্রনাথের মত ইনিও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিখতে যান। ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে শান্তি-নিকেতনের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, সন্তোষচন্দ্রের আত্মা প্রথম আসে ৬ নবেম্বর। পরে এসেছে ২৮ ও ২৯ নবেম্বর।

মণিলাল গাঙ্গুলি

জন্ম ১৮৮৮ ॥ মৃত্যু ১৯২৯

অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। তাঁরই পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়িতেই থাকতেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বহু ছোট গল্প লিখেছেন। বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবিতকালে মণিলালের বাতিক ছিল প্রেতচর্চা। তাঁর আত্মা আসে ৫, ২৮, ২৯ নবেম্বর ও ১৬ ডিসেম্বর।

মোহিতচন্দ্র সেন

জন্ম ১৮৭০ ॥ মৃত্যু ১৯০৬

রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংকলনের সম্পাদক। শান্তিনিকেতনের একদা-অধ্যাপক। খ্যাতনামা পন্ডিত মিডিয়মা উমা দেবীর পিতা। তাঁর আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর।

সতীশ রায়

জন্ম ১৮৮২ ॥ মৃত্যু ১৯০৪

শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন কিছুদিন। তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবেও তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ অর্জন করেছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে অকালে বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আত্মা আসে ২১ নবেম্বর।

অজিত চক্রবর্তী

জন্ম ১৮৮৬ ॥ মৃত্যু ১৯১৮

রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক, শান্তিনিকেতনের আদিযুগের অধ্যাপক, মেধাবী পন্ডিত ও বহু পুস্তকের গ্রন্থকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে

অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর আত্মা প্রথম আসে ৫ নবেম্বর। তারপর আসে ২৮ নবেম্বর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ১৮৮২ ॥ মৃত্যু ১৯২২

খ্যাতনামা কবি, রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য, প্রবন্ধকার অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। বহু কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে একটি দীর্ঘ কবিতা রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'পূরবী'-তে আছে। সত্যেন দত্তের আত্মা প্রথম আসে ৫ নবেম্বর, পরে ১৬ ডিসেম্বর আবার এসেছে।

লোকেন পালিত

জন্ম ১৮৬৫ সাল

স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ শ্রোতা। রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করেন। তাঁর আত্মা আসে ২৯ নবেম্বর।

সুকুমার রায়

জন্ম ১৮৮৭ ॥ মৃত্যু ১৯২৩

পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। মাতা বিধুমুখী দেবী। পুত্র সত্যজিৎ রায়। খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক—বাংলা ভাষায় এখনও অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্র-শিষ্যদের একজন। স্ত্রী সুপ্রভা রায় ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। সুকুমার রায়ের আত্মা আসে ৬ নবেম্বর।

লোপমুদ্রা চন্দ

কবিশিষ্য অপূর্বকুমার চন্দের স্ত্রী, কবিবন্ধু চারুচন্দ্র দত্তের কন্যা। দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে অকালে মারা যান ১৯২৬ সালে।

শান্তি মিত্র

রবীন্দ্রনাথের অপরিচিতা। এঁর আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর। ইনি ঢাকা ট্রেনিং কলেজের মনোরঞ্জন মিত্রের কন্যা। অল্প বয়সে ১৯২৭ সালে মারা যান। রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভালবাসতেন।

সর্বজয়া

রবীন্দ্রনাথের অপরিচিতা এই মহিলার আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর। ইনি নিজের পরিচয় দেন রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদাদেবীর সখী বলে। ঠাকুর-বাড়িতে তাঁর নাকি যাতায়াত ছিল।

রাসমণি

১৯২৯ সালে ৬ নবেম্বর আসে এঁর আত্মা। ইনি নিজের পরিচয় দেন ঝোলাবারান্দাওয়ালা কোন এক বাড়ির দাসী বলে। আত্মা রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত।

সরিৎবাসিনী

অপরিচিত আত্মা, আসেন ২৯ নবেম্বর। তিনি পরিচয় দেন 'আমি কুলবধূ'। তাছাড়া জানান, জলে ডুবে তিনি মারা যান।

চন্ডীবালা

অপরিচিত আত্মা। আসেন ২৯ নবেম্বর।

আরতি মল্লিক

অপরিচিতা। বিনা আহবানেই তাঁর আত্মা আসে ৬ নবেম্বর। তাঁর উক্তি শুনে মনে হয়, তিনি জীবিতকালে রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। একবার দারজিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাকি পরিচয়ও হয়েছিল। তিনি জানান, তাঁর স্বামীর নাম এম কে মল্লিক, দিল্লিতে সরকারী চাকরী করতেন।

হালদার মশাই

অপরিচিত আত্মা। তাঁর জবানবন্দীতে জানা যায়, ঠাকুরবাড়িতে মাত্র একবার গিয়েছিলেন 'ডাকঘর' অভিনয় দেখতে। তিনি মিডিয়ামে আসেন ৬ নবেম্বর।

মালাকর

অপরিচিত। এঁর আত্মা আসে ২৮ নবেম্বর। ইনি নিজের পরিচয় দেন 'বার্তাবহ' আত্মা বলে, অন্য লোকের আত্মাকে এগিয়ে দেওয়াই নাকি তাঁর কাজ।

বার্তাবহ আত্মা

অনামী এই আত্মা আসে ২৯ নবেম্বর। সম্ভবত ইনিই মালাকর, আগে আর একবার এসেছিলেন।

আহবায়ক রবীন্দ্রনাথ ॥ মাধ্যম উমা দেবী
লিপিকর : ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

———

রবি-অনুরাগিণী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিবেদন

১৯৫৫ সালে পূজো সংখ্যা আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল রবি-অনুরাগিণী। তার সঙ্গে যুক্ত করেছি আরো দুই অনুরাগিণীকে। একজন জাপানের টোমি ওয়াডা কোরা, অন্যজন হেমন্তবালা দেবী। হেমন্তবালা পরলোক গমন করেছেন ১৯৫৬ সালে। আশী বছর পার করে এখনো বেঁচে আছেন টোমি ওয়াডা।

আমার তালিকায় রবি-অনুরাগিণী সাত জন। বড় কম সংখ্যা। আসলে হাজার হাজার অনুরাগিণী ছড়িয়ে আছেন দেশে বিদেশে। কিন্তু আমার সংজ্ঞা একটু আলাদা। অনুরাগ দুই তরফে হওয়া চাই। এই সাতজন সম্পর্কেই সংজ্ঞাটি পুরোপুরি খাটে।

এই বই লেখার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দেন রমাপদ চৌধুরী। তাঁরই তাগাদায় প্রথম ছাপা হয় পূজোসংখ্যা আনন্দবাজারে। তারপর তাগাদার ভার নেন হীরক রায়—অনন্য প্রকাশনের কর্ণধার। নতুন দুটি অধ্যায়যুক্ত বর্ধিত কলেবর এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় নিন্দা প্রশংসা হীরকের প্রাপ্য। [illegible]

প্রথমে ভেবেছিলাম বইয়ের নাম দেব 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকারা।' বাদ দিলাম এই কারণে যে, বাংলা ভাষায় অপব্যবহারের ফলে 'প্রেমিকা' শব্দের সঙ্গে 'অবৈধ-অবৈধ' গন্ধ জড়িয়ে গেছে। অবশেষে খুঁজে খুঁজে নতুন নামের সন্ধানে বেরিয়ে পছন্দসই কিছু মিলছিল না। পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন শ্রীমান শশিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'রবি-অনুরাগিণী' নামটি তাঁরই দেওয়া। বইটি কেমন হয়েছে বলতে পারব না, নামটি যে চমৎকার সে বিষয়ে সংশয় নেই।

অ চৌ

কলকাতা

চুম্বন-প্রত্যাশী সেই তরুণীর ব্যাকুল প্রার্থনার কী উত্তর দিতে পেরেছিলেন সেদিনের ওই নিভৃত কক্ষের একমাত্র পুরুষ-অতিথি? সদ্যোবয়ঃসন্ধি অতিক্রান্ত, প্রথম প্রণয়ভীত কিশোর? না, নিশ্চল নিরুত্তর ছিলেন তিনি, লজ্জার মুখোশ ছিঁড়ে মিলনোন্মুখ সুন্দরীকে কাছে টেনে নিতে পারেননি, বাসনায় উদ্বেল হয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন জীবনের প্রথম রমণীয় উপহার। আর পুরুষের স্পর্ধায় বিস্মিত, বিফলতার বেদনায় জর্জরিত সেই রমণী নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলেছেন, 'নারীর এ পরাভবে পঞ্চশর তোমারি এ পরাজয়'।

পরাজয় সেই কিশোরেরও। প্রস্থানরতা প্রিয়বান্ধবীর বিষাদমন্থর পদক্ষেপ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরেছেন, অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে আচ্ছন্ন ওই রমণীর করুণ মুখচ্ছবি মনে করে নিজেকে বড় স্বার্থপর ভেবেছেন। উদ্ভিন্নযৌবন সেই সতেরো বছর বয়সেই প্রচণ্ড দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়ে সত্যি সত্যি বুঝতে পারেননি 'বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা', না 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' তাঁর জীবনে বেশি প্রবল। হয়ত এই তরুণী সেই মুহূর্তে নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার রূপ ধরে এসেছিলেন বলেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এবং প্রত্যাখ্যানের পর দেখা দিয়েছে আবার দ্বন্দ্ব, হয়ত পর মুহূর্তে তাঁর বলতে ইচ্ছে করেছে, 'ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন, সূর্য অস্ত যায়নি এখনো, সময় রয়েছে বাকি।' —কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার জন্যে তখন কেউ আর অপেক্ষা করে নেই।

এই চাওয়া-না-চাওয়া এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে যাঁর সাবালক জীবনের শুরু, সেই অনিন্দ্যকান্তি জীবনশিল্পীর কিছু প্রীতিরঞ্জিত কাহিনী নিয়েই এই উপাখ্যান। সেদিনের সেই লাজুক কিশোর, তরণীটির 'প্রিয় রবি', পরবর্তীকালে আমাদের সকলের প্রিয় কবি। রবীন্দ্রনাথ। এই দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষের জীবনে শুধু আন্না নামধারী ওই তরুণী রমণীই শুধু নন, আরও কয়েকজন নারী বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা স্নেহে প্রেমে সেবায় কবির জীবন সুমধুর করে তুলেছেন।

অথচ কী দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের, তাঁর প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি ঢাকা পড়ে গেছে ঋষিপ্রতিম চেহারার আড়ালে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লিখেছেন, গান গেয়েছেন, ভাষণ দিয়েছেন—তাঁর মহৎ জীবন ও মহত্তর সৃষ্টি থেকে আমাদের এই ধারণা। প্রেম নিবেদনের উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর, কিন্তু এ সবই যেন ত্রিভুবনেশ্বরের চরণে ঢালা, পূজামন্দিরের ধূপে সুরভিত। আমরা ভুলে

থাকতে চাই, তিনিও রক্ত মাংসের মানুষ, নিজের সৃষ্টিতে আমাদের বারবার অলৌকিক জগতে নিয়ে গেলেও সব লৌকিক প্রবৃত্তি নিয়ে তিনিও একজন পরিপূর্ণ সংসারী। তাঁরও বয়ঃসন্ধি ছিল, যৌবনের আবেগ ছিল, নারীদেহের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং কবি হিসাবে সাধারণ মানুষের চেয়ে কামনা-বাসনা নিশ্চয়ই তীব্রতর ছিল। তাই যিনি সুন্দরের উপাসক, যিনি শুধু রূপে নয়, আমাদের ভালোবাসায়ও ভুলিয়েছেন, তাঁর জীবনে যদি সুন্দরের প্রতীক কোন নারী বারম্বার বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে হৃদয় দুয়ার খুলেই থাকেন এবং সে কথা যদি কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই অন্যায় বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো মহাকবি গ্যটের প্রণয়িনীদের নিয়ে লিখেছেন, নিজেই তাঁর যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলির কথা হঠাৎ হঠাৎ আমাদের শুনিয়েছেন।

তবু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। সাধারণ মানবিক প্রেমও তাঁর জীবনে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। সাধারণ নিয়মে তাঁকে বিচার করতে গেলে তাই ভুল বোঝার আশংকা বেশি। তাঁর প্রেমের জন্ম মনে, মনেই তার বিনাশ। তিনি বলেন, 'চাইনা তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে, আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও, নয় খাঁচাটার থেকে।'

তাছাড়া প্রেমের শিয়রে মিলনসুখের বক্ষোমাঝে নিত্যভয় তিনি জাগিয়ে রেখেছেন। তিনি যখন বলেন, 'কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখী পূর্ণিমাতে', তখন শুধু একটি মাত্র বিশেষ নারী নয়, বিশ্বের সব সুন্দরীর রমণীয়তা তাঁর যৌবননিকুঞ্জে পাখি হয়ে গেয়ে ওঠে, তাঁর বাসনা ত্রিভুবনে বাজতে থাকে এবং স্বপ্নসঙ্গিনীরা তিলোত্তমা হয়ে তৎক্ষণাৎ অখিলমানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণীর রূপ নেয়। তাঁর মুখে যখন শুনি, 'চপলতা আজি যদি কিছু ঘটে, করিয়ো ক্ষমা', তখন বিশেষ কোন নিরুপমার কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা বা রূপতরঙ্গিমা নয়, যুগে যুগে চাওয়া চিরকালের এক প্রেয়সী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান। যখন তিনি গান বাঁধেন, 'সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে', তখন শুধু একজোড়া চোখ নয়, বহুলোচন ত্রিলোচন হয়ে যায়। কেননা বিশেষকে নির্বিশেষ এবং নির্বিশেষকে বিশেষ করার জাদু জানতেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য বলেছেন, কবে কোন্ গান কাকে তিনি দান করেছেন, আমরা যেন তাঁকে না শুধাই। কিন্তু না শুধালেও সব বরবাদের পর উঁকি মারে কয়েকটি মুখ। তাঁদের আমরা হয়ত চিনি হয়ত চিনিনে, তাঁদের বাস কোথায়—দেশে কি বিদেশে—তাও ঠিক ঠিক জানিনে; কিন্তু বিভিন্ন চিঠিপত্র ও রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য থেকে এমন কয়েকজন মহিলাকে আমরা তাঁর অন্তরঙ্গের আসনে বসাতে পারি, যাঁদের সঙ্গে কবির মনের মিল ঘটেছিল। তবে অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। রমণীর শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ উপভোগ করেছেন তিনি কবিতায়, ফেনিলোচ্ছল

যৌবন সুরাও তিনি মুখে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু যখনই খসে গিয়েছে যামিনীর স্বপ্ন যবনিকা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমকে অলৌকিক, অশরীরী করে নিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের টান যতটা রবীন্দ্রনাথের, তার চেয়ে বেশি অন্য-পক্ষের। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে নিত্যপথের পথী। স্বভাবভীরুতায় নয়, চিত্তের দৃঢ়তায় তিনি আবেগের প্রাবল্য দেখে পিছিয়ে এসেছেন।

তারই মধ্যে যে-বিশেষ কয়েকজন নারী রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের কেউ সখীরূপে, কেউ সচিবরূপে, কেউ গৃহিণীরূপে কাছে এসেছেন। সেই ভাগ্যবতী মহিলারাই আমার এই রচনার উপকরণ। চরিত্রে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁদের একে অন্যের মিল নেই, রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও আলাদা আলাদা, কিন্তু এঁদের মিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগের আন্তরিকতায়। তথ্যে যা মেলে তার বাইরে আমি যাইনি, কোন গালগল্প বা গুজবের প্রশ্রয় দিইনি। প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল কিনা এবং ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারুদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কতটা ছিল, এই সব রটনার ধারে কাছে আমি যাইনি। আমাদের কাহিনীর শুরু রবীন্দ্রজীবনের সেই ঋতু পরিবর্তনের সময়ে, যখন 'লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল' পাঁপড়ি মেলছে প্রচন্ড আবেগে।

অসামান্যা সুন্দরী আন্না। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি দেহের গড়ন। তাছাড়া চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলে ঝকঝকে মেয়ে।—"যেমন শিক্ষিতা, তেমনি চালাকচতুর, তেমনি মিশুক। যাকে বলে চারমিং।"

আন্না বিলিতি আবহাওয়ায় মানুষ। চমৎকার ইংরেজি বলেন এবং ইংরেজি আদবকায়দায় তিনি বোম্বাই শহরের সেরা মেয়ে। তাঁর কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল, তাঁকে দেখলে পুরুষের বক্ষোমাঝে নাচে রক্তধারা।

আন্নার বাবা দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ তরখড়। বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র সমাজের শিরোমণি, প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরিবারের সবাই বিলাতফেরতা, ইংরেজিয়ানায় সুনিপুণ। সেই পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মাল ঘটনাচক্রে।

১৮৭৮ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো। কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ পড়ে মনে মনে তিনি নিজেকে নবকুমার ও নগেন্দ্র ভাবছেন। রোমান্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে একটু একটু; কিন্তু তাঁর ভয় ঘোচেনি, আড়ষ্টতা কাটেনি।

বিলেত যাবেন, তার আগে বিলিতি কায়দাকানুন রপ্ত করা দরকার। চিৎপুর পল্লীর জোড়াসাঁকো বাড়ির ছোট ছেলে বড় লাজুক, বড় ঘরকুনো। তাই মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, ছোট ভাই রবিকে ওই তরখড় পরিবারে পাঠাবেন ঘসামাজা করাতে। আর ইংরেজি ভাষার তালিমও হয়ে যাবে সেখানকার আবহাওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ মেজদাদার কর্মস্থল আমেদাবাদ থেকে সোজা চলে এলেন বোম্বাই, ওই তরখড়-পরিবারের অতিথি হয়ে। সুঠাম সুদর্শন এই কিশোরের মুখে তখন লাবণ্য, কণ্ঠে গান, হৃদয়ে উন্মাদনা। আন্না কিশোর রবিকে দেখলেন এবং দেখে মজলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই দুজনে এলেন কাছাকাছি, তাঁদের সম্পর্ক হল নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমার সঙ্গে সে প্রায়ই যেচে মিশতে আসত। কত ছুতো করেই যে ঘুরত আমার আনাচে-কানাচে।"

কিশোর-কবির রূপমুগ্ধ আন্না বাংলাদেশের বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গুণগ্রাহী। শুধু কবিতা নয়, তাঁর রূপের প্রশংসাও রবীন্দ্রনাথ প্রথম পান ওই আন্নার কাছে। পরে তিনি নিজেই বলেছেন, "মনে পড়ছে তাঁর মুখেই

প্রথম শুনেছিলাম, আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত।"

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এই আন্নার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে রেখেছেন, তাঁকে বলেছেন 'আপনমানুষের দূতী', বলেছেন, আন্না তাঁর 'হৃদয়ে দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে গেছেন।'

"মেজদাদা মনে করলেন বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়ত ঘর-ছাড়া-মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোন গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোন একটি এখানকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলাত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা' করেননি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করার ওই ছিল আমার মূলধন। যাঁর কাছে নিজের কবিয়ানার জানান দিয়েছিলেম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন।" (ছেলেবেলা)

এই আন্না হলেন সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সারাদিনের সঙ্গী। পড়ার ঘরে, খাওয়ার টেবিলে, বাইরের বাগানে সব সময় আন্না আর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আর আন্না। দুজনে কেবল কথা আর কথা, গান আর গান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভাষ্য এইরকমঃ "একথা আমি মানব যে, আমি বেশ টের পেতাম যে ঘটবার মতন কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু হায়রে, সে হওয়াটাকে উসকে দেওয়ার দিকে আমার না ছিল তৎপরতা, না ছিল কোন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।"

আন্না রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে একটু বড়, একটু বেশি ··· লভ, তাই কলকাতার কবির আড়ষ্টতার তুষার গলানোর দায়িত্ব নেন তিনি নিজেই। ইংরেজিয়ানায় তালিম কতটা হল সে খবর ঠিক জানি না, কিন্তু আন্না রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলাভাষা শেখেন, বাংলা গান শেখেন, এবং বাংলা কবিতা পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যখন কচি গলায় গান ধরেন, তখন আন্না মুগ্ধবিস্ময়ে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হন। একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেই ফেলেন—"কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"

একটি সন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথ একা ঘরে আছেন। টেবিলের উপর ঝুঁকে 'কবি-কাহিনী'র কবিতা সংশোধন করছেন। একটু পরেই আন্নাকে শোনাতে হবে। এমন সময় চুপি চুপি ঘরে এলেন আন্না। পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে কবির চোখ জড়িয়ে ধরেন, বলেন, 'বলোতো কে ?" চাঁপাকলি আঙুলের উষ্ণ স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, কার এই চাতুরি। আন্না খিলখিল

হেসে ওঠেন, তারপর বলেন, 'আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে তোমার কবিতা শুনবো।' যে-কবিতা বারবার শুনিয়েছেন, যা শুনে মুগ্ধ শ্রোতার আশ মেটেনি, সেই কবিতাই আবার পড়তে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ সুরেলা কণ্ঠস্বরে আন্না জগৎ সংসার ভুলে যান।

আন্নার সঙ্গে জীবনের মধুর দিনগুলি কাটিয়ে বিলেতে পাড়ি দেবার আগে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি বই ছাপাবার ব্যবস্থা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন, ছাপার পরই প্রথম কপি যেন আন্নাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর প্রিয় বই পেয়ে আন্না লেখেন—

Thank you very much indeed for sending me the entire publication of কবিকাহিনী though I have the poem myself in the numbers of ভারতী in which it was published, and which Mr. Tagore was good enough to give me before going; and have had it read and translated to me till I know the poem almost by heart.

আন্না রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি নাম প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নাম দেন 'নলিনী'। শুধু নাম নয়, এই নলিনীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি গান লিখে ফেলেন—

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি—
ঘুম এখনো ভাঙিল নাকি!
দেখো, তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী এসেছে তোমারি রবি।

এই নাম প্রার্থনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন, 'দিলেম জুগিয়ে। সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতায় ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভৈরবীর সুরে।"

আন্নার সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথও জেগে ওঠেন, সেই বয়সের কাব্যিক অপরিপক্বতা সত্ত্বেও আন্নাকে নিয়ে কবিতার পর কবিতা লিখে যান। কুণ্ঠায় যেকথা তিনি মুখে বলতে পারেন না, তাই প্রকাশ করেন কবিতায়—

শিথিল বসন তার
ওই দেখ চারিধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে,
যেথা যে গঠন আছে
পূর্ণভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচুনীচু প্রকৃতির বিধানে।

ও আমার নলিনী গো—সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস
তাই প্রকৃতির বাস
সেই বাস তোর দেহে নলিনী গো নলিনী।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আন্না তখন মূর্তিমতী অপ্সরী, মানসসুন্দরী। তাঁর সম্পর্কে আরও লেখেন—'অনেকের আঁখি পরে, সৌন্দর্য বিরাজ করে, তোর আঁখি পরে প্রেম, নলিনী গো নলিনী'।

এই 'নলিনী' নামটি কবির বড় প্রিয়। কবিকাহিনীর নায়িকা নলিনী, ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা নলিনী, নলিনী নামে আলাদা নাটক আছে এবং পরে সহধর্মিণী ভবতারিণীর নতুন নামকরণ যখন করেন মৃণালিনী, তখন সমার্থক নলিনী নামটিও মনে থাকে।

আন্নার সঙ্গ ছাড়ার অব্যবহিত পরে লেখা ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা নলিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—এক চপলস্বভাবা কুমারী। ইনি আন্না ছাড়া আর কেউ নন এবং তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবেন?—

চারিদিকে তীক্ষ্নধার, বাণ ছুটিতেছে তার
কার পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে।
তার চেয়ে নলিনীর আঁখি পানে চাহিতে
কত ভাল লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে।

আন্নার চোখে চোখ রেখে, আঙুলে আঙুল রেখে নিজেকে উজাড় করার ব্যাকুলতা তখন রবীন্দ্রনাথের মনে, কিন্তু হায় ভীরু প্রেম হায়রে, জয় করেও তার ভয় যায় না। তবে আন্নার হৃদয়ের গোপন কথাটি আর গোপন নেই, তিনি রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়মন সমর্পণ করে বসে আছেন।

একদিন দুজনে বসে আছেন ঘরে। একজন মুগ্ধ শ্রোতা, অন্যজন উদ্দীপ্ত গায়ক। গানভঙ্গের পর আন্না হঠাৎ বলে ওঠেন,—'রবি, তুমি কোনদিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন ঢাকা না পড়ে।' এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেন, সেই অনুরোধ তিনি রাখতে পারেননি, তবে—"আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।"

আর একদিন। চাঁদনি রাত। চারিদিকে অপরূপ আলো-হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঘরে বসে বাড়ির কথা ভাবছেন। আত্মীয়-স্বজনের জন্য মন খারাপ। এমন সময় আন্নার আবির্ভাব। মুখে হাসি চোখে ছল। এসেই বলেন, "আহা, কী এতো ভাবো আকাশ-পাতাল?"

আন্নার ধরন-ধারনে রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত। কিন্তু বাক্যস্ফূর্তির আগেই আন্না বসে পড়লেন তাঁর বিছানায়। তারপর রবীন্দ্রনাথের দিকে নিজেকে প্রসারিত করে বললেন, 'আমার হাত ধরে টানো তো। টাগ অব ওয়ারে দেখি

কে জেতে।' এই শক্তি পরীক্ষায় রাজী হতে না হতেই আন্না শ্লথভাবে হার মেনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথের বুকে। বারবার আন্নার হার, বারবার আন্নার কবিবক্ষে বক্ষ সমর্পণ। রবীন্দ্রনাথ এবার বুঝতে পারেন, সব খেলা থাকতে কেন এই টাগ অব ওয়ার।

আর একদিন। আর এক পূর্ণিমা সন্ধ্যা। আন্না ধীর পায়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের ঘরে। মুখে হাসি চোখে কৌতুক। সেদিন আকাশে মাদকতা, বাতাসে মাদকতা। রবীন্দ্রনাথও আন্নার সান্নিধ্যে পুলকিত। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই আন্নার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টি দিয়ে যেন বলতে চান, তোমার কানে কানে অনেক কথা বলেছি, সে কি তোমার মনে থাকবে। আন্নাও যেন নীরব নয়নের ভাষা দিয়ে বলতে চান, কত নিশীথ অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে তুমিও আমায় অনেক কথা বলেছিলে, সেকি তোমার মনে থাকবে? বন্ধু, আমি যে এই কথাটি শুধোতেই তোমার কাছে এসেছি।

রবীন্দ্রনাথের আড়ষ্টতা ভাঙাতে আন্না আবার প্রগল্ভ হয়ে ওঠেন। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে একটি বিলাতি উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়ে বলেন, "জানো রবি, ঘুমে অচেতন কোন কুমারীর ঘুম না ভাঙিয়ে যদি কেউ তার হাতের দস্তানা চুরি করে নিতে পারে, তাহলে তাকে চুম্বন করার অধিকার সেই পুরুষের জন্মায়।"

আন্নার কথায় রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হন এবং পর মুহূর্তেই আন্না যখন হঠাৎ একজোড়া দস্তানা বের করে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে রবীন্দ্রনাথের কাছেই শুয়ে পড়েন, তখন তিনি মনে মনে প্রমাদ গোনেন।

তারপরেই প্রত্যাশিত নাটক। আন্না দু'হাতে দস্তানা পরে ঘুমের ভাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, এ কপট নিদ্রা। মন চঞ্চল, হৃদয় উদ্বেল।—দস্তানা খুলে নেবেন কি নেবেন না, ভাবতে ভাবতেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ভয় লজ্জা এবং কুণ্ঠা তাঁকে গ্রাস করে ফেলে। নির্বাক কবি স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন।

আর আন্না? কপট নিদ্রার খোলস ফেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি দাঁড়ান, আহ্বানে নিঃসাড় কিশোর কবির দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টি ফেলে ধিক্কার দেন কবিকে, নিজেকে। তাঁর শরসন্ধান ব্যর্থ। তাঁর অভিসার বৃথা।

প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়ে আন্না ক্লান্ত চরণে দুয়ারের দিকে এগিয়ে যান, আর যেন শূন্যে সমুদ্রের পারে একা দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথের বুক তোলপাড় করে একের পর এক ঢেউ। পুঞ্জীভূত বিফলতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তিনি বাকি রাত ছটফট করেন। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে শান্ত সংযত করে আত্মস্থ হন। তারপর বিদায় নেবার দিন প্রসন্ন প্রভাতে প্রিয়-

বান্ধবীর বিষণ্ণ মুখখানি তুলে ধরে মনে মনে বলেন—"মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা সকল বোঝা, ভোরবেলাকার একলা পথে চলব সোজা, তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি।"

আন্নার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরে আর দেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বিলেত গেলেন, ফিরে এলেন, বিয়ে করলেন, বিশ্ববিখ্যাত হলেন। আন্না তার কিছুই দেখে যেতে পারেননি। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের পরের বছরই হ্যারল্ড লিটলডেল নামে এক স্কচ অধ্যাপকের সঙ্গে আন্নার বিয়ে হয়। বরোদাতে কিছুদিন থেকে স্বামীস্ত্রী দুজনেই এডিনবরা চলে যান। দুই কন্যার জন্ম দিয়ে আন্না মারা যান অকালে। সেকালে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে।

রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও কিন্তু আন্নাকে ভুলে যাননি। দিলীপকুমার রায়কে কথাচ্ছলে বলেছিলেন—"সে মেয়েটিকে ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কোন লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনদিন। আমার জীবনে তারপর নানান অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করে যে, কোন মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনও ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি—তা সে ভালোবাসা যে রকমই হোক না কেন।"

সজনীকান্ত দাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা আন্নার সেই চিঠিখানা খুঁজে পান পুরানো বইয়ের পাতায় অভাবিত ভাবে। যাচাই করার জন্য তিনি চিঠিটি নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ হাতের লেখা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারেন এবং বলেন, "তোমরা রবীন্দ্রজাদুঘর যদি করতে চাও তো এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।"

আন্নার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে 'ছেলেবেলা' বইয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—"জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে এক দিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিন রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"

দিলীপকুমার রায়কে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'প্রতি মেয়ের ভালোবাসা, তা সে যে রকমের ভালোবাসাই হোক না কেন—আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়। সে ফুল হয়ত পরে ঝরে যায়, কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"

এই আন্নাই সর্বপ্রথম তাঁর ভালোবাসার ফুল দিয়ে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রান্তে রঙিন কাজের পাড় বসিয়ে দিয়ে যান। পাড়ের রঙ অনেক দিন পরেও মলিন হয়নি, পাড়ের কাজ অনেক ঘসামাজার পরও অস্পষ্ট হয়নি।

আন্নার কাছ থেকে বিদায়, তারপরেই বিলাত প্রবাস। সম্পূর্ণ নতুন জীবন। বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম লণ্ডন গেলেন, তখন ভগ্নহৃদয় কাব্যের কবিতাগুলি মাথায় ঘুরছে। আর "ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে-যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুত-মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।" (জীবনস্মৃতি)।

আদিম অরণ্যের ছায়ায় ঘুরে বেড়ানো সেই অদ্ভুতমূর্তির আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মিশলেন ইংল্যাণ্ডের কেতাদুরন্ত সমাজে। পড়াশোনার চেয়ে বেশি চলল নাচ গান পার্টি পিকনিক। দুঃসহ সেই আঠারো বছর বয়স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কখনও লণ্ডন, কখনও ব্রাইটন, কখন টার্কি। একের পর এক ইংরেজ তরুণীর বাহুলগ্ন হয়ে যোগ দিতে লাগলেন নাচের আসরে। বিলাতী গান গেয়েও তিনি মাতালেন বহু গুণমুগ্ধা রূপবতীকে। নাচগানের সঙ্গে তাঁর রয়েছে আকৃষ্ট করার মতো প্রচুর রূপ এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যয় করার মতো প্রচুর অর্থ। হাজার হোক প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি তো। বোম্বাই শহরে আন্নার কাছে যিনি ছিলেন লাজুক কিশোর, লণ্ডনে এসে, তাই দেখতে পাই, তিনিই হয়ে গেলেন প্রগলভ যুবক। তিনি নিজেই বলেছেন, তখন "অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে পাগলের মতো" ঘুরে বেড়াতে ভাল না লাগলেও "যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না।"

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বুঝেছেন লণ্ডনের "বিবিরা দর্জি শ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাশান রাজ্যের বিধাতা ও যুবকদলের খেলনাস্বরূপ। যখনি কারও সখের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হল দুই একটি মিস-এর সঙ্গে হয়ত তিনি সেনটিমেনটাল অভিনয় করে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত।" তবে তিনি নিজে লেডিজাতকে বড় ডরান, কারণ তাঁদের সংস্পর্শে "মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা।"

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে তিনি আরও লিখছেন, "কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল—সে দেখতে বেশ জমকালো। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চারদিকে ব্যানড্ বাজছে—৬।৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিলধারয়েৎ—চাঁদের হাট তো তাকেই বলে—যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন। যেদিকে চোখ ফেরাই চোখ ঝলসে যায়।… সকলের মুখে হাসি, মন অধিকার করবার যত প্রকার গোলাগুলি আছে বিবিরা তা' অকাতরে নির্দয়ভাবে বর্ষণ করছেন।"

এই রকম নাচের আসরে রবীন্দ্রনাথ বহু সুন্দরীর মন আকর্ষণ করেন। —"এখানে ঘর যত পিছল হয়, ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, পা কোন বাধা পায় না আর আপনাআপনি পিছলে আসে। ঘরের চারিদিকে আশেপাশে যেসকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দুই একটি কৌচ চৌকি রেখে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে দুই একটি যুবকযুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন।"

এইরকম কোন প্রণয়ীকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ মধুরালাপে মগ্ন থাকতেন কিনা জানি না, তবে বাছাই করা সুন্দরীদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।—"মিস অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাকে বেশ দেখতে, তার সঙ্গে আমি 'গ্যালপ' নেচেছিলেম, তাই জন্যে তাতে আমার কিছু ভুল হয়নি। কিন্তু মিস অমুকের সঙ্গে আমি ল্যানসার্স নেচেছিলেম, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখতে—তাঁর চোখ দুটো বের করা, তাঁর গালদুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোট, সবচেয়ে তাঁর স্বভাব খিটখিটে—তাঁর সঙ্গে নাচতে গিয়ে যতপ্রকার দোষ হওয়া সম্ভব, তা' ঘটেছিল। যেমন তাস খেলবার সময় খারাপ পার্টনার পেলে তার পরে তার দলের লোক ভারী চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ পার্টনার পেলে মেয়েরা ভারী চটে যায়। তিনি বোধহয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, তিনিও নিস্তার পেলেন। আমি একবার একটি সুন্দরী পার্টনার পেয়েছিলাম।"

তারই মধ্যে একটু আধটু ফ্লার্ট করাও রবীন্দ্রনাথের চলছে।—"ফ্লার্ট করা কী জানো? ভালোবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জানছেন যে কেউ ভালো-বাসছেন না, অথচ মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান চলছে। অভিনেত্রী হয়ত অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান করলেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় করলো একটা হয়তো রসিকতার কথা বললেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষারহস্তে ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করে আদরমাখা রাগের অভিনয় করে বললেনঃ ওহ্ ইউ নটি উইকেড প্রভোকিংম্যান। নটিম্যান অত্যন্ত তৃপ্তিসূচক হাস্য করলেন। এই রকম হাসিতামাশা ও মিষ্টিকথার ক্ষণস্থায়ী

গোলাগুলি-বর্ষণের নাম ফ্লার্ট করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়।”

ফ্লার্ট করা তো বোঝা গেল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি সত্যি কোন মেমসাহেবের প্রেমে পড়েছেন! 'মিস এন' নাম্নী এক সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর মেলামেশা আর "ভারীপরিপক্ক আলাপ" দেখে একটা ফুসফাস উঠল।—“ম— সন্দেহ করলেন যে মিস এন-এর নেত্র রূপ ও বাক্যবাণ বর্ষণের মধ্যে পড়ে আমার বুকটা দু' তিন টুকরো হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম মাথা নেই তার মাথাব্যাথা। আমি একটা হৃদয়হীন শীতলশোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙেও না, চুরেও না। অমন একটা বিষম নটখটে পদার্থের আমি কোন সম্পর্কই রাখিনে। তিনি তো বিশ্বাসই করলেন না। তিনি বললেন, কোর্টশিপ চালাও। আমার মতো চুপচাপ লাজুক মানুষ কি কোর্টশিপ চালাবার উপযুক্ত নাবিক? আমি কি মশায়, তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে পারি? ডিনার টেবিলে আমার দিকে একটা লবণ-দানি সরিয়ে দিলে এমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢলঢল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্যরসে মুখখানা টসটসে করে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম? বায়রন থেকে বেছে বেছে এমন কবিতা পড়ে শোনানো যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়, পড়তে পড়তে বিশেষ একটা লাইনে থেমে অতিশয় করুণারসের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা, সে সব কি আমার পোষায়?”

কোর্টশিপ পুরোপুরি না হোক, কিন্তু এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এতটা কে জানতে পারে? সে কি পরবর্তীকালে মিস মুল-এর সঙ্গলাভের ফল? মিস্ মুল তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন, তাতে ভুল নেই। 'মিস্টার টি' অর্থাৎ টেগোর ছাড়া তিনি কারও সঙ্গে নাচতে চান না, কারও সঙ্গে বেড়াতে চান না। মিস্টার টি দেরি করে বাড়ি ফিরলে তিনি অভিমান করেন, গভীর রাত অবধি মুগ্ধবিস্ময়ে ওই বাঙালী কবিটির কণ্ঠে ইংরেজি গান শোনেন।—“মিঃ টি, কেন তুমি সমস্ত দিন বাইরে কাটালে, ঘরে থাকলে আমরা বেশ গানবাজনা নিয়ে থাকতে পারতুম।”—মিস মুল-এর গলায় উচ্ছ্বাস।

মিস মুল-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবশ্য তেমন আকর্ষণ নেই, কিন্তু মেয়েটি প্রেমে মাতোয়ারা। রবীন্দ্রনাথ যত রাতেই বাড়ি ফিরুন না কেন, তিনি জেগে বসে থাকেন। "রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি তখনও মিস মুল জেগে। তার সঙ্গে একটু-আধটু গল্প হল। কথায় কথায় উঠল তার বোন নেই। সে বললে, 'আই এম গ্ল্যাড অব ইট। আই হেট হেভিং সিসটার্স। ব্রাদার্স আর এভার সো মাচ নাইসার।' এদেশে বোনে বোনে কম্পিটিশন কিনা, উভয়ের মধ্যে বোধহয় খিটিমিটি চলে।”

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এদিকে দিনরাত মেয়েটির ফ্লার্ট চলেছে। তাঁর আছে একটা কনফেশন বুক। তাতে তাঁর প্রিয় কবিদের নামের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি লিখে রাখেন। রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ বাংলা ও ইংরেজিতে লিখে নেন। স্যাভয় থিয়েটারে যখন গনডোলিয়ার্স দেখতে যান তখন দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হন। মিস মুল রবীন্দ্রনাথকে ডাকেন, Robin Adair বলে। অনেক রাত অবধি গানবাজনা কাব্যালোচনার পর রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, গুড নাইট, তখন মিস মুল আবেশমাখা গলায় স্বপ্নমাখা চোখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কানের কাছে ফিসফিস করে বলেন, 'গুড নাইট গুড নাইট বিলাভেড্।'

মিস মুল-এর কিন্তু আর একজন ভারতীয় প্রেমিক আছেন, তাঁর নাম রাজনারায়ণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতায় তিনি ঈর্ষান্বিত। কেনসিংটন গারডেনে বা কিউ গারডেনে যাবার জন্যে মিস মুল আবদার ধরলেও রবীন্দ্রনাথ আর সাড়া দেন না। কারণ "রাজনারায়ণ এমন স্পষ্ট করে তার জেলাসি প্রকাশ করে যে, আমাকে ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয়।"

তবু মিস মুল রবীন্দ্রনাথকে ছাড়েন না। রবীন্দ্রনাথ যত পিছিয়ে যান, তিনি তত ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘোরাঘুরি থামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবল গানের মালা গাঁথেন। তার মধ্যে মিস মুল-এর সবচেয়ে ভালো লাগে 'অলি বারবার ফিরে যায়' গানটি। মিস মুল-এর মন্তব্য—It is sweetly pretty, so pathetic with its minor tones.

একটি চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর একজন রূপমুগ্ধা গুণমুগ্ধার সঙ্গে। তাঁর নাম মিস ওসওয়ালড্। সেখানে মিস মুল রবীন্দ্রনাথের কোমর জড়িয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন একটু এবং হাসতে হাসতে বললেন, "I am quick at everything." রবীন্দ্রনাথ ছাড়বেন কেন, তিনি ফ্লার্ট করার কায়দাকানুন কিছুটা জেনে গেছেন, বললেন, "quick to forget ?"

বলেই বিপদ, রবীন্দ্রনাথ ভেবেন, মিস মুল আরও ঘনিষ্ঠ, আরও স্বপ্নিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামনে রাজনারায়ণের ঈর্ষাকাতর মলিন মুখ ভেসে ওঠে, তিনি তাই আবার পিছিয়ে যান এবং সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে সেদিনের ঘটনা। মিস মুল পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। সামনে রাজনারায়ণ। বেচারা ভাবছেন তাঁকেই বোধহয় শোনাচ্ছেন বাজনাটা। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ঠিক বুঝতে পারেন, কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই সুমধুর পিয়ানো সংগীত। তিনি ড্রয়িংরুমে গেলেন না। কিন্তু মিস মুল রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘক্ষণ না আসাতে বাজনা থামিয়ে দেন এবং রাজনারায়ণকে জিগগেস করেন, "Is Mr. Tagore out I wonder ?" রাজনারায়ণ ক্রোধে বাঁকা জবাব দেন, "No, Evidently your signal has not attracted him."

ওই সংলাপ শুনে রবীন্দ্রনাথ স্থির করে ফেললেন, মেয়েটির সঙ্গে আর নয়। বিদায় নেবার আগে একদিন নির্জন সন্ধ্যায় তিনি শেষবারের মতো মিস

মুলকে তার প্রিয় গানগুলি শোনালেন। শেষ গান—"remember me." মিস মুল ধরা গলায় বললে—"Mr. T, I shall remember you."

মিস মুলের সঙ্গে সম্পর্কের এইখানেই ইতি। কিন্তু একজনকে বিদায় দিলে কী হবে, মিস লং, মিস ভিভিয়ান প্রভৃতি আরও কত মেয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভের জন্যে আকুল। রবীন্দ্রনাথ কারও কাছে বিশেষ ধরা দেন না, তবে উপেক্ষাও করেন না।—"সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে আমার খুব ভালো লাগে, আমি দেখেছিলুম ক'দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমার স্টুপিডিটিবশতঃ আমি ধরা দিইনি। সে কাল রাত্তিরে আপনি এসে বলল, "aren't you going to sing? আমি কেবল বললুম, yes। বলে গান গাইতে গেলুম। আজ সকালে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। তার মুখে এমন একটা প্রশান্ত গম্ভীর সুমিষ্ট আরনেস্টনেস আছে,—এমন সুন্দর চোখ নাক এবং ঠোঁট—আমার ভারী ভালো লাগে। আমার বোধহয় আমাকেও তার মন্দ লাগে না।"

আর একদিন একটি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে, কিন্তু "সন্ধ্যের সময় সুন্দরীর সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্তা কয়ে এমনি শ্রান্তি ও বিরক্তি বোধ হতে লাগল যে কোন ছুতোয় পালাতে পারলে বাঁচি।"

এই ব্যাপারে দিলীপ রায়কে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি: "দুঃখের কথা বলব কি, আমার এই চেহারাটা যে নেহাৎ অচল নয় একথা আমি প্রথম টের পাই কোথায় জানো? বিলেতে।...এতই লাজুক ও মুখচোরা ছিলাম সে সময়ে যে তরুণীমহলে এরকম প্রতিষ্ঠার কানাঘুষো শুনেও ওদিকে ভিড়তে সাহস পাইনি।...আসলে আমার বয়স হয়েছিল দেরিতে।"

এমন মনের অবস্থা তাঁর কেন?—"আমি মনে মনে মেয়েদের এত ভালো-বাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারিনে।" আবার একটু পরেই বলেন, "যে মেয়েটিকে আমার ভালো লাগে তার নাম মিস্ লং।" মিস লং যতবার তাঁর সমুখ দিয়ে চলে যান, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে যান, তিনিও হাসেন। সন্ধ্যের সময় তাঁর কাছে গিয়ে তিনি বলেন,

It was unkind of you Miss long to look so aggressively well yesterday while we were all so miserable. মিস লং জবাব দেন—I was awfully sorry for you. You looked so bad.

কিন্তু এরা সবাই দুদণ্ডের সহচরী। এই দ্বিতীয়বারে সফরে তিনি যাঁকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন তাঁর নাম লুসি—লুসি স্কট।—"লণ্ডনে নেমেই আমার সবাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছে কি না। সে বললে, তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে

এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে-ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলুম সমস্ত বদল হয়ে গিয়েছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘরে এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লনডনের বাইরে কোন-এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। ভারী নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম। মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের এই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার সেই অমুক এখানে আছে তো? দ্বারী উত্তর করলে—না, সে অনেকদিন হল চলে গেছে। চলে গেছে? সে-ও চলে গেছে? আমি মনে করেছিলুম, কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময়-অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর-কেউ কারও ঠিকানা খুঁজে পাবে না। জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে বললুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী। কেমন করে প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল। একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি—আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই-যে ঘরের সম্মুখে বারান্দার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়তো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কারও মনেও পড়েনি।"

'আমার বন্ধু' 'আমার সেই অমুক' আর কেউ নন,—লুসি স্কট। প্রথমবার লনডনে এসে আন্নার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন মন নিয়ে তিনি এই স্কট-পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। বাড়িতে ডাঃ স্কট, মিসেস স্কট, চার মেয়ে, দুই ছেলে তিন দাসী আর 'টোবি' নামে একটি কুকুর নিয়ে সংসার। তারই মাঝখানে অতিথি রবীন্দ্রনাথ। ডাঃ স্কট তাঁকে ভালবাসেন, মিসেস স্কট তাঁকে স্নেহ করেন আর সেই চার কন্যার মধ্যে দু'টি তাঁর প্রেমে পড়েন। একসঙ্গে দুই বোনের প্রেমে রবীন্দ্রনাথও দিশেহারা। একজনের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেন তো, অন্যজন চটে যান, একজনকে নিভৃতে একটা গান শোনালে, অন্যজনকে অন্তত দুটি শোনাতে হয়, একজনকে নিয়ে ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি ঘরে নিভৃতালাপ করলে অন্যজনকে নিয়ে অন্তঃপুরের বাগানে বেড়াতে হয়। অনভ্যস্ত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক বোধ করেন, কিন্তু ক্রমে আকৃষ্ট হন দুই ইংরেজ ললনার রূপে।

অথচ এই পরিবারের পেয়িং গেস্ট হয়ে তাঁর যখন আসার কথা উঠল, যখন

এঁরা শুনলেন, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছেন, তখন তাঁদের ভারী ভয় হয়েছিল। না জানি কেমন হবে এই ভাবনায় তাঁদের সারারাত ঘুম হয়নি এবং যেদিন রবীন্দ্রনাথের আসার কথা, দুই বোন পালিয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়িতে। এক সপ্তাহ পর ফিরে এসে দেখেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি সুদর্শন মানুষ। ভয় গেল ঘুচে, এবং অপরিচিত অতিথির রূপে দুজনেই হলেন মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, "আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

মাথা ঘুরে গিয়েছিল অবশ্য দু বোনেরই, কিন্তু তিনি মাথাঘোরা লক্ষ্য ক'রলেন একটির—যার নাম লুসি।

এই দুজন আর রবীন্দ্রনাথ মিলে সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত মধুর করে তোলেন। পালা করে তাঁরা অনেক রাত অবধি বই পড়েন, ফুলবাগানে পরিচর্যা করেন এবং দুটি বোনই রবীন্দ্রনাথের আরও ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে হাত বাড়ান। কিন্তু আড়ষ্টভাব কাটলেও রবীন্দ্রনাথ তখনও পুরোদস্তুর সাহসী হয়ে ওঠেননি। বহু বৎসর পর বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের সেই প্রেমোপাখ্যান সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে স্কটকুমারীযুগলের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালবাসত, একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই। কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"

কিছুদিন থাকার পর স্কট-পরিবার থেকে রবীন্দ্রনাথের বিদায় নেবার সময় এল। দেশের আলোক দেশের আকাশ তাঁকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিচ্ছিল। মিসেস স্কট তাঁর দুহাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "এমন করেই যদি চলে যাবে, তবে এত অল্পদিনের জন্যে তুমি কেন এখানে এলে?"

এতো শুধু মিসেস স্কটের মনের কথা নয়, তাঁর দুই কন্যারও। রবীন্দ্রনাথ যতই বলেন, বিদায় নেবার সময় এবার হলো, প্রসন্ন মুখ তোল তোল, ততই তাঁরা রুমালে চোখ মোছেন।

দুই বোনের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি এবং কবিতায় বা গানে রবীন্দ্রনাথ এই দুই বোনকে তেমন স্মরণীয় করেও রাখেননি। শুধু 'ভারতী' পত্রিকার পাতা খুলে 'দুদিন' নামক কবিতাটি পড়লে স্কটকন্যাদের একজনের কথা পরিষ্কার ফুটে ওঠে—

> বিদেশে আসিয়া শ্রান্ত পথিক একেলা…
> একদিন দুইদিন ফুরাইল শেষে,
> আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।
> এই যে, ফিরানু মুখ, চলিনু পুরবে
> আর কি-রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে।…

সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উছলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দু'একটি সুর তার উদিবে স্মরণে,
সেদিনের কথাগুলো বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।
পাষাণ মানবমনে সহিবে সকলি !
ভুলিব যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি,
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু।

যে-কোমল প্রাণটি তিনি ভেঙে রেখে এলেন, তাঁর কথা এবং তাঁর ঈর্ষাকাতর বোনটির কথা রবীন্দ্রনাথ পরেও মনে রেখেছেন। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—"এই ডাক্তার পরিবারের কেহ-বা পরলোকে, কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।"

রবীন্দ্রনাথের মনে চিরপ্রতিষ্ঠিত ওই গৃহের দুই কন্যাকে, বিশেষ করে তার একটিকে রবীন্দ্রনাথ পরেও খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পাননি। অথচ তাঁদের প্রথম পরিচয়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, রবীন্দ্রনাথ আর লুসি—দুজনেই যখন বার্ধক্যের ভারে অবনত, সেই সুখের দিন যখন শুধু স্মৃতি, তখন আবার একটি আহ্বান এসেছিল সমুদ্রের ওপার থেকে। তবে সে কাহিনী বড় করুণ, বড় বিষাদময়।

১৯২৯ সাল। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে। কানাডায়। হঠাৎ একটা চিঠি এল শান্তিনিকেতনে। পত্রদাতা লুসি-র বার্তাবহ। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নানারকম কথার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, তিনি জানেন তাঁর পিসিমা লুসি-র সঙ্গে কবির কী রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি জানেন তাঁরা একে অপরকে কত ভালোবাসতেন। সেই অবিবাহিতা পিসিমা এখনও রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন, সেদিনের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, আজ সেই লুসি শুধু বৃদ্ধা নন, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন শায়িতা। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে আশ্রয়। কবির সঙ্গে সেদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে পিসিমাকে লুকিয়ে তিনি এই চিঠি লিখছেন। তাঁর প্রার্থনা, রবীন্দ্রনাথ পিসিমাকে যেন একটা চিঠি লেখেন এবং সম্ভব হলে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু সাবধান, ওই সাহায্য প্রার্থনার কথা পিসিমা যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারেন।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে যত্নে রাখা এই চিঠির জবাব কি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ? কানাডায় তাঁর কাছে চিঠিটি কি পাঠানো হয়েছিল, কিংবা দেশে ফেরার পর চিঠি কি তাঁকে দেখানো হয়েছিল, তিনি কি কোনপ্রকার সাহায্য করেছিলেন তাঁর বান্ধবী লুসিকে ?—না, তার কোন উত্তর নেই। সেই করুণ পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের হাতে আদৌ পড়েছিল কিনা, সে খবরও কারও জানা নেই। আর কোন দিন জানাও যাবে না।

দেশের বাইরে দেড় বছর কাটিয়ে আবার সেই জোড়াসাঁকো বাড়ি। দাদা বউদি ভাইপো ভাইঝি ভাগনে ভাগনিদের নিয়ে ভরা সংসার। গানবাজনা অভিনয়ে চারদিক জমজমাট। রবিকাকা ফিরে আসতে খুশি গগন অবন বলু অরু প্রতিভা অভি, রবিমামার জন্য খুশি সরলা সত্য ইরাবতী, রবি আসাতে খুশি বড়দাদা ন' দিদি নতুন দাদা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ফিরে এলেন অন্যরকম হয়ে। কোথায় সেই মুখচোরা ছেলেটি, এ যে কথাবার্তা গানে বাজনায় চৌকস। এমনিতেই সুন্দর চেহারা, তার উপর পড়েছে বিলাতপ্রবাসের পালিশ। চোখ আরও দীপ্তিময়, মুখ আরও লাবণ্যময়, দেহ আরও সুগঠিত।

সকলের খুশির মধ্যে সবচেয়ে খুশি যিনি হলেন তিনি অন্তঃপুরচারিণী। তিনি নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। এই অনন্যা মহিলাটির বিশেষ ভালোবাসা তাঁর কনিষ্ঠ দেবরটির প্রতি। নিঃসন্তান কাদম্বরী তাঁর সকল স্নেহ এবং ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন বাল্যে মাতৃহীন স্নেহের কাঙাল এই কবিতা-পাগল ছেলেকে। তিনি নিজে কাব্যামোদী, সুন্দরের উপাসিকা, সেই বাল্যকাল থেকে পরম মমতা দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কাছে টেনে রেখেছেন। বিরাট সংসারের ভিড়ে থেকেও নিঃসঙ্গ কাদম্বরীর ওই দীর্ঘ দেড় বছর কেটেছে প্রিয় দেবরের জন্য প্রতীক্ষায়। সেই সময়—"তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা-সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিলেন সেখানে তাঁহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম।"

আর রবীন্দ্রনাথ? তাঁরও সুখের অন্ত নেই। বিলাতে ওই মুল-লুসি-লং-ভিভিয়ানের মধ্যেও সবচেয়েও বেশি যাকে মনে পড়ত, তিনি এই নতুন বৌঠান। এই মমতাময়ী বৌঠাকুরাণী ধ্রুবতারার মতো তাঁর সারা জীবনে অবিচল রয়েছেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে কাদম্বরী দেবী যখন বালিকাবধূ হয়ে এই বিরাট সংসারে এলেন, তখন বালক রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত। তখন থেকেই একে অন্যের খেলার সাথী, গল্পের সঙ্গী, সাহিত্যচর্চার দোসর। নিরুদ্ধ নারীহৃদয়ের সকল প্রেম প্রীতি আকাঙ্ক্ষা যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, তেমনি নতুন বৌঠান ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের

কলরব। গত চোদ্দবছর তাঁদের সখ্যে কোথাও খাদ নেই, দুজনে মিলে গড়ে উঠেছে যে নিষ্কলুষ শিল্পীসত্তা, তা এই সাময়িক বিচ্ছেদের পর আরও অন্তরঙ্গ, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন তাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। কাদম্বরী দেবীও ফিরে পেলেন তাঁর আনন্দের চাবিকাঠি। তখন একজনের বয়স উনিশ, অন্যজনের একুশ।

কাদম্বরী দেবী প্রচলিত অর্থে রবি-অনুরাগিণী নন। কিন্তু অনুরাগ তো শুধু কামের আজ্ঞাবাহী নয়। যথার্থ অনুরাগ আসে সুন্দরের শুভ্রতা নিয়ে, অমলিন মাধুর্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন লালন করেছেন নতুন বৌঠানের স্মৃতি। বৃদ্ধ বয়সেও এলাহাবাদে হঠাৎ দেখা তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, নয়নসমুখে না থাকলে কী হবে, নয়নের মাঝখানে তুমি ঠাঁই নিয়েছ। প্রকৃত অনুরাগ না হলে আকর্ষণ এত দীর্ঘস্থায়ী, এত দৃঢ়মূল হত না। এই সম্পর্ক শুধু ফ্রয়েডীয় জৈব ব্যাখ্যা দিয়ে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভগ্নহৃদয় কাব্য সমাপ্ত করে এনেছেন। তাঁর গানের গলা হয়েছে আরও সুমিষ্ট, কবিতা লেখায় কলম অবিশ্রান্ত এবং পুস্তকে বর্জিত জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী তাঁর মনের অবস্থা এইরকম—'যৌবনের আরম্ভ সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেন। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপনমনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব—এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।'

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে ঘরে সবচেয়ে আপন নতুন বৌঠান, বাইরে জ্যোতিদাদা। জ্যোতিদাদা স্কচ-ভুপালিতে পিয়ানো বাজান, রবীন্দ্রনাথ গান লেখেন। নতুন বৌঠান বিহারীলালের কাব্য পড়েন, শোনেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিদাদা নাটক লেখেন মানময়ী, উর্বশী সাজেন নতুন বৌঠান, মদন রবীন্দ্রনাথ। নতুন গান নতুন কবিতার একধারে সমালোচক ও পাঠক কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথের গুণ ছিল, ভালো পড়ে শোনাতে পারতেন। আপন মনে পড়ার চেয়ে তাঁর পড়া শুনতে বউঠাকরুণ ভালবাসতেন। তখন বিজলি পাখা ছিল না, বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বউঠাকরুণের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ তিনি আদায় করে নিতেন। তাছাড়া—'দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলার কাছারিতে। বউঠাকরুণ ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকত তার সঙ্গে আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাঁপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদী খুনচেতে করে জলখাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।"

তারপর তাঁর অখণ্ড অবসর। এই অবসরে সঙ্গী কনিষ্ঠ দেবর রবীন্দ্রনাথ। তেতলার সেই ঘরটি হাস্যে পরিহাসে কাব্যালোচনায় মশগুল হয়ে থাকত। সাহিত্যে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। বাংলা বই তিনি সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করতেন। কখনও পড়া হত স্বপ্নপ্রয়াণ, কখনও সারদামঙ্গল। তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের কবিতা পাঠ। বউঠাকরুণকে খুশি করার জন্যে কবিতায় থাকত তাঁর প্রিয় কবি বিহারীলালের অনুকরণ। কিন্তু সাহিত্যের এই সঙ্গিনীটি বড় কঠিন সমঝদার। কারণ অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাকে দমন করা দুরূহ হবে ভেবে তিনি কেবল কবিতা সম্বন্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের কণ্ঠ সম্বন্ধে কোন মতে প্রশংসা করতে চাইতেন না।…"বউঠাকরুণের ব্যবহার ছিল উলটো। কোন কালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোটা দিয়ে বলতেন কোনকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মনমরা হয়ে ভাবতুম তার চেয়ে অনেক নিচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তাহলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধ সাধত।"

এই সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের কাজে লেগেছে। বউঠাকরুণের মন জয় করার জন্যে আরও আরও ভালো রচনা নিয়ে হাজির হয়েছেন এবং পাঠিকার মুখের হাসি দেখে মনে করেছেন, এই মুহূর্তে তাঁর বিশ্ববিজয় সমাপ্ত।

তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল।—"দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটিতে ছাঁচি পান। বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে ছড়ি, আমি চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।"

এই স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-ই চলে গেলেন অন্য কাজে, তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নিজ্বালা ছাদের উপর নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতেন শুধু তাঁরা দুজন। ছাদে বউঠাকরুণের হাতেগড়া ফুলের বাগান—চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা। জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে ফুলের মিষ্ট গন্ধে গোটা জোড়াসাঁকো বাড়িকে সেই মুহূর্তে মনে হত কোন এক মায়াবী প্রাসাদ এবং সেই প্রাসাদের অধিবাসী আর কেউ নয়; সারাক্ষণ কাছে কাছে থাকা দুটি ঘনিষ্ঠ হৃদয়।

মায়াবী প্রাসাদের এই সেই ছাদ, যেখানে সেই অল্প বয়স থেকেই এই দুজনের মনের মিল। এইখানেই দুজনের সব মান অভিমান, হাসি আহ্লাদ। —"একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, শ্যামলা

হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার মানুষ। হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক কালের বাঁধের তলা খইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল।—বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বউঠাকরুণের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হলো পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাত পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউঠাকরুণ রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইসকুল থেকে ফিরে এলেই ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয় বাড়িতে যেতেন ঘরের সামনে তাঁর চটি জুতো জোড়া দেখতে পেতাম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোন দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার? তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো। এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনখানে? কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড় ছোট সবাই ছিল ছেলেমানুষ।"

ইতিমধ্যে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছে। উৎসর্গ কাদম্বরী দেবীকে। উৎসর্গপত্রে পরিষ্কার লিখলেন, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" আরও লিখলেন "চরণে দিনুগো আনি, এ ভগ্নহৃদয় খানি। চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত-ধারা।" কিন্তু হঠাৎ এই মধুময় জীবনের মাঝখানে ছেদ পড়ল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী—মুগ্ধ কবির সকল কাব্য-প্রলাপের প্রথম শ্রোতা—হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেলেন বেড়াতে। রবীন্দ্রনাথ পড়ে রইলেন একা। সেই ছাদ, সেই তেতলার ঘর, সেই জ্যোৎস্না রাত্রি, সেই ফুলের গন্ধ—সবই আছে, নেই শুধু সকল সুখের খনি নতুন বৌঠান। এই মহিলাটির কাছ থেকে স্নেহ পাওয়াটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন স্নেহ করবে কে, আবদার মেটাবে কে?

রুদ্ধ আবেগ মেটাতে তাই তেতলার শূন্য ছাদের ঘরে বসে চলল কবিতার পর কবিতা রচনা, হল সন্ধ্যাসঙ্গীতের সূচনা। বিহারীলালের প্রভাব ছিন্ন হয়ে শুরু হল নতুন চেতনার নতুনতর বিকাশ। এবং তারই মধ্যে একটি কবিতায় (পরিত্যক্ত) কাদম্বরী দেবীর অনুপস্থিতির তীব্র বেদনা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ। মনে অভিমান, কেন তাঁকে একা ফেলে চলে গেলেন নতুন বৌঠান।—

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো।"

কিছুদিন পরেই বেদনার অবসান। জ্যোতিদাদা আর বউঠাকরুণ ফিরে এলেন এবং ফেরার পর আবার ছুটি কাটাতে গেলেন চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাংলোয়। এবার সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ। গঙ্গাতীরে কাদম্বরী দেবীর সান্নিধ্যে তিনি আবার আনন্দিত। জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেনঃ "আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণবিকশিত পদ্ম-ফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম। পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে পৌঁছিতাম, তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষ দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব দিগন্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকঝিক করিতেছে।"

এই অবকাশযাপনে তিনজন এক সঙ্গে থাকলেও মুখ্যত ছিলেন দুজনই—কাদম্বরী দেবী আর রবীন্দ্রনাথ। এখানে এসে তাঁরা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করলেন, আরও ভালো করে চিনলেন এবং সেই কারণেই জীবনস্মৃতির চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় অন্যত্র, ভারতী-র এক প্রবন্ধে লিখলেন—"আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সন্ধ্যার ছায়া? একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই ভাবগুলির

মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। সেই লেখাগুলির মধ্যে এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক-একদিন খুলিয়া, তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর-সকলে পড়িবে।"

চন্দননগরের রেশ কাটতে না কাটতেই দারজিলিং। সেখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নামমাত্র আছেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘমুক্ত মহিমার নিচে কিংবা দেবদারু বনে কিংবা ঝরনার ধারে কাদম্বরী দেবী আর রবীন্দ্রনাথ। দুজনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী। চন্দননগরে সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর দারজিলিঙে প্রভাত সঙ্গীত।

দারজিলিং থেকে এবার পশ্চিম ভারতে সিন্ধুদেশযাত্রা। এবার সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল কারোয়ার। আবার অন্তহীন সুখের জীবন, অন্তহীন আনন্দের আধার বউঠাকরুণ। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপন্যাস লিখেছেন বউঠাকুরাণীর হাট। কারোয়ারে এসে লিখলেন প্রকৃতির প্রতিশোধ। তার সঙ্গে ছবি ও গান। বাইশ বছরের রবীন্দ্রনাথের দেহমনেও তখন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।—"আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এবং তাহারি মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়া-মন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক—।"

এই সময়েই লেখা 'রাহুর প্রেম'। প্রেম তো নয়, এ যেন প্রেমের অভিশাপ। নিষ্ফল প্রেমের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস ব্যর্থ করে ভালোবাসা প্রেমিকাকে অনুসরণ করছে রাহুর মতো, অভিশাপের মতো।

> তুই রে আমার বন্দী অভাগিনী
> বাঁধিয়াছি কারাগারে
> প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
> দেখি, কে খুলিতে পারে।

এই প্রেমের কবিতার বইও রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করলেন কাদম্বরী দেবীকে। উপহারে কারো নাম নেই, কিন্তু বোঝা যায়, মানুষটি কে?—"গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ মালা গাঁথিলাম। যাহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।"

শুধু ভগ্নহৃদয় আর ছবি ও গান নয়, রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক বই,—

সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি—উৎসর্গ করেছেন তার প্রিয় বউঠাকুরাণীকে। প্রকৃতির প্রতিশোধে লেখা 'তোমাকে দিলাম', এবং শৈশবসঙ্গীতে লেখা 'তোমাকেই দিলাম।' ভানুসিংহের পদাবলীও তাই। তাছাড়া 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' 'ভাই জ্যোতিদাদাকে' উৎসর্গ করলেও লক্ষ্য জ্যোতিদাদার স্ত্রী। উৎসর্গপত্রে "স্নেহভাজন রবি" লিখেছেন "ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।" ইউরোপপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা অধিক যাঁকে মনে পড়ত, তিনি সম্ভবত জ্যোতিদাদা নন, নতুন বৌঠান। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর উৎসর্গে আছে—"ভানু সিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, তুমি দেখিতে পাইলে না।" শৈশব সংগীতের উৎসর্গপত্রেও ওই একই হাহাকারের প্রতিধ্বনি: "এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।"

এই নতুন বৌঠান যখন রবীন্দ্রনাথের যৌবনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতো বিরাজ করে কিরণ বিকীরণ করছেন, আর রবীন্দ্রনাথও প্রেমের কবিতা এবং প্রেমের গানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন ওই আলোকিত পরিবেশে, সেই সময়েই প্রকৃতির প্রতিশোধ। মৃত্যুর রূপ ধরে রুদ্রচণ্ডের আবির্ভাব। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান—মুহূর্তে সব মিথ্যা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার, বিষাদ আর বিষাদ। গত সতেরো বৎসরের বন্ধন ছিন্ন। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সঙ্গী নতুন বৌঠান হঠাৎ হলেন আত্মঘাতী।

বড় মর্মান্তিক বড় সাংঘাতিক এই আকস্মিক অঘটন। কয়েক বছর আগে এই নতুন বৌঠানই আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আগেকার সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে উপলক্ষ করেই 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতা। জীবনের ধ্রুবতারা কাদম্বরী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে একেবারে উন্মাদের পারা কেন ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলেন, কেন জ্যোতির্ময় তারা-পূর্ণ বিজন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কেন ডুবাতে চেয়েছিলেন নিজের মুখের জ্যোতি, কেন সে জ্যোতি হতে চায় না, তার উত্তর না মিললেও ভারতীতে প্রকাশিত তারকার আত্মহত্যা কবিতার আত্মহননেচ্ছার করুণ কাহিনীই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এবার আর ব্যর্থতা নয়, না জানি কী নিদারুণ অভিমানে জোড়াসাঁকো বাড়ির সবচেয়ে রূপবতী সবচেয়ে গুণবতী বধূটি ভরা যৌবনে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন অপঘাত মৃত্যুতে। মৃত্যুর তারিখ ৮

বৈশাখ ১২৯১। তার মাত্র সাড়ে চার মাস আগে ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০, রবীন্দ্রনাথ বিবাহ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শোকে মুহ্যমান, দুঃখে ছিন্নভিন্ন। তিনি বুঝতে পারেন না, কেন, কেন এই অভিমানিনী নারী ইহলোকের সব সম্পর্ক নিজহাতে ছিন্ন করে দিয়ে বহু শরৎ-প্রভাতের, বহু হেমন্ত দুপুরের, বহু বর্ষা-সন্ধ্যার, বহু বসন্ত-রজনীর সহচর এই ভালোবাসার বন্ধুকে সর্বস্বান্ত করে পরলোকে পাড়ি দিলেন? কেন সংগীতে কবিতায় হাস্যপরিহাসে মুখর দিনগুলিতে টেনে দিলেন অন্ধকারের যবনিকা? কেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন হেমময় প্রেমময় দীপশিখা?

রবীন্দ্রনাথ তখন আর রবীন্দ্রনাথে নেই। অস্থির পদচারণা করেন ছাদে, প্রতিটি রাত্রি তাঁর নিদ্রাহীন এবং বুকের ভিতর কেবল হাহাকার। যে দিকে তাকান, শুধু নতুন বৌঠানের স্মৃতি আর স্মৃতি। একটি গানের কলি, একটি কবিতার লাইনও নেই, যা তিনি তাঁর এই সমব্যথী সহধর্মী প্রিয়জনের কানে গুঞ্জন করেননি। তাই বুকের জ্বালা কমাতে তাঁর ব্যথার পূজা সমাপ্ত করার আগে সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে 'পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন পরলোকগতা বউঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে'। তিনি লিখলেন:

—হে জগতের বিস্মৃত আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এ সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তপথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে, যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারোও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না। যে সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর এক দেশে আর এক নতুন কবির কবিতা শুনিতেছ?

"আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম বলিয়া ডাকে। কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না এবং সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে সাড়া দেয় না। এক একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি আর একটা নতুন নামকরণ করিতে চাই। কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত,—আমাকে কত প্রভাত কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায়, সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে কত বর্ষায় কত

শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম। সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে-আমাকে সে জানিত, সে সেই সতেরো বৎসরের খেলা-ধুলো, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলো লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না জানে না।

"আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আর সতেরো বৎসর যাইতে পারে·····কত শত দিন রাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে।······যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেক অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক।"

এই শোকাশ্রু বিসর্জন আছে জীবনস্মৃতিতেও।—"বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনে একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপর আঁকপড়া কোন-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম।"

লৌকিক সংসার রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন নিরর্থক। তাই আহারে পোশাকে কোন লক্ষ্য নেই। জীবনের প্রতি আসক্তিও তাঁর একেবারে চলে গিয়েছে। ধুতির উপর একটা মোটা চাদর পরেই বাইরে বেরিয়ে যান, খাওয়া দাওয়া খাপছাড়া এবং সুখশয্যা ছেড়ে বাইরে রাত কাটান। 'বৃষ্টিবাদল শীতেও তেতলার বাহিরের বারান্দায়।' সেই বারান্দায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতেন: "চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়ে বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম, সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা রহিল এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া!"

রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টিছাড়া মনের ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন আত্মীয়-স্বজনেরা। চুঁচুড়া থেকে পিতা দেবেন্দ্রনাথ পত্র লেখেন:—"তোমার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মধ্যে একপ্রকার কষ্ট বা বুক ধড়ফড় করে। তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্যই তোমার এই দুর্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না।"

পিতৃ-আদেশ সত্ত্বেও মন স্থির হয় না, সান্ত্বনা মেলে না। এই অশান্ত চিত্তের প্রতিধ্বনি আছে গ্রন্থে বর্জিত পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে একটি অপরিণত কবিতার খসড়ায়—

হায় কোথা যাবে
অনন্ত অজানা দেশ
নিতান্ত যে এক তুমি।
পথ কোথা পাবে?
হায় কোথা যাবে।
কঠিন বিপুল এ জগৎ
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুত্তলি তুমি,
সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে?
হায় কোথা যাবে।
মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়।
মহা সে বিজন মাঝে
হয়ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায় কোথা যাবে?

কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিতে হয়। বুকের জ্বালা না কমলেও বাহ্যিক স্তব্ধতা আসে কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি উপলব্ধি করেন, "মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর, সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ যুগান্তর।" কিন্তু স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়।

সেই সব এই সব তেমনি পাখির রব
তেমনি চলিছে হেসে জাগ্রত সংসার,
দক্ষিণ-বাতাসে মেশা ফুলের গন্ধের নেশা
দিকে দিকে ব্যাকুলতা করিছে সঞ্চার।
অবোধ অন্তরে তাই চারিদিক পানে চাই
অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠে ফুল
বুঝি সেই স্নেহসনে ফিরে এল এ জীবনে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল।

চলিয়াছি গৃহপানে খেলাধূলা অবসান, ওহে জীবনবল্লভ, দীর্ঘ জীবনপথ কত সুখতাপ, শ্যামা, কাঁচা আম, বধূ, ছবি, স্নেহস্মৃতি, দুঃসময় মৃত্যুর পরে ইত্যাদি কত গান আর কত কবিতা ওই স্মৃতিতে লেখা। শুধু গানে বা কবিতায় নয়, যখনই কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেছেন তখনই নতুন বৌঠানের কথা তিনি তুলেছেন, সেই বৃদ্ধ বয়সেও ওই নামে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। মৃত্যুর আগে দেখতে চেয়েছিলেন নতুন বৌঠানের ছবি। অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে বলেছেন, "আমার যে-পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন, শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নিচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি।"

এই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লিপিকার সতেরো বছর, প্রথম শোক, সন্ধ্যা ও প্রভাত। পুষ্পাঞ্জলিতে যা ছিল ভ্রূণাকারে. তাই স্পষ্ট হল লিপিকায়। অযাচিত প্রীতি-স্নেহ-সান্ত্বনার পুরো সতেরো বছর অভিষিক্ত ছিল যাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে, তাঁর স্মরণেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

আমি জিজ্ঞেস করলেম, আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ?

সে বললে, এই দেখো না আমার গলার হার। দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাঁপড়িও খসেনি।

আমি বললেম, আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয়নি।

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, মনে আছে? সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাও না; তুমি শোককেই চাও।

লজ্জিত হয়ে বললেম, বলেছিলেম, কিন্তু তার পরে অনেকদিন হ'য়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।

সে বললে, যে-অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেননি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।'

আমি তাঁর হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি!

সে বললে, যা ছিল শোক, তাই হয়েছে আজ শান্তি।

সেই পরমা শান্তির মধ্যে ডুবে থেকে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক বছর আগে চন্দননগরে আসেন। সেই চন্দননগর, যেখানে সেই যৌবনে, সেই সুখের দিনে নতুন বৌঠানের সঙ্গে এসেছিলেন। স্মৃতির যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ আবার কাতর।

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় সে স্মৃতি ম্লান হয়নি। অবশেষে যন্ত্রণা লাঘব হয় কবিতার ছন্দোবন্ধনে।—

মনে ছবি আসে ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি
কচি মুখখানি বয়স তখন ষোল,
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে।
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা,
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে,
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি :
ছায়াফেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে
কার কথা ভেবে বসে আছ জান না কি ;

বাইরের ওই ঝিকিমিকি ছবির পাশাপাশি আর একটি ছবি আছে। এ ছবি একেবারে ঘরের ভিতরের।

ফুলতলায় বাড়ি, তাই মেয়ের নাম ফুলি। ফুলতলা খুলনা জেলায় দক্ষিণডিহি গ্রামের একটি পাড়া। ফুলি সাধারণ ঘরের মেয়ে, তাঁর বাবা কাজ করেন এক জমিদারি সেরেস্তায়। জমিদার বাবুমশায়রা কলকাতার নামী লোক।

ফুলি গ্রাম্য পরিবেশেই মানুষ। রান্নাবান্না ঘরকন্না আর পাঁচালি ব্রতকথা নিয়েই তাঁর জীবন। এই ফুলির বয়স যখন এগারো কি বারো, দূরদেশী এক রাজপুত্রের খবর এল তাদের বাড়িতে। একেবারে যেন রূপকথার সেই গল্প। রাজপুত্র যেমন নামী তেমনি দামী, তাঁর বয়স বাইশ, রূপে অপরূপ। দেখলে চোখ জুড়ায়। যেন দেবদূত।

সেই রূপকথার রাজকুমারের সঙ্গে এল ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ। ফুলির বাবা আনন্দে আত্মহারা। একমাত্র পিরালি ছাড়া আর কোন মিল নেই দুই পরিবারে। কোথায় দক্ষিণডিহি গ্রামের গরিব ঘরের অতিসাধারণ একটি মেয়ে, যাঁর না আছে রূপ না আছে বিদ্যে, আর কোথায় কলকাতার অভিজাত পরিবারের কুলপ্রদীপ—তাঁদের নিজেদেরই বাবুমশায় !

বাবুমশায়দের আদিনিবাস ছিল এই অঞ্চলে। তাই বরাবর বিয়ের কন্যা যায় খুলনা—যশোর থেকে। এই ছোট বাবুমশায়ের জন্যেও জমিদার বাড়ির লোকজনেরা কলকাতা থেকে নৌকো করে মেয়ের খোঁজে এসেছিলেন, তাঁরাই পছন্দ করে গিয়েছেন ফুলিকে। বিয়ের তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল।

পাত্রের মা নেই, বাবা বর্তমান। ও'দের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী পাত্রীপক্ষ সদলে চলে এলেন কলকাতায়। বিয়ে হবে কন্যাহবানে। পাত্র নামকরা কবি। কবি এক অভিনব নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন বন্ধুদের

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি। অনুগত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর পাত্রী ফুলি। ভাল নাম ভবতারিণী, বিয়ের পর স্বামী যার নাম রাখেন ওঁর আর একটি ডাক নাম পদ্ম'র সঙ্গে মিলিয়ে

মৃণালিনী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, প্রিয়তমা সহধর্মিণী এই মৃণালিনী ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের জীবনে সঞ্চার করলেন নূতন আবেগ।

কবি রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা সেই সময়ে অন্য রকম।—"মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষার আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলাকার তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।"

বিবাহের অব্যবহিত পরে নতুন বৌঠানের মৃত্যু অবশ্য কবিজীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তবু তিনি নূতন সংসারে শান্তি আনার জন্যে বলেন, "যাবে যদি যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও, এইভাবে দুঃখ রেখে যাও।" কেননা তখন তাঁর 'যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' নারীকে পরিপূর্ণ-ভাবে প্রত্যক্ষ করার অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে কবিতার অক্ষরে। 'কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা' রবীন্দ্রনাথ বুঝেও বোঝেন না, স্তনের বন্দনা করে বলেন 'বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে, কুসুমিত হয়ে ওই ফুটিছে বাহিরে, সৌরভসুধায় করে পরাণ পাগল' এবং প্রেমিকার অধীর 'অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা' এঁকে দিয়ে কামনা করেন, 'ফেলোগো বসন ফেলো, ঘুচাও অঞ্চল, পরো-শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ।' এ শুধু ঐশ্বরিক অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়—'প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।' নারীদেহের রহস্যে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গ দিয়ে সব দেখতে চান, স্পর্শ করতে চান। পরিবর্তে তাঁর প্রার্থনা, 'লও লজ্জা লও বস্ত্র ; লও আবরণ এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে।' তারপর 'দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ।' কারণ

> সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়
> পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
> অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন,
> কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
> স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে—

রবীন্দ্রনাথ শোকের স্মৃতি বুকে ধরেও ধীরে ধীরে মৃণালিনী দেবীর ঘনিষ্ঠ হন। রবীন্দ্রনাথ অতি নিবিড়ভাবে মৃণালিনী দেবীকে ভালোবাসেন। অসাধারণ ব্যক্তির সাধারণ পত্নী, কিন্তু স্বামীর দিক থেকে প্রেমের কোন ঘাটতি ছিল না। গ্রাম্যবালিকাটিকে তিনি আদরে কাছে টেনে নেন।

আর মৃণালিনী দেবী? ধীরে ধীরে আড়ষ্টতা কাটল তাঁর। বিরাট বাড়ির আদবকায়দা সব শিখে নিলেন বুদ্ধির জোরে। লোরেটোতে গিয়ে পড়লেন ইংরেজি, সংস্কৃত বাংলা শিখলেন নামকরা পণ্ডিতের কাছে, আর রান্নাঘরে

তিনিই হলেন অন্নপূর্ণা। বড় বাড়ির ছোট বউ, রবীন্দ্রনাথ আদর করে ডাকেন 'ভাই ছুটি' বলে। রাগে অনুরাগে তিনিও কবিজীবন করেন অভিষিক্ত।

ছুটি-কে নিয়ে কবি গেলেন গাজিপুর। সেইখানে একান্তে নিজস্ব সংসার। রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরেই প্রথম পত্নীকে পেলেন সঙ্গিনী প্রণয়িনী-রূপে। মৃণালিনী দেবীর অভিলাষও পূর্ণ হল স্বামীকে আরও নিবিড়ভাবে নিজের মতো করে পেয়ে।

গাজিপুরের পর শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আবার ভরাট সংসার। স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেমন জমিদার, তেমনি মৃণালিনী দেবী রান্নাবান্না ঘরকন্না, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, স্বামীসেবা প্রজাদের সুখশান্তির দিকে নজর রাখা নিয়ে কুঠিবাড়ির লক্ষ্মীপ্রতিমা।

মৃণালিনী দেবীর সাজপোশাক ছিল সাধারণ, গয়না পরতেন কদাচিৎ। একবার দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন কানে, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ সামনে এসে পড়ায় লজ্জায় কানচাপা দেন দু'হাতে। সমবয়সীদের তিনি সাজতে বলতেন, কিন্তু নিজে সাজতেন না।– "বড় বড় ভাসুরপো ভাগনেরা চারদিকে ঘুরছে, আমি আবার কী সাজব"—এই ছিল তাঁর মনের কথা।

মৃণালিনী দেবীর রান্নায় হাত ছিল চমৎকার। তাছাড়া নতুন নতুন রান্না আবিষ্কারের শখ ছিল রবীন্দ্রনাথের। স্ত্রীর রন্ধন-কুশলতা এ ব্যাপারে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশি। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়ায় বসে নতুন রান্নার ফরমাশ করছেন, ফরমুলা দিচ্ছেন, এমনও দেখা গেছে অনেকবার। নূতন মশলায় নূতন প্রণালীতে রান্না করে মৃণালিনী দেবী স্বামীর শখ মেটাতেন। তিনি কিন্তু স্ত্রীকে রাগাবার জন্যে কপটগৌরবে যখন বলতেন, "দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম। তখন মৃণালিনী দেবী বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে, জিতেই আছ সব বিষয়ে।'

সিঁড়ি থেকে চেঁচিয়ে 'ছোট বউ ছোট বউ' ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে তিনি আসতেন। সবাই শুনে খুব মজা পেত। রবীন্দ্রনাথ একবার কোন কারণে খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দিলে মৃণালিনী দেবী আত্মীয়দের বলতেন, 'না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তারপর নিজেই শিখবেন। কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ উনি নন।' জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিয়ের সময় পণের টাকা নিয়ে যখন পাত্রপক্ষের সঙ্গে গণ্ডগোল চলছিল এবং রবীন্দ্রনাথ সব ব্যাপারেই তালগোল পাকাচ্ছিলেন, তখন মৃণালিনী দেবী স্বামীর বিচক্ষণতায় কটাক্ষ করে চিরন্তনী স্ত্রীর ভাষায় প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন, অতঃপর বিয়ের ব্যাপারে সব কথাবার্তা যেন তাঁর সঙ্গেই হয়।

বড় বারান্দায় পায়চারি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করছেন। রচনা যে-ই শেষ হল, অমনি চিৎকার পেড়ে স্ত্রীর বন্ধু অমলা দাশকে বলেন,

'অমলা, অমলা, শীগগীর এসে শিখে নাও, একখুনি ভুলে যাব কিন্তু।' মৃণালিনী দেবী হেসে বলতেন, 'এমন মানুষ আর কখনও দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজেই ভুলে যায়।' রবীন্দ্রনাথ তখখুনি হেসে জবাব দেন, "অসাধারণ মানুষের সবই অসাধারণ হয় ছোট বউ, চিনলে না তো!"

রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেছিলেন। স্বামীকে তিনি ঠিকই চিনেছিলেন। শিলাইদহের সংসার গুটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে চলে এলেন বীরভূমের খোলা মাঠে—শান্তিনিকেতনে, অর্থকষ্টে যখন তিনি দুর্দশাগ্রস্ত, তখন মৃণালিনী দেবী গায়ের ও বাক্সের সব গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'আমার যা আছে সব দিলাম, ইস্কুল চালাও।'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর সম্পর্কে পরে বলেছেন, "আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি, তাতে কিছুই এসে যায়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ করে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল।"

ভয়ানক অসুখ? হ্যাঁ তাই। শান্তিনিকেতনে আসার কয়েক মাস পরেই শয্যার আশ্রয় নিলেন মৃণালিনী দেবী। তারপর কলকাতা। সেখানেই মাত্র আঠাশ বছর বয়সে সব অবসান। রবীন্দ্রনাথ রাত জেগে পত্নীর শুশ্রূষা করেছেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। শেষ বারের মতো জীবন-সঙ্গিনীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান ছাদে, বারণ করে যান কেউ যেন তাঁর কাছে না যায়। সারারাত সেখানে অনন্ত আকাশের দিকে সান্ত্বনা খুঁজলেন, যেমন খুঁজেছিলেন নতুন বোঠানের মৃত্যুর পর ওই একই জায়গাতে—ওই ছাদে।

পত্নীবিয়োগের পর কবি হলেন নিরামিশাষী। অনেকদিন ভাত-রুটি সব ছেড়ে দিয়ে শুধু ভিজানো ছোলা, ভিজানো মুগ খেয়ে দিন কাটান। সেই সময়েই শান্তিনিকেতনে বাড়ির দোতলায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে ঘরে তৈরি মিষ্টি প্লেটে দিতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নেই।' বোঝা গেল স্ত্রীর হাতের তৈরি মিষ্টি হঠাৎ মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিয়েছে।

অন্তঃপুর শূন্য। নিঃসঙ্গ জীবন। সেই সঙ্গে বিরাট দায়িত্ব বিরাট কর্মভার। তবু স্ত্রীর স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ গেঁথেছেন ছোট ছোট কবিতার মালা। ছন্দোবন্ধ হাহাকারে গাঁথা 'স্মরণ' কবিতাগ্রন্থে তিনি লেখেন—

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আর বার এলে তুমি ফিরে,
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণ স্নানে।

'স্বল্প আয়ু, এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন' মৃণালিনী দেবী পেয়েছিলেন, তারই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

গেলে যদি একবার গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ বৎসরের যে সুখদুঃখ ভার,
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।

মৃণালিমী দেবী রবীন্দ্রনাথের জীবনে মিশিয়েছিলেন মৃত্যুর মাধুরী। স্নেহমুগ্ধ জীবনের দু'চারটি চিহ্নে ভরা খানকয় পুরাতন চিঠি হাতে নিয়ে তিনি তাই বলেন—

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমাসনে
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।

আরও কত স্মৃতি মৃণালিনী দেবীকে ঘিরে। বিয়ের পর যখন দ্বিতীয়-বার বিলেত গেলেন, এডেন থেকে স্ত্রীকে লিখেছিলেন: "রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড় খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে দেখি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বললুম, ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কি না।"

সাজাদপুর থেকে আর একখানা চিঠি: "আজকাল তুমি দু' বেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছ কি না আমাকে বল দেখি! এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্ছে কি না তা'ও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিব্যি আরামে নভেল পড়ছ।"

অভিমান ভরা আর একখানা চিঠি: ভাই ছুটি···আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না। এরকম করে চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমার অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়—এতে তোমাদের মনেও একটুখানি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় না। তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখতে তাহলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশঃ বিশ্বাস হয়ে আসছে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু' ছত্র চিঠি লিখতে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ, কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখলে তুমি হয়ত একটুখানি খুশি হবে এবং না লিখলে হয়ত চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান জানেন।"

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে অনুরোধ করেন, "আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোট বউ! গাড়িটা তো এখন তোমারি হাতে পড়ে গিয়েছে—রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো। কেবলি পরকে ধার দিয়ো না।" তিনি স্ত্রীর কাছে এই কথাও জানতে চান, "তোমার সন্ধ্যাবেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই। আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে?"

স্ত্রীর জীবনসূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুদিন পর আত্মস্থ হয়ে একদিন সি. আর. দাশের বোন অমলা দাসকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেখো অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোন একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি।" প্রতিমা দেবীর সঙ্গে যখন পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়, রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে মৃণালিনী দেবীর আত্মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে মৃণালিনী দেবীর অভাব ততটা অনুভব না করলেও একটি ব্যাপারে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভাই ছুটি'র কথা স্মরণ করেই তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি: "স্ত্রীর বিদায়ের পর আমার কেউ নেই, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়।"

তবে এত বেদনা নিয়েও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শোকে গণ্ডিবদ্ধ নন। মৃণালিনী দেবীর চিরবিদায়ের পর তিনি বলেই লিখতে পেরেছেন—

প্রেম এসেছিল চলে গেল সে যে খুলি দ্বার—
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার।

আরেক অতিথি? কে সেই অতিথি? 'পুরনো সেই কিশোর প্রেমের ব্যাকুলতা' আবার দেখা দিল কোন প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনায়?

তিনি অদেখা এক সুন্দরী। তাঁর ছবি কবিকল্পনায় আছে দীর্ঘকাল থেকে। ফিরে ফিরেই এসেছেন তিনি, রহস্যসিন্ধুর পারের এক বিদেশিনী। আমরা কিছু তার বুঝি না বা, কিছু পাই অনুমানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই কবে তপ্ত যৌবনে শিলাইদহে বসেই লিখেছেন, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।' চেনা হল, কিন্তু অনেক পরে জীবনের শেষ লগ্নে, ঘটনার এক আশ্চর্য আকস্মিকতায়।

১৯২৪ সাল। তাঁর বয়স তখন তেষট্টি। বার্ধক্যের ভারে অবনত, তবু দেহে আবার যেন কিসের শিহরণ—অস্থিমালা গেছে খুলে, মাধবীবল্লরী দুলে, ভালে মাখা পুষ্পরেণু চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করেন

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে-প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া,
কানে কানে তাহারই ভাষণ।

কবি মন দেয়ানেয়া তো অনেক বার করেছেন, হাজার মরণেও মরেছেন, কিন্তু এবার দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করে শেষ রাগিণীর বীন বাজান পূরবীর ছন্দে। এবং শারদ প্রাতে মাধবী রাতে হৃদিমাঝে দেখা সেই বিদেশিনীর ডাক শুনতে পান—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলাসঙ্গিনী?
কাজ ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিংকিণী।
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

যাওয়ার কথা ছিল পেরুতে, তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে। সঙ্গী সচিব লেনার্ড এলমহার্স্ট। যাওয়ার পথে আরজেনটিনার রাজধানী বুয়েনেসে এয়ারেস নেমে কবি হলেন অসুস্থ, উঠলেন হোটেলে, বাতিল করলেন পেরু যাত্রা। এবং সেই সময়ই দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হল এক অসাধারণ মহিলার সঙ্গে, যার নাম ভিকটোরিয়া ওকামপো। বয়স তাঁর তেত্রিশ, কবির চেয়ে ত্রিশ বছরের ছোট। যেমন রূপসী তেমনি বিদুষী। অভিজাত পরিবারের মেয়ে, সমাজের শিরোমণি, সর্বগুণান্বিতা অসামান্যা। ইনিই সেই 'বিদেশী ফুল', যিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসের দিন মাধুর্য সুধায়' পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন, যাঁর সম্পর্কে পরে তিনি বলেছেন—

হে বিদেশী ফুল,
যবে তোমায় বুকের কাছে ধরে
শুধালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া দুলালে মাথা,
কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাক কোন দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই
আর কোথা নাই।

ওকামপো গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পাগল। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন: (সব অনুবাদ শঙ্খ ঘোষের) "যে সব ছবি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে তুফান তোলে, সে সবই খুব সহজে অবারণীয়-ভাবে মিলিয়ে যাবে একদিন, যেমন শূন্যতায় মিলিয়ে গেছে আরো সব ছবি। কিন্তু থেকে যাবে গীতাঞ্জলি, যে-গীতাঞ্জলি এমন করে সেদিন কাঁদিয়েছিল আমায়। ঠিক জানি না রবীন্দ্রনাথ, না কি ঈশ্বর, কার কথা ভেবে উঠেছি তখন—

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি, যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

ভিকটোরিয়া,—যার নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বিজয়া, যাকে তিনি সন্ধ্যা-

বেলায় রাগিণীর নামে পূরবী কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন—অসুস্থ রবীন্দ্র-নাথকে হোটেল থেকে নিয়ে এলেন শহর থেকে খানিক দূরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাগানবাড়িতে—পাহাড়ঘেরা সান ইসিদ্রো-র মাঝখানে। বাড়ির নাম মিরালরিও। স্পেনীশ শব্দ মিরালরিও'র মানে 'নদীশোভনা।' চারদিকে ফুল আর ফুল। তিনতলার বারান্দা থেকে দেখা যায় জাকারান্ডা গোলাপ, টিউলিপ। আর উইলো গাছের সারি। পাশেই একটা নদী। নদীর নাম প্লাতো। ওকাম্পো নিলেন রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যার ভার। দোতলায় থাকেন কবি, একতলায় তিনি আর অন্যান্য পরিচারকেরা। কবি সান্নিধ্যে রোমাঞ্চিত ওকাম্পো মনে মনে বলেন,

আমার বসন্ত গান
তোমার বসন্ত গানে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব
ভ্রমরগুঞ্জনে নব
পল্লব মর্মরে।

অনেকদিন আগে ওকাম্পো লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পড়ার আনন্দ'। পরে লিখেছেন বই 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'। সেখানে কবিদর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন অসাধারণ ভঙ্গীতে। তিনি লিখেছেন: "সান ইসিদ্রোর ১৯২৪ সালের সেই বসন্ত ছিল রৌদ্রবিভাময়। গোলাপে গোলাপে ছেয়ে আছে দেশ। জানালাখোলা ঘরে আমার সময় কাটছে রবীন্দ্রনাথ পড়ে, তাঁর কথা ভেবে, তাঁকে চিঠি লিখে, যদিও সে চিঠি কখনই ডাকে দেওয়া হবে না।"

ঠিক একই রকমের কথা বলেছেন কবির আর একজন গুণগ্রাহী বিদেশিনী। তাঁর নাম জেনোবিয়া কামপ্রুবিদে হিমেনেথ। গীতাঞ্জলির স্পেনীশ অনুবাদক, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ী হুয়ান রামন হিমেনেথের স্ত্রী। মিসেস হিমেনেথও রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্যে পাগল। এই অদেখা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে তিনিও মনে মনে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। তাঁরও ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে এসে কবিদর্শন করে জীবন ধন্য করার। কিন্তু তা আর হয়নি। তাঁর একটিমাত্র চিঠি উদ্ধার করা গেছে। তিনি ১৯১৮ সালের ১৩ আগস্ট মাদ্রিদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেন, তার কিয়দংশ হচ্ছে এইরকম:—

For so long, I have been writting to you in imagination and the letters I have written are so many, that now, I actually sit down to write as a fact, I cannot quite realize that this is going to reach you, and I know that it will say nothing at all of all the things I have thought in four years."

মিসেস হিমেনেথের কথা থাক, আবার ফিরে আসি বিজয়ার স্মৃতিচারণায় ঃ 'সেই সেপটেমবরের বাগানের সুরভিতে মিশে গিয়েছিল আমার উত্তেজনা। এই সব পড়া ভাবনা প্রতীক্ষা আর লেখা—তারই থেকে প্রস্তুত হলো 'লা নাসি'ও' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটি। বস্তুত এ যেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিই চেহারা নিল প্রবন্ধে। সে সব দিনে কখনও ভাবতেও পারিনি যে, সান ইসিদ্রোর উপর একদিন আমারই অতিথি হবেন কবি! স্বপ্নের জগতের বাইরেও যে এমন সুখের ভাগ্য সম্ভব, তা কল্পনাই করা যেত না সেদিন।"

তারপরেই ওকামপোর রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ঃ "আমরা পৌঁছিলাম রবীন্দ্রনাথের ঘরে। সেখানে আমাদের একলা রেখে চলে গেলেন সেকরেটারি। ভয়ে ভয়ে আমি ভাবছি, কী লাভ এই দেখাশোনায়? একটা কথাও বলছি না। ভীরু মানুষেরা সমস্ত জীবন ভরে সবচেয়ে বেশি করে যা চায়, ভাগ্য তাকে প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এনে দিলে ভয় পেয়ে যায় তারা। আমাকেও চেপে ধরল সেই ভয়, ইচ্ছে হল পালিয়ে যাই। আমার এত আকুলতার যিনি কারণ, এই অস্বস্তিজনক প্রতীক্ষার দ্রুত অবসান ঘটালেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন তিনি,—নীরব, সুদূর, তুলনাহীন, বিনীত। ঘরে এসে তিনি দাঁড়ালেন, আবার এও সত্যি যে, ঘরে যেন তিনি নেই।...তেষট্টি বছর বয়স। প্রায় আমার বাবার বয়সী, অথচ কপালে একটিও রেখা নেই, যেন কোন দায়িত্বভারই নষ্ট করতে পারে না তাঁর সোনালী শরীরের স্নিগ্ধতা। সুগোল সমর্থ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে উছলে ওঠা ঢেউ-তোলা সাদা চুলের রাশি। শ্মশ্রুমণ্ডলে মুখের নিচের দিকটা আড়াল, আর তারই ফলে ওপরের অংশ হয়ে উঠেছে আরো দীপ্যমান। মসৃণ ত্বকের অন্তরালে তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের গড়ন এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য রচনা করেছে। তেমনি সুন্দর তাঁর কালো চোখ, নিখুঁত টানা ভারি পল্লব! শুভ্র কেশদাম আর স্নিগ্ধ শ্মশ্রু, এর বৈপরীত্যে জ্বলে উঠছে তাঁর চোখের সজীবতা। দীর্ঘ দেহ, শোভন চলন। তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুভ্র হাতের সুধীর সুষমা যেন অবাক করে দেয়। মনে হয়, যেন এদের নিজেদেরই কোন ভাষা আছে। ..আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি এই মানুষটির সত্যি আবির্ভাবের সামনে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল।"

ওকামপোর সেবায় সান ইসিদ্রোর পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ খুশি, তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। সকালের দিকে তিনি লেখেন, বাগানে বেড়ান আর ধ্যানমগ্ন তন্ময়তায় দেখেন ফুল, পাখি, নদীর স্রোত। কখনও কখনও চলে আসেন ওকামপোর বাগানে, সেখানে দুজনে প্রাণ খুলে কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবেন, 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ, ওগো খেলার সাথী?'

রূপমুগ্ধ ওকামপো একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলেন, "অল্প বয়সে বিলেতে

পড়াশোনার সময় নিশ্চয় সাংঘাতিক ছিলেন আপনি। ইংরেজ মেয়েগুলি নিশ্চয়ই পাগল হয়েছিল আপনার প্রেমে ?"

রবীন্দ্রনাথ হাসেন আর গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলেন, 'সত্যিই তো !'

রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট খাতা পড়ে থাকত টেবিলে। খাতায় লেখা হত কবিতা। বাংলা বোঝেন না বলেই ওকামপো সাহস করে ওই খাতার পাতা ওলটান রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতে। হাতের লেখা দেখেই তিনি মুগ্ধ। খাতায় অনেক কাটাকুটি আঁকিবুঁকি। তার থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক দানব বা সরীসৃপ কিংবা কোন মেয়ের মুখ। এর থেকেই শুরু হল রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি—অসাধারণ চিত্রশিল্প। ছবিরই প্রথম প্রদর্শনী যখন হল প্যারিসে, ১৯৩০ সালে—তখনই আবার ওকামপোর আবির্ভাব। ব্যুয়েনেস এয়রিস থেকে প্যারিস ছুটে গিয়ে তিনিই ব্যবস্থা করলেন গ্যালারির, তিনিই বহন করলেন যাবতীয় খরচ।

ওকামপো তাঁর স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন—"যখন ওঁর সঙ্গে একা থাকতাম, শ্রদ্ধায় ভয়ে তখন যেন ফিরে যেতাম বয়ঃসন্ধির দিনগুলিতে। আমাদের সেকেলে বয়ঃসন্ধি, হাল আমলের ঔদ্ধত্য ছিল না সেখানে।...রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ঠিক ইংরেজী শব্দ খুঁজে পাই না বলেই এই নীরবতা। তা কিন্তু নয়, ভাষার ভয় নয়, ওঁরই ভয় আমাকে চেপে ধরেছিল। সে কথা ওঁকে বলবার সাহসও ছিল না আমার। উনি কেমন করে বুঝবেন, ঝলমলে খুশি খুশি পোশাক পরা এই তরুণী—অবাধ্য রোগীর শুশ্রূষা-ভার নিয়ে যে মেতে আছে, খাবার টেবিলে সব সময়েই বসছে সঙ্গে, ফুর্তিবাজ, কখনো কখনো স্তব্ধ,—তার মজ্জায় যে মিশে আছে ওঁরই রচনা। ফিরে যাবার পর জাহাজ থেকে লিখেছিলেন একবার, "আমরা যখন এক সঙ্গে ছিলাম, পরস্পরের দিকে খোলা চোখে তাকাবার সমস্ত সুযোগ আমরা শব্দের খেলায় বা হাসির তোড়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। সে সব হাসি অস্পষ্ট করে দিত আমাদের মনের আবহ, আচ্ছন্ন করে দিত আমাদের দৃষ্টি।—বস্তুত মস্ত একটা প্রভেদ ছিল আমাদের দুজনের মনোভাবে। রবীন্দ্রনাথ কী, তা আমি জানতাম ; তাঁর লেখা পড়ে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে এ ধারণা আমার পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আমাকে জেনে নেবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর বোধ, কেবলই বোধ। সান ইসিদ্রোতে পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই একটি কবিতা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন আমার হাতে : 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।' কিন্তু আমার নীরবতা থেকে আমার ঠিক ঠিক অভিপ্রায়টি তিনি চিনতেন কি না, আজ সন্দেহ হয়। আমাদের সম্পর্কটা ছিল নিতান্ত একপেশে। তাই হবার কথা, নিয়তি-নির্বন্ধ। এ জন্য আমার দুঃখের অন্ত ছিল না। উনি কখনো জানতে পারবেন না যে, সাগরপার থেকে ভেসে আসা এই সব কবিতা পড়ে বা শুনে আমার কেবলই মনে হতো স্যাঁ-ঝন্

পার্সের ভাষায় আবার আমি ফিরেছি আপন তীরে। একটিই শুধু ইতিহাস আছে, আত্মার ইতিহাস।"

দু' মাস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ওকামপোর সান্নিধ্যে। সেই দু' মাস যেমন ওই মহীয়সী মহিলার জীবনে দৈব আশীর্বাদ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অসামান্য অভিজ্ঞতা। সান ইসিদ্রো থেকে বিদায় নেবার সময় বিষণ্ণ দুজনেই। কিন্তু বিদায়ের কালে পুনর্দর্শনের কামনা নিয়ে যাত্রার সব আয়োজন করেন ওকামপো নিজেই। নিজেই ভাড়া করেন জাহাজের দুটি বিলাস-কেবিন। একটিতে থাকা, একটিতে লেখাপড়া। তারই মধ্যে থাকবে কবির প্রিয় আরাম-কেদারাটি—যাতে তিনি বসতেন উইলো গাছের তলায়, গোলাপের বাগানে মিরালিরিওর বারান্দায়। কেবিনের দরজা দিয়ে আরামকেদারাটি না ঢোকায় ওকামপোর নির্দেশেই তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রি ডাকিয়ে কেবিনের দরজা কেটে বড় করে দেওয়া হয়।

এই আরামকেদারাটি এখনও আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে। একটি চিঠিতে ওকামপোকে পরে তিনি লেখেন ঃ "দিন-রাত্রির বেশির ভাগ সময় এই চৌকিটার উপর বসে কাটাই।" তারপর, এই চৌকির স্মৃতিতেই থেকে গেছে মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই সুন্দর কবিতাটি—

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দু' পহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুকভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণা ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।

সান ইসিদ্রোর পর প্যারিসে দ্বিতীয়বার এবং শেষবার সাক্ষাৎ দুজনে, সেই রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনীর সময়। ওকামপো স্মৃতিকথায় বলছেন, "পারীর গার দ্যু নর্ প্ল্যাটফর্মে তাঁকে আমার শেষ আলিঙ্গন।"

কিন্তু না হোক আর দেখা, দুজনে পত্রালাপ চলেছে দীর্ঘদিন। মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে ১৯৪০ সালের ১০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লেখেন ঃ

Often it comes to my mind the picture of that riverside home and the regret that in my absentminded foolishness I had failed to accept fully precious gift offered to me. যেন কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে চন্দননগরের স্মৃতির মত আরও একটি ঝিকিমিকি বেলার ছবি আঁকা।

আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সে-দিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট্ট একটা কার্ডে লিখেছে, 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।'—একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে যে কী করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সব চাইতে সেরা সুখ-সুবিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল। অজস্র টাকা আমার জন্যে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সব সময়ে তবু আশায় থাকত, আমি কী চাই ? আমার চাওয়া ও প্রাণ দিয়ে মেটাবে এমন ভাব।"

রবীন্দ্রনাথ ওকামপোকে কয়েকটি বাংলা শব্দ শিখিয়েছিলেন, ঠিক যেমন শেখাতে চেয়েছিলেন জীবনের শুরুতে সতেরো বছর বয়সে বোমবাইয়ের সেই প্রগলভা তরুণী আন্না তড়খড়কে! রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও দুজনেরই ভাষাচর্চা বেশি দূরে এগোইনি। তবে ওকামপো একটি বাংলা শব্দ লিখতে পড়তে বুঝতে শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যখন চিঠি লিখতেন, এই শব্দটি বাংলাতেই ব্যবহার করতেন এবং রবীন্দ্রনাথও তার ইংরেজী চিঠির শেষে এই শব্দটি বাংলায় লিখে দিতেন। কারণ ওই একটি শব্দই ওকামপো ভালো বোঝেন। শব্দটির নাম 'ভালোবাসা'।

ওকামপো রবীন্দ্রনাথকে একটি পশমের জোব্বা বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই পরতেন এবং চিঠিতে জানাতেন তাঁর দেহের সঙ্গে জড়ানো এই পোশাকের প্রতিটি সেলাইয়ে আছে স্মৃতির সুগন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছে ছিল আবার ওকামপোর কাছে যাওয়ার। যাওয়া হয়নি। ওকামপোর বড় ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে আসার। আসা হয়নি। কিন্তু আশি পার করেও এই বন্ধু এখনও রবীন্দ্রস্মৃতি নিয়ে জীবনের শেষ কটি দিন কাটিয়েছেন। ১৯৬১ সালে তাঁরই আগ্রহে আরজেনটিনার সরকার বের করেন রবীন্দ্রনাথের নামে ডাকটিকিট, তাঁরই চেষ্টায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় 'আদেনিদা তাগোরে', স্পেনীয় ভাষায় তিনি পরিচালনা করেন, 'ডাকঘর', তিনিই ছিলেন ওদেশের সর্বত্র রবীন্দ্র-বিষয়ক আলোচনার শিরোমণি।

স্পেনীশ ও ফরাসীতে আঠারোটি বইয়ের লেখিকা, সুর (দক্ষিণ) পত্রিকার সম্পাদিকা, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তমা, এই রবি-অনুরাগিণী মহিলাটি বাংলা-দেশের কবিকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, বয়ঃভারাক্রান্ত চিরযুবার শেষ জীবনে নতুন তাৎপর্য এনে দিয়েছিলেন।

ওকামপো নিজেও কী রকম তাঁর প্রেমে অবশ হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন, অকপটে,—"অল্পে অল্পে রবীন্দ্রনাথও বশ করে নিলেন একাধারে বন্য আর নিরীহ এই নবীন প্রাণীটিকে। রাত্রিবেলায় যে-কোন গৃহপালিতের মতো তাঁর দরজার বাইরে মেঝের টালির উপর যে শুয়ে থাকতাম না, তার একমাত্র কারণ এই যে, ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না।" ভালো না দেখাক, তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন একথা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নেই ; আন্না লুসি নতুন বৌঠান ভাই ছুটি—রবি-অনুরাগিণী

ওঁরাও কেউ নেই, স্মৃতিভারে পড়ে ছিলেন শুধু এই বিজয়া—ভিকটোরিয়া ওকামপো। সত্তরের দশকের একেবারে শেষ দিকে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছনোর জন্যে তিনি ছিলেন আকুল। একবার তিনি একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : It is may turn now to be homesick ! I am home-sick for you, since you went away, and I cant find rest.

গৃহকাতর, অশান্ত বিজয়া-র প্রতি দিন কি ছিল তাঁরই জন্য প্রতীক্ষার ? আর রবীন্দ্রনাথ ? বিজয়াকে ছেড়ে আসার বেদনা নিয়ে যে কথা লিখেছিলেন দেশে ফেরার জাহাজে বসে, সেই কথাই কি তিনি আবার উচ্চারণ করছেন জীবনমরণের সীমানা ছাড়ানো অন্য জগতের অলিন্দ থেকে ? এ অলিন্দ হয়ত সেই মিরালরিও বাড়ির মতোই স্বপ্ন দিয়ে তৈরি স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এ জগৎ হয়ত সান ইসিদ্রোর সেই পুষ্পিত স্বর্গরাজ্যের মতোই মধুগন্ধভরা এবং সেদিনের সেই হাতে হাত দিয়ে নীরবে বিজনে বসে থাকা ভালোবাসার মুহূর্তগুলি স্মরণ করে তিনি যেন বলে চলেছেন—

জীবন মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি,
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলছি আজ একা ভেসে
কোথায় যে কত দূর দেশে
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলিব এসে
কেবল তুমি আর আমি।

রাত দশটা। ফিটন গাড়ি ছুটে চলেছে চিৎপুর রোড ধরে। ফিটনের ভিতরে এক অসামান্যা রূপসী। তাঁর মুখ ঘোমটায় ঢাকা। গাড়ি বাঁক নিয়ে লোহার ফটক পার হ'ল। সামনেই লালবাড়ি। রূপসী রমণী উত্তেজনায় কাঁপছেন। গাড়ি থেকে নামলেন সন্তর্পণে। শ্রীরাধার গোপন অভিসারের মতো তিনি 'চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিনি কম্পিতবক্ষে সবার অগোচরে যে ঘরে এলেন, সেখানে আধো আলো, আধো অন্ধকার। ঘরের কোণে জ্বলছে টেবল-ল্যাম্প। সেখানে আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় যিনি শুয়ে আছেন, তাঁকে দেখে ওই অসামান্যা সুন্দরী কুলবধূর সর্বাঙ্গ অবশ। এইতো, এইতো আমার মনের মানুষ, প্রাণের ঠাকুর। একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে, সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।

এই প্রথম সাক্ষাৎ। মহিলা প্রণাম নিবেদন করলেন চরণে। পায়ের আঙুলে মাথার সিঁদুর পড়ে যেতেই তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। আঁচল দিয়ে পায়ের সিঁদুর মুছে দিতেই ওই মহাপুরুষের প্রথম কথা—'তুমি ভালো আছ তো?'—কথাতো নয়, যেন বীণার ঝংকার। যেন সেই পৌরাণিক যুগের ঋষিকুলপতির মুখে মন্ত্রপাঠ। প্রণাম করে রূপসীর তীর্থস্নান সমাপ্ত। মনে হল, যেন বৈদিক যুগের একজন মহর্ষির চরণপ্রান্তে তিনি উপনীত। সহাস্য সম্ভাষণে আর আন্তরিকতায় সব শঙ্কা দূর হয়ে গেল মহিলার। একটু আগেই মনে মনে বলছিলেন, "আভিজাত ভবনে ধনী বিদগ্ধ জনতার মাঝে আমি গিয়ে দাঁড়াব কী করে? আমি যে দীন।" সব আশঙ্কা ঘুচে গেল তাঁর। এবার নতুন অধ্যায়, এবার নতুন জীবন।

নয়ন সার্থক করে শ্রবণ সার্থক করে দীর্ঘ আলাপ শেষে বিদায়ের সময় সেই ঋষিসদৃশ অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'এসো হেমন্ত, আমার দুয়ার তোমার জন্যে সারাক্ষণ খোলা রইল।' জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাবাড়ি থেকে ধীরে নেমে এলেন হেমন্তবালা দেবী—রাজবাড়ির মেয়ে, রাজবাড়ির বউ, রবি-অনুরাগিনীদের একজন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম সাক্ষাৎ। ১৯৩১ সাল।

সাক্ষাতের আগের কাহিনীও একটু আছে। যার অসাধারণ বর্ণনা লিখেছেন প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ এই মহিলাকে অজস্র চিঠি লিখেছেন, যার কিছু আছে চিঠিপত্র নবম খণ্ডে। তাছাড়া হেমন্তবালা নিজে লিখেছেন পুরানো

দিনের কথা ও স্মৃতিকথা নামে দুখানা বই। স্মৃতিকথা আছে প্রভাতবাবুর কাছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাসূত্রে হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন দাদা বলে। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পিতা, স্বামী ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী। নানা সংঘাতের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে ৮২ বছর বয়সে হেমন্তবালা পরলোকগমন করেছেন ১৯৭৬ সালে পুরীতে। সেখানেই ছিল তাঁর সন্ন্যাসের আশ্রম। অল্প বয়সে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে লাগল সংঘাত। একটিমাত্র পুত্র আর একটিমাত্র কন্যাকে নিয়ে চলে এলেন পিত্রালয়ে। স্বামীকে ছেড়ে দীক্ষা নিলেন বৈষ্ণব ধর্মে। নিলেন সন্ন্যাসিনীর বেশ। পূজা অর্চনা আরতি আর গোপাল নিয়ে যৌবন কাটে। পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে বিরোধের শিকার হলেন হেমন্তবালা। কিশোরানন্দ গুরু মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে রইলেন পুরীর চক্রতীর্থে। কিন্তু মন অশান্ত। আবার ফিরলেন স্বামীর কাছে। তবু অশান্তি ঘুচল না। অবশেষে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ। অপরূপ লাবণ্যবতী, রূপবতী হেমন্তবালা আশ্রয় নিলেন গুরুর আশ্রমে, সোনার গৌরাঙ্গের পদতলে। তাতেও শান্তি নেই। গঙ্গাজল তুলসিপাতা মাটির তিলক নিয়েও বুকের আগুন নেভে না। কৃষ্ণনাম জপের মধ্যেও ঘুরে ফিরে আসে রবীন্দ্রনাথের ছবি, আসে রবীন্দ্রসংগীতের কলি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১—জীবনের এই শেষ দশ বছর যে-নারী রবিপ্রদক্ষিণ করেছেন অবিরাম, তিনি, এই হেমন্তবালাদেবী কবির জীবনের হেমন্তবেলায় আবির্ভূত হয়ে নতুন রঙ লাগিয়েছিলেন। সে সময় এতো ঘনিষ্ঠ আর কোন মহিলা ছিলেন না। ধর্মজীবনের নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আসেন। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও অসাধারণ সব মন্তব্য করেন।

হেমন্তবালা অবশ্য রবীন্দ্রসান্নিধ্যে আসার পথ প্রশস্ত করেন কৌতুকের মধ্যে। ১৯৩১ সালে হঠাৎ একখানা চিঠি আসে শান্তিনিকেতনে—'যোগাযোগের গ্রন্থকারকে অজস্র নমস্কার।' দ্বিতীয় চিঠিতে লেখা 'হে মোর অমর কবি, হে চিরমধুর।'—নিচে সই খদ্যোৎবালা। কে এই খদ্যোৎবালা? তৃতীয় চিঠিতে সই জোনাকি দেবী, চতুর্থটিতে দক্ষবালা দেবী। সঙ্গে অনুরোধ, একটি কবিতা চাই। কৌতুকপ্রিয় কবি ছদ্মনামী এই পত্রদাতাকে নীহারিকা নামে একটি কবিতা পাঠান। দক্ষবালা খুশি, তবু লেখেন—মহাকবি হয়েও কবি কেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কেন তিনি বৈষ্ণব কবিতার মতো লিখছেন না। রবীন্দ্রনাথের সচিবরা হাতের লেখা থেকে ইতিমধ্যে আন্দাজ করে ফেলেছেন খদ্যোৎবালা, জোনাকি দেবী, দক্ষবালা দেবী—একই ব্যক্তি। পরপর আটখানি চিঠি এইভাবে আসার পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—তুমি কে তা জানিনে, কিন্তু তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে।... তোমার চিঠি

পড়ে আমি বিরক্ত হচ্ছি, এমন কল্পনা করো না। যে গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তুমি গিয়েছ, সেটা আমার জানতে ভালোই লাগছে।'

অবশেষে আত্মপ্রকাশ। হেমন্তবালা দেবী ছদ্মনামের মুখোশ খুলে ফেলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরিচয় জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে জোড়াসাঁকো বাড়িতে কবিদর্শন। শেষের কবিতা যোগা-যোগ পড়ে তিনি মুগ্ধ। কুমুদিনী যেন তিনি নিজেই। আর রবীন্দ্রসংগীত ? হেমন্তবালার কাছে বেদমন্ত্র। তবু মনে খটকা। রবীন্দ্রনাথ কেন বৈষ্ণব নন, কেন তিনি ব্রাহ্ম ? আহা রে, যদি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হতেন তাহলে তো হেমন্তবালার মনে কোন বিরোধ থাকত না। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথমে তিনি যেতেন গোপনে, আত্মীয়দের অজ্ঞাতে। তারপর জানাজানি হতেই বাড়ির গাড়িতেই এসেছেন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। বাড়ির অনুমতি যদি মিলল আশ্রমের অনুমতি মেলে না, তাদের পছন্দ নয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমন্তবালার এতো নিকট সম্পর্ক। আবার মনঃকষ্ট আবার যন্ত্রণা। কিন্তু হেমন্তবালা গুরুর বারণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়তে পারলেন না। স্বামীর ঘর গেছে, আশ্রমও বুঝি যায়, তা যাক, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর চলবে না। তিনি লিখেছেন—"আমার মনে অনেক অশান্তি জমিয়াছিল। কাহারো কাছে মনের সুখদুঃখের কথা উদ্ঘাটন করিবার কাহারো নিকট হইতে একটু সান্ত্বনার বাণী শুনিবারও প্রয়োজন ছিল।"—এই সান্ত্বনার বাণী তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। হেমন্তবালার কথায় নিন্দা তিক্ততা কটূক্তি থাকত। নীলকণ্ঠের মতো সব সহ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন—"আমি বুঝতে পারি, আমাকে চিঠি লেখার তোমার আন্তরিক প্রয়োজন আছে। প্রকাশ করবার আবেগ তোমার মধ্যে আছে। তার উপলক্ষ চাই। আমি স্নেহের সঙ্গে শুনছি জেনে তুমি অবাধে তা করে যাচ্ছ। আমাকে তুমি দেখোনি, স্পষ্ট করে জানো না। সে'ও একটা সুযোগ। কেন না তোমার শ্রোতাকে তুমি নিজের মনে গড়ে নিয়েছ।"

তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি। রবীন্দ্রনাথ সেই সাক্ষাতের পর লিখলেন—"সেদিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তোমার মুখশ্রী।" হেমন্তবালা রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, চিঠির মাত্রাও বাড়ালেন আবার জোড়াসাঁকোতেও আসতে লাগলেন ঘনঘন। গঙ্গাস্নানে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে আসেন জোড়াসাঁকো, বলেন, আমার কাছে জোড়াসাঁকোও দেবালয়। কখনো কখনো অর্ধমলিন আটপৌরে শাড়ি পরেও কবিকক্ষে হাজির হন। রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ বিব্রত হন, খুশিও হন ছেলেমানুষিতে। হেমন্তবালা খাবার তৈরি করে পাঠান রবীন্দ্রনাথকে, পাঠান ফল। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ফল নয়, ফুল চাই। হেমন্তবালা ফলের সঙ্গে পাঠান ফুল।

গোড়ায় ছিল সংকোচ। তা কেটে যেতেই শুরু হল হৃদ্যতা। এমনভাবে কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ, যেন তাঁর সমবয়সী বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের কাছে এলে হেমন্তবালার মনে থাকতনা তিনি রক্ষণশীল পরিবারের বউ বা মেয়ে। তিনি অসংকোচে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতেন, তর্ক জুড়ে দিতেন। এই সরলতা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগত। হেমন্তবালা লিখছেন—"কতভাবে কত মূঢ়তা দেখিয়েছি। তিনি অনায়াসে আমাদের উপেক্ষা করতে পারতেন, তা করেন নি। কারণ তাঁর করুণা ছিল। মানুষকে একটু আনন্দ, একটু শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়া একটু খুশি করে দেওয়া যেন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। কেন না মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানের প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন।"

তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় নেওয়ার কারণ হেমন্তবালা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন স্মৃতি কথায়।—"ক্ষুব্ধ অশান্ত মন লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিলাম। আমি তাঁহার পথের পথিক ছিলাম না। একটু স্নেহ, একটু করুণা, একটু সমবেদনা ও সহানুভূতির স্পর্শ, একটু সৌহার্দ্য—যাহা তখন আমার ক্ষুধিত পিপাসিত প্রবঞ্চিত আর্তচিত্তের কাম্য ছিল, তাহাই তাঁহার কাছে পাইয়াছিলাম। কবিগুরু আমার নিকট হইতে কিছুই পাইবার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি আশ্রয়চ্যুত নীড়হারা পাখির মতো আমার অবস্থা দেখিয়া কিছুদিনের জন্য কিছু আশ্রয় কিছু ভিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় তাঁহার পত্রে অনেক সান্ত্বনা অনেক উপদেশ অনেক সৎপরামর্শ ছিল। আমি তাঁহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে একটা দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছি। আগের চেয়ে অনেক দৃঢ় ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার মতো ক্ষেত্র পাইয়াছি। নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি। অনেকটা নির্ভয় নিঃশঙ্ক, অনেকটা আত্মনির্ভর হইতে পারিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। হেমন্তবালার কন্যা বাসন্তীর বিয়ের আগের দিন রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির ল্যান্সডাউন রোডের বিয়ে বাড়িতে। অগোছালো ঘর দোর। হেমন্তবালা লজ্জিত। তবু তারি মধ্যে একটি গোলাপ পায়ের কাছে রেখে প্রণাম জানালেন। রবীন্দ্রনাথ জল চাইলেন। জলের সঙ্গে এল মোরাদাবাদী থালায় সন্দেশ কমলালেবু। রবীন্দ্রনাথ গ্লাসে চুমুক দিয়ে জল খেতে ইতস্তত করেন। গোঁড়া বৈষ্ণব হেমন্তবালার দৃষ্টিতে তিনি ব্রাহ্ম, সুতরাং পতিত সমাজচ্যুত। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে হেমন্তবালা রেগে আগুন—কী ভাবেন আমাকে, আমি কি এতই নীচ? রবীন্দ্রনাথ জল খেলেন বাদানুবাদের পর, বললেন, 'তোমার বাসন অশুচি হয়ে গেল তো।' হেমন্তবালার চোখে জল আসে ক্ষোভে। বুঝতে পারেন তাঁর রক্ষণশীলতার জন্যেই এই আঘাত দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা হোক, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে প্রভু এবং প্রিয়, তিনি এখন থেকে তাঁর চিরজীবন চিরপথের সঙ্গী।

জোড়াসাঁকোয় আর একদিন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে

আসনা কেন? তারা আমার দলের লোক, আমার ভক্ত। তাঁরা এখানে এলে আমার সঙ্গে খাবে, তাতে, তাদের বোধহয় জাত যাবে না। আচ্ছা, তুমি কী করে আস এখানে? এই যা দেখছ, এইসব এঁটো, বাড়ি গিয়ে এত রাত্তিরে আবার স্নান করবে তো?

হেমন্তবালা বুঝতে পারেন রবীন্দ্রনাথ কোথায় আঘাত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, দেখুন, ও রকম করে বলাটা কি আপনার উচিত? আমি গাড়িতে চড়লেই কাপড় ছাড়ি বা দিনের বেলায় হলেও স্নান করি। আমার বাবার ওখানে গেলেও ওরকম করি।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আচারনিষ্ঠা নিয়ে হেমন্তবালাকে খোঁটা দেন। হেমন্তবালাও ছেড়ে কথা কন না।

চোখ মুখ পাকিয়ে বলেন—আপনি যে গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকার নিন্দে করেন, একদিন ঐ পঞ্জিকায় আপনারও নাম উঠবে।

আর একদিন। হেমন্তবালা এসেছেন জোড়াসাঁকোয় রাতের বেলা। ঘরে দুজনে মুখোমুখি। হেমন্তবালা বলেন—আমরা শ্রীকৃষ্ণের পুজো করি বলে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু ধরুন যদি একশ বছর পরে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব থাকে আর তারা যদি আপনাকে সূর্যের বা ইন্দ্রের অবতার ভেবে নিয়ে পুজো করে, তাহলে আপনি কী করবেন?

রবীন্দ্রনাথ—আমি ভূত হয়ে তার ঘাড় ভাঙবো।

হেমন্তবালা আপনার কপালে তাই আছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি তাই হবে। হবে কী, এখনই তো হচ্ছে। আপনি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখুন না, সব ঘরে আপনার ছবি ঝুলছে। আর তার গলায় ফুলের মালা দেওয়া হচ্ছে।…যত দোষ শ্রীকৃষ্ণের বেলায়।

রবীন্দ্রনাথ—আরে, আমি তো বারণ করি, ওরা শোনে না যে.

হেমন্তবালা—আপনি বারণ করলে কী হবে, মানুষের ওই স্বভাব।

দুজনে এমন তর্ক চলে যখনই দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমার এতো লেখালেখির পর তোমরা সনাতনীরা বেঁচে আছ কী করে? হেমন্তবালা হেসে জবাব দেন,—মরব কেন? মুসলমান ইংরেজ আমাদের মারতে পারেনি, এখন মরব কেন?

হেমন্তবালা মনে মনে ভাবেন, রবীন্দ্রনাথ যার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন সারাজীবন, যে কুসংস্কারকে সরাতে চেয়েছেন ভারতের মাটি থেকে, তিনি নিজে বোধহয় মূর্তিমতী তাই। কিন্তু বিবাদমান দুইপক্ষে মনের মিলে খাদ নেই। দুই কোটির দুই মানুষ বারবার একত্র হয়েছেন বন্ধুত্বের পরিবেশে। না জানি কী ছিল বিধাতার মনে, অসম্ভবই সেদিন সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মহত্বে এবং হেমন্তবালার আন্তরিকতায়। এত বকুনি খেয়েও হেমন্তবালা নিজেকে ধন্য মনে করেন। কারণ তিনি জানেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ

পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লেখেন—তোমার পরে কত গভীর আমার স্নেহ এবং করুণা, তা তুমি হয়ত উপলব্ধি করতে পার না।

ভুল কথা, হেমন্তবালা মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট দুঃখজর্জরিত এই রূপবতীকে রবীন্দ্রনাথ পাঠান গরদের শাড়ি, শ্রীনিকেতনের শাড়ি, চামড়ার ব্যাগ, নিজের বই, জোব্বা, কলম, ছবি। হেমন্তবালা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। হেমন্তবালার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন কবিতা (পরিশেষ ঃ অপূর্ণ)। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

কত সত্য কত মিথ্যা
কত আশা কত অভিলাষ,
কত না সংশয় তর্ক
কত না বিশ্বাস।
আপন রচিত ভয়ে
আপনারে পীড়ন কত না
কতরূপে কল্পিত সাধনা,
মনগড়া দেবতারে
নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিন ভেঙে করে ঢেলা।

হেমন্তবালা কবিতা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হন। বিস্ময়ে অধীর হন। রবীন্দ্রনাথ তাকে এতো ভালোবাসেন? রবীন্দ্রনাথ কি অন্তর্যামী?

একদিন রাত্রে এসে হাজির হেমন্তবালা। ঘরে রবীন্দ্রনাথ নেই। টেবিলে পড়ে আছে কবিতার খাতা। হেমন্তবালা নাড়া-চাড়া করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ এসে দেখতে পেয়ে ক্ষুন্ন হন, বলেন, তোমার কেমন স্বভাব। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে এটা সেটা নাড়াচাড়া কর? হেমন্তবালা এমন কড়া কথায় রাগ করেন। তিনিও দু'কথা শুনিয়ে দিতে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, আমি কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে কী নাড়াচাড়া করতে গেছি? রবীন্দ্রনাথের হাজির জবাব—আমাকে কি তুমি ভদ্রলোক বলে মনে করো না? হেমন্তবালা ছাড়বার পাত্রী নন। কিছু গায়ে না মেখে বলেন, তা আপনার বাড়িতে আসতে আবার অনুমতি নিয়ে আসতে হবে নাকি? রবীন্দ্রনাথ হাল ছেড়ে দেন। দুজনে নিভৃতে কথার মালা গাঁথেন। তাতে আছে মান অভিমান সুখের কথা দুঃখের কথা, সর্বোপরি আছে সান্ত্বনার কথা—যা হেমন্তবালার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর পাঠালেন হেমন্তবালা যেন দুপুরবেলা আড়াইটা নাগাদ জোড়াসাঁকোয় যান। তিনি চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। হেমন্তবালা এলেন চারটে বাজার পর। প্রণাম করতে যেতেই রবীন্দ্রনাথের ধমক—দুটি

ঘণ্টা নষ্ট হল আমার! কত ক্ষতি হল কাজের। তুমি তার কী বুঝবে? হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের ধমককে আমলই দিলেন না, একগাল হেসে বললেন, ভালোই হল, দু'ঘণ্টা বিশ্রাম হয়ে গেল। ডাক্তার তো তাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও হেসে ফেলেন, তাঁর রাগ গলে জল।

হেমন্তবালা একদিন একটা ফটো চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ কপট ক্রোধে বলেন, তোমাকে কেন দেব, যারা আমার আপনজন, তাদের দিয়েছি, দেব।

হেমন্তবালা পালটা আঘাত হানেন—না, দিলেন তো নাই দিলেন, আমার বয়েই গেল। আমার কি আর বন্ধুবান্ধব নেই!

তার কয়েকদিন পরে জোড়াসাঁকো এসে হেমন্তবালা দেখেন লাল বেনারসীর জরিদার জোব্বা পরে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। হেমন্তবালা বলেন, কনে কোথায়? বিয়ে কখন?

রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে সাফাই গান—পোশাক নির্বাচনের ভার বৌমার উপর।

এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চলে বছরের পর বছর। যতদিন যায়, তত ঘনিষ্ঠ হন দু'জনে। হেমন্তবালা কোনদিন শান্তিনিকেতন যাননি, সব সাক্ষাৎ জোড়াসাঁকোয়। তবে হেমন্তবালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যত কথা হয় মুখোমুখি, তার চেয়ে বেশি হয় চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—আমার ঠাকুর মন্দিরে নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়। আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে. মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত শোকাতুর।

হেমন্তবালার মনে তখনো তীব্র অশান্তি। অধ্যাত্মজীবন আর রবীন্দ্রসঙ্গের মধ্যে বিরোধ। ইতিমধ্যে মৃত্যু হল তার উপাস্য গুরুঠাকুরের। এই শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি কবির শরণাপন্ন হলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন— আমি গুরু নই, কবি। একটি চিঠিতে সে সময় লেখেন—অন্তরে তুমি যাকে গ্রহণ করেছ, তাঁর ভাবরূপ যদি আমার মধ্যে কল্পিত করে থাকো, তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না।... আমাকে তোমার গুরু বলে মান্য করো না, আপনার জন বলেই জেনো।'

আর একখানা চিঠি ঃ গুহের ও সম্প্রদায়ের কঠোর বন্ধনে শৃংখলিত এরকম বন্দিদশা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। কৃত্রিম ও সংকীর্ণ নিয়মের নাগপাশে মানবাত্মাকে এমনভাবে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করাকে আমি অধম বলেই জানি। এই বন্ধনকে তুমি নিজেই যখন স্বীকার করে নিয়েছ, একেই তুমি যখন মুক্তি বলে কল্পনা কর, তখন উপায় নেই। এ অবস্থায় বন্ধনে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে।

আর একখানা ঃ তোমার দীর্ঘকালের অন্ধ অভ্যাস সত্ত্বেও ধর্মমূঢ়তা তোমাকে অভিভূত করতে পারেনি, এই দেখেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আমার চিন্তা থেকে তোমাকে দূরে রাখতে পারিনি।

আরো কয়েকখানি ঃ "তোমার চিঠি পড়ি, তোমার কথা ভাবি। একটা

কথা বারবার মনে আসে। তোমার চিরাভ্যস্ত ধর্মমত ও আচার থেকে আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিনি, বিক্ষিপ্ত করেছি। তাই নিয়ে তোমার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলছে। অথচ এ দুঃখ আমি কোনদিন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করিনি। কারো মত নিয়ে আমার কোন জেদ নেই। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি আমার বিরুদ্ধতা জাগে না।

"তুমি স্ত্রীলোক, নানা শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাসে সংস্কারে তোমাকে ঘিরেছে। তোমার আন্তরিক শক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয়নি। তাই কষ্ট পাচ্ছ। অথচ তোমার আর কোন গতি নেই। নূতন যে পথ খুঁজতে যাবে, খুঁজে পাবে না, কষ্ট পাবে।"

"শরীরটা বিধাতার দুর্লভ দান। ওটাকে অবহেলা করবার অধিকার কারো নেই। লক্ষ টাকা দাম দিয়ে যদি ওকে কিনতে হতো, তবু এর উপযুক্ত মূল্য হতো না।"

হেমন্তবালার মর্মপীড়ায় কবি উদ্বিগ্ন। একদিকে দীক্ষাগুরু, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ। একদিকে আচারনিষ্ঠা, অন্যদিকে প্রগতির মুক্তি। অন্তর্দ্বন্দ্বে হেমন্তবালার কৃচ্ছ্রসাধন বেড়ে যায়। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"অবসাদের ছায়াচ্ছন্ন তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি দুঃখবোধ করেছি। আমার বিশ্বাস, তোমার এই মানসিক গ্লানি তোমার শারীরিক অস্বাস্থ্যেরই অনুবর্তী।"

হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে শান্তি পান, জবাবে লেখেন, "আপনিই আমার যথার্থ আচার্য অধ্যাপক শিক্ষক। আপনিই পৃথিবীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-সকল রোগের চিকিৎসক।"... "আপনি জানবেন আপনার সঙ্গে যে তর্ক করি, সে আপনাকে হারাবার দুরাশায় নয়, সত্য আবিষ্কারের জন্য।"

মমতাময় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পৃথিবীতে অনেক লোকেরই সংশ্রবে আসতে হয়। কিন্তু যথার্থ পরিচয় হয় অল্প লোকের সঙ্গে। তুমি এসেছ আমার পরিচয়-মণ্ডলের মধ্যে।"..."আমার মনের মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষ নন, একথা নিশ্চয়ই জেনো। তাঁর আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ।"

চিঠির পর চিঠি। অসংখ্য চিঠি। এমন অকপট হৃদয়-উন্মোচন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কারো কাছে করেননি। শেষ চিঠি লেখেন মৃত্যুর তিনমাস আগে,—"জরার প্রান্তসীমায় আমি আজ শয্যাগত। তোমরা যে অর্ঘ আজ আমাকে পাঠিয়েছ, মুখে উপযুক্ত সমাদর করতে পারলেম না। আনন্দ অন্তরে অব্যক্ত রইল। নিশ্চিত জানি তোমার কাছে তা' অগোচর থাকবে না। তুমি আমার আশীর্বাদপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

হেমন্তবালা অভিভূত। আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথে

মগ্ন। তাঁর কৃষ্ণ উপাসনায় প্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য রবীন্দ্রনাথ। হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথকে বলেন, "আপনার করুণার, স্নেহের অন্ত নাই।...আপনাকে দেখিলে সেই ব্রহ্মবাদী বেদজ্ঞ ঋষিগণের সত্তারই উপলব্ধি করি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে হেমন্তবালা অন্তরে উপলব্ধি করেন, কিন্তু জীবনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে হেমন্তবালার জীবন কাটে। তার আগে দ্বন্দ্ব ছিল অন্যত্র। ১৯৫৮ সালে স্বামী মারা যান। দাম্পত্য জীবনে পঁচিশ বছরই স্বামী থেকে আলাদা। স্বামীর মৃত্যুশয্যায়ও থাকতে পারেননি। জীবনের শেষ ক'টি বছরও কেটেছে পুরীর আশ্রমে, সেখানেই ১৯৫৬ সালে জীবনাবসান। সে সময় তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে রবীন্দ্রমননে, রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে। তিনি প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে বলেছেন, "দুর্দিনে গান ছাড়া সান্ত্বনার কিছু পাইনে খুঁজে। আজও গানের মধ্যেই আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।"

প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে তিনি গেয়ে শোনান "স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমারো দ্বারে।" প্রভাতবাবু তাঁর শেষ জীবনের চেহারার একটি বর্ণনাও দিয়েছেন: "সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চেয়ে লম্বা, একহারা তাঁর গড়ন। ফরশা রং। কিন্তু ভিতরের কোন তপঃক্লিষ্ট অগ্নিতেজে যেন গায়ের রং কে পুড়িয়ে চেহারার নিটোলতাকে ঝরিয়ে দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে এমন সমর্পণ হেমন্তবালা ছাড়া আর কারো জীবনে ঘটেনি। তাই তিনি অনায়াসে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে পারেন—"আমি যতই কেন না আমি হই, আমি আপনার।...আপনি আমার দেবতা, আমার কল্পলোকের রাজা।—আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার পূর্ণপূজা আপনার চরণে দিতে পারছি না। আপনি কি আমার মন দেখতে পারছেন না?"

তাঁর প্রয়াত দীক্ষাগুরুর নির্দেশ তিনি অমান্য করতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেবতা মেনেও পূর্ণপূজো দিতে পারেন নি। সেই দুঃখেই তিনি জ্বলে পুড়ে মরেছেন, বলেছেন—"আমি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ক্রমে আমি স্বধর্মের একটি নূতন ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি, যাহা আমারই জীবনের অনুকূলে। আমি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই। কিন্তু তাঁহার বাণী হইতেই প্রেরণা পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছি।...তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে নিজের ধর্ম নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা ফলিয়াছে। আমি একরকম করিয়া মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু তিনি এখন তাহা জানিলেন না।"

'জানিলেন না' বলে হেমন্তবালার আক্ষেপের অন্ত নেই। ১৩৪৮ সালের বাইশে শ্রাবণ তাঁর চোখের সামনে কালো পর্দা টেনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেই দৃশ্যের এক অনন্য বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। ইহলোকের তাঁর প্রিয়জন

পরলোকে গিয়ে যাতে মুক্তি পান সেইজন্যে বৈষ্ণবীয়মতে তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। তিনি শেষ শয্যায় শয়ান রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য সুন্দর দেহের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করে মনে মনে বললেন—

"আমি মনে মনে বলিতেছিলাম প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহার বংশীয় খড়দহের গোস্বামীশিষ্যের এই সন্তানটিকে কৃপা করুন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ইঁহাকে গ্রহণ করুন। এই জীবাত্মা এই ব্রাহ্মণদেহে ম্লেচ্ছ সংসর্গে যাহা কিছু নিজ বর্ণাশ্রমবিরোধী অনাচার করিয়াছেন, তাহার ফল সংক্ষয়পূর্বক ইঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ইঁহাকে কৃপা করিয়া শান্তিধামে লইয়া যান। আমার হাতে অদৃশ্যরূপে গঙ্গাজল তুলসি মৃত্তিকা তিলক মাটি প্রভৃতি মাখানো ছিল। সেই হাতে ললাটে হাত বুলাইয়া দিয়া আমি যুক্তকরে ইহাই সেদিন মনে মনে প্রার্থনা করিলাম। তারপর, শরীরে প্রাণ থাকিতে থাকিতেই পরবর্তী দৃশ্য আর দেখিব না বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম সব শেষ হইয়াছে, শোকযাত্রা শ্মশানে চলিয়াছে।"

সব শেষ। জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একালের নরোত্তম। উপাসনা ব্রহ্মসংগীত ধূপের গন্ধ রজনীগন্ধা শ্বেতপদ্মের কোল থেকে অন্তর্হিত হলেন পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ। পুষ্পরথে শয়ান দিব্যদেহ ভেসে চলে গেল শোকাকুল জনতার শির থেকে শিরে। তারপর অন্তর্ধান।—

যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

টোকিও ছাড়িয়ে কানাগোয়াকেন। সাগরপারে ছোট একখানা বাড়ি। বাংলাদেশ থেকে আনা ফলফুলে ভরা বাগান। বাড়ির নাম শান্তিনিকেতন—কাঠের ফলকে বাংলায় লেখা। বাইরে দেখতে সাধারণ জাপানী বাড়ি, ভিতরে অন্য জগৎ। রবীন্দ্রনাথের ফটো আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেয়াল ভরা। তার সঙ্গে আছে চিঠি ছবি—অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন। দেয়ালে অবলম্বন করছে একটি রবীন্দ্র কবিতা—'বিরহ প্রদীপে জ্বলুক দিবস রাতি, মিলনস্মৃতির নির্বাণ-হীন বাতি।' এ ঘর থেকে ও ঘর—সর্বত্র নেপথ্যনায়ক রবীন্দ্রনাথ। সর্বত্র তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

এই শান্তিনিকেতন বাড়ির অধিবাসী এক জাপানী পূজারিনী। বয়সের ভারে তিনি অবনত, আশী-পার মুখে বয়সের কুটিল রেখা। কিন্তু যখনই আসে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, যখনই তিনি তাকিয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে, মন পিছন ফিরে চলে যায় ১৯১৬ সালে, ১৯২৪ সালে, ১৯২৯ সালে। সামনে ভেসে ওঠে একখানা প্রশান্ত মূর্তি—যে মূর্তিকে ঘিরে একদিন তিনি রচনা করেছিলেন অনেক স্বপ্ন।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এই শান্তিনিকেতন-এর মতোই আর একখানা বাড়ি আছে টোকিও শহরে। সেখানেও চারদিকে রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। ঘরে ঢুকতেই জাপানী সিল্কের লম্বা দুটি স্ক্রল। দুটিতেই রবীন্দ্রনাথের সই করা দুটি ছবি। একটি হাতে আঁকা কালো মেয়ের ছবি, আর একটিতে লেখা, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তার তলায় লেখা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং টোমি ওয়াডা কোরা।

টোমি ওয়াডা কোরা অতি ঘনিষ্ঠ রবিঅনুরাগিনীদের একজন। আর সবাই পরলোকে, এই ১৯৮২ সালেও জীবিত আছেন একমাত্র এই জাপানী মহিলাই। কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথের আসন তখন ভুবনজোড়া। সবাই তাঁকে চান হৃদয়-আসনে বসাতে। কিন্তু সকলে চেয়েও পারেন না। যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। টোমি পেরেছিলেন।

কিছুদিন আগে আমার এক শান্তিনিকেতনী ভাগনি, আঁখি (পোশাকী নাম সুচন্দ্রা বসু) জাপানে গিয়ে দেখা করেছিল এই বৃদ্ধার সঙ্গে। তারপর একটি অনবদ্য রচনা উপহার দিয়েছে সেই সাক্ষাতের। ভাগনির

খ্যাতির ভাগ নিতে, সেই রচনা থেকেও গ্রহণ করলাম এ যাবৎ না-জানা অনেক বিবরণ।

১৯১৬ সালে জাপান সফরের সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা টোমি ওয়াডার। তখন তিনি কলেজের ছাত্রী। বয়স মাত্র কুড়ি। রবীন্দ্রনাথ এলেন ওই কলেজে বক্তৃতা দিতে। ছাত্রীদের এক্সকার্সনে যাওয়ার কথা কারুইজাওয়া পাহাড়ে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ বারুসে কবিকে অনুরোধ জানালেন সঙ্গী হতে। মুকুল দে, এনড্রুজ আর পিয়ার্সন সমেত রবীন্দ্রনাথ গেলেন এক্সকার্সনে। টোমি ওয়াডা কোরা সেই পাহাড়ে নানারূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ। কখনো তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানগম্ভীর, কখনো কাব্যসৃষ্টিতে মগ্ন, কখনো পাহাড়ের কোলে পদচারী।

একটু বেলা হলেই রবীন্দ্রনাথ চলে আসতেন ছাত্রীদের খাবার ঘরে। ওয়াডা পাহাড়ী ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁর জন্যে। রবীন্দ্রনাথ স্মিত হাস্যের প্রতিদান দিতেন। ওয়াডা ছাড়া আর কেউ ইংরেজি জানেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্রীদের কবিতা পড়ে শোনান, কোরা তার তর্জমা করেন। এই কারণেই দু'জনে হলেন আরো ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ওয়াডাকে প্রীতির চিহ্নরূপে উপহার দেন একটি কবিতা—

হে মহাধীমান
বিশ্বের অন্তরে তব স্থান।
তব চিত্রপটে
বিশ্বের প্রাণের কথা রটে।

পাহাড়ের উপরে ওক গাছের নিচে কাঠের বেদিতে কুশন পেতে বসানো হয় কবিকে। মেয়েরা বসে সামনে হাঁটু মুড়ে, বসেন ওয়াডাও। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পাহাড়ের নীলে আর আকাশের নীলে সেই মন্ত্র গমগম করে। ওয়াডা সেই অলৌকিক পরিবেশে অবশ হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ যখন 'ওঁম্' বলেন, প্রতিবারই তাঁর প্রতিধ্বনি হয় ওয়াডার হৃদয়ে। পরে এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—"across the cloud he had to say 'om' as if calling the spirit of earth."

হোটেলে যে ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ, ওয়াডা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। ঘর সাজানোর সময় মেঝেতে বা টেবিলে ছড়িয়ে থাকত কবির সাদা চুল বা দাড়ির ছাট। ওয়াডা রোজ সেগুলো কুড়িয়ে গোলাপী কাগজে মুড়ে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ ওয়াডার এই কাণ্ড দেখে একটি কবিতা লেখেন ইংরেজিতে—
Woman, with the grace of your fingers you touched my things and new order came out like music.

তারপর বিদায়ের পালা। ট্রেনে কবিকে তুলে দেবার সময় ওয়াডার কী কান্না কী কান্না। অন্য মেয়েদের চোখও ছল ছল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিচলিত।

ট্রেন ছাড়ার পরই একটি কবিতা লিখে পাঠান ওয়াডাকে।—'O women, thy tears go around the world encircling the world giving sorrow and joy and spiritual awakening of the humanity'.

ওয়াডা এবং অন্য ছাত্রীরা ছবিতে ভরা একটি এলবাম পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাতে লেখেন—In remembrance of his visit to Karuizawa from the students of Japan university.

কবির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। তখনই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল, এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও মননে বাঁধা হয়ে রইলেন। পাহাড়ে কিছুদিনের সঙ্গ, কিছু ঘনিষ্ঠতা কুড়ি বছরের এই তরুণীকে আচ্ছন্ন করে দিল। বছর তিন পর আবার সাক্ষাৎ। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গেছেন আমেরিকায়। ওয়াডাও আছেন সেখানে। পড়তে গিয়েছেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাগজে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন নিউইয়র্কে। ওয়াডা সোজা হাজির হলেন হোটেলে। দুজনেই খুশি, ওয়াডা আরো ঘনিষ্ঠ হলেন রবীন্দ্রনাথের। ওয়াডা বললেন, আবার চলুন জাপান। রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর কেটে গেল কয়েক বছর। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ওয়াডাকে লিখলেন—

প্রিয় ওয়াডা, নিউইয়র্কের স্মৃতি আর জাপানের নিমন্ত্রণের ডালি নিয়ে আসা তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল। তোমার দেশের সুখময় স্মৃতি এখনো আমার মনে উজ্জ্বল। আশা করছি আগামী বসন্তে আবার উপস্থিত হব তোমার দেশে।

দীর্ঘ চিঠির খণ্ডমাত্র উপরের অংশটুকু। তলায় লিখলেন, "তোমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ"।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে এলেন চীন ভ্রমণে। খবর পেয়েই ওয়াডা জানালেন আমন্ত্রণ। চিঠি লিখে বললেন—

I have received your telegram with such gratitude and joy. So you are coming to Japan which I think is timely and most needed. I am thankful that you decided so. I will come to Kobe to welcome you and introduce you to Mr. Murayama who has fought for nearly fifty years for liberal opinions and pacific co-operation of the oriental people and who is the president of Ashahi press in Tokyo and Osaka. He has most valued your acceptance of speaking for Osaka People, which he hopes will be on the earliest date after your arrival.

My family will be ever so delighted if you would stop over

as long as possible through the summer, and if you wish and if you could we will be so delighted to welcome you to the mountains such as Karuizawa of further north, please take care of your health and I pray for your pleasant journey to Japan.

ওয়াডার ডাকেই সেবার রবীন্দ্রনাথ হলেন জাপানযাত্রী। নাগাসাকিতে নেমেই দেখেন, অভ্যর্থনার উষ্ণ হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়াডা। রবীন্দ্রনাথকে সাদরে বরণ করে নিলেন তিনি। কতদিন পর দেখা, আবার সেই এক ঋষিপ্রতিম মহামানবের সামনে দাঁড়ানো। ওয়াডার আনন্দে বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তখন আমের সীজন। আম-পাগল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে বাংলাদেশের আমের বাক্স। আমের বাক্স নামানো হল কিনা, সেই দুশ্চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে, বললেন, ওয়াডা আমি খুব আম খেতে ভালবাসি। আমার কেবিনের আইসবক্সে অনেক আম রয়েছে। আমেতে আমাতে বিচ্ছেদ হলে সেই বিরহ যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারব না।

ওয়াডা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই খুব হাসেন। ওয়াডা আশ্বাস দিলেন, সব ব্যবস্থা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঘোরেন এক শহর থেকে অন্য শহর। ওশাকা, টোকিও, ইয়োকোহামা, কিয়োটো। সর্বক্ষণের সঙ্গী ওয়াডা। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা পান আর ওয়াডার বুক আনন্দে ভরে যায়। ওয়াডা ভাল ইংরেজি জানেন। রবীন্দ্রনাথের সব বক্তৃতায় তর্জমা তিনি করেন জাপানিতে। দোভাষী হতে গিয়েও বিপদ। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে বলছেন তো বলছেনই, থামতে চান না। ওয়াডা বিপদে পড়েন। তারপর প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের জোব্বা টেনে সংকেত দেন, এবার থামিয়ে তর্জমা করতে দিন। সভা শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ খুশি। হাসতে হাসতে বলেন, ওয়াডা, তুমি আমার মতো কবিকে একেবারে পকেটে পুরে ফেলেছ!—This young girl puts the great poet in her own pocket and carries him along whatever she wishes.

ঘুরে ঘুরে কবি ক্লান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছেন টোকিওয়। পরিচর্যার ভার নিয়েছেন ওয়াডা। একদিন একদল যুবক এসে হাজির। ওয়াডাকে ওরা বলল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। ওয়াডা বলেন, হবে না, কবিকে বিশ্রাম দিতে হবে। ওরা তকখুনিই ছোরা বের করে বলে, দেখা না হলে হারাকিরি করব। ওয়াডা ভয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে খবর দেন। রবীন্দ্রনাথ এসে দেখা করেন!

১৯২৯ সালে তৃতীয় সাক্ষাৎ। রবীন্দ্রনাথ কানাডা যাচ্ছেন। ওয়াডা চিঠি দিলেন, জাপানে আসুন। রবীন্দ্রনাথ এলেন। ওয়াডা এবারও দোভাষী, এবারও সঙ্গী। কবি তখন অসুস্থ হলে সেবার ভার নেন ওয়াডা। রবীন্দ্রনাথ

প্রীতির নিদর্শন হিসাবে একটি কবিতা উপহার দেন তাঁর গুণমুগ্ধা জাপানী যুবতীকে—

The bird leaves no trace
of it's flight
only some feather on the dust.
আকাশের পাখি
চিহ্ন কিছু না রাখে,
স্খলিত পালক
ধুলায় পড়িয়া থাকে।

ওয়াডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। তার ছয় বছর পর ১৯৩৬ সালে ওয়াডা নিজেই ছুটে এলেন শান্তিনিকেতন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আন্না তড়খড়, কাদম্বরী দেবী, হেমন্তবালা দেবী, লুসি —কেউই দেখেনান রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বাস্তবরূপ শান্তিনিকেতন। একমাত্র ওয়াডাই তাঁর প্রিয় ঋষি-কবিকে দেখতে পান আশ্রমের পটভূমিকায়। তার আগে ১৯৩৪ ওয়াডা বিয়ে করেছেন জাপানের এক নামকরা ডাক্তারকে। তখন থেকেই বাড়তি পদবী নিয়ে তিনি হলেন টৌমি ওয়াডা কোরা।

শান্তিনিকেতনে এসে ওয়াডা মুগ্ধ। তিনি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অতিথি। যা দেখেন তাতেই বিস্ময়। পরিচয় হল প্রতিমা দেবী ও নন্দিতা কৃপালনির সঙ্গে। তখন চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মহড়া চলছিল। ওয়াডা বসে বসে দেখতেন। তাঁর কাছে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আঁখিকে ১৯৭৩ সালে তাঁর বাড়িতে বসে বলেছেন—"It was glory all over Santiniketan." আর রবীন্দ্রনাথ ?—"দেখলাম তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে সামনে। শরীর অসুস্থ। কিন্তু আমাদের দেখে খুব খুশি। আমিও খুশি তাঁকে দেখে।"

ওয়াডা বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপহার পাঠান এবং চিঠিতে লেখেন—

It gave me great pleasure to receive your wedding card, please permit me to wish you many many years of a happy fruitful married life. Let me thank you also for the sculpture that you sent me and the lovely pieces of silk for me to draw on. I appreciate your gift very much. I am sending a photo of mine recently taken when I was touring in south India.

রবীন্দ্রনাথ সেই সিল্কের উপর একটি মেয়ের ছবি এঁকে পাঠান যা আজো আছে ওয়াডার বাড়িতে। কবিপত্র পেয়ে আনন্দিত কোরা লেখেন,—

Dear Gurudev,—

Your wonderful gift of beautiful drawing was certainly one of the greatest surprise in my recent life and I have no sufficient word to express my gratitude and thanks. All my friends who admire you wanted to have glimpse of your marvellous drawing and that kept me busy showing them.

My friends asked me questions as to what that lady with such spiritual face mean. I could give them no definite answer, but only I could feel what Gurudev must have felt in the mighty soul and its emotion of red and yellow. Then it was a joy to have received sweet letter from Pratima, your devoted daughter-in-law describing your days in the mountain. How often I wished you would come once more to spend summer in Japanese mountains. I shall never give up eager prayer that our much admired poet will be able to come to our land again.

দীর্ঘ চিঠির একটি খণ্ডমাত্র উপরের এই অংশ। আর এক জায়গায় লিখছেন—

Do please remember that my heart is always with you and your beloved ones in Bengal. Days may come when I shall be able to come to you once again. Please do not hesitate to call me for whatever service I can do for you.

সত্যি কথা, ওয়াডার হৃদয় তাঁর সেই ১৯১৬ সালের কুড়ি বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধা।

ওয়াডা সেবার ত্রিবান্দ্রমে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান স্বদেশে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ চলে চিঠিতে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগতেই সব ছিন্ন হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরও তাঁর কাছে পৌঁছয়নি সময়ে। হিরোশিমার যখন বোমা পড়ে, তখন ওয়াডা মনে মনে ভাবতেন, গুরুদেব না জানি কত দুঃখ পাচ্ছেন এই ঘটনায়। পরে শুনলেন, তাঁর আগেই তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর পেয়ে ওয়াডা বিষন্ন হয়ে পড়েন। কত সুখস্মৃতি, কত আনন্দমুহূর্ত। সব এখন শেষ। স্বামী আর তিন কন্যার মাঝখানে থেকেও তিনি শান্তি পান না। সারাদিন বসে বসে রবীন্দ্রনাথের চিঠি নাড়াচাড়া করেন, বারবার একই ছবি দেখেন আর রোমন্থন করেন কারুইজাওয়া পাহাড়, নিউইয়র্কের হোটেল, ইয়াকোহামার সম্বর্ধনা সভা, শান্তিনিকেতনের উদয়ন। তবুও যখন শান্তি ফিরে পান না, মন দেন

রবীন্দ্ররচনার জাপানী অনুবাদে। ইতিমধ্যে যুদ্ধে মারা গেছে তাঁর একটি কন্যা। তাঁর শোক ভুলতে হাতে নিয়ে বসেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই গীতাঞ্জলি। জাপানী ভাষায় অনবরত আবৃত্তি করেন—

জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে
সেই ধ্বনিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা যাওয়া—

ওয়াডা আর কথা বলতে পারেন না। চোখ জলে ভরে যায়। মৃতা এক কন্যার আর মৃত গুরুদেবের স্মৃতিতে তিনি আকুল হয়ে পড়েন। এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন গান করে শুনিয়েছিলেন। সেই সুরের রেশ এখনো লেগে রয়েছে হৃদয়ের স্তরে স্তরে।

১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে ওয়াডা আসেন শান্তিনিকেতনে। তখন তাঁকে দেখেছি আমরা। তারপর আবার আসেন ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে। সেবার দেখা হয় জওহরলাল এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও।

ওয়াডা জাপানের পার্লামেণ্টে ডায়েটের সদস্যা ছিলেন বেশ কয়েক বছর—১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯। সেখানে রাজনৈতিক বক্তৃতার সময়ও প্রায়ই উদ্ধৃতি দিতেন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। কারণ ওয়াডার মতে Rabindranath was the greatest human being born in this century.

ওয়াডার কিছু চাওয়ার নেই। তাঁর জীবন সার্থক। সেই কবে ১৯১৬ সালে প্রথম যৌবনে প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে, সেই প্রথম স্মৃতি আজো অম্লান। আজ বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়েই পড়ে আছেন তিনি। আছেন টোকিওয়, কিন্তু মন শান্তিনিকেতনে। আর ঘুরে ফিরে মনে পড়ে সেই কবে শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি কথা—your smile was the flower of our field, your talk was like your own mountain pines, but your heart was the women that we all know.

নব্বুইয়ের কোঠায় তাঁর বয়স। কুঁচকানো চামড়া, চোখের দীপ্তি স্তিমিত তবু খানিক পরেই বেরিয়ে পড়ে মেঠোফুলের মতো সেই হাসি, পাহাড়ী পাইনের মতো সেই কণ্ঠস্বর। আর আরো খানিক পরেই ধরা পড়ে চিরচেনা সেই নারীমূর্তি—যেমন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কারুইজাওয়া পাহাড়ের উপর পাইন গাছের তলায় একরাশ ফুলের মাঝখানে।

সেই ফুল বহুকাল ফুটে থাকবে জাপানের আর এক শান্তিনিকেতনে।

অন্য রবীন্দ্রনাথ

অণিমা ও অশোকতরুকে

রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি ভাসা ভাসা। জানি তিনি সংগীতকার ঔপন্যাসিক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ওই 'ইত্যাদির-'র বাইরে আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন, যাঁর পরিচয় মেলে চিঠিপত্রে, অন্তরঙ্গের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে। সেখানেই তাঁর আসল চেহারা। ওই দাড়িগোঁফ আলখাল্লা আর ঋষিপ্রতিম চেহারা ছাড়িয়ে অন্য সে এক মানুষ, যিনি রাগেন, হাসেন, বকেন, যিনি সাঁতার কাটেন গোরাইয়ের এপার ওপার, ছাত্রদের পড়ান দিনে তিন চার ক্লাস, পাটের আখের গোলাপের, চামড়ার কারবার করেন নানা জায়গায়। তাছাড়া পারিবারিক রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন তাও ছড়িয়ে আছে নানান কাহিনী আর রচনায়। সেই সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা দরকার, তাহলেই আমরা জানতে পারবো সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে।

তিনি নিজে অবশ্য বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে', বলেছেন, 'বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।' কিন্তু তিনি নিজেই তো ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর করেছেন। প্রমাণ সর্বত্র—তাঁর দীর্ঘ আশী বছরের জীবন জুড়ে।

মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর বিয়ের গল্প। সত্তর-উত্তর বৃদ্ধ বলেছিলেন, "আমার বিয়ের কোন গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বললুম তোমরা যা হয় করো, আমার কোনো মতামত নেই!" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণীকে বেছে নিয়েছিলেন অন্যের পরামর্শে, যদিও প্রেম করে বিয়ে সে যুগে অচল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ। বৌ খুঁজতে নৌকো করে যশোর গিয়েছিলেন কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজন আর কিছু দাসী। যেহেতু রবীন্দ্রনাথদের আদি বাসস্থান যশোর, তাই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বৌ-রা আসতেন খুলনা-যশোর থেকে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিয়ের সময় বলেছিলেন, বিয়ে করতে অন্য কোথাও তিনি যাবেন না, বিয়ে জোড়াসাঁকোতেই হবে। তাই হয়েছিল, ভবতারিণী দেবী, পরে যাঁর নাম বদলে হয়েছিল মৃণালিনী—এসেছিলেন জোড়াসাঁকোতেই। 'মৃণালিনী' নাম কেন? ভবতারিণীর বাড়িতে ডাক নাম ছিল 'পদ্ম', তাই?

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের অন্য কোন সম্বন্ধ কি এসেছিল? এসেছিল। তিনিই বলেছেন—"একবার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য প্রদেশের মেয়ের সঙ্গে আমার

বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে বড় গোছের জমিদার আর কি। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিবারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন। একটি নেহাৎ সাদাসিধে, জড়ভরতের মত এক কোণে বসে রইল, আর একটি যেমন সুন্দরী তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ! পিয়ানো বাজালো ভালো। তারপর গান-বাজনা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। আমি ভাবলুম, এর আর কথা কী! এখন পেলে হয়!—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়স হয়েছে, কিন্তু সৌখিন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন—"Here is my wife', এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে, "Here is my dauaghter" আমরা আর করব কি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করেই রইলুম। আরে, তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন? যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়। মেয়ে যেমনই হোক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে তো এ হাঙ্গামা করতে হ'ত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালই হয়েছে। কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার নিজের প্রাণ রাখা শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথরা আদিতে যশোরের লোক হলেও এবং তাঁর মামাবাড়ি যশোর হলেও যশোরের সঙ্গে তাঁদের অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না। না ভাষায়, না আহারে। কেবল 'মুগির ডাল, কুলির অম্বল', এই দুটি শব্দ বলতে পারতেন। সেই সুবাদে একবার শান্তিনিকেতনের বাঙালসভার' সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন। ওই সভার নিয়ম ছিল 'বাঙাল ভাষায় বক্তৃতা দিতে হবে। তা ছাড়া আহারের ব্যাপারে যশুরে চৈ ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে চালু ছিল। চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রবীন্দ্রনাথের কাছে উপাদেয় ছিল।

এই চৈ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প আছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন—"তখন অনেকদিন আমি নিরামিষ খাই, মাছ মাংস একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আমার শাশুড়ির কাছে গিয়েছিলুম। তিনি আমায় মাছ খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। আমি দেখলুম, এটা তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, মাছ খাওয়া না খাওয়া তাতে এমন কিছু এসে যায় না, তাই বললুম তাঁকে যে, আমি মাছ খেলে যদি আপনি আন্তরিক খুশি হন, তা হলে না হয় খাব মাছের ঝোল। চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল খাওয়া গেল। সঙ্গে ছিল আমার চাকর উমাচরণ। সে বাড়িতে এসে বললে, বাবামশায়কে আমরা যখন বলি কিছুতেই শোনেন না, আর যে-ই শাশুড়ি বললেন অমনি মাছের ঝোল দিব্য খেলেন।"

এবার অন্য প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানারকম নিন্দা চলছে চারিদিকে। তিনি নাকি কল্পলোকের কবি, সাধারণ মানুষের কোন খোঁজখবর রাখেন না, বিলাসব্যসনে কাটে তাঁর দিন-রাত্রি। এই সব মিথ্যা অপবাদ রবীন্দ্রনাথের কানে

আসে। মুখ বুঁজে সহ্য করেন। একবার ওই অপবাদ নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে রসিকতাও করেন।—"অনেক গল্পই ঘুরে আমার কানে আসে। কে একজন বলছিল সুন্দরী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে কাছে আসতে দিই নে। আহা, শুনে রোমাঞ্চ হয়। এ ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হত না। শান্তিনিকেতন তা'হলে স্ত্রী-জাতিশূন্য হতো। আরো শুনেছি, আমার নাকি একটা কাচের ঘর আছে, তার সমস্ত ছাদটা কাচের ডোম। রাত্রিবেলা সব তারা দেখা আমার একান্ত প্রয়োজন। ভোরবেলা সুন্দরী মেয়ের গান শুনে তবে আমার ঘুম ভাঙে। আর স্নানের যা আয়োজন সে আর বলে কাজ নেই। সোনার গামলায় জল, তাতে যে আতর ব্যবহার হয় তার এক তোলার দাম ১০০ টাকা।"

একবার রবীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল। মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়েছেন, হঠাৎ পায়ের আঙুলে বৃশ্চিক দংশন। অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় ঔষধ। সমস্ত বাড়ি ঘুমে অচেতন। নিজের কষ্টের জন্য অন্যদের ঘুম ভাঙিয়ে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট দিতে চান না। অথচ যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন তখন। কী করা যায়? রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবতে থাকলেন—কাকে বিছে কামড়ালো? ওই পা-টি কা'র? কার ওই আঙুল? সে কি আমি? কে এই দেহধারী রবীন্দ্রনাথ? না না আমি, আর আমার এই যন্ত্রণাকাতর দেহ, এক তো নয়! তিনি তখন একাগ্র হয়ে নিজেকে নিজের দেহ থেকে বিযুক্ত করে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে যে-দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে, তার সঙ্গে তাঁর মনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রণা। নিজের সঙ্গে নিজের বেদনার বিচ্ছেদ ঘটল। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হঠাৎ মনে হলো যেন কোন কষ্ট নেই, ছিল না। পরদিন সকালে উঠে সেই আঙুলটাতে যে ক্ষতচিহ্ন ছিল তা ছাড়া বেদনার আর কোন প্রমাণ ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কী ভাবতেন? বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর স্মৃতি কেমন ছিল? আদরের ছোট বৌ, যাঁকে চিঠিতে লিখতেন 'ভাই ছুটি', সেই মৃণালিণী দেবী সম্পর্কে বলছেন—"সংসারের ভার একলাই আমাকে বইতে হয়েছে। এদের প্রত্যেকের সমস্ত ব্যবস্থা, পড়াশোনা, বিয়ে এমন কি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলাই বহন করতে হয়েছে। সবই করেছি, কিন্তু জালে জড়াই নি। দূরের থেকে করেছি। ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সব করেছি কিন্তু সেটা বুদ্ধি বিচার বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মতো।

"রথীদের পড়াতে গিয়েই তো শান্তিনিকেতনের শুরু হল। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো আমরা অত খুঁতখুঁতে ছিলাম না। আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন শান্তি-নিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। কিন্তু সে তো হলো না, অল্প পরেই তাঁর

সেই ভয়ানক অসুখ হলো। এখনও আমার স্ত্রীর অভাব অনুভব করি কি না? ঐ যে বলেছি, চিরদিন আমি একটা জায়গায় উদাসীন নিরাসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। তাছাড়া যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আমার এক মুহূর্তে অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মতো চেপে রয়েছে, কাজের অন্ত নেই।

"তখন নিজের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়! মেজ মেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়। তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হতো শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছোটাছুটি চলছেই। তবে সবচেয়ে কী কষ্ট হতো জানো? এমন কেউ নেই, যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যেই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়। সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছেন এক বিধবার সঙ্গে, কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা পালন করতে এক বিধবা-বিবাহ ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওই রবীন্দ্রনাথই। আদরের ভাইপো বলু—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা গেলেন তিনি, রেখে গেলেন কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীকে। সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে। জোড়াসাঁকো বাড়ির অনেকেই ভাবেন, আহা মেয়েটির আবার বিয়ে দিলেই হয়। মেয়ের বাবা থাকেন এলাহাবাদে, সকলের পরামর্শে তিনিও রাজী হলেন। কিন্তু তখনও ঠাকুর বাড়ির বড় কর্তা দেবেন্দ্রনাথ—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম। তিনি এই বিবাহে মত দিতে নারাজ। বড় দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মভোলা মানুষ। এই বিবাহ বন্ধ করার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি দিতে চাইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করে বলেন, এই ভার নিতে তিনি অপারগ, কারণ তিনিও চান বিয়েটা হোক। মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত ফেরং আই-সি-এস নারীমুক্তির বড় উকিল। তিনিও প্রত্যাখ্যান করলেন পিতার অনুরোধ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে বক্তব্যও তাই।

অবশেষে ডাক পড়ল কনিষ্ঠ পুত্র রবির। দেবেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি চান না যে তাঁর পৌত্রবধূর পুনর্বিবাহ হোক। হাজার হোক ঠাকুরবাড়ির বউ। দেবেন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন, রবীন্দ্রনাথ যেন যেভাবেই হোক এই বিয়ে বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন মহা বিপদে। নীতিগতভাবে তিনি এই বিয়ে সমর্থন করেন। অথচ পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করার কোন উপায় নেই। মানসিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ রবীন্দ্রনাথ শেষমেষ স্থির করলেন পিতৃআজ্ঞা পালনই শ্রেয় এবং উদ্যোগী হয়ে এলাহাবাদ গেলেন, সাহানা দেবীর বিবাহ বন্ধ করে দিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে এলেন।

তবে এই প্রতিক্রিয়া তখনও তাঁর মন তোলপাড় করছিল। ১৯০৫ সালে মারা গেলেন দেবেন্দ্রনাথ। তার মাত্র কয়েকবছর পরেই পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হল। যে রবীন্দ্রনাথ পিতৃআজ্ঞা পালন করতে একটি বিধবা-বিবাহ ভেঙে দিয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই নিজ পুত্রের বিবাহ ঠিক করলেন আর এক বিধবার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, পাত্রী নিকট আত্মীয়া, অবনীন্দ্রনাথের ভাগনি, নাম প্রতিমা দেবী।

আর একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমি ব্রাত্য, আমি সমাজচ্যুত। আর ১৯০১ সালে যখন শান্তি-নিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করলেন, তখন তিনি উপবীতধারী পরিপূর্ণ একজন ব্রাহ্মণ। বিদ্যালয় তখন আশ্রম। ছাত্ররা কাষায়বস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক নগ্নপদ। অধ্যাপকরা যেন প্রাচীনকালের মুনিঋষি। তখন নিয়ম ছিল অধ্যাপনা শুরু হবার আগে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপাসনা ও অধ্যাপকপ্রণাম ছাত্রদের করতে হবে। শিবধন বিদ্যার্ণব, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মণ-শিক্ষকদের মাঝখানে এলেন একজন অব্রাহ্মণ-শিক্ষক—কুঞ্জলাল ঘোষ। প্রশ্ন উঠল. ব্রাহ্মণ ছাত্ররা এই অব্রাহ্মণ শিক্ষককে প্রণাম করতে পারে কি না। অধ্যাপককুলের রায়—'না, পারে না।' তবু বিচার গেল সুপ্রীম কোর্টে—রবীন্দ্রনাথের কাছে। তপোবন বিদ্যালয়ের কুলপতি কবিও নানা দিক বিবেচনা করে রায় দিলেন—'না, পারে না।' কুঞ্জলাল ঘোষকে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিতে হল। তিনি বদলি হলেন অন্য কাজে।

এই বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পরে হল বিশ্বভারতী. আগেকার সব সংস্কার উপড়ে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। তাঁর প্রতিষ্ঠান হল সকল ধর্মের. সকল জাতির প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ নাম লেখালেন জাতহারা কুলহারাদের দলে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ঊনত্রিশ এক ত্রিশ, সেই সময় জমিদার হয়ে প্রথম যান শিলাইদহে। নতুন বাবুমশায় পুণ্যাহে আসছেন জেনে কুঠিবাড়িতে হইচই পড়ে যায়। ঘরদোর সব সাজানো হল যত্ন করে। আমলা গোমস্তারা ছোটাছুটি করছেন তদারকির কাজে। প্রজারাও ভিড় করল কুঠিবাড়ির সামনে।

বাবুমশাই এলেন। কিন্তু কী কাণ্ড, তার জন্যে নির্দিষ্ট আসনে তিনি বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন চুপটি করে। সদর নায়েব বাবুমশায়ের মুখের চেহারা দেখে তটস্থ. এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে বললেন. "বসুন বাবুমশায়, এখনই অনুষ্ঠান শুরু হবে।"

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললেন, "না, অনুষ্ঠান এখনই শুরু হতে পারে না। আমি বসতে পারি না। আগে এই চেয়ারগুলো সরান. তারপর।"

চেয়ারগুলো ছিল সম্পন্ন প্রজা ও আমলাদের জন্যে। সদর নায়েব বললেন, "এটাই নিয়ম, প্রিন্স্ বাবুমহাশয়ের আমল থেকে চলে আসছে।"

রবীন্দ্রনাথ তারপর জানতে চাইলেন, সামনের দিকে একটি অংশ শতরঞ্জির উপর সাদা চাদরে ঢাকা, অন্য দিকে নয় কেন? উত্তরে জানলেন, চাদরে ঢাকা অংশে বসবে হিন্দু প্রজা, অন্য অংশে মুসলমান প্রজা।

রবীন্দ্রনাথের মুখে বিরক্তি দেখা দিল। সদর নায়েবকে বললেন, "এই মিলনের দিনে চেয়ার তো সরাতেই হবে, তার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সব প্রজাদের জন্য সমান বসার ব্যবস্থা করতে হবে। হয় সর্বত্র শাদা চাদর লাগান, নয় শাদা চাদর তুলুন।" তাঁর কাছে প্রজারা সব সমান।

সদর নায়েব কাকুতিমিনতি করে বললেন, বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে তিনি কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "পরিবর্তন না হলে আজ পুণ্যাহ হবে না।"

সদর নায়েব ঃ আমি তাহলে পদত্যাগ করব।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তা করতে পারেন, কিন্তু ভেদাভেদ না তুললে আমি তো বসবোই না, পুণ্যাহও হবে না।

সদর নায়েব চুপ। রবীন্দ্রনাথের জেদে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব প্রজার বসার সমান ব্যবস্থা হল। রবীন্দ্রনাথও জমকালো সিংহাসন সরিয়ে দিয়ে শতরঞ্চির উপর গালিচা পেতে বসলেন। পুণ্যাহ সমাপ্ত হল।

তার পরবর্তী ইতিহাস জানা। তার প্রজারা বেশিরভাগ মুসলমান। তারাই চাষী, তারাই গরিব। তাদের বাঁচাতে রবীন্দ্রনাথ কৃষি ব্যাঙ্ক খুললেন, কত কিছু করলেন। তাতে চটে গেলেন হিন্দু সম্পন্ন প্রজারা। এঁরাই আবার মহাজন। রবীন্দ্রনাথ তখন হিন্দু মহাজনদের হাত থেকে মুসলমান বাঁচাতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। মহাজনরা বেশিরভাগ সাহা, চাষীরা বেশিরভাগ শেখ। তখনই জমিদারি জুড়ে একটি কথা চালু হয়ে গেল, নতুন বাবুমশায় এসেছেন সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে।

আর একটি কাহিনী। জোড়াসাঁকো পাড়াকে রবীন্দ্রনাথ যতই অপছন্দ করুন, তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর সঙ্গে বাঁধা রইল কলকাতার এই নোংরা ঘিনজি পাড়া। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রাণাধিক শান্তিনিকেতনেই মৃত্যু হোক, কিন্তু সু-চিকিৎসার তাগিদে স্বজনরা তাঁকে ২৫ জুলাই নিয়ে আসেন কলকাতায়। ছোট্ট একটি নীল বাসে অসুস্থ কবিকে তোলা হল উদয়নের সামনে, বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বোলপুর স্টেশনের দিকে। বাস পেরোলো উত্তরায়ণের ফটক। এপাশে ছাতিমতলা, মন্দির, শান্তিনিকেতন বাড়ি, ওপাশে বাসবী, শ্রীনিকেতন যাবার পথ। বাস এগোয়। এপাশে আম্রকুঞ্জ বকুলবীথি, গৌর প্রাঙ্গণ, শালবীথি। ওপাশে চৈত্য, খেলার মাঠ, কলা ভবন, সংগীত ভবন। বাস আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে মোড় ফিরে ধরল নেপাল রোড। এপাশে গুরুপল্লী, চীনা ভবন, হিন্দী ভবন, ওপাশে শিশু বিভাগ মুকুট বাড়ি, দেহলি, দ্বারিক। গোটা রাস্তায় দু পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আশ্রমিকরা, ছাত্রছাত্রী-

অধ্যাপক-কর্মী সবাই, প্রত্যেকের চোখ ছলছল, মুখে গান—'আমাদের শান্তি-নিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।' বাস ডান দিকে মোর ফিরে ভুবনডাঙা বোলপুরের পথ ধরল। শোকে তাপে জর্জরিত কবি বহু দুঃখের আঘাত সহ্য করেছেন অবিচলচিত্তে, কিন্তু সেদিন নিজেকে সামলাতে পারেন নি, চোখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

তার পরের ইতিহাস সকলের জানা। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় মারা গেলেন বাইশে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর প্রিয়তম ঋতু বর্ষাকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। শ্রাবণ মাসের বাইশ তারিখটি বাংলার অন্যতম দুঃখের দিন হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথকে অপারেশন করা হয় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি বার বার বলেছেন, "শরীরে খুঁত নিয়ে মরতে চাই না। বয়স হয়েছে বিদায় নেবোই তো, স্বাভাবিকভাবেই সব শেষ হোক, কাটা-ছেঁড়া কেন ?"

রবীন্দ্রনাথের আপত্তি অগ্রাহ্য করে যখন সাব্যস্ত হয় অপারেশন হবেই তখন তিনি বলেন, "নিজের ইচ্ছামতো আমার মরারও অধিকার নেই।"

এই কথাটা বুঝেছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার। তিনি অপারেশনের বিরুদ্ধে ছিলেন। অন্য ডাক্তারদের বলেছেন, "দেখুন রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ রোগীর মত দেখবেন না। তাঁর স্নায়ু, তাঁর শিরা উপশিরা দৈহিক গঠন সবই অসাধারণ। আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রের নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষের দেহের পক্ষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।"

সে যাই হোক, অপারেশন করলেন ললিতমোহন ব্যানার্জি এবং এই অপারেশনের ধকল সহ্য করতে না পেরে প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্যে কবি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। মৃত্যুর মুহূর্তে অন্যান্য অন্তরঙ্গজনের মাঝখানে কাছে ছিলেন ডাঃ জ্যোতিষ রায়। কবির কানে মুখ এগিয়ে শোনানো হচ্ছে শান্তম অদ্বৈতম মন্ত্র, অনবরত হচ্ছে ব্রহ্মসঙ্গীত, এবং তারই মাঝে ডাঃ জ্যোতিষ রায় নাড়ি দেখে ঘোষণা করলেন—'সব শেষ।'

সব শেষ। রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন পালংকে, এক হাত বুকের উপর, অন্য হাত ছড়ানো। হঠাৎ অবিশ্বাস্য কান্ড। ডাক্তারীশাস্ত্রের ঘোষণা নস্যাৎ করে সব শেষ হল না। ঘরে উপস্থিত সকলেই দেখতে পেলেন রবীন্দ্রনাথের ছড়ানো হাতটি কাঁপতে কাঁপতে বুকের উপর রাখা অন্য হাতটির কাছাকাছি আসতে চাইছে। অতি কষ্টে এলোও এবং কর্ন্ড় হতেই সব চিরকালের জন্য স্তব্ধ।

হাতটি উঠল কেন ? তার উত্তর তখনই অনেকে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ দু-হাত দিয়ে চিরমঙ্গলময় ভগবানকে করজোড়ে শেষ প্রণাম জানাতে চেয়েছিলেন। ডাক্তারী বিধান তা বন্ধ করতে পারে নি। এই হাতের ব্যাপারটা আমাকে বলেন,

শেষ শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত অমিতা ঠাকুর। কিন্তু অন্যতম সেবিকা রাণী চন্দ বলেন, কথাটা ঠিক নয়।

নানারকম ঘটনা নানারকম কাহিনী দিয়ে সাজানো অন্য রবীন্দ্রনাথের এই সব ছবি তাঁর সাহিত্যের, তাঁর সংগীতের চেয়ে কম আকর্ষক নয়। বিপরীতধর্মী নানা চিত্রে উজ্জ্বল এই রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা আরও ভাল করে জানি, তাহলেই আরও ভাল করে বুঝতে পারব মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথকে।

কুইন ভিক্টোরিয়া বলতেন 'মাই প্রিন্স'। সেই থেকে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর—ভিক্টোরিয়ার ভাষায় প্রিন্স 'টারাগোনা'। সেই প্রিন্সের বংশধররাই আনলেন জগৎজোড়া খ্যাতি। বিরাট পরিবার, বিরাট বিরাট প্রতিভার ঠিকানা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। একবার সেই বাড়িতেই দ্বারকানাথের প্রপৌত্ররা খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষতে বসেন, ভিক্টোরিয়া, না দ্বারকানাথের পরিবার বড়। বংশতালিকা খতিয়ে দেখা গেল দ্বারকানাথেরই জিৎ। সেদিন জোড়াসাঁকো বাড়িতে বিরাট হুল্লোড়—প্রিন্স দ্বারকানাথের কাছে কুইন ভিক্টোরিয়া পরাজিত।

দ্বারকানাথের তিন ছেলে—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন আর মধ্যম গিরীন্দ্রনাথ থেকে এসেছেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথেরা। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ থেকেই পরিবারের বিস্তার। সব মিলিয়ে মোট পনেরোটি সন্তানের জনক তিনি। এবং সেই পনেরোর একজন রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয় যশোরের মেয়ে সারদা দেবীর। বিয়ের সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো, সারদা দেবীর সাত। বিয়ের তারিখ ১৮৩৪ সালের ফাল্গুন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলে কি হয়, সারদা দেবী ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। বাইরে চলতো উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা আর অন্দরমহলে পুজো-আর্চা, ঠাকুরসেবা।

দেবেন্দ্রনাথ-সারদা দেবীর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে আমরা নাম বেশি জানি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আর স্বর্ণকুমারী দেবীর। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের রচনায় দু-চার বার উল্লেখ ছাড়া বাকি দশ জন বরাবর অপরিচয়ের অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথের সেই অখ্যাত দাদা-দিদিদের নিয়েই আমার এই উপাখ্যান।

জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০—১৯২৬)—রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ডাকতেন বড়দাদা —সুখ্যাত কবি, দার্শনিক, আত্মভোলা ঋষি। মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২— ১৯২৩). রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা, প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস. সমাজসংস্কারক, লেখক। পঞ্চম ভ্রাতা, রবীন্দ্রনাথের নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯—১৯২৫) সংগীতকার, নাট্যকার. শিল্পী—সর্বজনপরিচিত।

কিন্তু আমরা ক'জন জানি জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের অগ্রজাও ছিলেন একজন! না, তাঁর নামকরণ পর্যন্ত হয় নি। কারণ অকালমৃত্যু। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের চেয়েও দু-বছরের বড়। জন্ম ১৮৩৮ সালে। দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ কন্যার মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠা। পঞ্চদশ সন্তানের মধ্যে প্রথমা। দেবেন্দ্রনাথ-সারদা দেবীর অনেক গুণবান ও রূপবান পুত্র-কন্যা পরে হয়েছে, কিন্তু অনুমান করতে পারি, অন্য মা বাবার মতই অকালমৃত্যু প্রথম সন্তানের শোক তাঁরা কোনদিন ভুলতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া দিদি সৌদামিনী (১৮৪৭—১৯২০)। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দিন তিনি বিধবা হন এবং তখন থেকেই বাকি জীবন নিয়োগ করেন পিতৃসেবায়। তৃতীয়া সুকুমারী (১৮৫০—১৮৬৪), চতুর্থ শরৎকুমাবী (১৮৫৫—১৯২০)।

শরৎকুমারীর দৌহিত্র শিল্পী অসিতকুমার হালদার। পরবর্তী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬—১৯৩২), যাঁকে রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন ন'দিদি, সুপরিচিতা। তাঁরই মেয়ে সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথের ছোড়দিদি বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৮—১৯৪৩) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগের বছরও রবীন্দ্রনাথ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বসেছেন, আর 'ছোড়দিদি' এসেছেন ভাইফোঁটা দিতে।

অখ্যাত দাদাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের (১৮৪৪—১৮৮৪) নাম। তিনি ছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গৃহশিক্ষক। ভূগোল, ইতিহাস, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনিই তাঁর আগ্রহ জন্মিয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ বাংলায় বিজ্ঞানের উপর অনেক লিখেছিলেন। সেই লেখার খাতা আছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদনে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন,—"যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজী পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।" এই সেজদাদার কন্যা প্রতিভা ও অভিজ্ঞার গানের গলা ছিল অসাধারণ। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে এঁরা দুজন ছিলেন। সুভো ঠাকুর, বাসব ঠাকুর হেমেন্দ্রনাথের বংশধর। গায়িকা অমিয়া ঠাকুর হেমেন্দ্রনাথের পৌত্রবধূ। হিতেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। তিনিও ভাল গান গাইতেন।

দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-১৮৫৭)। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর কোন উল্লেখ নেই। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পুকুরে ডুবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কোন পুকুরে কী ভাবে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলো তার খবর বিশেষ কেউ আমাদের জানান নি। তাঁর ছবিও কোথাও নেই। তাই রবীন্দ্রনাথের এই অখ্যাত দাদাটি বাড়ির অন্য অনেক সুকুমারদর্শন ছেলের মতন কল্পনার ছবিতে

চিরকাল থেকে গেলেন। একই ভাবে থেকে গেলেন দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩—১৮৬৪)। দ্বিজেন্দ্রনাথকে যেমন সবাই ভুল করে ভাবেন দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তেমনি সাধারণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথও থেকে গেছেন পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। কিন্তু তাতো নয়, কনিষ্ঠেরও যিনি কনিষ্ঠ, তিনিই বুধেন্দ্রনাথ—সোম ও রবির পর বুধ। শৈশবেই মৃত, রবীন্দ্রনাথের দু-বছরের ছোট।

পনেরোটি সন্তানের মধ্যে বাকি রইলেন দু'জন—চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ এবং সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথ। একজন রবীন্দ্রনাথের ন'দাদা, অন্যজন শুধু দাদা। ন'দাদা বীরেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন সত্তর বৎসর। ১৮৪৫ সালে জন্ম, ১৯১৫ সালে মৃত্যু। তাঁরই ছেলে বলেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র। বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী আর হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ী দেবী ছিলেন দুই বোন। প্রফুল্লময়ী দেবী দুঃখিনী, মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। কৈশোরে বিধবা পুত্রবধূ সাহানা দেবীকে নিয়ে তাঁর শোকের সংসার চলে। এদিকে স্বামীও উন্মাদরোগগ্রস্ত।

বড় সুপুরুষ ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। আর ছিলেন গণিতবিদ। সারা দিন অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত নিয়ে পড়ে থাকতেন। বিয়ের পরেই দেখা দেয় তাঁর উন্মাদ রোগ, একেবারে মত্ত অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাঁকে বন্দী রাখতে হতো একটি ঘরে। আলাদা চাকর-বাকর সব ছিল, কিন্তু তাঁর চিৎকার চেঁচামেচিতে সারা বাড়ি সচকিত হয়ে থাকতো। অবস্থা এমন গেছে, দড়ি দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে হয়েছে অনেক সময়। কারো কথা শুনতেন না, কোন অনুরোধ মানতেন না। ব্যতিক্রম ছিল গানের বেলায়। কেউ গান ধরলে তিনি নীরবে শুনতেন। বিশেষ করে পুত্রবধূ সাহানা দেবী যখন গান গাইতেন, বীরেন্দ্রনাথের স্নায়ু শীতল হতো, তাঁর চোখে-মুখে দেখা দিত প্রশান্তি।

বীরেন্দ্রনাথ যে ঘরে বন্দী থাকতেন, তার চার দেয়ালে দেখা যেত অঙ্ক আর অঙ্ক। গণিতের কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান তিনি করতেন দেয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে। সেই ছিল তাঁর অবসর যাপনের খেলা। আর ছিল অদ্ভুত উপায়ে সেলাই করার অন্য খেলা। লম্বা লম্বা নখ রাখতেন বীরেন্দ্রনাথ। সেই নখ ফুটো করে তাতে সুতো পরাতেন এবং সেই সুতোতে চলতো সেলাই।

অজ্ঞাত এইসব তথ্য আমাকে বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজে দেখেছেন উন্মাদরোগগ্রস্ত গৃহবন্দী তাঁর ন-দাদা বীরেন্দ্রনাথকে। প্রফুল্লময়ী দেবীও তাঁর স্মৃতিকথায় নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা অসাধারণ। দুর্ঘটনায় অসুস্থ হয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা যান বলেন্দ্রনাথ—১৮৯৯ সালে। যে দিন তাঁর মৃত্যু ঘটে, সেই সময় ঘরের ভিতর বীরেন্দ্রনাথের কী ছটফটানি। বন্ধ দরজায় বার বার আঘাত করে কেবলই চিৎকার করেছেন—"আমায় বাইরে নিয়ে যাও,

আমায় বাইরে নিয়ে যাও।" একমাত্র পুত্রের শোকাবহ মৃত্যুর ইঙ্গিত তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, নইলে এত উতলা হতেন না।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে আর একজন পাগল ছিলেন। তিনি সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯—১৯২৩)। রবীন্দ্রনাথ আর তিনি পিঠোপিঠি ভাই। শৈশব থেকেই দু-জনে গলায় গলায় ভাব, তাঁদের দু'জনের তৃতীয় সঙ্গী ছিলেন ভাগনে সত্যপ্রসাদ—বড় দিদি সৌদামিনীর ছেলে।

রবীন্দ্রনাথের অখ্যাত দাদাদের মধ্যে সবচেয়ে গুণী সোমেন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন ৬৪ বৎসর। সোমেন্দ্রনাথের উন্মাদ রোগ বাল্যে বা কৈশোরে দেখা যায় নি, যৌবনে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার প্রধান উৎসাহদাতা। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'-এর তিনিই প্রকাশক। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"আমার দাদা আমার এই-সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার ন্যাশনাল পেপার পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কহিলেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন-না।' শুনাইতে বিলম্ব হইল না।"

সোমেন্দ্রনাথ পাগল হয়ে যাওয়ার পরও তার ভ্রাতৃপ্রেম যায়নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর নিজের ভাই যে কবিতা লিখে নাম করেছেন, তার জন্য গর্ব অনুভব করতেন। তবে প্রায়ই বলতেন, "রবি ভালো কবিতা লেখে বটে, কিন্তু তাঁর লেখা গান ভালো নয়, চমৎকার গান লিখেছেন জ্যোতিদাদা।" বলেই তিনি অলীকবাবু-র গান গাইতে শুরু করতেন গলা ছেড়ে। ভালো গানের গলা ছিল তাঁর।

রবীন্দ্রনাথ যেবার নোবেল প্রাইজ পেলেন, সোমেন্দ্রনাথের কী আনন্দ। সারা বাড় দৌড়ে বেড়ান আর চিৎকার করেন—"রবি প্রাইজ পেয়েছে, রবি প্রাইজ পেয়েছে।" আবার নাতিরা যখন তাঁর কাছে যায়, তিনি তাঁর ঘরের ভিতর তাদের ডেকে এনে ফিসফিস করে বলেন, "একটা কথা জানিস? গীতাঞ্জলির সব কটি কবিতা কিন্তু আমার লেখা। রবি আমার কাছ থেকেই তো নিয়েছে।"

এই কথা শুনে নাতিরা যখন বলেন, "তাহলে তুমি এতো আনন্দ করছো কেন," সোমেন্দ্রনাথ তখন ক্ষেপে যান, চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করে বলেন, "তোদের এত হিংসে কেন রে, আমার ছোট ভাই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে আমি আনন্দ করব না তো কে করবে? কার লেখা তাতে কী?"

এই সব কাহিনীও শ্রীযুক্ত অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শোনা। তিনি নাতিদেরই একজন। তিনি আরও বলেছেন, জোড়াসাঁকো বাড়িতে বাইরের কেউ

এলে তাঁকে সোমেন্দ্রনাথ ধরে নিয়ে বলতেন, "চলো আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়িতে একজন কেরাণী আছে, তাঁকে দেখাবো চলো।" তেতলার ঘরে রচনায় নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন—"ওই দ্যাখো কেরাণী, কলম পিষছে তো পিষছেই।" তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যদি ঠিক মত লিখতেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় লেখক হতেন। সোমেন্দ্রনাথ অবশ্য ললিত রাগে একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন—"দেখিতে তরঙ্গময় ভবপারাবার।" এই গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেন, "দাদার যা অবস্থা, তাতে তিনি সব কিছু তরঙ্গময় তো দেখবেনই।"

অখ্যাত সোমেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা গল্প আছে। তার কিছু কিছু আমি নির্ভরযোগ্য নানা সূত্র থেকে উদ্ধার করেছি। সব মেলালে দেখা যাবে উন্মাদ রোগগ্রস্ত সোমেন্দ্রনাথ মানুষটি অত্যন্ত সরস, অতীব বিচিত্র। প্রতিভা ও পাগলামি সামান্য হেরফের, দুই প্রান্তে অবস্থিত। এই হেরফের না ঘটলে পাগলও প্রতিভাবান হতে পারেন। তাছাড়া প্রতিভার বিকাশ এক ধরণের পাগলামি নয়তো কী! জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিভা ও পাগলামির সহাবস্থান এই কথাই প্রমাণ করে যে পাগল সোমেন্দ্রনাথও মূলত প্রতিভাবান। বিধাতার খেয়ালে তাঁর বিকাশ ঘটলো অসংলগ্নতায়।

ছোটবেলায় সোমেন্দ্রনাথ অবশ্য এমন ছিলেন না। এনট্রান্স পাস করেছিলেন তিনি। তাঁর শৈশব সঙ্গী দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের স্মৃতিতে পরে রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী-র শৈশবসন্ধ্যা কবিতায় লিখেছেন—"মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা শৈশবের কত গল্প, কত বাল্য খেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিনজন।" এই তিন সঙ্গীর লেখাপড়া হয়েছে এক সঙ্গে, উপনয়ন হয়েছে এক সঙ্গে—১৮৭৩ সালে। এযাবৎকাল ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন হত বিশুদ্ধ হিন্দুমতে। সেবারই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম অপৌত্তলিকভাবে ও বৈদিক মতে উপনয়ন অনুষ্ঠান করান। এদের উপনয়নের জন্য নতুন মন্ত্র তৈরি করেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সোমেন্দ্রনাথ আমৃত্যু থেকেছেন জোড়াসাঁকোর ছ-নম্বর বাড়ির একতলায়। তাঁর জন্যে ছিল আলাদা চাকর। তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল বিশেষ এক জনের হাতে। মহর্ষি তাঁর এই উন্মাদ পুত্রের বিশেষ ব্যবস্থা করে যান। পরে তাঁর ঘরেই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসার ঘর।

সোমেন্দ্রনাথ পান খেতে ভালোবাসতেন। তাঁকে রোজ পান সেজে দিতেন নাত-বৌ কমলা দেবী—দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী। কমলা দেবী তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন, তাঁকে দেখতে না পেলেই মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে ডাক পাড়তেন—

> 'কম্‌লি কম্‌লি তুই কোথা ছিলি বল্‌,
> তোরে না হেরিয়া চিত্ত হয়েছে বিকল।'

এমনিতে তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন। কথাবার্তা ছিল মোটামুটি স্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে খেপে যেতেন, তখন বেঁধে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হলেই নিজের ঘরে বসে অসংলগ্ন কবিতা বানাতেন মুখে মুখে। তার একটি হল—

একটা পাখি বলে, চোখ গেল,
আর একটা পাখি
বসেছিল ডালে,
তারে মারলে কী বলে ?
আমি অনুমানে বলতে পারি,
চিন্তে ময়রার সে বাপ ছিল।

তিনি যখন একা বসে থাকতেন, হঠাৎ হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ করতেন। শব্দটি হচ্ছে—হা—পি—তু। তাছাড়া একটা মজার গান গাইতেন—

মাণিকপীর ভবনদীর
পারে যাবার না,
জয়নাল ফকিরী নিলে
পানি খেলে না।

গানটি তাঁর মুখে মুখে বানানো, না অন্য কারও রচনা এবং তার মানেই বা কী কিছু বোঝা যায় না।

বীরেন্দ্রনাথ বা সোমেন্দ্রনাথ তো বাড়ির ছেলে, তাছাড়া বাইরের পাগলাদের আড্ডাখানা ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। পাগলাদের পৃষ্ঠপোষক গোড়ায় ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বড় নাতি দ্বিপেন্দ্রনাথ—দ্বিপুবাবু। তাঁর আসরে দেখা যেত কেউ ময়ূর, কেউ টিকটিকি। একজন পেখম মেলে ওড়ার চেষ্টা করছেন, অন্যজন দেয়াল বেয়ে সিলিংয়ে উঠতে চাইছেন। দ্বিপুবাবুর পাগল পোষার খবর পেয়ে বাইরে থেকে নানারকম পাগল আসতে থাকে। এলেই কিছু টাকাও পাওয়া যায়। কিন্তু বিপদ ঘটলো এখানেই। অর্থপ্রাপ্তির সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ামাত্র অনেক নকল পাগল ভিড় জমাতে লাগলো দ্বিপুবাবুর বৈঠকখানায়।

খবরটা গেল সোমেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি ছুটে এসে দ্বিপুবাবুকে বললেন—"নেফিউ, করছ কী, বোগাস পাগল এসে তোমায় ঠকিয়ে যাচ্ছে। আরে, নিজে পাগল না হলে কী করে বুঝবে, কে পাগল, কে পাগল নয়। আমি ঠিক যাচাই করতে পারবো।" শুনে দ্বিপুবাবু বললেন—"ঠিক আছে আংকল, এখন থেকে তুমি থাকবে বৈঠকখানায়, তুমিই টেস্ট করবে কে আসল পাগল।"

দ্বিপুবাবু আর সোমেন্দ্রনাথ প্রায় সমবয়সী ছিলেন বলে দুজনে নেফিউ ও আংকল ডাকতেন।

এরপর কোন পাগল এলেই সোমেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেন। তিনি নিজে

ঠকাস করে দেয়ালে মাথা ঠুকে আগন্তুককে বলেন 'মাথা ঠুকো।' যে পাগল অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ নিজের মাথা দেয়ালে মারে, সোমেন্দ্রনাথ তাকে পাস করান। সে তখন দ্বিপুবাবুর কাছে গিয়ে পাগলামি বাবদ টাকা নেয়। আর যে পাগল মাথা ঠুকতে একটু ইতস্তত করে, সোমেন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে বলেন—'ভেজাল ভেজাল, পাগল নয় পাগল নয়।' সে আর দ্বিপুবাবুর আসরে যাবার সুযোগ পায় না, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়।

তারপর নতুন পাগল আসে। সোমেন্দ্রনাথ তার সামনে ধপাস করে হঠাৎ লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে যান, পাগলকে উদ্দেশ্যে করে বলেন—'ঠিক আমার মত মাটিতে পড়।' ইতস্তত না করলে পাস, আর 'পড়ব কি পড়ব না'—এইভাব দেখালেই ফেল। এইভাবে পাগল যাচাই চলেছে দিনের পর দিন এবং নতুন একটা দায়িত্ব পেয়ে সোমেন্দ্রনাথ খুশি।

রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। এক অপ্রকৃতিস্থ ভদ্রলোক এঘর সেঘর ঘুরে সোজা রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে হাজির।

কী চাই?—রবীন্দ্রনাথ জানতে চান।

আমার একটা সমস্যা আছে।—ভদ্রলোক জবাব দেন।

কী সমস্যা আপনার?—রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

ভদ্রলোক তখন সবিস্তারে তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, 'দেখুন মশায় কী জ্বালাতন, দশখানা লুচি খেলে আমার পেট ভরে যায়, কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে রোজ পনেরোখানা লুচি খাওয়াবেই। কী করি বলুন তো?"

অসহায় রবীন্দ্রনাথ লেখা থামিয়ে ভদ্রলোকের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন, তারপর বলেন, "আমি তার কী করতে পারি?"

ভদ্রলোক বলেন, "শুনেছি এই বাড়িতে নানারকম সমস্যার সমাধান হয়, তাই ছুটে এলাম।"

রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে বলেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন, তবে ভুল করে এখানে এসে পড়েছেন। আপনি সিঁড়ি বেয়ে ওদিকে চলে যান। ডান দিকে এক বিরাট বৈঠকখানা দেখতে পাবেন। সেখানে বিরাটাকায় এক ভদ্রলোক বিরাট গোঁফ নিয়ে বসে আছেন। তাঁকে বলুন, তিনিই সব সমাধান করে দেবেন।"

ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে চলে যান। যান দ্বিপুবাবুর ঘরে। আশা করা যায় আংকল সোমেন্দ্রনাথের সাহায্যে নেফিউ দ্বিপেন্দ্রনাথ লুচির সংখ্যা নিয়ে বিব্রত ভদ্রলোকের একটা সুরাহা করে দিয়েছিলেন।

দ্বিপেন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের কাছেও নানারকম পাগলের আনাগোনা ছিল। আসতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা ও ইয়েটসের গুরু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভাই, সাহিত্যিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাকা সজনীমোহন। তার পরণে থাকতো মেমসাহেবের গাউন আর হ্যাট। আর

আসতেন চম্পটিবাবু, শুধুমাত্র সেমিজ পরে। পুলিস কোর্টের উকিল প্রফুল্ল ব্যানার্জিও আসতেন। তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন 'মিলটন অব বেঙ্গল' বলে। তাছাড়া নিত্য যাতায়াত ছিল আর এক পাগলের। তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ। তাঁর হাতে থাকতো একটা খেলনা মেশিনগান। এসেই তিনি মেশিনগানটা ফিট করতেন রবীন্দ্রনাথের ঘরের দিকে। কোন কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর রাগ ছিল, বলতেন— "এই মেশিনগানের গুলিতে রবিঠাকুরকে ঠান্ডা করে দেবো।" সোমেন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "কেন, কেন, রবিকে গুলি করবে কেন?"

জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় চোখ পাকিয়ে জবাব দিতেন, "কী আশ্চর্য, জানেন না? লর্ড কিচেনার আমায় এই হুকুম দিয়েছেন যে!" লর্ড কিচেনারের নাম শুনে সোমেন্দ্রনাথ বলতেন—"ও, তাই বুঝি? বেশ বেশ।"

সুধীন্দ্রনাথের কাছে পাগলা ছাড়া জ্ঞানীগুণীও অনেক আসতেন। তিনি নিজে ছিলেন খ্যাতনামা গল্পকার এবং লেখক, 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক। এই সব গুণীদের আগমনে আবার নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। একবার এক প্রকৃতিস্থ ভদ্রলোক এলেন সুধীন্দ্রনাথের ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখেন সুধীন্দ্রনাথ নেই, আছেন তাঁর কাকা সোমেন্দ্রনাথ। ভদ্রলোক বললেন, "সুধীবাবু আছেন?"

সোমেন্দ্রনাথ তখন এই ঘরে বসেই ভাত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "কেন, কাকে চাই?"

ভদ্রলোক জানালেন, তিনি সুধীবাবুর বন্ধু, তাঁর সঙ্গে কাজ আছে।

কথাটি শোনামাত্র সোমেন্দ্রনাথ ভাতের থালা ফেলে লাফ মেরে এগিয়ে এলেন, এসেই এঁটো হাতে আগন্তুক ভদ্রলোকের হাত টেনে নিয়ে ভীষণ জোরে চেপে করমর্দন শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, "আপনি সুধীর বন্ধু? ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ।"

এঁটো হাতের চাপে ভদ্রলোকের তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক। চিৎকার শুনে সুধীন্দ্রনাথ অন্য ঘর থেকে দৌড়ে এসে বললেন, "এ কী হচ্ছে সোমকাকা, হাত ছাড়ো?"

সোমেন্দ্রনাথ তখনও হাত ছাড়েন নি, তাঁর নিজের হাতের ভাত-ডাল-তরকারি ওই ভদ্রলোকের হাতে মাখাতে মাখাতে তখনও বলে চলেছেন, "ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ।"

অগত্যা সুধীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে হাত ছাড়ালেন। কাকাকে এক ধমক দিতেই সোমেন্দ্রনাথ ফ্যালফ্যাল করে বলেন, "ভদ্রলোক বললেন যে তোমার বন্ধু, তাইতো তাঁকে একটু আপ্যায়ন করেছিলুম। হাজার হোক তিনি তোমার বন্ধু তো।"

আগেই বলেছি, অকৃতদার সোমেন্দ্রনাথের সারা জীবন কাটে জোড়াসাঁকো বাড়িতেই। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন কোথাও তিনি যান নি। আপন মনেই

থাকতেন। মাঝে মাঝে যখন উন্মাদ রোগ প্রবল হতো, ন-দাদা বীরেন্দ্রনাথের মত তাঁকেও বেঁধে রাখতে হতো। সে সময় তিনি গলা ছেড়ে চিৎকার করতেন, 'বন্ধন মোচন করো, বন্ধন মোচন করো।' সারা জোড়াসাঁকো বাড়ি সেই চিৎকারে গমগম করতো, প্রতিধ্বনি ফিরত ঘরে ঘরে—'বন্ধন মোচন করো।' সবাই সচকিত হতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের ধ্যান ভাঙতো, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো বন্ধ হতো, রবীন্দ্রনাথের লেখা থামতো, ছোট ছেলেমেয়েরা দাসীর আঁচলে মুখ লুকাতো। এক দিন রাত্রে দাঁড় ছিঁড়ে সোমেন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। এলেন হল ঘরে। সেখানে পূর্বপুরুষদের বিরাট বিরাট তৈলচিত্র। নীলমণি, রামমণি, দ্বারকানাথ। আর আছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। সোমেন্দ্রনাথ তীব্র বেগে ছুটে বেড়ান সারা হল ঘর। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার পাড়েন—'ইনিই, ইনিই আমাকে বিয়ে দেন নি।' উত্তেজনার চোটে পায়ের জুতো ছুঁড়ে মারেন পিতার তৈলচিত্রের দিকে। পাদুকাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে পিতামহ দ্বারকানাথের তৈলচিত্রে। চিত্রটির একাংশ ছিন্ন হয়ে যায়। সোমেন্দ্রনাথ হা-হা অট্টহাস্য করে ওঠেন। আর যেন বিরাট সেই হল ঘরে ক্রুদ্ধ উন্মত্ত পৌত্রের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ। ঝাড়লণ্ঠন নিভে গেছে। চারদিক নিঃস্তব্ধ নিঝুম। কেবল বীরেন্দ্রনাথের ঘর থেকে ভেসে ভেসে আসে গানের কলি। উন্মাদ শ্বশুরকে ঘুম পাড়াতে গুন গুন গান গাইছেন, বিধবা পুত্রবধূ সাহানা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে সেই মুহূর্তে অলৌকিক এক ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়।

সোমেন্দ্রনাথের অট্টহাস্য তখনও থামে নি। হল ঘরে তখনও তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্রুদ্ধ সিংহের মত। ভোরের আলো কখন ফুটে উঠেছে খেয়াল নেই।

মেয়ের ডাক নাম পদ্ম। মা-বাবা তাই ডাকেন। মেয়ের আর এক নাম ফুলি। ফুলতলায় বাড়ি, তাই ফুলি। ফুলতলা খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের একটি পাড়া। সেই পাড়াতেই মেয়েটি জন্ম নিয়েছিল ১২৮০ সালে।

সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাবা বেণীমাধব রায়চৌধুরী কাজ করেন জমিদারী সেরেস্তায়। জমিদার বাবুমশায়রা কলকাতার নামকরা লোক। ফুলি গ্রাম্য পরিবেশেই মানুষ হতে থাকেন। রান্নাবান্না, ঘরকন্নার কাজেই মেতে থাকেন সারা দিন। লেখাপড়ার শখ ছিল, কিন্তু পড়বেন কোথায়? গ্রামের কাছাকাছি কোন বড় ইস্কুল নেই, তাই ওই পাঠশালাতেই প্রথম মাস পর্যন্ত আসা যাওয়া করেই তার বিদ্যাচর্চার ইতি।

সেই ফুলির যখন বয়স দশ কি এগারো, কপালে ছিঁড়ল শিকে, দূরদেশের এক রাজপুত্রের খবর এল তাঁদের বাড়িতে। রাজপুত্রটি যেমন নামী, তেমনি দামী। তাঁর বয়স তখন কুড়ি-একুশ, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তিনি খ্যাতিমান? আর রূপ? দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, রাজপুত্র তো নয়, সাক্ষাৎ দেবদূত। সেই ধনীর দুলালের সঙ্গে এল ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ। ফুলির বাবা বেণীমাধব আহ্লাদে আটখানা। একমাত্র পিরালিত্ব ছাড়া আর কোন মিল নেই দুই পরিবারে। কোথায় দক্ষিণডিহি গ্রামের গরিব ঘরের সাধারণ একটি মেয়ে, যার না আছে রূপ, না আছে গুণ, আর কোথায় কলকাতার অভিজাত পরিবারের কুলপ্রদীপ তাঁদেরই বাবুমশায়।

বাবুমশায়ই তো, যে জমিদারী সেরেস্তার তিনি কাজ করেন, সেই ধনী মানী পরিবারের ছোটছেলের সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে ফুলির। বাবুমশায়দের আদিনিবাস ছিল যশোর-খুলনায়। তাই বরাবর মেয়ে যায় এই তল্লাট থেকে। ছোটবাবুমশায়ের জন্যেও জমিদার বাড়ির লোকজনেরা কলকাতা থেকে নৌকো করে মেয়ের খোঁজে এসেছিলেন, তাঁরাই পছন্দ করে গিয়েছেন ফুলিকে। বিয়ের তারিখ ঠিক হল ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০। জমিদারবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী পাত্রী-পক্ষ সদলবলে কলকাতা চলে এলেন, বিয়ে হবে কন্যাহরানে, মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করার রেওয়াজ পাত্রপক্ষের নেই।

পাত্রের মা নেই, বাবা তখনও বেঁচে। নামকরা লোক। বিরাট পরিবারের ছোট ছেলে, সকলের আদরের। ইতিমধ্যে দু'চারখানা বই লিখে নামও করেছেন। তিনি গাইতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন, আর কবিতা লিখতে পারেন অনর্গল। তাছাড়া যৌবন-বেদনারসে তাঁর সেদিনের দিনগুলি উচ্ছল। বেণী-মাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ফুলির সঙ্গে বিয়েতে তিনি সম্মতি দিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একটি অভিনব নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন। অন্তরঙ্গ সহচর প্রিয়নাথ সেনকে লিখলেন—

প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি—

অনুগত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হ্যাঁ পাত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর পাত্রী ফুলি। এই ফুলিই ভবতারিণী, বিয়ের পর স্বামী তাঁর নাম রাখেন মৃণালিনী—মৃণালিনী ঠাকুর। ডাক নাম পদ্ম-র সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নাম। এই 'পদ্ম' নামের কথা আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবীর ভাইপো যগেন্থনাথ রায়চৌধুরীর ছেলে বীরেন্দ্রনাথ।

রবিঅনুরাগিনী গ্রন্থে মৃণালিনী দেবীর কথা আলাদা লিখেছি। এই রচনাটি তার আগেকার মূল বইয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এটিও ছাপা হল। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই। পারিবারিক বেনারসী শাল গায়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে। স্ত্রী আচারের সরঞ্জাম সেখানে সাজানো। ধুতি আর শাল গায়ে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপরে। রবীন্দ্রনাথের নতুন বোঠান কাদম্বরী দেবী, মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ ভাইঝিরা, হেমলতা দেবী প্রমুখ ভ্রাতুষ্পুত্রবধূরা বর-কনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কাদম্বরী দেবীর এক আত্মীয়া কালো রঙের বেনারসী ডুরে পরে বরণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। ওদিকে সদ্য গ্রাম থেকে আসা পাত্রীটি ভয়ে জড়সড়। শাড়িতে গয়নায় রোগা শরীর ঢাকা। চেলির ফাঁকে দেখা যায় অসহায় দুটি চোখ আর নাকের নোলক।

সাতপাক ঘোরানোর পর কাপড় গিঁটে বেঁধে বর কনে দুজনে দালানে গেলেন সম্প্রদান-অনুষ্ঠানে। সম্প্রদানের পর বাসর। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তাঁর থাকবার জন্যে একটি ঘর আলাদা করে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরেই বসল বাসর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহবাসর। বাসরে উপস্থিত ঠাকুর বাড়ির আর একজন বধূ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা দেবীর জবানীতেই বাসর ঘরের বর্ণনা শোনা যাক।—

'ভাঁড়কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলো ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়কুলো খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন, "ও কী করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উলটে পালটে দিচ্ছিস কেন?" রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি. নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "জানো না কাকিমা—সব যে উলটপালট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বাকসিদ্ধ মানুষ, কথায় তাঁকে হারাতে পারবে না কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন, "তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে—তুই এমন গাইয়ে থাকতে?" রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কী চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে, বুঝতে পারবে না। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে, তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে। বাসরে গান জুড়ে দিলেন—

আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী
পূর্ণিমা জ্যোছনা দিয়ে
মার্জিত বদন খানি।
নেহারিয়া রূপ হায়
আঁখি না ফিরিতে চায়
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী
কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারি কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নেই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।"

নতুন বৌ, বাড়ীর সবচেয়ে ছোট বৌ। ধীরে ধীরে আড়ষ্টতা কাটতে লাগল মৃণালিনী দেবীর। রবীন্দ্রনাথ কখনও ডাকেন 'ছোটবৌ' কখনও আদর করে ডাকেন 'ভাই ছুটি'। স্ত্রীকে লেখা কবির বহু চিঠি 'ভাই ছুটি' সম্বোধনে।

অসাধারণ ব্যক্তির সাধারণ পত্নী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ভালোবাসার কোন ঘাটতি ছিল না। গ্রাম্য বালিকাটিকে অতি সমাদরে তিনি কাছে টেনে নিলেন। আর মৃণালিনী দেবী? তিনি তাঁর চরিত্রগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। পুত্রকন্যাদের ব্যাপারে মহর্ষিদেবের এই শেষ সামাজিক কর্তব্য অনুষ্ঠান। বিয়ের পর কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে শিক্ষায় দীক্ষায় ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের সমতুল্য করার জন্যে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন। লরেটোতে তাঁর ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা

হল এবং সংস্কৃত শেখাবার জন্যে নিয়মিত বাড়িতে আসতে লাগলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত মৃণালিনী মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণের গল্পাংশ অনুবাদ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে। তবে সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে উপনিষদ থেকে তাঁর কিছু বাংলা অনুবাদ। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রধানত জন্মেছিল বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত বাংলা ইংরেজীতে যে সব বই পড়তেন, তাঁর কাকিমাকে সেগুলি পড়ে শোনাতেন এবং এইভাবে শুনে শুনে এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতার বাইরে প্রথম গেলেন গাজিপুর। প্রথম সন্তান বেলার জন্মের পর, ১৮৮৭ সালে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবি জীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মতো করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের মধ্যে বাসে কবি-পত্নীর সে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণই ছিল। গাজিপুর বাসে পৃথক সাংসারিক জীবনের সূত্রপাতে তাহা এই প্রথম কার্যে পরিণত হইল। পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় এখন প্রথম পাইলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে—প্রণয়িনীরূপে।"

গাজিপুর বাসের পরিণতি শিলাইদহে। রবীন্দ্রনাথ যখন পৈত্রিক জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আশ্রয় নিলেন, সেখানে গৃহিণীরূপে অধিষ্ঠিতা হলেন মৃণালিনী দেবী. দুই পুত্র তিন কন্যা ও স্বামীকে নিয়ে সাজালেন তাঁর সুখের সংসার। নিজের হাতে রান্নাবান্না ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ এবং প্রজাদের সুখ শান্তির দিকে নজর—একেবারে কল্যাণী মূর্তি। প্রজারা তাঁকে ডাকতো 'মা' বলে। বাবুমশায়কে তাঁরা যা বলতে পারতো না, বলতো মা-কে এবং মা তাদের আবদার সহ্য করে দরবার করতেন স্বামীর কাছে। পরিণামে গরিব প্রজার খাজনা মকুব হতো, পাইকের মাহিনা বৃদ্ধি পেতো, রাস্তা তৈরির টাকা মিলত। শিলাইদহ বাস যে-ই চুকলো, রবীন্দ্রনাথের সুখের সংসারও ভাঙলো। সেখান থেকে শান্তিনিকেতন এবং পরবর্তী এক-বছরের মাথায় সর্বনাশ।

মৃণালিনী দেবীর সাজপোশাক কেমন ছিল? অতি সাধারণ। গহনা পরতেন অতি অল্প। হেমলতা দেবী জানাচ্ছেন, তাদের ধরা-ধরিতে কবিপত্নী একবার কানে দুটি ঝোলানো বীরবৌলি পরে ছিলেন, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ সামনে এসে পড়ায় লজ্জায় দু-কানে হাত চাপা দিলেন, টানাটানি করেও হাত নামানো যায় নি। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলতেন, কিন্তু নিজে কখনও সাজতেন না। "বড়ো বড়ো ভাসুরপো ভাগনেরা চার দিকে ঘুরছে, আমি আবার কী সাজব"— এই ছিল তাঁর মনের ভাব। মৃণালিনী দেবী একবার খুব সাধ করে স্বামীকে

সোনার বোতাম গড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জন্মদিনে। বোতাম দেখে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বলেন, "ছি ছি, পুরুষ মানুষে কখনও সোনা পরে ?"

১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে প্রবাসীতে 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়ে হেমলতা দেবী অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার কিয়দংশ পুনর্লিখনের লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

কবিপত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরি করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন, তাঁরা আর ভোলেননি। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজ স্বর্গীয় জগদীন্দ্রনাথ রায় কবিপত্নীর হাতের তৈরি দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। নতুন নতুন রান্না আবিষ্কারের শখ কম ছিল না কবিরও। বোধহয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ সম্বন্ধে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশি। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নতুন রান্নার ফরমাশ করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না। নতুন মালমসলা দিয়ে নতুন প্রণালীতে নতুন রান্না শিখিয়ে কবি শখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, "দেখলে, তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।"

তিনি চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে ? জিতেই আছ সব বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারতো না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর করেই চলেছেন। জন্ম হতে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন ওই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনায়াসে।······স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময়ে কবিপত্নীকে বলতাম, "বলুন না কাকিমা, কাকামশায়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।" কবিপত্নী বলতেন, "তোমরা চেনো না, বললে জেদ বাড়বে. না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তারপরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

পথযাত্রায় গৃহস্থালি সরঞ্জাম দু একটি বেশী সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে সেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন ?—পুরুষদের কথা। সময়কাল অভাবে ঠেকতে না হয়—মেয়েদের ভাব। কবিপত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক করে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন, "দেখতো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, ভাজ সিঙ্গাড়া,

ভাজো নিমকি-কচুরি—তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্রবোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে, সে কথা বলে কে ?"

মৃণালিনী দেবী এই রান্না-বান্না নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসতেন। আর খাওয়াতে ভালবাসতেন খুব। তার সাক্ষ্য দিয়েছেন অনেকে। চিত্তরঞ্জন দাশের ছোটবোন ঊর্মিলা দেবী জানাচ্ছেন : রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড়ো তৃপ্তি পেতেন মৃণালিনী দেবী। আমার দাদা (সি. আর. দাশ) যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে বলতে উঠতেন, 'কাকিমা আজ কিন্তু লুচি মাংস খাব।' তক্ষুনি তিনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন। কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কন্ঠে 'ছোট বউ' 'ছোট বউ' করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগতো শুনে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য : বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে। মা ছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেই জন্যই ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটো বৌ হলে কি হয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তাঁর কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখ দুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনদিন কর্তৃত্ব করতে হয় নি, ভালবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেই জন্য ছোটরা যেমন তাঁকে সমীহ করত, বড়রা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বলুদাদা অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখছেন : বলুর বিবাহে খুবই ঘটা হইয়াছিল। আমার ছোট জা মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়-স্বজন সব সঙ্গে লইয়া নানারকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটি খুব সরল ছিল, সেই জন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

•

এবারে কয়েকটি ছবি। নানাজনের সাক্ষ্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ গুণগুণ করে সুর ভাঁজছেন, কথা বসাচ্ছেন। বড়ো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গান রচনা যে-ই শেষ হচ্ছিল, অমনি চিৎকার পেড়ে ডাকলেন, "অমলা, ও অমলা (অমলা দাশ) শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু।" মৃণালিনী দেবী হেসে বললেন, "এমন মানুষ আর কখনও দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়।" রবীন্দ্রনাথ তক্ষুনি হেসে জবাব দিলেন, "অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয় ছোট বউ, চিনলে না তো।"

এক দিন রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, "ছোটবৌ, রাণীর (মেজমেয়ে) বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটে দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে।" মৃণালিনী

দেবী অবাক হয়ে বললেন, "তুমি বল কি গো, এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে?" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ছেলেটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে ছোটবৌ, যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব।" মৃণালিনী দেবী বললেন, "এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কী করে হবে?"—"হবে হবে সব হবে, কলকাতা শহরে নাকি কিছু আটকায়? তুমি শুধু একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাওতো ছোটবৌ, সব ঠিক হয়ে যাবে"—রবীন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ জবাব।

মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসছেন। ঠাকুর চাকর আমলারা বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়ে। মৃণালিনী দেবী চোখের জল মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন। কেউ ডাকল 'মা' বলে, কেউ ডাকল 'মাইজি' বলে। মৃণালিনী দেবী স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে বললেন, "শান্ত হও, আমি আবার আসব। তোমাদের কি কখনো ভুলতে পারি।"

শিলাইদহের বাস তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন শান্তিনিকেতন, এলেন নতুন ইস্কুলের দায়িত্ব নিয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে। সঙ্গে নাবালক পুত্রকন্যা এবং সহধর্মিণী মৃণালিনী। জোড়াসাঁকো বাড়ির গৃহলক্ষ্মী শান্তিনিকেতনে এসে হলেন আশ্রমজননী। নতুন নতুন ছাত্র এলেন বিদ্যালয়ে, মৃণালিনী দেবী তাদের মায়ের অভাব পূর্ণ করলেন স্নেহ মমতা ভালবাসায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত। পুরীর বাড়ী বিক্রি করেও ধার শোধ হল না। সেই মুহূর্তে এগিয়ে এলেন মৃণালিনী, গায়ের সমস্ত গয়না খুলে স্বামীর হাতে দিলেন, বললেন, "আমার যা আছে সব নাও, ইস্কুল চালাও।"

রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত, আনন্দিত। এতদিন পর সহধর্মিণী হলেন সহকর্মিণী। শুধু গহনা বিক্রি নয়, বিদ্যালয়ের সব ছাত্রের খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব নিলেন কবিপত্নী, জলখাবার বানিয়ে দিতেন তিনি নিজে। মৃণালিনী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে থাকতে হতো ছাত্রাবাসে। মায়ের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হতো, ছেলেকে বাড়িতে রেখে খাওয়ান, কিন্তু অন্য ছাত্রদের কথা ভেবে তিনি নিজের ছেলের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বিসর্জন দিয়েছিলেন। বরং ছুটির দিন বুধবার সকলকে বাড়ি ডেকে এনে আলাদা খাওয়াতেন নিজের হাতে রান্না করে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁর চমৎকার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আমরা সবাই মিলে মায়ের ভাঁড়ার ঘর লুঠ করতাম।"

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন—

তখন অবশ্য তিনি (মৃণালিনী দেবী) ছিলেন। এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে।...আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয় নি, তাতে কিছুই এসে

যায় নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ করে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হল, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল।

ভয়ানক অসুখ? হ্যাঁ, তাই। ১৯০১ সালে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে, ১৯০২ সালেই সব শেষ। পরবর্তী ঘটনাবলী আমার অক্ষম লেখনীতে প্রকাশ করব না, মৃণালিনী দেবীর সুযোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষার সাহায্য নিলাম। তিনি বলছেন—

শান্তিনিকেতনে কয়েকমাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল। যখন নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া—আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি—কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে—এইসব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে। একসময় নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা-পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর—তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য সাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভাল লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম। তারপর কত বছর গেছে, প্রতিবারই বোলপুর-কলকাতা যাতায়াতের সময় সেই পদ্মপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই—পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে আর ফোটে না।

কলকাতায় এসে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা—প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এবিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয় নি। মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাতে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে

আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম ; কোন সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম, আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম। এক মাস ধরে তিনি অহোরাত্র মা'র সেবা করেছেন, নার্স রাখতে দেন নি, শ্রান্তিতে শরীর মন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, "এটা তোর কাছে রেখে দিস্, তোকে দিলুম।" এই দু'টি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের সেই চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথের কথা শেষ। এবার আসুন ভাসুরপো দ্বীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতা দেবীর বর্ণনা।—

আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্নী অনেকবার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমোও ঘুমোও, শমীকে রেখে এলেন, আমি কি ঘুমোতে পারি তাকে ছেড়ে। বোঝেন না সেটা।"

তারপর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য।—মৃণালিনী দেবী তখন শয্যাগত, সেই সময়ে তাঁহার পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় ভাইঝি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"পিসিমা, আমি শয্যাগত, ছেলেমেয়েদের বড়ো কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, তাদের ভার নিলে নিশ্চিত হতে পারি।" পিসিমা ভাইঝির কথা রক্ষা করেছিলেন। সেই দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ উন্মনা। মাত্র ২৮ বছরের স্ত্রীকে শেষ নিদ্রায় শুইয়ে দিয়ে শেষবারের মতো জীবনসঙ্গিনীর কাছে বিদায় নিলেন। চলে গেলেন বাড়ির ছাদে। বারণ করে গেলেন কেউ যেন তাঁর কাছে না যায়।

সারা রাত ছাদে বসে অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। ভোরবেলা পূর্বাস্য হয়ে সূর্যপ্রণাম সেরে নেমে এলেন নিচে! তারপর আবার বিশ্বসংসারের সঙ্গে মোকাবিলা। রয়েছে শান্তিনিকেতন, রয়েছে শিলাইদা, রয়েছে সাহিত্যচর্চা এবং সর্বোপরি নাবালক পুত্রকন্যাদের পরিচর্যা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ৪১। সেই সময় মহর্ষিদেব কনিষ্ঠপুত্রের পত্নীবিয়োগের সংবাদে বলেন—"রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোটো ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।"

পত্নীবিয়োগের পর কবি হলেন নিরামিষাশী। এমন কি অনেক সময় ভাত-রুটি ছেড়ে দিয়ে শুধু ভিজানো ছোলা, ভিজানো মুগ ডাল খেয়ে দিন কাটান। বাড়ির সকলে কত অনুরোধ করেন, পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপন সিদ্ধান্তে অটল।

খবরটি পৌঁছল মৃণালিনী দেবীর মা রবীন্দ্রনাথের শাশুড়ির কাছে। তিনি তখন ফুলতলা ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে থাকতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় আমিষ খাবারগুলি বাটিতে বাটিতে সাজিয়ে জামাইকে খেতে বসালেন। তার মধ্যে চই দিয়ে কই মাছও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো খেতে নারাজ, শাশুড়িঠাকরুণও নাছোড়বান্দা, শেষমেষ রবীন্দ্রনাথকে নতিস্বীকার করতে হল।

স্ত্রী চিরবিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরও নিঃসঙ্গ। শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে আরও জড়ালেন। কিন্তু মনটা সব সময় হু হু করে। সেই হাহাকার ছন্দোবদ্ধ হয়ে ধরা পড়ল "স্মরণ" কবিতাগ্রন্থে। পরলোকগতা পত্নীর স্মরণে রচিত হল একের পর এক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যে মিশে গেল মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর মাধুরী। তিনি বললেন,

"গেলে যদি একেবারে, গেলে রিক্তহাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলেনা কি সাথে ?
বিশ বৎসরের যে সুখদুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।"

তারপর আবার বললেন—"মৃত্যুর নেপথ্য হতে আর বার এলে তুমি ফিরে নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে নিঃশব্দ চরণপাতে, ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি ঘুচেছে মরণস্নানে।"

'স্বল্প আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন' মৃণালিনী দেবী পেয়েছিলেন, তারই স্মৃতিতে কবি বিভোর। খুঁজতে খুঁজতে পেলেন 'স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি' প্রিয়তম পত্নীর 'খানকয় পুরাতন চিঠি।'

অসাধারণ সেই চিঠি। একটি গ্রাম্য মেয়ের উত্তরণের সাক্ষী সেই চিঠি। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি ভালো শিখেছিলেন মৃণালিনী দেবী। তাঁর চিঠির ভাষাও চমৎকার। তাঁর বড় ভাসুর দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুররের মা, চারুবালা দেবীকে একটা চিঠিতে লিখছেন—

চারু, অনেকদিন পর তোমার একখানা চিঠি পেলুম। তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি, পাছে আমি হিংসা করি! তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত কুন্তলীন মাখতে আরম্ভ করেছি। তোমার মেয়ে মাথাভরা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়ামাথা দেখে হাঁসবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবেনা······

আর একখানা চিঠি। ভাগনে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা—

'আগেকার যে পঞ্চাশ টাকা আমার নামে সরকারীতে হাওলাত আছে, আর সেদিন যে চল্লিশ টাকা নিয়েছি এ নব্বুই টাকা এ মাসে কেটে নিও না। আগামী মাসে কেটে নিও। এ মাসে কেটে নিলে আমার খরচ চলা অসম্ভব। মাসকাবারি কবে বেরোবে? আমার টাকাটা আজকেই দিতে বলে দিও। আমার কাছে মোটে টাকা নেই।'

মৃণালিনী দেবীর নিচের চিঠি তাঁর বাবা বেণীমাধব রায়চৌধুরীকে লেখা। তাতে নগেন্দ্র নামে যাঁর উল্লেখ, তিনি কবিপত্নীর ছোটভাই আর বাবামহাশয় মানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

'নগেন্দ্রর চিঠি পেয়েছি। আমাদের এখানে আজ তিন-চার দিন থেকে দিনরাত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের ওখানেও কি বিষ্টি হচ্ছে? আমরা সকলে ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন লিখবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। মৃণালিনী।'

'পুনশ্চ। এর মধ্যে যদি কোন লোক আসে তো তার সঙ্গে কচু ও কলম্বা নেবু পাঠিয়ে দেবেন কিংবা ডাকে পাঠিয়ে দেবেন—অনেক দিন থেকে বাবামহাশয় কচুর কথা বলেছেন। দিদিমার জন্যে একটা চিঠি দিলুম, তাঁকে পড়ে শুনিও।'

এতো গেল একদিক। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বামীকে লেখা মৃণালিনী দেবীর কোন চিঠির হদিস আমি পাই নি। তবে স্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য চিঠিগুলি সংকলিত হয়েছে চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে। তার দু-তিনটির কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

বড়মেয়ে বেলার বিয়ে দিয়েছেন মজঃফরপুরের এক উকিলের সঙ্গে। সেখানে মেয়ে জামাইকে দেখতে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৯০১ সালের ১৬ জুলাই স্ত্রীকে লিখছেন—

"ভাই ছুটি,

তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো, জামাইবাড়ি এসে আমি কী রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবিঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি—

মেয়ের বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে স্ত্রীকে লিখছেন—

"ভাই ছুটি,

বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়—বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে—নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই।

আমি ভেবে দেখলুম, বিবাহের পরে অন্তত কিছুকাল বাবা মায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাকলে তার ব্যাঘাত ঘটে।" ইত্যাদি ইত্যাদি—

১৮৯০ সালে বিলেত থেকে লিখছেন—

'...আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোট-বউ। গাড়িটা ত এখন তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে—রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না।...'

১৮৯১ সালে সাজাদপুর থেকে আর একখানা চিঠির অংশ—

"আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোনরকম উল্লেখমাত্র যে করলে না, তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখচি, অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আসচে। প্রতিমাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে, যেন বিয়ের পূর্বে থেকে তোমার সঙ্গে আমার এইরকম কথা নির্দিষ্ট ছিল... ।"

এইরকম চিঠি প্রচুর। মমতা, ভালবাসা এবং তার সঙ্গে সরসতা মিলে প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি আন্তরিক। স্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ কত ভালবাসতেন প্রত্যেকটি শব্দে তার প্রকাশ। কুড়ি বছর দাম্পত্য-জীবন ভোগ করে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক হলেন, জীবনের বাকি চল্লিশ বছর অন্তরে তার স্মৃতি লালন-পালন করেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পৌত্রবধূ হেমলতা দেবী যখন কবির পছন্দের কথা ভেবে ঘরে তৈরি মিষ্টি এনে দেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বুক কেঁপে ওঠে, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর কথা স্মরণ হয়, হেমলতা দেবীকে বলেন, 'ঘরের মিষ্টি আমার আর দরকার নেই।' বোঝা যায়, স্ত্রীর হাতের তৈরি মিষ্টির কথা মনে পড়ে যায়।

বহুদিন পরে চিত্তরঞ্জন দাশের বোন, মৃণালিনী দেবীর সখী অমলা দাশকে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর প্রসঙ্গে একবার বলেন—'দেখো অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোন সমস্যায় পড়ি, যেটা একা আমার পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয় তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোন দ্বিধা নেই।'

আমার 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' বইতে দেখিয়েছি পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির করার সময় প্ল্যানচেট মারফৎ রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত পত্নীর সম্মতি বা অসম্মতির কথা জানতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্ত্রীর অভাব এখনও তিনি বোধ করেন কি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে ততটা নয়, তবে একটি ব্যাপারে তিনি বড় নিঃসঙ্গ বোধ করেন। 'স্ত্রীর বিদায়ের পর আমার এমন কেউ নেই, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়।'

এই একটি বাক্যে পত্নীবিয়োগকাতর স্বামীর সব কথা ফুটে উঠেছে। কবির প্রিয় 'ছুটি' কোনদিনই কবির জীবন থেকে ছুটি নেন নি।

জননী সারদা দেবী

জননী সারদা দেবী কি রবীন্দ্রসাহিত্যে সত্যিই উপেক্ষিতা? মায়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আঁকেন নি ঠিকই, কবিতায় গানে মা যেখানে এসেছেন, এসেছেন দেশ-জননীরূপে। যখন বলেন 'ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে', তখন এই মা তো জননী জন্মভূমি। 'গোরা' উপন্যাসে মাতৃচরিত আনন্দময়ী আছেন বটে, কিন্তু তিনি তো অবশেষে হয়ে গেলেন ভারতমাতা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক জায়গায় বলেছেন, শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার জন্যে মাতৃচরিত্র তাঁর সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারল না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিজ গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, করেননি কেবল মাকে। বাবাকে দিয়েছেন 'নৈবেদ্য' আর এত বই থাকা সত্ত্বেও মা'র কথা মনে পড়ে নি।

বাহ্যত কথাটা ঠিক, কিন্তু অবচেতন মনেও কি মাতৃস্মৃতি অনুপস্থিত? নিশ্চয়ই না। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করলে সপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি মেলে। শৈশবে মায়ের আদর যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়ার ক্ষোভ নিশ্চয়ই তাঁর ছিল, থাকবারই কথা, তবে নানাভাবে মা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেক জায়গায় এসেছেন।

শান্তিনিকেতন মন্দিরের এক উপাসনার কথাই ধরা যাক। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত তাঁর একটি গল্পের কথা বর্ণনা করেন, বলেন—"আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বাল্যকালে মাতৃহীন। আমার বুড়ো বয়সের জীবনে মা'র অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারে বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী মনে হল জানি না আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখন তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, তুমি এসেছ?—এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।"

এ তো গেল স্বপ্নের কথা। খুঁজলে দু-চারটে কবিতায়ও মাকে পাওয়া যায়। ১৩২৬ সালের আগমনীতে মাতৃবন্দনা নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাওয়া যায়। তার একটির কিয়দংশ হলো—

হে জননী, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরায় শোণিতে তাহা বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবনে সে তো তব আশীর্বাদ।

আর একটি কবিতাও আছে, যেখানে মায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—

পুণ্যময়ী মাতৃভূমি
চিনায়ে দিয়েছ তুমি
তোমা হতে চিনিয়াছি নিখিল মাতারে
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

ওই একই সুরে বাঁধা আরও কয়েকটি কবিতা তুলে ধরছি। জীবনস্মৃতির সম্পাদক গ্রন্থপরিচয়ে তার বিশদ উল্লেখ করেছেন এই সম্বন্ধে।

ওগো মা, তোমারি মাঝে বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিনী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্ব জননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ মা, চলি,
তাহারি পূজায় দিনু তব পুষ্পাঞ্জলি।

জননী সারদা দেবীর স্মৃতি প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছে আরও দুটি কবিতায়—

হে জননী বসিয়াছ মরণের মহাসিংহাসনে?
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভূষণে।
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে।
মোদের উৎসব-মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস।
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিস-করতল,
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল।

উল্লেখ করা ভাল, কবিতা হিসেবে কোনটিই রসোত্তীর্ণ হয় নি। এমন কি নিচেরটিও না—

জননী, তোমার মঙ্গল মূর্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্তি
অমর্ত্য জগতে।
তোমার আশিস দৃষ্টি করিছে আলোক বৃষ্টি
সংসারের পথে।
তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন গো মোদের চিত্ত বরণে জাগায় নিত্য
কুসুম চন্দন।

মাতৃবন্দনা শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে আর একটি কবিতা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে আছে এবং পরবর্তীকালে সুর সংযোগে রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে সুপরিচিত। গানটি হলো—

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু, আজি এ অরুণকিরণরূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।

রবীন্দ্রনাথের মা মারা যান তাঁর ছোট বেলায়। তাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ না পাওয়া গেলেও কিছু কিছু ছড়িয়ে আছে আত্ম-জীবনী-মূলক রচনায়। শিশুকালে যখন যাত্রা শুনতে যেতেন, ঘুম পাওয়া মাত্র বাড়ির চাকর আসর থেকে তুলে নিয়ে মায়ের কাছে ঘুম পাড়িয়ে দিত। যাত্রা শুরু হওয়ার পর মা স্বয়ং তাঁকে জাগিয়ে দেবেন, এই ভরসায় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন মায়ের কোলে কিংবা মায়ের পাশে বিছানায়। মিথ্যে অসুখের নাম করে রবীন্দ্রনাথ যখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যেতে চাইতেন না, তখন মা দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথের উকিল হয়ে। 'ছেলেবেলা' বইয়ে তিনি নিজেই লিখছেন—"পেট কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন. একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন,'আচ্ছা, যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কী লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের

কাছে তো ফিরে যেতেই হতো তার উপরে খেতে হত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল। চিরকালের জন্যে আমার হতো ব্যামোটা।”

মায়ের একটা নিজস্ব মহিলা মহল ছিল অন্দরে। রবীন্দ্রনাথ একটু বড় হওয়া মাত্র ডাক পড়ত সেখানে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিলঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধ্যেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করছে।......এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথিপড়া বিদ্যের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি, সূর্য পৃথিবীর থেকে ন' কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ। মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন' কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ সব শ্লোক, স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।”

রবীন্দ্রনাথ সে সময় “মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল” করে বসে আছেন। জীবনস্মৃতিতে লিখছেন—“পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধানবক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মা'র কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।” রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠ্য বইয়ের দু-চারটে কবিতা পড়ে মা-কে অবাক করে দিতেন। শুধু তাই নয় অন্যের মুখে শোনা পাঁচালির গানও তিনি মা-কে শুনিয়ে দিয়ে বাহবা আদায় করেছেন। তারপর এলো মূল রামায়ণ পাঠ। “পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর-আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।' হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশতঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, যে-মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে 'ভুলিয়া গেছি' বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং, ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জনা করিয়াছেন, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না। মা মনে করিলেন, আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর-সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, 'একবার

দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।' তখন মনে-মনে সমূহ বিপদ গনিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন, 'রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্ না।' পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধহয় কোন-একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মায়ের মৃত্যুও রবীন্দ্রনাথের মনে বেশ দাগ কাটে।—"যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।' তখনই বউ ঠাকুরানি তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশংকা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না; সে দিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম, তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। ...কেবল যখন তাঁর দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম, তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর-একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।"

শুধু বিরাট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ঘরকরনার মধ্যে নয়, সারদা দেবী তাঁর খ্যাতিমান কনিষ্ঠ পুত্রের বিশাল রচনাবলীর মধ্যে তাঁর 'আপন আসনটিতে' এসেও বসতে পারলেন না। তার জন্যে দায়ী মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসার অভাব বা পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহের অভাব নয়। পুত্রের অল্পবয়সে মাতার মৃত্যু এবং বাল্যাবধি পিতার ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাব সারদা দেবীকে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাধান্য দেয় নি। তবে রবীন্দ্রনাথের মন থেকে মায়ের স্মৃতি যে কোনদিনই লুপ্ত হয়ে নি, তার প্রমাণ অজস্র। রবীন্দ্রনাথ মা সম্পর্কে কিছু লেখেন নি বা কিছু বলেন নি—এই ধারণাটা ঠিক নয়। সারদা দেবী রবীন্দ্রসাহিত্যে উপেক্ষিতা হতে পারেন, নির্বাসিতা নন।

উৎসর্গ-পৃষ্ঠা

গ্রন্থরচনার সমাপ্তিতে উৎসর্গ-পৃষ্ঠা পূর্ণ করার কাজ ছোট বড় অনেক লেখককেই ভাবনায় ফেলে। আত্মীয়ের বন্ধু-বান্ধবের প্রিয়জনের পরিচিত নামগুলি কলমের মুখে এসে ভিড় জমায়। তার ভিতর থেকে বাছাই করে একটি কি দুটি নাম উজ্জ্বল করে রাখতে হয় নতুন লেখা বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায়।

বহু গ্রন্থের স্রষ্টারা এই ব্যাপারে সৌভাগ্যবান। তাঁরা বহু প্রিয়জনকেই বই উৎসর্গ করে খুশি রাখতে পারেন। এই শ্রেণীর সৌভাগ্যবানদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান পয়লানম্বরে। প্রায় তিন শত মত গ্রন্থের স্রষ্টা উৎসর্গের মারফৎ বহু প্রিয়জনকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা স্নেহ বিতরণের সুযোগ পেয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি কিন্তু সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নি। হিসেব করে দেখা গেছে তিনি মাত্র চৌষট্টিখানা বই বিভিন্ন লোককে উৎসর্গ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্থান পেয়ে যাঁরা সৌভাগ্যবান ও অন্যের ঈর্ষার পাত্র, তাঁদের নামের একটি তালিকা কৌতূহলী পাঠকের কাছে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এবং বই উৎসর্গ করার ব্যাপারে সামাজিক ও পারিবারিক রবীন্দ্রনাথের মনের একটা মোটামুটি পরিচয়ও এর থেকে পাওয়া যায়।

একজন বাদে রবীন্দ্রনাথের লেখা বই দুখানার বেশি কেউ পান নি। যাঁরা দুখানা করে পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা আট। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন 'আলোচনা' ও 'নৈবেদ্য', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন 'রুদ্রচণ্ড' ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', লোকেন পালিত পেয়েছেন 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ও 'ক্ষণিকা', জগদীশচন্দ্র বসু পেয়েছেন 'কথা' ও 'খেয়া', সুরেন্দ্রনাথ কর পেয়েছেন 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'আরোগ্য', নন্দিতা কৃপালনি পেয়েছেন 'পত্রপুট' ও 'গল্পসল্প', রাজশেখর বসু পেয়েছেন 'পরিশোধ' আর 'সুর ও সঙ্গীত'। শেষোক্ত বইখানা ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ।

রবীন্দ্র গ্রন্থের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় চির উজ্জ্বল অন্যান্য সৌভাগ্যবানদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

সৌদামিনী দেবী (বৌঠাকুরাণীর হাট), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (প্রভাত সঙ্গীত), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কড়ি ও কোমল), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

(সমালোচনা), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিসর্জন), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাজা ও রাণী), প্রিয়নাথ সেন (গোড়ায় গলদ), দেবেন্দ্রনাথ সেন (সোনার তরী), বিহারীলাল গুপ্ত (ছোটগল্প), আশুতোষ চৌধুরী (গল্প দশক), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নদী), জগদিন্দ্রনাথ রায় (পঞ্চভূত), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (কণিকা), রাধাকিশোর দেববর্মন (কাহিনী), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (কল্পনা), বিধুশেখর শাস্ত্রী (বাংলা শব্দতত্ত্ব), রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোরা), যদুনাথ সরকার (অচলায়তন), সি. এফ. এন্ডরুজ (উৎসর্গ), দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ফাল্গুনী), প্রমথ চৌধুরী (ঘরে বাইরে), ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সঞ্চয়), উইলিয়ম পিয়ার্সন (বলাকা), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (জাপানে পারস্যে), কাজী নজরুল ইসলাম (বসন্ত), বিজয়া দেবী অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (পূরবী), লেডি রাণু মুখার্জী (ভানুসিংহের পত্রাবলী), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কালের যাত্রা), নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পুনশ্চ), নন্দলাল বসু (বিচিত্রিতা), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিত্রাঙ্গদা), সুভাষচন্দ্র বসু (তাসের দেশ), দিলীপকুমার রায় (ছন্দ), কৃষ্ণ কৃপালনী ও নন্দিতা কৃপালনী (পত্রপুট), রাণী মহলানবীশ (শ্যামলী), অমিয় চক্রবর্তী (সাহিত্যের পথে), প্রতিমা দেবী (ছড়ার ছবি), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সে), অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্ব-পরিচয়), নীলরতন সরকার (সেঁজুতি), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাংলা ভাষা-পরিচয়), কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (আকাশ-প্রদীপ), নন্দিতা কৃপালনী (গল্প-সল্প) ।

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নাম করে রবীন্দ্রনাথ কোন বই উৎসর্গ করেন নি, তবে 'স্মরণ' স্ত্রীর মৃত্যুর পরে লেখা এবং পুরো বইটাই স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করা। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় শুধু লেখা আছে স্ত্রীর মৃত্যু তারিখ ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯। 'পত্রপুট' দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর এবং 'নদী' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে উৎসর্গ করা।

রথীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন পুত্র-কন্যার নামে রবীন্দ্রনাথ কোন বই উৎসর্গ করেন নি। তবে 'শিশু' 'মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের পরিতোষের জন্য'। তাছাড়া আরও ছ'খানা বই আছে, যার উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে কারও নাম লেখা নেই, আছে ইঙ্গিতে। সেই ছ'খানা বই রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের লেখা 'ভগ্নহৃদয়' 'শৈশবসঙ্গীত' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' 'ছবি ও গান' এবং 'মানসী'।

উৎসর্গ পত্রের বক্তব্য দেখে মনে হয়, ঐ ছ'খানা বই-ই 'কোন একজন স্নেহশীল নারীর' স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা। রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের কাছে সে নাম খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার নয়। কিশোর কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয়ও ঐ ছ'খানা বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠার ভাষায় ও বক্তব্যে পাওয়া যায়।

'ভগ্ন-হৃদয়' উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লেখা আছে…'শ্রীমতী হে……' তারপরই ত্রিশ

পঙক্তির দীর্ঘ কবিতা। তার প্রথম দুটি পঙক্তি—

'হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত,
ঐ মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।'

'ভারতী' পত্রিকায় ঐ বইখানা প্রকাশের সময় উপহার-কবিতা ছিল 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি। 'শৈশবসংগীত' বইয়ের উপহারে লিখেছেন—'এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ-লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।'

'ছবি ও গানে'র উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তের মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম'।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে লিখেছেন—'ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।'

ঐ যুগেরই লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় শুধু লেখা আছে—'তোমাকে দিলাম'। এই 'তুমি' নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী।

উপরে দেওয়া নামের তালিকা থেকে দেখা যাবে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী কোন বই পান নি। শৈশবে মাতৃস্নেহ পরিপূর্ণ-ভোগ না করার বেদনা কি গ্রন্থোৎসর্গের ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে? পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অন্তরঙ্গতা সর্বজনবিদিত। তাই দেখি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে দুখানা বই। বহু সহোদরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর মনের মিল বেশি। তাই ঐ তিন জনই উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবার জ্যোতিদাদা ছিলেন বেশি অন্তরঙ্গ, তিনি পেয়েছেন দুখানা বই! ভগ্নীদের মধ্যে পেয়েছেন একমাত্র সৌদামিনী দেবী—'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু।'

সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের আবাল্য প্রীতি। এঁরা দুই জনেই পেয়েছেন একখানা করে বই। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথও পেয়েছেন একখানা করে বই। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একখানা।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রতুল্য জামাতা প্রমথ চৌধুরী—দু-জনেই পেয়েছেন দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস—'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'। এই দুই বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় উৎসর্গ রীতি হুবহু এক 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু' এবং 'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু।'

অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে পেয়েছেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথ—যিনি অকালে বিদেশে মারা যান (পুনশ্চ…'নীতু')। আর পেয়েছেন 'নীতু'র ভগ্নী নন্দিতা কৃপালনী।

বিদেশীদের মধ্যে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ভক্ত পিয়ারসন ও এন্ডরুজ। আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—যে নারী 'মাধুর্যসুধায়' পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ আমেরিকা 'প্রবাসের দিন।'

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে জগদীশ বসু, লোকেন পালিত, ব্রজেন শীল, প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাধাকিশোর দেববর্মণ—সকলেই পেয়েছেন একখানা দুখানা করে বই।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পেয়েছেন একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কবিদের মধ্যে আর পেয়েছেন প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র জগদীশ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র স্যার নীলরতন সরকার, শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নন্দলাল বসু ও কথাশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য আর যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ও প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও বিশিষ্ট অন্তরঙ্গদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও আর কয়েকজনের নাম উৎসর্গ থেকে বাদ পড়া বিশেষ লক্ষ্য করার মত।

আরও লক্ষ্য করার মত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা প্রথম কবিতার বই 'কবি কাহিনী' এবং জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতার বই 'জন্মদিনে' কারও নামে উৎসর্গ করে যান নি। তেমনি উৎসর্গ করেন নি নোবেল পুরস্কারের খ্যাতির সহিত জড়িত বিখ্যাত বই 'গীতাঞ্জলি'। শুধু তাই নয়, 'শেষের কবিতা' 'রক্তকরবী' 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' 'তিন সঙ্গী' 'চার অধ্যায়' 'মালঞ্চ' 'বাঁশরী' 'তপতী' 'লিপিকা' 'জীবনস্মৃতি' 'অরূপরতন' 'চিত্রা' 'চৈতালী' 'বনবাণী' 'মহুয়া' 'নটীর পূজা' প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত বইও কারও নামে উৎসর্গ করেন নি। অনুসন্ধানে আরও ধরা পড়ে, রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বই উৎসর্গ করে গেছেন, তার প্রায় অর্ধেকই কবিতার বই।

উৎসর্গপত্রে নামের সঙ্গে কবিতা লেখা আছে 'রুদ্রচণ্ড' 'বৌঠাকুরাণীর হাট' 'ভগ্নহৃদয়' 'বিসর্জন' 'ক্ষণিকা' 'পরিশেষে' 'খেয়া' 'বিচিত্রিতা' 'পত্রপুট' 'শ্যামলী' 'খাপছাড়া' 'সে' 'কথা ও কাহিনী' 'সেঁজুতি' 'আরোগ্য' এবং 'গল্প-সল্প'-এ।

উৎসর্গপত্রে কারও নাম উল্লেখ না করে কবিতা লেখা হয়েছে 'চৈতালি' 'মানসী' 'মহুয়া' 'গীতাঞ্জলি'তে। রবীন্দ্রনাথের বই উৎসর্গ করার রীতি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। উৎসর্গপত্রে উৎকৃষ্ট কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে অনেক পদ্য যা উৎকৃষ্ট কবিতার সারিতে ফেলা যায় না। উদাহরণ-

স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে 'কথা ও কাহিনী'র উৎসর্গপত্র বইখানা জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করে লেখা আছে—'সত্যরত্ন তুমি দিলে পরিবর্তে তার, কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।'

এই পদ্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—'চৈতালি'র উৎসর্গপত্রের সার্থকতা 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে—'। উৎসর্গ রীতিতেও প্রথম ও শেষ যুগের অনেক তফাৎ। প্রথম যুগের একখানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। 'সমালোচনা' বইয়ের উৎসর্গ রীতি এইরূপ—'পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর করকমলে—স্নেহের সামান্য প্রতিদানস্বরূপ এই গ্রন্থ সাদরে সমর্পিত হইল।'

শেষ যুগের লেখা বইয়ে উৎসর্গরীতি অন্য রকম। 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু' কিংবা কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে আশীর্বাদ, কিংবা 'বৌমাকে'। কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে আছে কবিতা। নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করা বইয়ের কবিতার শুরুতে লেখা আছে—'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।' শরৎচন্দ্রের সাতান্ন বছর বয়সের জন্মদিনে 'কালের যাত্রা' বইখানা কবির সস্নেহ উপহার।

'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গে আছে সত্যেন বসুকে লেখা এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গে আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা দুখানা দীর্ঘপত্র। 'আকাশ-প্রদীপ'-এর উৎসর্গে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছেন—'আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে এই আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।' কারণ সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অস্বীকৃতির সংশয় বাক্য উচ্চারণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের বাংলায় লেখা বই-গুলোই এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নামে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক কতগুলো বই উৎসর্গ করেছেন, তার একটা তালিকা বের করতে পারলে মন্দ হয় না।

মালাকার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলেছেন—

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

এই আনন্দের দানকে কবি নানারূপে নানাভাবে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নীল আকাশের আলোর ধারা আকণ্ঠ পান করে প্রকৃতির রূপসাগরে সারা জীবন ডুব দিয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্য শাখার কথা বাদ দিলাম, তাঁর কাব্যে, বিশেষতঃ সংগীতে প্রকৃতির জয়গানই প্রধান। ঋতু সংগীতে তো বটেই, পূজা এবং প্রেমের গানেও বর্ণে গন্ধে সমুজ্জ্বল প্রকৃতি ছড়িয়ে আছে।

ফুল প্রকৃতির প্রধান উপাচার। কী কী ফুল তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে জানার কৌতূহল অনেক সময় হয়। তার তালিকা উদ্ধার করে দিতে পারেন কোন পরিশ্রমী গবেষক। আপাততঃ আমি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের ঋতু সংগীতে কী কী ফুলের উল্লেখ কতবার করেছেন, তার একটি তালিকা হাজির করছি। এই তালিকা থেকে রবীন্দ্র চরিত্রের অন্য একটা পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রত্যেক শ্রোতাকে শিশুর মতো হাত ধরে ধরে প্রকৃতি পরিচয়ের পাঠ দিয়েছেন, ফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

"তুমি কেগো ?"—"আমি বকুল।"
"তোমরা কে গো ?"—"আমরা পারুল।"

ফুলের ভাষা ও কবির ভাষা এক জায়গায় এসে মিশে গিয়েছে, তারা ঘরের লোকের মতো আপন।

ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।

তাছাড়া নিতান্ত আপন জন না হলে ফুলের সঙ্গে তাঁর তুই-তুকারিই বা চলে কী করে? রামপ্রসাদ যেমন তাঁর প্রিয় আরাধ্যা কালীকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি অনায়াসে বলতে পারেন—

সহসা ডালপালা তোর উথলা যে—

ও চাঁপা ও করবী,

কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে

জানি না যে, জানি না যে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করি। ইদানীং ফুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধু বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ। গোলাপ রজনীগন্ধা এবং কয়েকটি বিলিতি ফুল ছাড়া অন্য কোন ফুলের সঙ্গে আমাদের তেমন জানাশোনা নেই। চাক্ষুষ পরিচয় না থাকায় বহু বর্ণিত ও বহু পঠিত ফুলের নাম আমরা গড়গড় মুখস্থ বলে যেতে পারি, চিনতে পারি না। মল্লিকা ও বেলি একই ফুল, মালতী ও চামেলি যে অভিন্ন, তা কি আমরা সবাই জানি? শরৎকালে শিউলি, বসন্ত-কালে পলাশ ফোটে আমরা বইয়ে পড়েছি গানে শুনেছি, কিন্তু তার চেহারা কেমন জানি না। এই অজ্ঞতা অনেক সময় বিভ্রান্তি ঘটায় এবং সেই কারণেই আধুনিক গীতিকার অনায়াসে লিখে ফেলেন—

কাজল কাজল কুমকুম

শিউলি পড়ে ঝুমঝুম।

গানের কথা শুনে মনে হয়, গীতিকারের নিজস্ব প্ল্যাস্টিকের কারখানায় এই শিউলি ফুল তৈরি। নইলে এতো ঝুমঝুম শব্দ হবে কেন?

আমার দৃঢ় ধারণা রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গেয়ে থাকেন তাঁদের সকলের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য কিছু দিন শান্তিনিকেতনে থাকা দরকার। গোটা শান্তিনিকেতনই রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সংগীতের বাস্তব ছবি।

শালের বনে থেকে থেকে

ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে…

কিংবা

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল

বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল—

এই সকল পংক্তি শান্তিনিকেতন ছাড়া কোথায় এমন সুন্দরভাবে চোখের সামনে সাজানো?

রবীন্দ্রনাথের ঋতু সংগীত প্রায় তিন শ। নিচে দিলাম কোন্ ফুল কত বার ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকা। তাল তমাল পিয়াল ধান অশ্বত্থ জাম ইত্যাদির উল্লেখ বহুবার থাকা সত্ত্বেও তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি।

বকুল (২৫ বার) নীপ কদম্ব কদম (২০) মালতী চামেলি (১৮) শিউলি শেফালি শেফালিকা (১৭) পলাশ কিংশুক (১৩) মাধবী (১১) মল্লিকা (১০) চাঁপা (১০) যূথী জুঁই (১০) শিরিষ (৭) আমের মঞ্জরি (৭) কেতকী কেয়া (৭) অশোক (৭) করবী (৫) কাশফুল (৫) পারুল (৫) কুন্দ (৩)

পদ্ম (৩) রজনীগন্ধা (২) জবা (২) কৃষ্ণচূড়া (২) ঝুমকোলতা (২) দোলনচাঁপা, শ্বেতকরবী, শ্বেতপদ্ম, মেঠোফুল, বনফুল, সরষেফুল, কামিনী, শিমুল, কাঞ্চন, রঞ্জন, গোলাপ, পারিজাত একবার করে উল্লেখিত। বকুল ফুলের উল্লেখ সব ঋতুতেই, তাই তার নাম শীর্ষে। মালতীর উল্লেখ বর্ষা বসন্ত শরতে। বর্ষায় কদম্ব, শরতে শিউলি এবং বসন্তে পলাশের প্রাধান্য।

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে কদমফুলের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও, 'কদমকুঞ্জের সুগন্ধি মদিরা' তাঁকে পাগল করে তুললেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কদমফুলকে তেমন ভালোবাসতেন না। শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত, অধুনালুপ্ত 'ঋতুপত্র' নামক পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠির কিয়দংশ তুলে ধরছি। এই চিঠিতে ফুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনের গোপন খবর অনেকটা পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সচিবকে লিখছেন—

"বাগানে বিশেষ করে মন দিস। কাছাকাছি গোটা দুই তিন চামেলির ঝোপ লাগিয়ে চামেলিয়া নাম সার্থক করতে হবে। আমি বড় গাছ ভালবাসি, কিন্তু বাড়ির খুব কাছে নয়। সজনে গাছের কথা মনে রাখিস। শীতের সময় ফুল ধরায়, অথচ বাড়তে সময় নেয় না। মহানিম শিমুল ওখানকার মাটিতে ধরে সহজে। পালতে মাদারের বেড়ায় কাঁটা এবং ফুল দুই পাওয়া যায়। বন যুঁইয়ের বেড়াও উত্তম। রক্তকরবী গরুতে খায় না, তার ফুলের গৌরবও আছে। সাদা করবী লাল করবী দুই পাশাপাশি চলবে। নেবুফুলের গন্ধ আমার প্রিয়, তার ব্যবস্থা রাখিস। ফুলের ঐশ্বর্য আছে চালতা গাছে। শিরীষ জামরুল গোলাপজামকে আমি ফুলের জন্য পছন্দ করি। মহাদেব ছুটি নিলে তার জায়গায় পরিশ্রমী সাঁওতাল মালি রাখিস। সারা জ্যৈষ্ঠ মাস জল লাগবে। কোন একটা লাইন কেটে পর্যায়ক্রমে কুরচি ও কাঞ্চন লাগানো যেতে পারে। দু-চারটে গন্ধরাজ লাগালে দোষ নেই। যে গাছ ভালবাসি নে, সে হচ্ছে ছাতিম ও কদম্ব।"

যে কদম নিয়ে গানে এতো মাতামাতি, যে ছাতিম নিয়ে শান্তিনিকেতনের পত্তন, যার তলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদা তাঁর ধ্যানের আসন পেতেছিলেন, তাকেই রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ? আশ্চর্য!

সাংবাদিক-কবি

সাংবাদিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি জগৎজোড়া না হোক, বাংলাজোড়া ছিল। সাধনা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক প্রভৃতি নানা সাময়িক পত্রের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সম্পাদনাও করেছেন কয়েকটি কাগজের। তাছাড়া বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। সাংবাদিকদের কাছে তিনি নিজে শুধু 'সংবাদ'ই ছিলেন না, নানাভাবে নানাক্ষেত্রে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশও তাঁরা পেয়েছেন। আর আজও তিনি বাংলা দৈনিকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছেন। সংবাদের শিরোনামে, সম্পাদকীয় বক্তব্যে রবীন্দ্র-রচনার ছড়াছড়ি ।

অনেক সময় ভাবি, রবীন্দ্রনাথ যদি কোন বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক হিসাবে কিছুদিন কাজ করতেন, তাহলে কী হতো? রবীন্দ্রনাথের নিজের কোন উপকার হোক না হোক, সংবাদ-সাহিত্য যে তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এখনকার খবরের কাগজের কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের তৈরি ভাষার সড়কে তরতর করে এগিয়ে যেতে পারতেন এবং প্রতিশব্দ আর বাক্যপ্রয়োগের গোলকধাঁধায় পড়ে দিকভ্রান্ত হতেন না। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে রিপোরটার বা সাব এডিটার না হয়েও তাঁদের পেশাগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁদের কাজের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কি ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাছা বাছা কয়েকখানি খবরের কাগজ পড়তেন। শেষ জীবনে অন্যতম সঙ্গী ছিল অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার। প্রহাসিনী, গল্প-সল্প অনেক বইয়ে আনন্দবাজারের উল্লেখ আছে। তাছাড়া কার কোন্ কাগজ পড়া উচিত সেই সম্পর্কেও তিনি উপদেশ দিয়েছেন। ১৩১৪ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছেন—"স্টেটসমান কাগজের চাঁদা ফুরোলেই আর পাঠাবো না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম' কাগজ পাঠাতে থাকবো। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে।"

বাংলা খবরের কাগজের চিরন্তন সমস্যা ইংরেজি শব্দের জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে। পদে পদে বিপদ। রবীন্দ্রনাথ যদি কোন বাংলা পত্রিকায়

স্টাফ রিপোরটারের কাজ করতেন, তাহলে অনুমান করতে পারি, প্রথম দিন কাজে যোগ দিয়েই বলতেন. "ওই রিপোরটার শব্দটি সম্পর্কে আমার আপত্তি, বাংলায় এ অচল।" ভাবতে অবাক লাগে, রিপোরটার না হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রিপোর্ট ও রিপোরটারের বাংলা প্রতিশব্দ অনেক কষ্টে খুঁজে বের করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—"হঠাৎ মনে পড়ল, কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন।' আর ভাবনা রইল না। প্রতিবেদন প্রতিবেদিত প্রতিবেদক—যেমন করেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধেনা।"—রিপোরট্ রিপোরটেড্ ও রিপোরটারের এমন চমৎকার বাংলা খুঁজে বের করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

খবরের কাগজে দ্রুত সৃষ্ট শব্দাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি সবচেয়ে বেশি ছিল, 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা, নবতম অবদান, অন্তরীণ, পরিস্থিতি, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, অংশগ্রহণ' ইত্যাদি ব্যবহার নিয়ে। টিয়ারগ্যাসের বাংলা অনুবাদ করা হয়, কাঁদুনে গ্যাস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাঁদুনে নয়, কাঁদানে গ্যাস। এই গ্যাস কাঁদে না, কাঁদায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সর্বাপেক্ষা 'বদর্থক শব্দ' 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। তিনি বলেন, কম্পালসারী এডুকেশনের বাংলা হওয়া উচিত 'অবশ্য শিক্ষা'। 'অন্তরীণ' শব্দটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি অন্য কারণে। তিনি এক জায়গায় লিখছেন—"কিছুকাল পূর্বে ভারত-শাসনকর্তারা 'ইন্টার্ণ' শুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দ-সাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোন যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কি হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। এক্সটার্নমেন্টকে কি বলতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত (ইন্টার্নড), বহিরায়ণ, বহিরায়িত ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।'—ধাতুগতভাবে ব্যাকরণগতভাবে নিরর্থক 'পরিস্থিতি' শব্দের প্রয়োগ ও 'অবদান' শব্দের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর আপত্তিও সর্বজনাবাদত।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রতিশব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া উচিত। কারণ ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়; অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়।

এই প্রসঙ্গে খবরের কাগজের ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঠাট্টার' একটী উদাহরণ দিই তাসের দেশ নাটিকা থেকে। এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সম্পাদক চরিত্র জুড়ে দিয়েছেন। তাসের দেশের উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ—

রাজা—ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম—কী রাজাসাহেব?

রাজা—তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম—আমি তাসদ্বীপ প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা—কৃষ্টি! এটা কি জিনিষ? মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো?

গোলাম—না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন—নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন!

সকলে—কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা—তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম—দুটো বড় বড় স্তম্ভ।

রাজা—সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম—বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা—ওটা আবার কি বললে? বাধ্যতামূলক আইন।

গোলাম—কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

কৃষ্টি, নবতম অবদান, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, বাধ্যতামূলক আইন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

রবীন্দ্রনাথ খবরের কাগজের ব্যস্তবাগীশ লোকদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন ইংরেজীর অনেকগুলি বাংলা প্রতিশব্দ আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার কয়েকটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। যথা—Charred—অঙ্গারিত, Over population—অতিপ্রজন, Footpath—একায়ন, Body guard—ঐকাঙ্গ, Apathy—অনীহা, Dissolved—প্রলীন, For show—প্রেক্ষার্থ, Out of order—ভিন্নক্রম, Original—মৌল, Self sufficiency—স্বয়ম্ভর ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অনুবাদ চর্চা' বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নবাগতদের একখানা অবশ্য-পাঠ্য বই। ইংরেজীতে লেখা সংবাদ কী করে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়, তার অনেক উদাহরণ আছে বইটিতে। ১৯১৭-১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 'ইস্কুল মাস্টার', তখন প্রধানতঃ অন্য প্রদেশের ছাত্রদের জন্যে কলকাতার ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র থেকে তার বাংলা অনুবাদ করে দেখাতেন কী ভাবে তর্জমা করতে হয়। তিনি স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী প্রভৃতি কাগজ থেকে সংবাদ বেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ নিজেই করতেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত একটি বাংলা সংবাদ নিচে দিলাম। কয়েকটি বিশেষ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়—

"৩১শে অক্টোবর সমাপিত সপ্তাহে অল্প কয়েক স্থানে লঘু বৃষ্টিপাত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে আরও অধিক বৃষ্টির আশু প্রয়োজন। কোন কোন জিলায় আমন ধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার শস্যের ভাবী অবস্থা সাধারণতঃ আশাজনক নহে। অন্যত্র ভাবী

অবস্থা মাঝামাঝি রকম। রবিশস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বীজ বপনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রদেশে মোটা চালের গড়মূল্য পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় শতকরা হারে মাত্র দুই টাকা বাড়িয়াছে।"

এই ধরণের সংবাদ রিপোর্টার সাব-এডিটারদের প্রায়ই রচনা করতে হয়। সহজে বোধগম্য এমন ঝরঝরে বাংলা বের করতে অনেককে গলদঘর্মও হতে হয়। উইক এণ্ডিং অন থার্টিফার্স্ট অক্টোবর—এই বাক্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে এখনও প্রায়ই লেখা হয়ে থাকে—"৩১শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে।" অথচ রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কী সুন্দর লিখেছেন—"৩১শে অক্টোবর সমাপিত সপ্তাহে।"

রবীন্দ্রনাথের রচনা আর একটি বাংলা সংবাদ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করি। এই সংবাদটি এক দুর্ঘটনার—

"এইরূপ প্রকাশ যে গগন মণ্ডল বলিয়া কোন একজন বজবজের চালের ব্যবসায়ী এক দেশী নৌকায় একটা বড় রকমের চালের চালান লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল এবং পোজালি খাল বলিয়া হুগলী নদীর এক খালের মধ্যে রাত্রের মত নোঙর করিয়াছিল। মালিক এবং দাঁড় মাঝিরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় কে একজন আগুন চাহিতেছে শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। এইরূপ হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মাল্লাদের ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে অন্য দুইটি নৌকা উপস্থিত হইল। তাহাদের আরোহীরা চালের নৌকার লোকদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল এবং ইহারা ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডাকাতেরা সমস্ত মাল নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্রুতবেগে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া গেল।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধ রক্ষা হয়েছে বটে কিন্তু কবিতা হয় নি। ঠিক তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হেরম্ব মৈত্র প্রমুখদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক ফরমাশী কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর যে কবিতা তিনি লেখেন তা অনবদ্য হলেও ফরমাশী এবং খোঁজ নিলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টির বেশির ভাগই অন্তরের প্রেরণাজাত নয়, ফরমাশী। আমরা সৌভাগ্যবান, ভাগ্যি তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁকে সারা জীবন ফরমাশ করে করে বিপুল পরিমাণ অসাধারণ সাহিত্য লিখিয়ে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আশী বছরের জীবন ঘাঁটাঘাঁটি করে ভেবে আশ্চর্য হই, ভদ্রলোক এত কাজের মধ্যে এত লিখলেন কী করে। মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব, জমিদারী পরিচালনা, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে ডুবে থাকা, সতেরো বার বিলেত ঘোরাঘুরি, গোলাপ চাষ, কৃষিব্যাঙ্ক, শান্তিনিকেতনের ইস্কুল চালানো, জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা, রাজনীতি, সমবায়, গ্রামের কাজ, হাজার হাজার চিঠি লেখা, আলুর চাষ, আখ মাড়াইয়ের কল বসানো, পত্রিকা সম্পাদনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, বক্তৃতার পর বক্তৃতা ইত্যাদির ফাঁকে গল্প নাটক কবিতা উপন্যাস, গান প্রবন্ধ গীতিনাট্য ইত্যাদির জোয়ারে তিনি পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অথচ তাঁর জোড়াসাঁকো শিলাইদহ বা শান্তিনিকেতন বাসের মোট আশী বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, সাহিত্য ব্যাপারটাই যেন বাই প্রোডাক্ট, আসলে তিনি যেন অন্য কাজের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কাজ অবশ্য অসাধারণ পটুতার সঙ্গে তিনি সম্পাদনাও করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের তিন পর্ব। প্রথম ত্রিশ বছর জোড়াসাঁকোর, দ্বিতীয় দশ বছর শিলাইদহের এবং সর্বশেষ চল্লিশ বছর শান্তিনিকেতনের। পর্বে পর্বে আলোচনা করলে জানা যাবে, জোড়াসাঁকো পর্বে প্রধানতঃ দাদা এবং ভাইপো ভাইঝিদের ফরমাশ মেটাতে গিয়ে গানের পর গান প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রভাত সংগীত কিংবা কড়ি ও কোমল জাতীয় বই কিংবা 'গহনকুসুম কুঞ্জ মাঝে'

ধরনের কিছু গান হঠাৎ-প্রেরণার তাগিদে আবির্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু সে পর্বের বিখ্যাত তিনটি বই কাল মৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভা এবং মায়ার খেলা একেবারেই অনুরোধজাত। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মনরক্ষা করতে গিয়েই লিখেছেন প্রথম দুটি বই এবং বন্ধুপত্নী সরলা রায়ের মুখরক্ষা করার জন্যেই তড়িঘড়ি লিখে ফেলেছেন 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি। তা ছাড়া জ্যোতিদাদার পিয়ানো বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কত গান যে বেরিয়েছে, তার খবর রবীন্দ্র-জীবন-জিজ্ঞাসুরা সকলেই জানেন। জোড়াসাঁকো এবং শিলাইদহ পর্বে তাঁর পিছন পিছন তাড়া দিয়ে ফিরেছে কয়েকটি পারিবারিক পত্রিকা। বালক, ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) প্রভৃতি। পত্রিকাগুলিতে বলেন্দ্রনাথ বা সরলা দেবীর প্রাকবিজ্ঞপ্তির খেসারৎ দিতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। ভারতীতে ঘোষণা করে দেওয়া হল আগামী সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হবে এবং মনে মনে যতই ক্রুদ্ধ হন না কেন বাধ্য হয়েই রবীন্দ্রনাথকে মাসে মাসে উপন্যাসের কিস্তি সরবরাহ করে যেতে হয়েছে। সরলাদেবী চৌধুরাণীর ফরমাশে লিখতে হয়েছে চিরকুমার সভা এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পীড়াপীড়িতে বিসর্জন। পরবর্তীকালে বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং জামাই প্রমথ চৌধুরীর প্রয়াশ মেটাতে গিয়ে নিরীহ রবীন্দ্রনাথকে প্রবাসী ও সবুজ পত্রের অনেকগুলি পাতা ভরিয়ে রাখতে হয়েছে। আর আমরা পেয়ে গেছি অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা প্রবন্ধ ও উপন্যাস।

'গল্পগুচ্ছ' শিলাইদহ পর্বের অপূর্ব সৃষ্টি। কিছুটা তার মূলে বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর ফরমাশ। জগদীশবাবু সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে যতবার শিলাইদহ গিয়েছেন, ততবারই রবীন্দ্রনাথকে বন্ধুর মনোরঞ্জনে একটি বা দুটি গল্প লিখে, পড়ে শোনাতে হয়েছে। এইভাবেই আমরা পেয়ে গেলাম, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, বোষ্টমী, কাবুলীওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, ছুটি, নিশীথে ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া কালান্তর রাজা ও প্রজা ইত্যাদি কালজয়ী প্রবন্ধ সংকলন সেই সময় সৃষ্টি হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনের পর্বে এই ফরমাশী সাহিত্যের পরিমাণ গেল আরও বেড়ে। মাতৃহারা শিশুদের মন ভোলাতে লিখে ফেললেন শিশু ও শিশুভোলানাথ, নিজের ও ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে লিখলেন সহজ পাঠ, কথা কাহিনী, ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত শিক্ষা ইত্যাদি এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের তাগিদে লিখলেন গানের পর গান, নাটকের পর নাটক। অধ্যাপকরা এসে ধরলেন, এবার শরতে অভিনয়ের জন্যে নতুন নাটক চাই, লেখা হয়ে গেল শারদোৎসব। ছাত্রছাত্রীরা আবদার করল, এবার বসন্তে নতুন গানের মালা চাই, লেখা হয়ে গেল ফাল্গুনী, নবীন ও বসন্ত। বর্ষাতেও একই ফরমাশ। প্রতি বৎসর বর্ষামঙ্গলে একই অনুষ্ঠান—পুরোনো গান চলবে না। বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নতুন গুচ্ছ গুচ্ছ বর্ষার গান এবং তৈরি হয়ে গেল শেষ বর্ষণ বা

শ্রাবণ গাথা। ডাকঘর, অরূপরতন, রক্তকরবী, মুক্তধারা ইত্যাদি রচনার উৎসও একই—ফরমাশ।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা শ্যামা চিত্রাঙ্গদা বা তাসের দেশ রচনার মূলেও বিশেষ কোন প্রেরণা নেই। নিতান্তই আকস্মিক যোগাযোগ এবং অতি অবশ্যই ফরমাশ। উপরোক্ত চারটি নাটক আদিতে ছিল গল্প বা কবিতা। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী হয়তো 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নিয়ে নাটক লিখলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে দিলেন সংশোধন করে দিতে। রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করতে গিয়ে নিজেই লিখে ফেললেন আনকোরা নতুন নাটক 'তাসের দেশ।' পরিশোধ কবিতা থেকে শ্যামা নৃত্যনাট্য সৃষ্টির কাহিনীও মোটামুটি একই। চিত্রাঙ্গদা বা চণ্ডালিকাও হয় সংশোধন, নয় অনুরোধের পরিণাম।

তালিকা আর বাড়াবো না। ইচ্ছে আছে এই বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর একখানি গবেষণা গ্রন্থের থান ইট ছুঁড়ে মারবো। আমার প্রমাণ করার ইচ্ছে হল, প্রেরণা সাধনা ইত্যাদি কথাগুলো সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিতান্তই বানানো, সাহিত্যিকরা নিজেদের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ওই সব শব্দ তাঁদের রচনার সঙ্গে চালিয়ে দিয়েছেন। কেন না, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই যদি ফরমাশ বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও তা হবে না কেন? অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যদের তফাং আছে একটি ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ফরমাশী সাহিত্য হয়েছে প্রকৃত সাহিত্য, অন্যদের বেলায় সর্বক্ষেত্রে তা হয় নি।

শুধু সাহিত্য, শুধু সংগীত, শুধু চিত্রকলা? মোটেই তা নয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আরও অনেক কিছুর স্মৃতিকাগার। যেমন পোশাক। বাঙালী পোশাক বলে আজ যা চালু, আজ যা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ, তার জন্ম সুদূর অতীত নয়, এই একালেই, এই ঠাকুরবাড়িতেই। যেমন মেয়েদের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজের কমবিনেশন। তার আবিষ্কর্ত্রী রবীন্দ্রনাথের মেজবৌঠান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ওঁরা দীর্ঘদিন ছিলেন বোম্বাইয়ে। সেখানকার পারশি মেয়েদের পোশাকের অনুকরণে একটু অদলবদল করে যা তৈরী করেন, তাই আজকাল চলছে বাঙালী মেয়েদের পোশাক বলে। ছেলেদের বেলায়ও অনেকটা তাই। ধুতি পানজাবি চাদর ছিল, কিন্তু মোজা না পরে কেউ বাইরে বেরোতেন না। আর ধুতি পানজাবির কদরও ছিল না ভদ্রসমাজে। এক ডিনার পার্টিতে তিন ভাইপোকে নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি চাদর আর মোজা ছাড়া জুতোয় হাজির হয়ে বোমা ফাটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে সেদিন থেকেই বাঙালী অভিজাত সমাজে ওই পোশাক চালু।

তাছাড়া আরও কত রকমের এক্সপেরিমেন্ট ওঁরা করেছেন পোশাক নিয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরতো একবার এমন একটা কোট বানালেন যার বোতাম পিঠের দিকে। ওই পরে তিনি বাইরে পর্যন্ত বেরোতেন। এই "অনন্য আবিষ্কারের" কারণ হিসাবে তিনি বলেন, সামনে বোতাম লাগানো জামায় বুকে ঠান্ডা লাগে, পিছনে বোতাম থাকলে লাগে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক্সপেরিমেন্ট আর এক কাঠি বাড়া। তিনি এমন একটা পোশাক বানালেন, যাকে ধুতিও বলা যায়, বলা যায় পাজামাও। ধুতির কোচা দুই থামওয়ালা পাজামার মাঝখানে তিনি এমনভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ এটা পরে বাইরে বেরোবার সাহস পায় নি।

এই বিচিত্র পোশাকের ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের মাথায়ও খেলত। তিনি নিজে নানা রকম পোশাক তো পরেছেনই, তাঁর উপন্যাসের নায়কদের গায়েও অদ্ভুত অদ্ভুত সব পোশাক পরিয়েছেন। যেমন শেষের কবিতা বইয়ের অমিত রায়। অমিত রায়ের ডিসটিংগুইশড্ পোশাক এই রকম: ধুতি শাদা থানের, যত্নে কোঁচানো।......"পানজাবি পরে তাঁর বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডানদিকের কোমর

অবধি। আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু'ভাগ করা। কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জড়ি দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে। তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোট থলি। তার মধ্যে ও'র ট্যাকঘড়ি। পায়ে শাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাটকরা পাড়ওলা মাদরাজী চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে। বন্ধু মহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে, মাথায় চড়ায় এক মুসলমানী লখনউ টুপি—শাদার উপর শাদা কাজ করা।" অন্যদিকে 'গোরা' উপন্যাসের নায়কের পোশাক একেবারে আলাদা। গোরার "গায়ে একখানা খাকি রঙের পানজাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন। হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি। চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো পরিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের পোশাক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মতো এতটা দুঃসাহসী হতে পারেন নি। তবে অন্য আর দশটা জিনিসের মতো পোশাকের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ অনন্য। এমন রুচি, এতো বৈচিত্র্য আর কেউ দেখাতে পারেন নি। নানা সময়ে কতো রকমের পোশাকই না তিনি পড়েছেন। যা পরেছেন, তাতেই মনে হয়েছে দেবদূত। এমন অনিন্দ্যকান্তি দীর্ঘদেহে সবই সুন্দর। দেশী বিলাতী যে কোন পোশাক —ধুতি পানজাবিই হোক আর কোট প্যাণ্টই হোক—সব কিছুতে তিনি মানানসই। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে-পোশাক, সেই জোব্বাটি রবীন্দ্রনাথ পরতে শুরু করেন অনেক পরে। তিব্বতী বাকুর অনুকরণে প্রথমে জোব্বা তৈরি করান গগনেন্দ্রনাথ। সেটাই পরে হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। দেশে বিদেশে সর্বত্র তিনি এই পোশাক পরেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ঠাকুর-জোব্বা চলেনি। ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ পরেন-নি। ঠিক একই ভাবে চলেনি বিবেকানন্দের সেই পরিচিত পাগড়ি-আলখাল্লার পোশাক। তাঁর নিজের রামকৃষ্ণ মিশনেই অনুসৃত হয় নি, হচ্ছে কেবল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। তাদের সন্ন্যাসীরা বিবেক-রীতি মেনে চলছেন। একালের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মহাত্মা গান্ধীর খালি গা ও হাঁটুর উপর ধুতি পরা পোশাকও চলল না এদেশে—একমাত্র বিনোবা ভাবে ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের পোশাকের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু করলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে নানা সময়ে তোলা তাঁর আলোক চিত্রের। তাছাড়া আছে ঘনিষ্ঠ দু'চার জনের সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম আলোকচিত্র তোলা ১৮৭৩ সালে। তখন তাঁর বয়স বারো। সঙ্গে শ্রীকণ্ঠসিংহ, দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগনে সত্যপ্রসাদ। মাথায় তাজ ধরণের টুপি। ভিতরে বুকবন্ধ একটি জামা, তার উপরে ড্রেসিং গাউনের মতো আচকান। নীচে পাজামা। আর পাম্পশু' ধরনের জুতো। সেটাই ছিল বড় বাড়ির ছেলেদের পোশাকী চেহারা। রবীন্দ্র-

নাথের দ্বিতীয় আলোকচিত্র ১৮৭৬ সালের। তখন তাঁর বয়স পনেরো। আলোক-চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ নয় বলে নিম্নাঙ্গে কী পোশাক ছিল জানার উপায় নেই, শুধু জানা গেল আচকানের সঙ্গে মাথায় রয়েছে পাগড়ি ধরনের লেজওলা এক টুপি।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিত্র ১৮৭৯ সালের। বিলেতে তোলা। তখন বয়স ১৮। একটি ছবিতে পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাক। কোট ওভারকোট ওয়েস্ট কোট—সব মিলিয়ে একেবারে মিস্টার টেগোর। ব্রাইটনে তোলা অন্য ছবিতেও প্রায় তাই। কেবল ওভার কোট নেই—গলায় চমৎকার 'বো' লাগানো। বিলাত-প্রবাসে এই তাঁর শেষ বিলাতী পোশাক। তারপর যখনই গিয়েছেন বিদেশে, বরাবর স্বদেশী পোশাকই পরেছেন। দ্বিতীয়বার লন্ডনে গিয়ে মাথায় পরেন মুসলমানী টুপি, গলাবন্ধ কোট। তবে পরবর্তী আর একখানি ছবিতে দেখা যায় স্বদেশেই রবীন্দ্রনাথ বিদেশী পোশাক পরেছেন। ছবিটি কারসিয়াঙে তোলা। কোট প্যান্ট শার্টে পুরোপুরি সাহেবিয়ানা। সম্ভবত ঠান্ডা জায়গা বলেই এই পোশাক পরতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। লোকেন পালিত প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে তোলা আর একখানা ছবিতেও মোটামুটি ওই একই পোশাক।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ছবিও তোলা আছে। সেটা ১৮৮৩ সালের। অন্য দশজন বাঙালী বরের মতো তাঁর পরনেও ধুতি পানজাবি শাল। তারপর যে ক'টি ছবি দেখা যায়, তাতে তলায় ধুতি, উপরে শুধু গরম চাদর। সেই সময়কার পোশাকের একটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নিজেই, "তখন আমার বেশভূষার আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর। তার খুঁটোয় বাঁধা ভোর বেলাকার তোলা একমুঠো বেলফুল। পায়ে এক জোড়া চটি।" সেই সময় থেকেই তিনি লম্বাচুল রাখতে শুরু করছেন। পাজামা পানজাবি বা ধুতি চাদরের সঙ্গে কুঞ্চিত কেশদাম নিয়ে এক অপরূপ মূর্তি। ১৮৯১ সালে তোলা এক ছবিতে দেখছি, প্যাণ্ট ও গলাবন্ধ কোটের সঙ্গে মাথায় পাগড়ি। পাগড়ি বেয়ে নেমে পড়েছে লম্বা চুল। এই পাগড়ি পরা আর একখানা ছবি আছে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে। সেখানে পাগড়ির সঙ্গে লম্বা কোট, লম্বা প্যাণ্ট।

১৮৯৪ সালে, অর্থাৎ ৩৩ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেহারা ও পোশাক কেমন ছিল, তার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' বইয়ে। "কী শান্ত, কী সুন্দর, কী প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মতো দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্তকুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা। কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমন্ডল। কৃষ্ণপক্ষযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণগৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃস্টের মুখ

মনে পড়ে। পরিধানে শাদা ধুতি, শাদা রেশমি পিরান ও চাদর। চরণে কোমল পাদুকা। ইংরেজি পাদুকার কঠিনতা অসহ্যতাব্যঞ্জক।"

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি আছে। ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ এসরাজ বাজাচ্ছেন, আর খুড়ো রবীন্দ্রনাথ বই খুলে গান গাইছেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও সব সময় ধুতির সঙ্গে পানজাবি পরতেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, এই ছবিতে ধুতির সঙ্গে গলার বোতাম আঁটা শার্ট। পায়ে জুতোর সঙ্গে মোজা। রবীন্দ্রনাথের আর একটি ঘরোয়া ছবি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীদের সঙ্গে মাটিতে আসনপিঁড়ি হয়ে খেতে বসেছেন, লম্বা ঘোমটা আর লম্বা হাতা নিয়ে পরিবেশন করছেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে মুখের গ্রাস আর পরনে ধুতি পানজাবি চাদর।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের অন্য ছবি। একটিতে শুধু ধুতি পানজাবি, অন্যটিতে ধুতির উপর শুধু চাদর। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে একটি ছবিতে তাঁর পোশাক অদ্ভুত। উপরে এলানো মোটা চাদর। বালাপোষ ধরনের আর মোটা কপেড়ের লুঙ্গি মতো একটা যেন কী। আর একটি ছবিতে রবীন্দ্রনাথ একেবারে মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। পাগড়ি, চাদর, লম্বা ঢোলা পানজাবিতে একেবারে মারাঠী চেহারা। এই দুষ্প্রাপ্য চিত্রটি অনেকেরই অজানা। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন মারাঠী অধ্যাপক ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁকে এই পোশাকটি উপহার দিয়েছিলেন। আর একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র রয়েছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। এই চিত্রটি রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে মূল্যবান। এইটিই একমাত্র ছবি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের খালি গা। বয়স ত্রিশের এদিকে। কোলে একটি শিশু—হয় প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা, নয় প্রথমপুত্র রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গালে অল্প দাড়ি, চুলও লম্বা। আর পোশাকের মধ্যে একমাত্র ধুতি, আঁটোসাঁটো করে পরা। উধর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। আসন করে বসা রবীন্দ্রনাথ কোলে রাখা শিশুটির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছেন।

জোব্বা রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পঞ্চাশের পোশাক। ঘরে বাইরে সর্বত্র ওটাই মার্কামারা হয়ে যায়। জোব্বারও নানা বাহার রঙে। বিদেশে ওটাই ছিল তার দরবারী পোশাক। কখনও সখনও গলাবন্ধ লম্বা কোট। জোব্বার সঙ্গে কখনও থাকত প্যাণ্ট, কখনও পাজামা। বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে লুঙ্গিও থাকত অনেক সময়। পানজাবি বা জোব্বার ভিতরে থাকত ফতুয়া। হাফহাতা ফতুয়া পরে একটা ডেসকের উপর লিখে চলার একটা ছবি এই প্রসঙ্গে চোখে ভাসছে। তাছাড়া অন্যান্য সময় পানজাবি লুঙ্গি ও চটি ছিল তাঁর নিয়মিত পোশাক। তবে ধুতি পানজাবি আর চাদর ছাড়া কোন স্বদেশী অনুষ্ঠানে তিনি যেতেন না। শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার মন্দিরে যখন উপাসনায় যেতেন, কিংবা পৌষ উৎসব, নববর্ষ বা বসন্তোৎসবে আচার্যের ভাষণ দিতেন,

তখন পরণে অনিবার্যরূপে থাকত ধুতি-পানজাবি। কলকাতায় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের সময় মঞ্চের একটি কোণে বসা থাকা তাঁর পোশাকও সেই ভূমিলুণ্ঠিত কোঁচাওলা ধুতি, লম্বা পানজাবি আর চাদর। মহাজাতি সদনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কিংবা মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবনের উদ্বোধনের সময়ও ওই ধুতি-পানজাবি-চাদর।

তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার ও পোশাক—কোথাও অসুন্দরের স্থান ছিল না। এমন দিব্যকান্তি চেহারা, এমন সুঠাম গৌরবর্ণ দেহ—তাতে যা পরতেন, তাই মানাতো ঠিকই, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি অসাধারণ হয়ে উঠতেন সাধারণ পোষাক পরেও। তাঁর কখন কোন্‌টা পরলে মানায় কোন্‌টা মানায় না—এই সহজ সত্যটি তিনি জানতেন। তাঁর পোশাকে কখনও বাবুয়ানা ছিল না, ছিল শালীনতা, ছিল স্বকীয়তা। বিদেশে যখনই তিনি গিয়েছেন, প্রথমে সবাই মুগ্ধ হয়েছে তাঁর চেহারা দেখে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি লম্বা জোব্বার সঙ্গে মাথায় পরতেন কাজ করা লম্বা টুপি। ওই চেহারা, ওই পোশাক দেখে কেউ বলেছেন, যেন যীশুখৃষ্ট, কেউ বলেছেন, প্রাচীন ভারতের কোন আর্যঋষি যেন হঠাৎ এসে আবির্ভূত হয়েছেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা জাতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতাদানরত একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। লম্বা টুপি লম্বা জোব্বার রবীন্দ্রনাথকে অলৌকিক জগতের কোন এক মায়াবী মানুষ বলে মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সেই তৈলচিত্রে সামান্য দাড়ি, ঘাড়ঢাকা চুল, পানজাবি আর পাঁশনে চশমায় আবার অন্যরূপ। যেন ব্যবহারিক জগতের ঊর্ধ্বে বিচরণশীল এমন একজন লোক, যিনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আবার শুভ্রকেশদাম হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে রঙীন জোব্বায় দীর্ঘ দেহ ঢেকে কিংবা পানজাবির উপর ফুলকাটা পশমী চাদর দুপাশে এলিয়ে তিনি যখন কোথাও বসেন, মনে হয় উজ্জয়িনীর রাজসভায় কোন এক সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয়েছি।

জীবনস্মৃতিতে ছেলেবেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকিঞ্চিৎকর পোশাক আশাকের কথা বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, পাদুকা বা পরিধানের ব্যাপারে না ছিল বাহুল্য না ছিল বিলাসিতা। এই বাহুল্য ও বিলাসবর্জন ছেলেবেলায় শুধু নয়, জীবনের শেষবেলা পর্যন্ত চলেছে। তবে সুন্দর দেহ সুন্দরতর হয়েছে মানানসই পোশাকে। তাঁকে বলা হয়েছে 'জীবনশিল্পী'। এই সম্বোধনটি এই কারণেই এতো সার্থক।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা আমরা অল্পবিস্তর জানি। 'বিশ্বপরিচয়' নামে তাঁর একখানা অসাধারণ বই তো আছেই, আর আছে নানা সময়ে নানা জনের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার টুকরো কথা। কিন্তু মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর নাড়ী বিচারের সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের উপর গ্রহউপগ্রহের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল কি? যেমন ছিল প্ল্যানচেট-মিডিয়াম, বায়োকেমিক ওষুধ ইত্যাদি সম্পর্কে?

না, রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনদিন জ্যোতিষচর্চা করেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। তবে ওই পরলোকচর্চা ব্যাপারটায় যেমন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা না ভেবেই তিনি কৌতূহল দেখিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি কোষ্ঠী ঠিকুজি হস্তরেখা-বিচার ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অনাগ্রহ ছিল না। এই মনোভাবের প্রতিফলন পাই স্ত্রীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে। চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে ১৯০১ সালে শিলাইদহ থেকে মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন—"দুটো চাবি পেয়েছি, কিন্তু আমার কর্পূরের কাঠের দেরাজের চাবিটা দরকার। তার মধ্যে রথীর ঠিকুজি আছে, সেইটের সঙ্গে রথীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করতে দিতে হবে।" এই কয়েকটি লাইনেই প্রমাণ, ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে তাঁর বিশ্বাস কিছুটা আছে।

১৮৯১ সালে সাজাদপুর থেকে স্ত্রীকে আর একখানা চিঠিতে লেখেন, "আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে কি না যে বিনা চেষ্টায় আমার যশ এবং আর দুই একটা জিনিস হবে।" রবীন্দ্রসদনে রাখা রবীন্দ্রনাথের ওই কোষ্ঠিতে কী লেখা আছে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে বর্জিত একটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর জন্মকুণ্ডলী কী রকম। তারপর বলেছেন:—

"ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।" 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধে কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের জন্মকুণ্ডলী বিচার করেছেন এই একইভাবে। তাছাড়া

রবীন্দ্রসদনে রাখা পারিবারিক ঠিকুজি খাতায় লেখা আছে—"কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী সোমবার রেবতী মীন শুক্রের দশা ভোগ্য ১৪।৩।১১।৩৯।"

মীন রাশি মীন লগ্নের জাতক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'লগন-চাঁদা' ছেলে তবে সে বিচারের ক্ষেত্র এই রচনা নয়। আমাদের আলোচ্য, জ্যোতিষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী। বিশ্বাসের কথা আগেই বলেছি, তবে তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঠাট্টার ভাবও ছিল। সে ঠাট্টা অবশ্য জ্যোতিষ নিয়ে নয়, কখনও জ্যোতিষী নিয়ে, কখনও নিজের ভাগ্য নিয়ে।

কোন কোন গানেও তিনি জ্যোতিষচর্চা করেছেন পরিহাসচ্ছলে। 'ফাল্গুনী' নাটকে নবযৌবনের দল গেয়েছে—"জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে সকল অনাসৃষ্টি, ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।"

ঠিকুজি কোষ্ঠি ছাড়াও হাত দেখা গণৎকাররাও রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক সময় এসেছেন। একজনের কথা তিনি স্ত্রীকে জানিয়েছেন। ১৮৯১ সালে সাজাদপুর থেকে লিখছেন: "আজ সকালে এ অঞ্চলের একজন প্রধান গণৎকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সমস্ত সকাল বেলাটা সে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে। বেশ গুছিয়ে লিখতে বলেছিলুম, বকে বকে আমাকে কিছুতেই লিখতে দিলে না। আমার রাশি এবং লগ্ন শুনে কী গুণে বললে জান? আমি সুবেশী, সুরূপ, রংটা শাদায় মেশানো শ্যামবর্ণ খুব ফুটফুটে গৌরবর্ণ নয়। আশ্চর্য কী করে গুণে বলতে পারলে বল দেখি? তারপরে বললে আমার সঞ্চয়ী বুদ্ধি আছে, কিন্তু আমি সঞ্চয় করতে পারব না। খরচ অজস্র করব, কিন্তু কৃপণতার অপবাদ হবে। মেজাজটা কিছু রাগী (এটা বোধহয় আমার তখনকার মুখের ভাবখানা দেখে বলেছিল)। আমার ভার্যাটি ভাল। আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে। আমি যাদের উপকার করব, তারাই আমার অপকার করবে। ষাট-বাষট্টি বৎসরের বেশি বাঁচব না। যদি বা কোনমতে বয়স কাটাতে পারি, তবু সত্তর কিছুতেই পেরোতে পারব না। শুনে তো আমার ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই তো সব ব্যাপার। যা হোক, তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছু না হোক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আমার সংসর্গ পেতে পারবে। ততদিনে সম্পূর্ণ বিরক্ত ধরে না গেলে বাঁচি। আমার ঠিকুজিটা সঙ্গে থাকলে তাকে দেখানো যেতে পারত। সেটা আবার প্রিয়বাবুর কাছে আছে। সে বললে, বর্তমানে আমার ভাল সময় চলছে। বৃহস্পতির দশা। ফাল্গুন মাসে রাহুর দশা পড়বে। ভাল অবস্থা কাকে বলে তা তো ঠিক বুঝতে পারিনে।"

আর একজন গণৎকার যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের হাত দেখতে এসেছিলেন, সেই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধূ শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর। তিনি আমাকে বলেছেন, এই গণৎকার ছিলেন নন্দলাল বসুর বন্ধু, সেই সুবাদেই এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন, অমিতা দেবী জানেন না। শুধু শুনেছেন গণৎকার

নাকি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে ভালো বোঝেন তাঁর বৌমা—অর্থাৎ প্রতিমা দেবী। তাছাড়া জীবনের শেষ দিকে একজন মহিলা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গণৎকার মহিলার নাম করেননি, তবে আমার অনুমান, সম্ভবত তিনি ভিকটোরিয়া ওকামপো।

আর একটি প্রাসঙ্গিক ছবি আছে, তার বৃত্তান্তও পুরো জানা যায়নি। ছবিটিতে যিনি একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে লুঙ্গি ও পানজাবি পরা রবীন্দ্রনাথের হাত একাগ্র মনে দেখছেন, তিনিই বা কে? সঙ্গে নন্দলাল বসুর ছবি থাকতে অনুমান, ইনিই তাঁর সেই বন্ধু গণৎকার। রবীন্দ্রনাথের পাশে চেয়ারে-বসা নন্দলাল বসু ছাড়াও ছবিতে আছেন আরও দুইজন শিল্পী—দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সুরেন্দ্রনাথ কর এবং একেবারে ডানপাশে রামকিংকর বেইজ। যে-মহিলা রবীন্দ্রনাথের পিছনে দাঁড়িয়ে, তিনিও ঠাকুর বাড়ির কেউ নন, শান্তিনিকেতনের এক ছাত্রী, নাম গীতা রায়। ছবির বামদিকের দুই মহিলাকে চিনতে পারিনি। সম্ভবত ছবিটি ১৯২৯ সালে তপতী অভিনয়ের সময় তোলা।

এই দুষ্প্রাপ্য ছবি হঠাৎ চোখে চমক লাগায়। সেই বয়সে প্রায় সব সময়েই রবীন্দ্রনাথ বক্তা, অন্যরা শ্রোতা। এক্ষেত্রে প্রধান বক্তা ওই গণৎকার। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বা কৌতূহল যাই বলুন, চোখেমুখে স্পষ্ট। কিন্তু গণৎকার ভদ্রলোক কী বলেছিলেন খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত এই পূর্ণ মানবকে? তাঁর মনের কথা, তাঁর দুঃখের কথা? জনতার মধ্যেও নিঃসঙ্গ, ঘনিষ্ঠ হয়েও দুরতিক্রম্য, শোকে সংযত, যশে উদাসীন এই অসাধারণ মানুষটি সম্পর্কে গণৎকাররা দূরে থাক, সামান্য আভাস দেওয়া ছাড়া তিনি নিজেও কি সব কিছু বলতে পেরেছেন তাঁর সৃষ্টিতে? বোধ হয় না।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকারকে—
যিনি আমায় সাংবাদিকতায় এনেছিলেন

সেদিন নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনায় রৌদ্রের উত্তাপ বড়ো প্রবল। পরগনারই একটি গ্রাম খোরশেদপুর। সেই গ্রামেরই কুঠিবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক চঞ্চল অশ্বারোহী। এদিকে পদ্মানদী, ওদিকে রথতলার মাঠ। মাঠের চার দিকে পাক খেয়ে খেয়ে তিনি ক্লান্ত, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে জমা স্বেদবিন্দু রৌদ্রের আলোয় চিকচিক করছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ধীরগতিতে তিনি আবার ফিরে গেলেন কুঠিবাড়িতে।

অশ্বারোহী বয়সে তরুণ। মাথায় জরির তাজ, গায়ে রঙিন আচকান। সুন্দর সুডৌল চেহারা। যেন যুবরাজ। যুবরাজই বটে, প্রবলপ্রতাপশালী জমিদারের কনিষ্ঠ তনয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন পরগনায় বেড়াতে। বিরাহিমপুর তাঁদেরই জমিদারি। কুঠিবাড়ির কাছেই সদর কাছারি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জমিদারির কাজ দেখতে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ঐ ছোটো ভাইকে। দুজনের বয়সের ব্যবধান বারো বছরের, তবু বন্ধুত্বে বাধা নেই। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে ছোটো ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেই প্রথম। উত্তর কলকাতার চিৎপুর পল্লীতে তাঁর বাস। ধনী অভিজাতবংশের সন্তান তিনি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের খোলা মাঠ নদীর ঘাট সবুজ বন বালির চর এবং পরবর্তী জীবনের বহু সুখদুঃখের সহচরী পদ্মানদীর সঙ্গে তাঁর সখ্য সেই প্রথম শুরু। কোথায় সেই কলকাতার ধূলিমলিন আকাশ, চিৎপুরের চিৎকার—এখানেই এই পদ্মাচুম্বিত জনপদে শুধু আরাম, শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি।

চৌদ্দ বছরের ঐ তরুণ অশ্বারোহীকে আবার আমরা দেখি হাতির পিঠে সওয়ার, জঙ্গলের দিকে আগুয়ান। তাঁর গায়ে শিকারের পোশাক, হাতে বন্দুক। আগে আর-একদিন তিনি পরগনারই এক জঙ্গলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে বাঘ শিকারে ভীতকম্পিত পদে গিয়েছিলেন। দাদার গুলিতে বাঘ ধরাশায়ী হয়েছিল। এবারও সেই বাঘের আহ্বান। খোরশেদপুর গ্রামের অনতিদূরে তার ডাক শোনা গিয়েছে। সেই বাঘকে ঘায়েল করতেই এবার তরুণের অভিযান! সঙ্গে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর শিকারী বিশ্বনাথ। কিন্তু ঘন বনের মধ্যে ঢুকে হাতি থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ঝোপের আড়ালে প্রচণ্ড গতিতে যেই লাফ দিয়েছে ঐ হিংস্রতার প্রতিমূর্তি, হাতির পিঠ থেকে তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল বন্দুক। না,

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি, বাঘ পলাতক। অপরূপ সেই দৃশ্য, ঘন সবুজের ফাঁকে দ্রুত অদৃশ্য হল হলুদ রঙের ছোপ। হাতির পিঠে বন্দুক হাতে সেই তরুণ শিকারের কথা ভুলে চলন্ত বাঘের গতিতে মুগ্ধ।

কখনো অশ্বারোহী, কখনো শিকারী এই তরুণকে আবার দেখা গেল নদীর কোলে। জমিদারি দেখাশোনার জন্যে যাতায়াতের যে বিরাট বজরা পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বাবুমশায়রা এসে থাকেন, সেখান থেকে বৈঠা হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি। আঁটসাঁট পোশাক, দেহের অনেকখানি অনাবৃত। হাতের আর পায়ের পেশী দেখলেই অনুমান করা যায়, নিত্য ব্যায়াম এবং হিন্দুস্থানী পালোয়ানদের সঙ্গে ভোরবেলা কুস্তি করার অভ্যাস তাঁর আছে। মাইনে করা মাঝিদের সরিয়ে দিয়ে বৈঠা হাতে তিনি বসলেন ছিপ নৌকায়। তারপর একা বৈঠা চালিয়ে পদ্মানদী করলেন এপার ওপার। হাতের পেশী আর পদ্মার ঢেউ বৈঠার ছন্দে একই সঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল। কুঠিবাড়ি-সংলগ্ন ঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ছাব্বিশ বছরের যুবক চোদ্দ বছরের তরুণকে ধীর শান্ত গলায় হয়তো বললেন—

'আর নয়; রবি, এবার উঠে এসো।'

'যাই জ্যোতিদাদা।'

দুই ভাই কুঠিবাড়িতে ঢুকে গেলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৫ সাল। আজ থেকে একশো বছর আগেকার বঙ্গদেশ। ঠিক একশো বছর আগেকার খোরশেদপুর গ্রাম, যার পরিচিত নাম শিলাইদহ।

এই শিলাইদহের নাম রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বহু কীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পদ্মা নদী আর এই বিস্তীর্ণ জনপদ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তার আগে তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছেন ডালহাউসি পাহাড়, গিয়েছেন বীরভূমের বোলপুর। খুব ছোটোবেলায় আর-একবার তিনি পিতার সঙ্গে এই অঞ্চলেও এসেছিলেন, কিন্তু সে স্মৃতি ঝাপসা। 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক চিঠিতে লিখেছেন, 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম।' কত সালে কোথাও তার উল্লেখ নেই। তবে সেই আসা বালকের মনে তেমন কোনো ছাপ রাখে নি।

গ্রামীণ পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ তিনি পেলেন ১৮৭৫ সালেই সর্বপ্রথম। তার পর দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন সময়ে বার বার তিনি এসেছেন এইখানে, এই পল্লীজননীর কোলে। এইখানেই তিনি শুরু করেন বিরাট কর্মযজ্ঞ, যা তাঁর বিপুল সৃষ্টির চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। বরং আলখাল্লাপরা ঋষিমূর্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর সেই কল্যাণব্রতী কর্মবীরের রূপ। নোবেল পুরস্কারজয়ী বিশ্বকবির অশ্বারোহী

বা বন্দুকধারী মূর্তিও কল্পিত কোনো ছবি নয়। আত্মজীবনীমূলক বহু রচনা বা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়ে সংগীতরচনার ইতিহাসও যেমন আমরা পড়ি, তেমনি এও দেখি ঘোড়ায় চড়া বা হাতির পিঠে বাঘ শিকার করার তালিমও তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম এই নতুন দাদার কাছে।

এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ। যিনি অক্সফোর্ডে 'রিলিজন অফ্ ম্যান' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনিই পদ্মার চরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, তিনিই কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। যিনি বার্নার্ড শ রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন সত্যসুন্দর নিয়ে, তিনিই কফিলুদ্দিন আহমেদ বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান খেতে পোকা মারার পদ্ধতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। যিনি শালবীথিতে হাঁটতে হাঁটতে গুণগুণ সংগীত রচনায় বা শ্যামলী-র বারান্দায় কবিতা সৃষ্টিতে মগ্ন, কিংবা মন্দিরে উপাসনার আচার্য, তিনিই চাষীদের প্রভিডেণ্ট ফান্ড কৃষিব্যাঙ্ক তৌজি, আদায় তহসিল মামলা-মকদ্দমা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। যিনি গেয়েছেন, 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন', তিনিই বলেছেন, 'অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু'।

এই অনন্য চরিত্র নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাই আমার বার বার মনে হয়েছে—কবি নয়, সংগীতজ্ঞ নয়, দার্শনিক নয়, যেন একজন হৃদয়বান কর্মযোগী হওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি জমিদারি পরিচালনার ফাঁকে উপজাত সৃষ্টি। অথচ জমিদার রবীন্দ্রনাথ-শীর্ষক রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। শিলাইদহ, পতিসর বা সাজাদপুরে রাখা কোনো কাগজপত্রই অবশিষ্ট নেই, সব লু·প্ত। অল্প যা-কিছু আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে, তাও প্রধানত জোড়াসাঁকো বাড়ির বা শান্তিনিকেতনের কাছারির হিসাব। অবলম্বনের মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, কিছু গদ্য রচনা, আর নানা জনের সাক্ষ্য। পল্লীপ্রকৃতি, কালান্তর, সমবায়নীতি, আত্মশক্তি ও সমূহ, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি পড়লে গ্রাম ও নিজের জমিদারি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকটা বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের নাম। তিনি শিলাইদহের একদা-অধিবাসী, দীর্ঘদিন ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ধন্য। তিনি জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর লেখা নানা বইয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে অনেক ব্যাপারে ঋণী। আর ঋণী বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনের কাছে। তবে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও হুকুমের ফাইল খোঁজ করেও আমি পাই নি। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দাবি আমলে জমিদারির স্বার্থের প্রতিকূল হবে

ভেবে নদীয়ার কালেক্টার সব নথি পুড়িয়ে ফেলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পতিসরের কাগজপত্রও বিনষ্ট।

আর-একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। রবীন্দ্রসাহিত্য এই রচনার সঙ্গে আমি মিশিয়ে দিই নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-পরিচয় এখানে উহ্য, জমিদারি পরিচালনা করতে করতে কী কী লিখেছেন বা পদ্মানদী ও সাজাদপুর তাঁকে কী প্রেরণা দিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা দিই নি বা বর্ণনা করি নি। সে তো অনেকেরই জানা এবং আমার আলোচনার ক্ষেত্রও তা নয়, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কবি নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথ।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষণীয়। বেশ কিছু বাঙালী বিশ্বাস করেন এবং সাড়ম্বরে প্রচার করেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি জমিদার হিসাবে অত্যাচারী ছিলেন, প্রজাদের ভাতে মেরে নিজের পরিবারের ভাণ্ডার ভরাট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এলাকায় বসবাসকারী বহু লোকও এই মতে আস্থাবান। তাঁদের বেশির ভাগই হিন্দু। কিন্তু ঠাকুর-এস্টেটের মুসলমান প্রজাদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথকে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক বলে চিহ্নিত করার মূলে অবশ্য আছে সেই চিরাচরিত রবীন্দ্রবিদ্বেষ। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যে সংগীতে বা দর্শন-চিন্তায় লোকোত্তর প্রতিভা, এই কথাটা দেশে বিদেশে বার বার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনিন্দকদের শেষ ভরসাস্থল তাঁর জমিদারতনয়ের ভূমিকা। কিন্তু সে অপবাদ যে কত মিথ্যা, কত অসার তার প্রমাণ যিনি তাঁর চিঠিপত্র ও রচনা নাড়াচাড়া করবেন, তিনিই পাবেন।

এই রবীন্দ্রনিন্দকদের একদল কুৎসা রটনা করেন অজ্ঞতা থেকে, অন্যদলের কারণ সংগত। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে কায়েমী স্বার্থের যে কটি দুর্গে কামান দেগেছিলেন, তার সব ক'টিরই রক্ষক ছিলেন হয় হিন্দু গোমস্তা, নয় হিন্দু মহাজন বা জোতদার। তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রবিদ্বেষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই প্রথম তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জেদ আর কল্যাণব্রতের সামনে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করেছিলেন। আর যেহেতু ঠাকুর-এস্টেটের অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান, তাই সবরকম কল্যাণকর্মে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিলেন ঐ মুসলমান প্রজারাই। তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি ঐ কারণেই। কিন্তু কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক সাধারণ গ্রামীণ অর্থনীতির কথা ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি টেনে এনেছেন জমিদারিতে। এমনও বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম কিনা, তাই এত মুসলমান-প্রীতি। সেই মিথ্যাপ্রচার সঞ্চারিত হয়েছে কলকাতার কিছু-না-জেনেও-সবজান্তা বিশ্বনিন্দকদের বৈঠকখানায় ও মজলিসে।

তথ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নেওয়ার

অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে প্রজামঙ্গলে বিপ্লব ঘটিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এমন অনেক নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন, যা আজও অনেক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ কী দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের, স্বদেশবাসীর কাছে বিলাসব্যসনে মগ্ন মৃণালভুক একজন জমিদারতনয়ের পরিচয় নিয়েই তাঁকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

২

জমিদার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়ার আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জমিদারির পরিচয় দেওয়া দরকার। যশোহরের পিরালী ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম কুশারীর বংশধর পঞ্চানন ইংরেজ আমলের শুরুতে কলকাতায় এসে পেলেন 'ঠাকুর' পদবী। পঞ্চাননের পৌত্র ও জয়রামের পুত্র নীলমণি ঠাকুর ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রে হলেন বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক। পাথুরিয়াঘাটা ছেড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন এই নীলমণিই। বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে জমি কিনে তৈরি করেন বিরাট প্রাসাদ—এখন যেটা ছয় নম্বর বাড়ি, রবীন্দ্রভারতীর সম্পত্তি। এই নীলমণির পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ—যাঁর প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা হলেন সেকালের সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সবচেয়ে ধনবান পরিবার। পাঁচ নম্বর বাড়ি—যেখানে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথরা থাকতেন—তৈরি করেন দ্বারকানাথ। সেটা ছিল তাঁর বৈঠকখানা-বাড়ি। সে বাড়ির চিহ্ন আজ আর নেই। পূর্ববঙ্গ আর ওড়িশায় বিশাল জমিদারি খরিদ করেন এই দ্বারকানাথ। তার আগে নীলমণি কিছু জমি খরিদ করেন ওড়িশায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচনও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু ভূসম্পত্তি কেনেন। জ্যেষ্ঠ রামলোচনের পালিত পুত্র দ্বারকানাথ তাঁর মধ্যমভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় সন্তান। রামলোচন ও দ্বারকানাথের আমলে যে-সব এলাকা ঠাকুর এস্টেটের অধীনে আসে, তার মধ্যে আছে নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর পরগনা (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগনা (সদর সাজাদপুর), রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা (সদর পতিসর) এবং ওড়িশার কটক জেলার পাণ্ডুয়া বালিয়া প্রহরাজপুর শরগড়া ইত্যাদি তৌজির জমিদারি। তা ছাড়া ছিল নুরনগর পরগনা, হুগলির মৌজা আয়মা হরিপুর, (মণ্ডলঘাট) পাবনার পত্তনী তালুক তরফ চাপাড়ি, রংপুরে স্বরূপপুর, যশোরে মহম্মদশাহী ইত্যাদি এলাকা। মেদিনীপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর মহকুমায় কিছু জমিদারি দ্বারকানাথ খরিদ করেছিলেন বলে জানা

যায়। এই সম্পর্কে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে [৯ জানুয়ারি ১৮৪২] য়ুরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী পাবনা রাজশাহী কটক মেদিনীপুর রঙ্গপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন-সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ন বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়-কার্য্যের পতন হয়, তবে স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারিও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে, ১৭৬২ শকে [১৮৪০ সালের ২০ আগস্ট], আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগনা কালীগ্রাম একত্র করিয়া, এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রুষ্ট-ডীড্ লিখিয়া, তিনজন ট্রুষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন ; আমরা কেবল তাহার উপস্বত্ব-ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।"

এই বিবরণেই প্রমাণ রামলোচন জমিদারির গোড়াপত্তন করলেও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। এবং এও জানা গেল শিলাইদহ অঞ্চলের জমিদারি দ্বারকানাথের আগেই খরিদ করা হয়। তবে পরে প্রধানত বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, সাজাদপুর ও কটকের জমিদারি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারি কী ভাবে কখন হাতছাড়া হল, তার বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ত্রিপুরা ও মেদিনীপুরের জমিদারির কোনো উল্লেখ নেই। শুধু শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রাখা ১৮৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি হিসাবের খাতাতে দেখা যায়, মহর্ষি নিজে মেদিনীপুর গিয়েছেন। জমিদারি দেখতে, না রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করতে, তার কোনো উল্লেখ অবশ্য ঐ খাতাতে নেই।

রবীন্দ্রসদনে ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারির কিছু খাতাপত্র আছে। তাতে ১২৯১ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের একটি জমাখরচের খাতায় আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়। এই আদায় ধান বিক্রির নয়, চাষীদের কাছ থেকে খাজনা স্বরূপ।—

১.	পরগণে বিরাহিমপুর জমা		৫২,৮৫৭৲
২.	ডিহি সাহাজাদপুর	জমা	৭৮,৩৩৮৷৪৷৷
৩.	পরগণা কালীগ্রাম	জমা	৫০,৪২০৷/০
৪.	তালুক পান্ডুয়া	জমা	১৫,৮৪৫৲
৫.	তালুক বালিয়া	জমা	৫,৫০০৲
৬.	কিসামত সদকী	জমা	৪৩১৲
৭.	মৌজে বিরাটগ্রাম	জমা	২৩৫৲
			২,৩২,৯৪৯৷৷/০
		গতবর্ষের বাকি	১৩২৫৮৶০
			২,৩৪,২৭৫৷৷
		মোট খরচ	২,২৯,৬৫১৶৯

এ ছাড়া আরো কয়েকটি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ঐ জমাখরচের হিসাব মারফত। ১২৮৬ সালের এক জমাখরচের খাতায় উপরের ঐ সাতটি ছাড়া আরো আছে— ৮. পরগনা নূরনগর ৯. নদীয়া জেলার বাজার সেরকান্দি মৌজা, ১০. হুগলী জেলার মৌজা আয়মা হরিপুর, ১১. পাবনার পত্তনীতালুক তরফ্ চাপড়ির উল্লেখ। আর-একটি হিসাবে আছে—১২. নদীয়া জেলার ধোবড়াকোল পাপুর ইত্যাদি চরজমিদারি। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত তালিকার ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ দফা জমিদারি ভালোভাবেই টিঁকে ছিল। ৬নং ও ৯নং দফা বিরাহিমপুরের শামিল, ৭নং দফা সাজাদপুরের অন্তর্গত, ১০নং দফা চুঁচুড়ার একজন ভদ্রলোক দেখাশোনা করতেন, ৮নং ও ৯নং দফা সম্ভবত বিক্রি হয়ে যায় এবং ১২নং দফা ১৯২১ সালে হস্তান্তরিত হয় ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর নামে।

দ্বারকানাথের পর দেবেন্দ্রনাথের আমল। দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি শুধু নন, রাজর্ষিও। তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মে মতি, বিষয়-বৈরাগ্য তাঁর ছিল, তবে তার সঙ্গে ছিল পরিবার-প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যবোধ। তাঁর আমলে জমিদারির প্রসার ঘটে নি বটে, কিন্তু ভূসম্পত্তির পরিচালনা সুসংহত হয়েছে। গোড়ায় তিনি নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্র-নাথের অংশেরও দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। পরে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ভাগ-বাটোয়ারা তিনি নিজেই করে দেন। মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে পাবনার সাজাদপুর পরগনা। কিন্ত গিরীন্দ্রনাথের পর তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ অকালে মারা গেলে গুণেন্দ্রনাথের তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিজে নিয়ে সব প্রাপ্য টাকা তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। গণেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর আজীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দেন মাসিক এক হাজার টাকা দেবার নির্দেশ দিয়ে।

সদর শিলাইদহসমেত বিরাহিমপুর পরগনার আদি ইতিহাস সঠিক পাওয়া যায় না। তবে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষির আমলের বাকি খাজনার আরজির জবানিতে। আরজির নকল হচ্ছে এই রকম: "জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজীর ৩৪৩০নং মহাল পরগণা বিরাহিমপুর বাদীর স্বর্গীয় পিতা ৺বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী। বাদীর পিতার পরলোকান্তে ঐ সম্পত্তি ও ত্যক্ত এষ্টেটের অন্যান্য সম্পত্তি বাদীর পিতার ১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের ডিড্ অব সেটেলমেণ্ট নামক দলিলের সর্ত্তানুসারে ও উক্ত এষ্টেটের স্বার্থভোগী বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিয়োগমতে ট্রাষ্টী পরম্পরায় ও পরিশেষে কথিতরূপ ট্রাষ্টসূত্রে বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ট্রাষ্টীত্রয়ের তত্ত্বাবধানে থাকনাবস্থায় গত ১৮৯৭ সালে বাদী ও শেষোক্ত ট্রাষ্টী ও অন্যান্যের মধ্যে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে ৫৮৫ নম্বরে পার্টিসান সুট উপস্থিত হইয়া ঐ মোকর্দ্দমায় পক্ষগণের সোলেনামা সূত্রে যে ডিক্রী হয় তদনুসারে ট্রাষ্টীগণের ট্রাষ্টস্বত্ব ১৩০৫ সালের সুরু হইতে লোপ পাইয়া অন্যান্য জমিদারীসহ উল্লিখিত পরগণে বিরাহিমপুর ষোলআনা রকম ও তৎসংক্রান্ত সর্বপ্রকার পাওনা বাদী নিজাংশে প্রাপ্ত হইয়া জমিদারির স্বত্বে কালেক্টরীতে নামজারী পূর্বক সদর মফঃস্বল কর আদায়ে স্বত্ববান্ ও দখলীকার আছেন ও কথিত সোলেনামা-মত শেষ ট্রাষ্টীত্রয়ের দখলীসময়ের বাকী বকেয়া খাজনা আদায় করিয়া লইবার স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন।..."

এই আরজিতেই আন্দাজ করা যায় যে, নানারকম আইনঘটিত ক্রিয়ায় বিরাহিমপুরের জমিদারি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঋণশোধের ব্যাপারে ঐরকম দাঁড়িয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ শেষ উইল করেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর। সেই উইল-মতো ওড়িশার সম্পত্তি পান তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনে মিলে একত্রে পেলেন নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজশাহীর কালীগ্রাম। কনিষ্ঠভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর জন্য মাসিক বরাদ্দ হয় ১০০০ টাকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, তাই তাঁর জন্যে মাসহারা ১২৫০ টাকা। সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত, তিনি পেলেন মাসে ২০০ টাকা। বীরেন্দ্রনাথও উন্মাদ, তার জন্যে বরাদ্দ মাসিক ১০০ টাকা, তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবীর জন্য ১০০ টাকা এবং বীরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা দেবীর জন্যে ১০০ টাকা। এই টাকা হাতখরচের জন্যে দেওয়া। দেবেন্দ্রনাথের অন্য দুই পুত্র—পুণ্যেন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ শৈশবেই মারা যান। সুতরাং মাসিক ভাতার প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া তাঁর

কন্যাদের মধ্যে জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল—সৌদামিনী দেবী ২৫ টাকা, শরৎকুমারী দেবী ২০০ টাকা, স্বর্ণকুমারী দেবী ৮৭॥ এবং বর্ণকুমারী দেবী ৮৭॥। শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে টাকা বেড়ে পরে হয় মাসিক ১০০ টাকা। অন্য কন্যা সুকুমারী দেবী অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁর জন্যে বৃত্তি বরাদ্দ হয় নি। সৌদামিনী দেবী পিতৃগৃহেই থাকতেন। তাঁর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ও পেতেন মাসহারা ৫০ টাকা। এই ব্যক্তি-বৃত্তি ছাড়াও জমিদারির আয় থেকে প্রতি মাসে দেওয়া হত আদি ব্রাহ্মসমাজকে ২০০ টাকা, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে ৩০০ টাকা এবং দেবসেবার জন্য সেবায়েৎ বার্ষিক ২০০০ টাকা। এ ছাড়া আদরের বড়ো নাতি হিসাবে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পেতেন মাসে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বার্ষিক ৫২,৪০০ টাকা।

এই টাকার জন্যে দায়বদ্ধ রইলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া ১৯১২ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ৯৯৯ বছরের ইজারা পাট্টা দেন তাঁর নিজস্ব এক-তৃতীয়াংশ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে। জমিদারিতে লাভ হোক আর লোকসান হোক, প্রতি বছর দ্বিজেন্দ্রনাথকে ৪৫ হাজার টাকা করে দেবার জন্যে দায়ী থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁদের ওয়ারিশগণ। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত একা রবীন্দ্রনাথই কার্যত দায়ী রইলেন এতগুলো টাকার জন্যে (মোট ৯৭,৪০০ টাকা)। কেননা, সত্যেন্দ্রনাথ সিবিল সারভিসের লোক, চাকরি নিয়ে বরাবর বাংলাদেশের বাইরে। ঐ প্রায় লাখ টাকার দায় ছাড়াও রয়েছে পারিবারিক ব্যয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির ব্যয়, জমিদারি পরিচালনার ব্যয়। এ বাবদ টাকার পরিমাণও কম নয়।—বছরে অন্তত আরো লাখ দুই তিন টাকা।

ঠাকুরবাবুরা সরকারকে সদর খাজনা কত দিতেন? কিছু তথ্য আছে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি খাতায়। তাতে দেখা যাচ্ছে ৮৭০ খ্রীস্টাব্দে একমাত্র বিরাহিমপুর পরগনার সদর খাজনা ১৬,৯০২ টাকা। এই হিসাবমতো বাংলাদেশের তিনটি পরগনা বাবদ সদরখাজনা অন্তত ৫০,০০০ টাকা। সেইসঙ্গে আছে ওড়িশার জমিদারির খাজনাও।

দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি দেখাশোনা ছেড়ে দিলেন তখন তাঁর প্রতিভূ হয়ে কাজ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও মেজো ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ, সারদাপ্রসাদের ছেলে সত্যপ্রসাদ এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ। সামগ্রিক দায়িত্ব দিয়ে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে কেন দেবেন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছিলেন তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে বরাবরই এই সন্তানটির প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা। এমন কথাও শোনা যায় যে, ঠাকুর-এস্টেটের আমলাদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ, নানারকম অসন্তোষ জমা হচ্ছিল প্রজাদের পক্ষ থেকে

এবং জমিদারিসংলগ্ন কুমারখালির মনীষী হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) কাগজ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় সেই-সব অসন্তোষের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। হয়তো দেবেন্দ্রনাথ এই অসন্তোষের প্রতিবিধান করতেই প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রকে জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে হরিনাথ মজুমদারের কাগজের গ্রাহক ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। আছে, রবীন্দ্রসদনে রাখা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব হিসাব-বহিতে।

রবীন্দ্রনাথ যখন দায়িত্বভার পেলেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশের নীচে। মাসহারার ঐ ৯৭ হাজার ৪ শত টাকার দায়িত্ব তো ঘাড়ে রইলই, তা ছাড়া দেখাশোনার ভার নিলেন আরো দুটি জমিদারির। একেবারে প্রথম দিকে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের অংশ ওড়িশার ও গুণেন্দ্রনাথের অংশ সাজাদপুরের জমিদারি পরিচালনা করে তার হিসাবপত্র লাভালাভ প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও রইল রবীন্দ্রনাথের উপর। পরে ঐ দুটি জমিদারিই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বিরাট এজমালি সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব প্রথমে পান নি। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি গোড়ায় পান ইন্সপেকশনের ভার—১৮৯০ সালে। তার পর রবীন্দ্রনাথের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ৮ আগস্ট পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে সমগ্র সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব দেবেন্দ্রনাথ ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথের উপর। সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রণিধানযোগ্য (দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ২৯৬)। পিতা পুত্রকে লিখছেন :

"এইক্ষণে তুমি জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"

রবীন্দ্রনাথ স্কুলে কোনো পরীক্ষায় পাস করেন নি, ব্যারিস্টারিতেও নয়, কিন্তু পিতার কাছে এই কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পুত্রের বিচক্ষণতায় পিতার 'প্রতীতি' হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ পুরো পাঁচ বছর শিক্ষানবিশী করে 'মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার' ভারপ্রাপ্ত হন। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা জায়গায় লিখেছেন ও বলেছেন, এই শিক্ষানবিশীকালে পিতার কাছে হিসাবের পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর কী রকম দুশ্চিন্তা হত, কী ভাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্য মহর্ষি বুঝে নিতেন, এক কানাকড়িও এদিক সেদিক হবার উপায় ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জমিদারির পুরো ভার পেয়ে চিরাচরিতপ্রথা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। তার আগে তাঁর দাদারা ভাইপো ভাগনে, ভগ্নিপতি এসেছেন একই দায়িত্ব নিয়ে, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাধারণ জমিদার-মাত্র, প্রথার দাস। তারও আগে এসেছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। তিন-চারবার। তিনি বেশির ভাগ বোটেই থাকতেন, বোটেই যাতায়াত করতেন। জমিদারি পরিচালনা ছাড়াও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। পাবনা, কুষ্টিয়া ও কুমারখালিতে তিনি তিনটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতামহ দ্বারকানাথও জমিদারিতে গিয়েছেন। তবে তাঁর আমলে পরিচালনার ভার ছিল প্রধানত সাহেব ম্যানেজারদের উপর। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ব্যাপারে হলেন ব্যতিক্রম। পূর্বসূরীদের সোজা রাস্তা ছেড়ে এগোলেন কঠিন রাস্তায়। সেই রাস্তা অতিক্রম করতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে বটে, তবে কখনো হতোদ্যম হন নি, আপন লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছেন।

বিরাট এজমালি সম্পত্তি কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পরিচালনা করেন। তরে পর আগেই বলেছি, ওড়িশার ভূসম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা চলে যায় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাবালক বংশধরদের হাতে। তারপর সাজাদপুর পরগনা গেল গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রদের দখলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রইল শুধু বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগনা।

পরবর্তীকালে হল আবার ভাগ। শিলাইদহ সমেত বিরাহিমপুর পরগনা গেল সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সুরেন ঠাকুরকে বলেছিলেন বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগনার মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে। সুরেন ঠাকুর বিরাহিমপুর পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের রইল শুধু রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনা—যার সদর পতিসর। তবে ঐ দুটি পরগনার মালিকানায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বা তাঁর ওয়ারিশনদেরও অংশ ছিল। সুরেন ঠাকুরের আমলে শিলাইদহ ঋণের দায়ে বন্ধক হিসেবে চলে যায় ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের হাতে। এই দেনা কোনোদিনই শোধ হয় নি, ওয়ার্ড এস্টেট, রিসিভার এস্টেট ইত্যাদির খোলস পরেও বিরাহিমপুর আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। অবশেষে ভাগ্যকুলের কুণ্ডুরাই হলেন শিলাইদহের মালিক। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেই শেষদিকে কালীগ্রাম পরগনা দেখাশোনার দায়িত্ব নেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার আগে দুই জমিদারির ম্যানেজিং এজেন্ট রূপে কিছুদিন কাজ করেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ। ১৯৫২ সালের এক অরডিন্যান্সবলে শিলাইদহ তো গেলই, কালীগ্রাম পরগনাও গেল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে। তার পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। রাজনৈতিক কত উত্থানপতন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িটি শুধু সংরক্ষিত গৃহ হিসাবে বিশেষ মর্যাদা পেল। অর্থাৎ ছয় পুরুষের ঠাকুর-জমিদারির এইখানেই ইতি।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার বিশদ বিবরণ দেবার আগে বাংলাদেশের গ্রাম, প্রজা-জমিদার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা করতেন জানা দরকার। সেই চিন্তাভাবনা অবশ্য কল্পিত কিছু নয়, তাঁর সমস্ত ধ্যানধারণাকে তিনিই একমাত্র বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। গ্রাম-বাংলার এই রূপকারের পরিচয় খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে আমরা জানি, শুধু জানি না, কী পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি, উদ্যম ও স্বচ্ছচিন্তা নিয়ে তিনি কাজে হাত দিয়েছিলেন। 'ফিরে চল্ মাটির টানে' বাক্যটি শুধুমাত্র গান নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা।

এই কথাটিই তিনি নানা সময়ে নানাভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ১৯০৭ সালের পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচরণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই, যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে।...জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই।...অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকে দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।"

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে যান নি, কিন্তু জানতেন স্বাধীনতা অচিরে আসবেই। তার প্রাক্‌প্রস্তুতি হিসাবে তিনি আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ সবল সতেজ পল্লী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন "বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে, তাহা নহে।" তিনি বুঝেছিলেন গ্রামই ভারতের প্রাণ, গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই নিভৃতে নিজ জমিদারিতে পল্লী উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে।"

রবীন্দ্রনাথ এইসঙ্গে লক্ষ করেছিলেন, দেশের নেতা ও গুণীজ্ঞানীদের গ্রামের প্রতি অবজ্ঞা। সমাজভেদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বড়ো দুঃখে লিখেছেন, "পল্লী-সমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না; দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে।"

নিজে জমিদার হয়েও দেশের উন্নতিতে পরাঙ্মুখ জমিদারবর্গকে উদ্দেশ করে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত ও নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার মহাজন পুলিস কানুন-গো আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে, তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া?"

১৩০৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে' (উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি ও জননেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মধ্যে বাদানুবাদের জবাবে) নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো লেখেন, "এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল, তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান অর্চনা কীর্তিস্থাপন আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প-সাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত, সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন।"

এই শ্রেণীর জমিদারদের মূর্ত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজে। তিনি নিজে ধনকামী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বলতে পেরেছিলেন—"ধনের ধর্ম অসাম্য। ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

হিতসাধন মণ্ডলীর সভায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা আজও 'সত্য হয়ে' আছে—"শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থি-মজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান ক'রে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উলটো। গ্রামের চাষীরা

ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না—উলটোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য।"

গ্রাম সম্পর্কে, অচেতন নগরবাসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তি (শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধনের ১৯৩৮ সালের ভাষণ) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।"

অথচ মূলত নাগরিক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। তিনি পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করেছেন পল্লীতে বাস করে। ১৩৪৬ সালে শ্রীনিকেতনে কর্মীদের এক সভায় বলেন: "প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি—নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির, আর-একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।"

রবীন্দ্রনাথের মতে: "গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।"

প্রকৃত ভারতবর্ষকে পাওয়ার জন্যে তাই তিনি পরে কর্মীদের বলেন: "আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতবর্ষের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে। এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব, এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।"

রাশিয়ার চিঠিতে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন জমিদারি পরিচালনার সময় কী ছিল তাঁর অভিপ্রায় : "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।"

১৯২৬ সালে ময়মনসিংহে এক অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন : "কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে? কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশ-বিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি! যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো—তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে।··· পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্য যারা ব্রতী তাদের পাশে আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন।"

তবুও 'ধনীর সন্তান' বলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কত কটাক্ষ! তাই বড়ো দুঃখের সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন : "লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়?"

দেশের মাটিকে তিনি বলেছেন, ভূমিলক্ষ্মী। সেই 'লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে' আসতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই লক্ষ্মীকে তাঁর জমিদারির প্রত্যেকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্বও স্বেচ্ছায় তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জমিদারি প্রজাদের হাতে বিলিয়ে দিয়ে রাতারাতি রাজা হরিশ্চন্দ্র বা দাতা কর্ণের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রজা এবং জমিদারের সম্মিলিত উদ্যোগে একটা মহৎ শক্তি সৃষ্টি করার দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল।

তবে প্রজাদের চরিত্রের দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সেই কারণে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছেন। জমিদারি প্রজাদের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সম্পর্কেও তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল নানা প্রশ্ন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'জমিদার নির্লোভ নয়' এবং এইসঙ্গে বলেছেন: "আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?" কেননা, 'রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয়' তাঁর জানা ছিল। "তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘরজ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।" তা ছাড়া "চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।"

এই উক্তিতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে বলেই তিনি কালান্তর গ্রন্থে আবার বলেছেন: "আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বর্নাবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: "জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে-লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমি বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমে যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের

পক্ষে সে জমি ততই অল্পস্বত্ব হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে।”

তবু 'জমিদারি ব্যবসায়' যে ফাঁকিবাজি, এ কথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন। তাই বলেন : “মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলামচোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে।”

১৮৯০ থেকে ১৯২২—প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনার কাজে যুক্ত থেকে জমিদার যে কী জিনিস এবং জমিদারির বস্তুটা যে কী সে সম্পর্কে অবশ্য তাঁর মনে অস্পষ্টতা ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলছেন : “আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে উপার্জন না করে কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।”

এই একই কথার পুনরাবৃত্তি পাই ১৯৩০ সালে রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে। তিনি লিখেছেন : “যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনো দিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।”

প্রতিমা দেবীকে অন্য একটি চিঠিতে ঐ একই সুরে তিনি লিখছেন : “ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের

পুরোনো কথা। বহু কাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারির রথ সে রাস্তায় গেল না—তার পর যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি—কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয়, তা হলে আর একবার আমার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।"

তবে জমিদারি ব্যবসায় সম্পর্কে যত বিতৃষ্ণাই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেশকে চিনেছিলেন ঐ জমিদারি পরিচালনা করতে এসেই। তাঁর জীবনে নতুন মোড় ফিরল ১৮৯১ সালে। তখনই তাঁর অন্য জীবন শুরু। আমরা এবার ফিরে যেতে পারি তাঁর সেই ৩০ বছর বয়সের মধ্যযৌবনে।

৪

সেদিনের সেই চতুর্দশবর্ষীয় বালক এখন পরিপূর্ণ যুবক। তরুণ মুখমণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে কৃষ্ণশ্মশ্রুর বিন্যাস, দুই চক্ষু আরো দ্যুতিমান, চলনে বলনে সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এই ধনীর দুলাল ইতিমধ্যে দুই দুইবার ঘুরে এসেছেন বিলেত, কবি হিসাবে খ্যাতিমান; বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেনের সপ্রশংস আশীর্বাদ সেই খ্যাতিকে আরো ব্যাপক করেছে। বাল্মীকিপ্রতিভা, কড়ি ও কোমল, মানসী ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি লেখক, সংগীত রচনায় এবং গায়ক হিসাবেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত। তদুপরি তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। বিবাহও করেছেন, এক কন্যা ও এক পুত্র তাঁর সংসারে। সংগীতে সাহিত্যে শিল্পে সমাজ-সংস্কারে আভিজাত্যে ঐশ্বর্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তখন ভরা জোয়ার। সেই জোয়ারের টান উপেক্ষা করতে নাগরিক সেই যুবক মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে জমিদারির নূতন দায়িত্ব নিয়ে চললেন পদ্মানদীর তীরে শিলাইদহের পল্লীভূমিতে।

তার আগে অবশ্য তিন-চারবার ঘুরে গিয়েছেন মধ্য ও উত্তরবঙ্গের সেই অঞ্চল। প্রথমবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে, দ্বিতীয়বার সেই ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে, তৃতীয়বার ১৮৮৯ সালে স্ত্রীপুত্র-কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেড়াতে। চতুর্থবার অরুণেন্দ্রনাথকে নিয়ে ১৮৯০ সালে। মাঝখানে একবার একা যান সাজাদপুর। তৃতীয়বারের সঙ্গী ছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর প্রিয়বন্ধু অমলা দাশ। দ্বিতীয়বারে যেমন রবীন্দ্রনাথ রপ্ত হয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়া এবং শিকারে, তৃতীয়বার তেমনি অন্য একরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই পদ্মা নদীর চরে। তাঁর স্ত্রী বন্ধুসমেত হারিয়ে গিয়েছিলেন বিজন নদীতীরে। রবীন্দ্রনাথের সে কী উৎকণ্ঠা, সে কী আশঙ্কা!

ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে লিখছেন : "নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণচন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো—মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি—মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য—এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কা-সবল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরাবালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিংবা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে হতে লাগল—'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম—বেশ বুঝতে পারলুম বলু বেচারা ভালো মানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল। এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিমুখে চললুম, বোটে গিয়ে পৌঁছতে অনেকক্ষণ লাগল। বোট ওপারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন।"

কিন্তু ১৮৯১ সালে এই ষষ্ঠ যাত্রার পিছনে রয়েছে ভিন্নতর উদ্দেশ্য, রয়েছে গুরুতর দায়িত্ব। পিতা দেবেন্দ্রনাথের ফরমান নিয়ে জমিদারির কাজ দেখতে তিনি চলেছেন পরগনায়, যাবেন শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর। তিনি সেখানে আর রবীন্দ্রনাথ বা রবিঠাকুর বা রবীন্দ্রবাবু নন, এখন তিনি নতুন বাবুমশায়—'হুজুর'। তিনি চলেছেন তাঁর প্রথম পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে। ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি রানাঘাট চুয়াডাঙা হয়ে কলকাতা থেকে ১১১ মাইল দূরে কুষ্টিয়া। সেখান থেকে ছয় মাইল পথ পাল্কিতে। ষোলো বেহারার পাল্কি। তার পরই বিরাহিমপুর পরগনার খোরশেদপুর গ্রাম। সেখানেই শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও সদর কাছারি।

শিলাইদহ নামের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। পদ্মা ও গোরাই নদীর সঙ্গমে বুনোপাড়ার কাছে প্রাচীন নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ি ছিল। দুটিই এখন পদ্মার বুকে বিলীন। কুঠিবাড়িটি কিনেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। তারই দোতলা-তিনতলায় থাকতেন ঠাকুরবাবুরা। পরে ১৮৯২ সালে তৈরি করা হয় নতুন কুঠিবাড়ি—এখনো যা স্মৃতিভারে পড়ে আছে পদ্মার তীরে। প্রায় তেরো বিঘা জমির উপর নূতন কুঠিবাড়ি। শিশু আম জাম নিয়ে মনোরম এই পল্লীভবন তৈরির ভার ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথের উপর। পরে রথীন্দ্রনাথ আরো সংস্কার করেন।

নীলকরদের একজন ছিলেন শেলী নামে সাহেব। তারই নামে হয় শেলীর দহ এই শেলীর দহ থেকেই পরে পাড়ার নাম হয়ে যায় শিলাইদহ। আদি নাম খোরশেদপুর তলিয়ে গেছে ঐ পাড়ার নামের আড়ালে। আসলে কুঠিবাড়ি কাছারি বাড়ি নিয়ে শিলাইদহ পল্লী খোরশেদপুর গ্রামেরই অংশ।

সাজাদপুর পতিসরের তুলনায় এই শিলাইদহের পরিচিতি বেশি। তার কারণ এই জায়গাটিই অনেকখানি জুড়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে ও রবীন্দ্রমননে। শিলাইদহ নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার একটি গ্রাম। কুমারখালি নামকরা শহর। এইখানেই ছিলেন বহু মনীষী—তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ। আর এখানেই আছে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের ভিটা আর খোরশেদ ফকিরের দরগা।

পদ্মা ও গোরাই নদীর সংগমে শিলাইদহের কুঠিরহাট। তারই কাছে রবীন্দ্রনাথদের তিনটি মহাল—কয়া, জানিপুর ও কুমারখালি। একটু দূরে ডাকুয়াখালের তীরে পাণ্টি মহাল—যশোরের প্রান্তে। পদ্মার ওপারে পাবনা, সেখানে সাজাদপুরের জমিদারি এবং উত্তরে উজিয়ে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনা।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার শিলাইদহর নাম উচ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কর্মের সম্পর্ক পরে বেশি ছিল কালীগ্রাম পরগনার সঙ্গে। সেখানকার সদর কাছারি পতিসরকে কেন্দ্র করে সব রকমের পরীক্ষা বেশি চালিয়েছিলেন তিনি। সব বাদ গিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কালীগ্রাম পরগনাই আমৃত্যু থাকে রবীন্দ্রনাথের ভাগে। মণ্ডলীপ্রথা, সালিশী, হিতৈষীসভা ইত্যাদি যুগান্তকারী ব্যাপার সফল হয়েছে ঐ পতিসরেই। শিলাইদহের মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পগুলি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি, বরং বাধাই দিয়েছে এবং সেই কারণেই রবীন্দ্র-বিরোধিতাও সেখানেই বেশি। পতিসর তার ব্যতিক্রম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ওড়িশার জমিদারি সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিবরণ রবীন্দ্রনাথ রেখে যান নি, যদিও ১৮৯৩ সালে বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই জমিদারি পরিদর্শন করেন। একমাত্র 'ছিন্নপত্রাবলী'তে প্রকৃতি-বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে—দুধারে চষামাঠ নেবে গেছে। আম অশত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ ঘেরা এক-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই—সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবসুদ্ধ বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে।"

রবীন্দ্রনাথ বার বার গিয়েছেন তাঁর বাংলাদেশের জমিদারিতে। বৃহৎ কোনো কাজে হাত দেবার আগে ভালো করে জেনেছেন পল্লীজননীকে আর সেখানকার দুঃখী মানুষদের। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবার পরই তিনি তাঁর বৃহৎ কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন।

প্রথম দিককার পরগনা-ভ্রমণ নিয়ে চমৎকার কিছু বর্ণনা আছে চিঠিপত্র

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে এবং ইন্দিরা দেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। জমিদারি থেকে স্ত্রীকে যে-সব চিঠি লিখেছেন, তাতে ব্যক্তিগত কথাবার্তাই বেশি। তবে তার থেকে সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

"ভিজে বাদলার বাতাস দিয়েছে, সূর্য প্রায় অস্তোমিত। পিঠে একখানি শাল চাপিয়ে জোড়াসাঁকোর ছাত আমার সেই দুটো লম্বা কেদারা এবং সাঁৎলা-ভাজার কথা এক-একবার মনে করছি। সাঁৎলাভাজা চুলোয় যাক, রাত্রে রীতিমত আহার জুটলে বাঁচি। গোফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটা ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কী একটা রন্ধনকার্যে নিযুক্ত আছে। মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় চিড়বিড় শব্দ হচ্ছে এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আসছে, কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি এলেই সমস্ত মাটি।"

ছিন্নপত্রাবলীতে সংকলিত ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে সেই সময়ের অবস্থা ও পরিবেশের বিবরণ প্রচুর। ১৮৯১ সালের জানুয়ারিতে পতিসর কাছারি থেকে লেখা একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো একটু কোলের মতো তৈরি করেছে—দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না। নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়—'হাঁ গা কাদের বজরা ?' 'জমিদারবাবুর।' 'এখানে কেন ? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি ?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'—এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এরকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি—এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়, দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খসখস শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আম-গাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে—নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে ; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসি কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও এ দৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে—তীরে কতকগুলো নৌকো

বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ—মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখাল শিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুরবেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।"

সাজাদপুর থেকে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা আর-একখানা চিঠি : "বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়, লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘন্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রমে কাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্নাওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন, কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।"

শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা আর-একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন : "পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা।...আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।...একদিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসেছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুরবেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল,

পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাবলিক নামক গ্যাসালোকজ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না। এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। 'সাধনা' চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁসফাঁস করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।"

আর-একটি চিঠি: "আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে—তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এঁরা যখন কোনো একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।"

পতিসর থেকে লেখা আর-একটি চিঠিও প্রায় এই ধরনের: "এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না। এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে।...আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধ মুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।"

পরপর এই কয়খানি চিঠিতে 'নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মমতা কতখানি ছিল, তার প্রমাণ তিনি বার বার দিয়েছেন।

ছেলেবেলার প্রমোদ-ভ্রমণ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে ছিলেন বা যাতায়াত করেছেন মোটামুটি পঞ্চাশ বছর। জমিদার হিসাবে শেষ যান পতিসরে

১৯৩৭ সালে—যখন তাঁর জগৎজোড়া নাম। শিলাইদহে শেষ যান ১৯২২ সালে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৮—এই আট বছর তিনি একাই থেকেছেন জমিদারিতে। মাঝে মাঝে গিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও অন্য বন্ধুবান্ধবেরা। বেড়াতে এসেছেন লোকেন পালিত, অক্ষয় মৈত্রেয়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, কর্নেল মহিম-ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু' ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ। পরে শান্তিনিকেতন থেকে গিয়েছেন, পিয়ার্সন ও এন্ডরুজ সাহেব। ১৯১৫ সালে একবার গিয়েছেন নন্দলাল বসু, সুরেন কর ও মুকুল দে। জোর করে একবার সাজাদপুর কাছারিতে নিয়ে যান ঘরকুনো দুই ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র-নাথকে। আসা-যাওয়ার পথের ধারে রানাঘাটে নেমেছেন স্থানীয় হাকিম নবীনচন্দ্র সেনের অনুরোধে। সেখানে তাঁকে শুনিয়েছেন গান। ১৮৯৪ সালে পরিণত যৌবনে রবীন্দ্রনাথের চেহারা কেমন ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' গ্রন্থে : 'কী শান্ত কী সুন্দর কী প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মতো দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা, কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল, কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু—সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখোবয়ব দেখিলে চিত্রিত খ্রীষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমি পিরান ও চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজি পাদুকার কঠিনতা অসহ্যতাব্যঞ্জক।'

শিলাইদহ অঞ্চলের জাগ্রত বিগ্রহ গোপীনাথ। সেবাইত সূত্রে গোপীনাথজীর সেবাপুজা পরিচালনা করতেন ঠাকুরপরিবার। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথের সেবা করেছেন। রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে প্রথম এলে তাঁকে সর্বাগ্রে গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল। জমিদারি ভাগাভাগির পর সুরেন্দ্রনাথের যখন অভিষেক দিলেন রবীন্দ্রনাথ তখনো পালকিতে চাপিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় গোপীনাথ মন্দিরে—আশীর্বাদ নিতে।

১৮৯৯ সালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কুঠিবাড়িতে তিনি পাতেন সুখের সংসার। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, প্রজাজননী মৃণালিনী দেবী আর বেলা রথী রেণুকা মীরা শমী। সংসার পাতার সঙ্গে সঙ্গে কুঠিবাড়িতেই বসল গৃহবিদ্যালয়। জমিদারির সেরেস্তা থেকে এলেন জগদানন্দ রায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিলেট থেকে পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব ও বিলেত থেকে 'পাগলা সাহেব' লরেন্স। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা এই শিলাইদহ কুঠিবাড়িতেই।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন

শচীন অধিকারী মশাই।—প্রত্যেক দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে উপাসনা ও সামান্য জলযোগ সেরে বেড়াতে বেরোতেন মাঠের মধ্যে একাকী। তাঁর অলক্ষিত একজন বরকন্দাজ দূরে দূরে থাকত। দু-তিন মাইল বেড়াতেন। প্রজাদের 'সেলাম হুজুরের' উত্তরে তাদের সঙ্গে নানা আলোচনায় মত্ত হতেন। কুঠিবাড়িতে ফিরতেন গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে। গান লিখতেন অবিরাম—'ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান।' তার পর বসত আমলা ও প্রজাদের দরবার। বেলা এগারোটার মধ্যে আহারাদি সেরে লেখনী ধারণ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না। 'জলনিবাস' বোটে থাকতেও এই অবস্থা। মনের মতো করে সুন্দর বৃহৎ জলনিবাস তৈরি করিয়েছিলেন। পদ্মা চিত্রা নাগরবোট আত্রাই ও লালডিঙি। দাঁড়িমাল্লা বাদেও সর্বক্ষণের জন্য দুজন প্রবীণ বরকন্দাজ বোটে থাকত—মেছের সর্দার ও তারণ সিং। থাকত বাবুর্চি গফুর ফরাস ফটিক ও ভৃত্য বিপিন। মাঝে মাঝে আসত পাগল লালা পাগলা ইত্যাদি। বোট বাঁধা থাকত বুনাপাড়ার কোলে অথবা হানিফের ঘাটে। সেখানে প্রায় সারাদিন পল্লীরমণীদের আনাগোনা। কবি পরমানন্দে তাদের আলাপ-বিলাপ শুনতেন। সাহিত্য সৃষ্টির কড়া তাগিদ এলে তিন-চার দিনের জন্যে পদ্মায় কোনো জনহীন কোলের মধ্যে বোট বাঁধা থাকত। হুকুম ছিল কেউ সেখানে যেতে পারবে না। সে কয়দিন কবির জমিদারি-চাকরির ক্যাজুয়েল লীভ।

কুঠিবাড়িতে তখন সরল গৃহস্থালি। মৃণালিনী দেবী প্রজাদের কাছে 'মা-জননী'। তিনিও মাতৃস্নেহে প্রজাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। কিন্তু হঠাৎ সুখের সংসারের সব-কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ১৯০১ সালে প্রথম কন্যা বেলার বিয়ের পরই স্ত্রী হলেন পীড়িতা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন শান্তিনিকেতন। প্রতিষ্ঠা হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯০২ সালে স্ত্রীর এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের কিছুদিন পর রেণুকার মৃত্যু। ১৯০৫ সালে মৃত্যু পিতার, ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের। শোকে শতছিন্ন কবি।

১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠীবিদ্যা শেখাতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ কন্যা মীরা-র বিবাহের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিও বিদেশ গেলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। যে যুগে আই. সি. এস. বা ব্যারিস্টারি পড়া ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সময় ধনী জমিদার রবীন্দ্রনাথের পুত্র, বন্ধুপুত্র ও জামাতাকে তার বদলে চাষবাস শিখতে বিদেশ পাঠানো অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক ঘটনা। বলা বাহুল্য, এই বিদেশ যাত্রার পিছনে কাজ করেছে, জমিদারির উন্নতি বিধান, এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও ফসল নিয়ে পরীক্ষার তাগিদ।

কলকাতার দুই প্রান্তে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে—পূর্বে আর পশ্চিমে কুষ্টিয়া আর বোলপুর, গোড়ার কয়েক বছর বাদ দিলে দুই দিকেই পাতা রইল রবীন্দ্রনাথের সংসার। একদিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, অন্যদিকে জমিদারি। শোকের পর শোকে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত জীর্ণ, কিন্তু নতুন কিছু করার অদম্য আগ্রহে তখনো দীপ্ত, কর্মব্যস্ত। ১৯০৩ সালে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে এল শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। চার মাস পর আবার শান্তিনিকেতনে। কুঠিবাড়ির গৃহশিক্ষকরাই হলেন শান্তিনিকেতনের আদি শিক্ষক।

১৯০৮ সালে গ্রামের কাজে যোগ দিলেন কালীমোহন ঘোষ। উৎসাহী তরুণ যুবক। তাঁর উপর ভার পড়ল গ্রামোন্নয়নের। সে বছরই যুগান্তকারী মন্ডলীপ্রথা প্রবর্তন। তার আগে যোগ দিয়েছেন শৈলেন মজুমদার, চন্দ্রময় সান্যাল ও কালীমোহনের মতোই একনিষ্ঠ দেশসেবক অতুল সেন। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথরা বিলেত থেকে ফিরে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার, পাম্প ইত্যাদির ব্যবহার। আজ যে পদ্ধতিতে চাষ সারা ভারতে, কোনোপ্রকার ঢক্কানিনাদ না করেই এদেশে সর্বপ্রথম চালু করলেন রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ। কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে শুরু হয় সেই গবেষণাগার। ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর কুঠিবাড়ির গৃহলক্ষ্মী হলেন প্রতিমা দেবী।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। পরের বছরই শান্তিনিকেতনের পরিপূরক শ্রীনিকেতন সৃষ্টি। পল্লী সংগঠনের অনেক পরিকল্পনা স্থানান্তরিত হল শ্রীনিকেতনে। এলমহার্স্ট সাহেব ও কালীমোহন ঘোষ নিলেন তার ভার। লক্ষণীয় যে, ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষ যান শিলাইদহে, সেই বছরই জমিদারির সাফল্য আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রীনিকেতনে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু।

রবীন্দ্রনাথের মন যদিও পড়ে ছিল মধ্য ও উত্তর বাংলার গ্রামে, তবু মন্ডলীপ্রথা নিয়ে প্রতিকূলতা, দেনার দায় ও পারিবারিক নানা সমস্যা তাঁকে বাধ্য করে বীরভূমের গ্রামে চলে আসতে। ওদিকে জোড়াসাঁকোয় বিভিন্ন অংশের পরিবার দিনদিন বাড়ছে, তাদের খরচও বাড়ছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার চাপে জমিদারির আয় ততটা বাড়ছে না। ফলে পারিবারিক নানা কলহও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ তাই অবশেষে আশ্রয় নিলেন বীরভূমের পল্লীতে, শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন নিয়ে নতুন পরীক্ষায়। সেখানে আমলা নেই, মহাজন নেই, এজমালি সম্পত্তি নেই—একেবারে ভিন্ন পরিবেশ। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, নিজ জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ যে-ধরনের দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনেও তা পারেন নি। জমিদারি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সংগঠনের আদিপর্বে বাংলাদেশের মরা গাঙে তিনি জোয়ার এনেছিলেন। ১৮৯১ সালে

প্রথম যখন জমিদার হয়ে এলেন পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে, তখনো তিনি ভাবতে পারেন নি, ভূমিলক্ষ্মী তাঁকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন।

তাই ১৮৯১ সালে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আবার ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাই সংশয়াচ্ছন্ন চিন্তাক্লিষ্ট এক যুবককে। বঙ্গজননীর যে মূর্তি তিনি অন্যত্র দেখেছেন, তার সঙ্গে এর মিল নেই। নিত্যকল্যাণীলক্ষ্মী বঙ্গজননীর 'বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা, সম্মুখে কষ্টের সংসার, বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।' মুহূর্তের মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন, প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অন্ধকারে আশার আলো জ্বালানোই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। তাই জমিদারির ভার নেবার প্রথম দিন পদ্মাতীরে সূর্যস্নাত প্রথম প্রভাতে কুঠিবাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝি মনে মনে বলেন—'আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি, অঙ্গদ-কুন্ডলকণ্ঠী অলংকাররাশি খুলিয়া ফেলেছি দূরে।'

ওদিকে পুণ্যাহ উৎসবের আয়োজন সমাপ্ত। বন্দুকের আওয়াজ রোশনচৌকি হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে কাছারি মুখর। নতুন বাবুমশাই কাছারিতে নেমে এলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরে শান্ত সৌম্য মূর্তি। প্রথামতো প্রারম্ভে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা এবং পরে হিন্দুমতে পূজো। পুরোহিত বাবুমশায়ের কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দনের তিলক। তিনি তখন দেবেন নতুন কাপড় চাদর দধি মৎস্য ও দক্ষিণা এবং এর পরেই প্রজাদের করদানের পর্ব।

কিন্তু হঠাৎ চিরাচরিত প্রথায় বিঘ্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত। তিনি ঘোষণা করলেন এভাবে পুণ্যাহ উৎসব চলবে না। পুণ্যাহ মিলনের দিন, পুণ্যাহ বিভেদ ভোলার দিন, কিন্তু এই উৎসবের আয়োজনে যে তার বিপরীত ব্যবস্থা! গোমস্তা নায়েবরা শঙ্কিত। কী ব্যাপার? বাবুমশায় অসন্তুষ্ট কেন? সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, আসনের ব্যবস্থায় জাতিভেদ তিনি মানবেন না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে পুণ্যাহ উৎসব হবে না।

প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ-অনুযায়ী পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে থাকে বিভিন্ন আসনের বন্দোবস্ত। হিন্দুরা চাদরঢাকা সতরঞ্চির উপর এক ধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান আলাদা এবং চাদর ছাড়া সতরঞ্চির উপর মুসলমান প্রজারা অন্য ধারে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ পদমর্যাদামতো বসেন পৃথক পৃথক আসনে। আর বাবুমশায়ের জন্য ভেলভেটমোড়া সিংহাসন।

বরণের পর রবীন্দ্রনাথের সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু তিনি বসলেন না। সদর নায়েবকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন: "নায়েব মশাই, পুণ্যাহ উৎসবে এমন পৃথক পৃথক ব্যবস্থা কেন?" এই অভাবিত প্রশ্নে বিস্মিত নায়েব বলেন: 'বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে।' রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন: "না, শুভ অনুষ্ঠানে এ জিনিস চলবে না। সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান,

ব্রাহ্মণ চন্ডাল সবাইকে একইভাবে একই ধরনের আসনে বসতে হবে।" নায়েবমশাই প্রথার দাস। তিনি বলেন, 'এই আনুষ্ঠানিক দরবারে প্রাচীন রীতি বদলাবার অধিকার কারো নেই।' রবীন্দ্রনাথ আরো রুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: "আমি বলছি, তুলে দিতে হবে। এ রাজ-দরবার নয়, মিলনানুষ্ঠান।" সদর নায়েবের সেই একই জবাব—'অসম্ভব, নিয়ম ভাঙা চলবে না।'

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত। নতুন বাবুমশায়ের আচরণে কারো মুখে কথা নেই। সদর নায়েব আবার রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন সিংহাসনে বসতে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আসনের জাতিভেদ দূর না করলে তিনি কিছুতেই বসবেন না, সাধারণ দরিদ্র প্রজার অপমান তিনি সহ্য করবেন না। সদর নায়েব জমিদারের হুকুম অমান্য করায় রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: "প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না, সবার একাসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম হুকুম।"

জমিদারি সম্ভ্রম আর প্রাচীন প্রথায় আস্থাবান সদর নায়েব ও অন্যান্য হিন্দু আমলারা একসঙ্গে হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, প্রথার পরিবর্তন ঘটালে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবিচলিত। তিনি উপস্থিত বিরাট প্রজামন্ডলীকে উদ্দেশ করে বললেন: "এই মিলন উৎসবে পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে মধুর সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। প্রিয় প্রজারা, তোমরা সব পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা—সব সরিয়ে দিয়ে, একসঙ্গে বসো। আমিও বসব। আমি তোমাদেরই লোক।"

অপমানিত নায়েব-গোমস্তার দল সবিস্ময়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা প্রকান্ড হলঘরের সব চাদর সব চেয়ার নিজেরাই সরিয়ে দিয়ে ঢালাফরাশের উপর বসে পড়ল। মাঝখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। সে এক অপরূপ দিব্যমূর্তি। প্রজারা মুগ্ধ হয়ে দেখল তাদের নতুন বাবুমশাইকে।

মিলন উৎসবে কারো মনে ব্যথা দেওয়া অনুচিত। প্রজাদেরই তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন: "যাও, সদর নায়েব আর আমলাদের ডেকে আনো, সবাই একসঙ্গে বসে পুণ্যাহ উৎসব করি।" রবীন্দ্রনাথ আমলাদের অনুরোধ করলেন পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করতে। উৎসব শুরু হল। দলে দলে আরো লোক কাছারি-বাড়িতে এসে ভেঙে পড়ল। এবং সেদিন থেকে ঠাকুর এস্টেটের পুণ্যাহ সভায় শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল।

কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা আর রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রারম্ভিক ভাষণ সেই মুহূর্তেই বীজ বপন করল নতুন সংঘাতের। দরিদ্র প্রজারা বুঝতে পারল, তাদের দুঃখের দিন ঘোচার লগ্ন উপস্থিত, আর আমলারা এবং সম্পন্ন মহাজনেরা জেনে গেলেন, তাঁদের দুঃসময়ের শুরু। আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও জেনে গেলেন তাঁর সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো সংকল্পবদ্ধ

হলেন, আরো স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এখানে তাঁকে কী করতে হবে, কিভাবে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রতি পদে বাধা আসবে কোন্ পক্ষ থেকে। সেই দিনই তিনি তাই ঘোষণা করলেন, "সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।"

'সাহা' বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো জাতিকে বোঝান নি। 'শেখ' বলতেও তা নয়। যেহেতু তাঁর জমিদারিতে অধিকাংশ মহাজনই সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু, সেইজন্যই মহাজন অর্থে তিনি 'সাহা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে অধিকাংশ দরিদ্র প্রজাই মুসলমান। তাই 'শেখ' বলতে তিনি দরিদ্র প্রজাদেরই বুঝিয়েছেন।

এই সম্পর্কে 'রায়তের কথা'য় প্রমথ চৌধুরী মশাই চমৎকার বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি—কেননা তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচানো। কিন্তু সেইসঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদারমাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি unique।'

৫

পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ সালে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "আমি যা বহু কাল ধ্যান করেছি, রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারি নি বলে দুঃখ হল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে।"

রবীন্দ্রনাথ 'বহু কাল ধ্যান' কী করে করেছিলেন এবং কী করতে পারেন নি বলে দুঃখিত? তা ছাড়া জনৈক আমলাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, জমিদারিতে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রস্তাবিত ধর্মরাজ্যের চেহারাটাই বা কী?

প্রমথ চৌধুরী মশাই বলেছেন, জমিদার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ ইউনিক। এই অভিনবত্বের সন্ধানে যাবার আগে একটি কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া দরকার, রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে জমিদারির ভার নিয়েও জমিদার হিসাবে যান নি, গিয়েছিলেন স্বদেশহিতৈষী কর্মী রূপে। সাধারণ মানুষের ধারণা, জমিদার বাবুমশাই দু'হাতে দান খয়রাত করবেন, জোর করে খাজনা আদায় করবেন, আমলাদের হাতে তামাক খাবেন, দু-চার দিন কাছারিতে আনন্দোৎসব করে স্বস্থানে ফিরে যাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওরা হতবাক। ইনি অন্য রকম, দান খয়রাতের বালাই নেই, খাজনা নিয়ে চাপও দেন না এবং আমলারা তাঁর ভয়ে

কম্পমান। তাই এই নতুন বাবুমশাইকে নিয়ে তাদের মনে নানারকম দ্বিধা, নানারকম সংশয়। বাধাও এল গোড়া থেকেই। যার স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে, সে তো বাধা দিলই, আর যার স্বার্থ রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়ালেন, সেই অজ্ঞ দরিদ্র চাষীদের অনেকে ভুল বুঝে আমলার ক্রীড়নক হল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এসেই ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে লিখলেন : "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো—নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।"

রবীন্দ্রনাথ এলেন এই প্রজাদের অভিভাবকরূপে। এসেই আত্মীয়তা পাতালেন চাষীদের সঙ্গে, কড়া নজর রাখলেন আমলা মহাজন আর জোতদারদের উপর। কিন্তু, আগেই বলেছি, তার মানে, এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একজন 'দয়ালু হুজুর' হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের স্বাবলম্বী করা, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভূমিলক্ষ্মীর আরাধনায় জয়যুক্ত করা। কিন্তু প্রথা আছে, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আছে, উপরন্তু সব সম্পত্তিই এজমালি। দয়া দাক্ষিণ্য আর প্রগতি দেখিয়ে সংসারের ভাঁড়ার শূন্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি এ কথাও বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে : "আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় সুখে রাখতুম এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে সেকালে জমিদাররা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়কারী। প্রচুর ক্ষমতাও ছিল তাঁদের হাতে। তাই জমিদারদের বিলাস ও প্রজাপীড়নও পাল্লা দিয়ে চলেছিল। রাজস্বের চাপ এড়াতে খাজনা বৃদ্ধিও চলেছে। এই কাজে জমিদারদের সহায় আমলারা। এই আমলারা আবার হাত মেলান মহাজন ও জোতদারদের সঙ্গে। এদেরই অত্যাচারে দরিদ্র চাষী দরিদ্রতর হয়। রবীন্দ্রনাথ বছর দুই জমিদারির সব অঞ্চল ঘুরে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। আমলার বিরুদ্ধে প্রজারা নালিশ করলে তিনি প্রজার কথাই বিশ্বাস করেছেন। বহু আমলার চাকরিও গেছে এই কারণে।

'জমিদারি ব্যবসায়'কে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে 'ধর্মরাজ্যে' পরিণত করেছিলেন, তার এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন একজন ব্রিটিশ সাহেব অল্প কয়েকটি কথায়। সাহেবদের রবীন্দ্রভক্তি থাকার কোনো কারণ নেই, বরং তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন। লাঠিখেলা স্বদেশীমেলা ইত্যাদির উপর কড়া নজর রাখতেন তাঁরা! তারই মধ্যে ১৯১৬ সালের রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে এল. এস. এস. ও-ম্যালে আই. সি. এস. জমিদার-রবীন্দ্রনাথের রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখছেন :

'It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zemindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahasildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary Schools in each division and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the estate contributes annually Rs. 1250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 percent per annum. The depositors are chiefly Calcutta friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans.'

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায় ঐ বিবরণে। কোনো রবীন্দ্রভক্ত বাঙালির নয়, জনৈক শাসক সাহেবের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রমাণ করে যে, অভাবিত বহু ঘটনা দীর্ঘদিন আগে

রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে ঘটে গেছে বাংলার পল্লীতে। জনপ্রিয়তা হারালে চাকরি হারানো—আজও কি কেউ ভাবতে পারে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয়ও বাড়িয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো খেয়ালখুশিতে খাজনা মকুবের বাসনা তাঁর ছিল না। প্রকৃত দুঃস্থকে কিংবা অজন্মা হলে তিনি রেহাই দিয়েছেন। অন্য জমিদাররা ঠিক এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না বলে বহু প্রজা রবীন্দ্রনাথের উপর চটে যান। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কর্ণপাত করেন নি। প্রজারা ভিখারীর মতো জমিদারের কাছে কেবল হাত পাতুক, এ জিনিসটা রবীন্দ্রনাথ আদৌ চান নি। তা ছাড়া যখন উন্নত ধরনের চাষে ও নানা প্রগতিশীল ব্যবস্থায় ফসলের উৎপাদন বাড়ল, রবীন্দ্রনাথ খাজনার হারও বাড়িয়ে দেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য বাবুমশায়ের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ যে কত 'অত্যাচারী', এ কথাও প্রচার হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত হন নি, অনেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রজাদের শান্ত করেন এবং বলেন, বাড়তি টাকার অধিকাংশই খরচ হবে চাষ ও চাষীর কল্যাণে। প্রজারা আবার অনুগত হয় এবং দেখে যে, সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয় থেকে আরো বেশি টাকা প্রজাদের জন্য খরচ করছেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলে নিই। শিলাইদহে ১৯২২ সালে শেষ যাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রজা-জমিদার এক বড়ো বিরোধের মধ্যস্থ হতে হয়েছিল। শিলাইদহ চরের প্রজা ইসমাইল মোল্লা ছিলেন বিদ্রোহী প্রজাদের নায়ক। প্রায় দুশো ঘর প্রজা তাঁর নেতৃত্বে ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারদের সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে লড়ছিলেন। দুদিনে প্রায় ছয় ঘন্টা দুপক্ষের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে চর অঞ্চলে যান। প্রায় চার ঘন্টা চরের অবস্থা দেখে এবং দু পক্ষের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ যে রায় দেন, সবাই তা মেনে নেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই রায়ের অনুকরণেই বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট সংশোধন করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথেরা অবশ্য অন্যান্যদের তুলনায় ধনী জমিদার ছিলেন না। ঠাকুর এস্টেটের কাছাকাছি ছিল নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ রায়ের, শীতলাইয়ের যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর, নলডাঙার রাজার। দীঘাপতিয়াও অদূরে। এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ধনী ছিলেন। কিন্তু সম্মান ও প্রতিপত্তিতে ঠাকুরবাবুরা ছিলেন সবার উপরে।

পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ চালু করেন হিতৈষী বৃত্তি ও কল্যাণ বৃত্তি। সেই বাবদ সংগৃহীত সব টাকাই ব্যয় হত জমি ও প্রজার উন্নয়নে। প্রজাদের কাছ থেকে হাল বকেয়া খাজনার টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে হিতৈষী বৃত্তি আদায় হত। জমিদারি সেরেস্তা থেকে মোট সংগৃহীত টাকার সমপরিমাণ দেওয়া হত এবং সেই টাকা খরচের ব্যবস্থা করত প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হিতৈষী

সভা। কল্যাণবৃত্তিও টাকায় তিন পয়সা। তার জন্যে আলাদা রসিদও দেওয়া হত এবং আদায়ের সমপরিমাণ টাকা দিতেন জমিদার নিজে। বছরে এই ভাবে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা সংগৃহীত হত। তা ছাড়া সায়রাত মহাল বন্দোবস্ত হলে মোট নজরের শতকরা আড়াই টাকা ও নাম খারিজের নজরানা সরকারী আইনে শতকরা পাঁচ টাকা আদায় হত। এই টাকাই ব্যয় হয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণে, মন্দির মসজিদ সংস্কারে, স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপনে আর চাষীদের বিপদ-আপদের সাহায্যে।

গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়ল শিক্ষা ও চিকিৎসার দিকে। প্রত্যেকটি গ্রামে জমিদার ও গ্রামবাসীদের টাকাতেই যৌথ উদ্যোগে বসল প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিন বিভাগে তিনটি মাইনর স্কুল এবং সদর কাছারিতে হাইস্কুল। সেখানকার ছাত্রাবাসও তৈরি হল একই পদ্ধতিতে। ছাত্রাবাস ও ইস্কুলবাড়ির খরচ হিতৈষী সভা থেকে দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথ এস্টেট থেকে সব টাকা দেন।

শিলাইদহে স্থাপিত হয় মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি কবিরাজী অ্যালোপ্যাথি—তিন পদ্ধতিতেই চিকিৎসা হত। কুইনিন বিলি হত বিনামূল্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চিকিৎসা করতেন মাঝে মাঝে। তা ছাড়া পতিসরে বসানো হয় বড়ো হাসপাতাল এবং কালীগ্রাম পরগণার তিনটি বিভাগে থাকেন তিনজন ডাক্তার। হেলথ কো-অপারেটিভ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা সারা ভারতে সর্বপ্রথম চালু করেন রবীন্দ্রনাথ, করেন তাঁর জমিদারিতেই।

মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একখানা অনুপম চিঠি লেখেন ১৯১৭ সালে—"এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারির এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটি মাত্র কার্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাসপাতালের চাঁদা আদায় করে আজ পর্যন্ত তার একটি ইঁটও ভিতের উপর চড়ে নি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারির এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্তের জন্য শোক করতুম না—কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেন্ট-পারসেন্ট সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যান্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার তো সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তা হলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম—মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্যন্ত কেটে যাবে—তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে, তারা তার দায়ও ভোগ করবে, তাতে এই বিশ্বজগতের কী আসে যায়, আর ; আমারি বা কি মাথাব্যথা।"

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা তো হলই, কুটিরশিল্পের উন্নয়নেও হাত দিলেন তিনি। বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হল একজন তাঁতিকে। স্থানীয় একজন মুসলমান জোলাকে পাঠানো হল শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খুললেন তাঁতের ইস্কুল। পটারির কাজেও হাত দেওয়া হল একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন :

"বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে—সেই রকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়।…তারপরে এখানকার চাষাদের কোন industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস—ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়।"

চাষীদের স্বাবলম্বী ও অতিরিক্ত আয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হন নি, হাতে কলমে কাজও করিয়েছেন। রাস্তাঘাট নির্মাণেও ছিল তাঁর উৎসাহ। কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছ মাইল রাস্তা তিনি তৈরি করিয়ে দেন। কিন্তু মেরামতির দায়িত্ব দেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর। কালীগ্রাম চলনবিল-সংলগ্ন। বর্ষায় নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হত। সাধারণ ফান্ড থেকে কয়েকটি রাস্তা এবং এস্টেট থেকে পতিসর-আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তা বানিয়ে দেওয়া হয়। কুয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব দেন গ্রামবাসীকে আর তিনি নিজে এস্টেট থেকে কুয়ো বাঁধানোর দায়িত্ব নেন। পুকুর সংস্কারও চলে একই রীতিতে। পতিসরে তিনি একটি ধর্মগোলাও বসান।

শিলাইদহে এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বসান। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শিখে এসে। ৮০ বিঘা জমি জুড়ে শিলাইদহে বসে কৃষিক্ষেত্র। আমেরিকার ভুট্টা আলু টমেটো আখ ইত্যাদির চাষ শুরু হয়। সেই ১৯১০ সালে ব্যবহৃত হয় ট্রাক্টর পাম্পসেট সার এবং চাষ হয় অধিক ফলনশীল ফসল। ইলিশ মাছ নৌকো বোঝাই শস্তায় কিনে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে হয় সার। অধিক ফলনের জন্য বসানো হয় কৃষি ল্যাবরেটরি।

পতিসরে রথীবাবু নিজেই ট্রাক্টর চালান। পরে কয়েকজনকে শিখিয়ে ট্রাক্টর চালানোর ভার অন্যদের দেন। প্রথম যেদিন ট্রাক্টর চলে, দেখতে ভিড় হয় হাজার হাজার গ্রামবাসীর। আল বাঁচিয়ে ট্রাক্টর চালানো সম্ভব ছিল না বলে, চাষীরা আল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল হাতে পাশে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আবার আল তৈরি করে দেয়। ট্রাক্টর চাষীদের হাতে রবীন্দ্রনাথ এমনি দিয়ে দেন নি। মেরামত ও চালকের মাইনের জন্যে বিঘা প্রতি এক টাকা আদায় করেন। পরে চাষীদের মধ্যে ট্রাক্টরে চাষের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একটা ট্রাক্টরে চাহিদা মিটছিল না।

আলু চাষেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রবল। জমিতে দুই বা তিন ফসলা করার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে আলু চাষ শুরু হয় কবি-নাট্যকার ও কৃষিবিশারদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে। কিন্তু তাতে লোকসানই হয় বেশি।

কালীগ্রামে চাষ সম্পর্কে ১৯০৮ সালে এক চিঠিতে জনৈক কর্মীকে লিখছেন : "প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের আলু চাষ সম্পর্কে ল্যান্ড রেকর্ড'স অব এগ্রিকালচারে ১৮৯৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টে লেখা আছে :

Experiment with Nainital Potatoes were made by Mr. Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kusthia Sub-division. The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore's continents, however, working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed, and success of the experiment is said to have induced several neighbouring Rayots to take the potato cultivation. Their experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued.

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধে তিনি বলছেন : "শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষা ব্যাপারে সরকারি কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের

তালিকা দেখে চিচেস্টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষীরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকে ছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্ব-প্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি।"

আলু চাষের ব্যর্থতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতই ঠাট্টাতামাসা করুন, ভুট্টা কপি পাটনাই-মটর আখ ইত্যাদি চাষে তিনি প্রজাদের উৎসাহিত করেছিলেন। ঢাকা থেকে গান্ডারি নামক আখ এনে তিনি শিলাইদহে চালু করেন। সেইসঙ্গে চলেছিল গুটিপোকার চাষ। রেশমও তৈরি হল। কিন্তু বাজারে চলল না, কারণ কাটতি নেই। সেই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লেখেন: "অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্র আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনাবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।"

এবারে সালিশী। 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়', প্রজানুরঞ্জনের কাজে হাত দিয়ে প্রথমে নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা চালু করলেন। তাঁর আমলে জমিদারির মধ্যে কোনো বিবাদ নিয়ে প্রজারা আদালতে যেত না। প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা তাঁদের ভিতর থেকে একজনকে প্রধান মনোনীত করতেন। ঐ গ্রাম-প্রধানরাই পরে আবার পরগণার সব প্রধানদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে মনোনীত করতেন। তাঁদের বলা হত পঞ্চপ্রধান। বিবাদ ও বিরোধ পঞ্চপ্রধানরাই মিটিয়ে দিতেন। শেষ আপিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো পক্ষ আদালতে নালিশ করলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে দিতেন। প্রজারা এই সালিশীপ্রথা মেনেছিল আর-একটি কারণে। আদালতের মামলায় অনেক ঝামেলা, অনেক টাকার শ্রাদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থায় মামলার কোনো খরচ লাগত না। এই ব্যবস্থা কালীগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও চালু ছিল। বন্ধ হয়ে যায় দেশ বিভাগের পর।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহও সেই সময়ে, তাঁর কর্মজীবনের সেই আদিযুগে। তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন, গ্রামকে বাঁচাতে হলে 'সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই।' তা ছাড়া তাঁর ধারণা 'অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে।' সেইসঙ্গে আরো বলছেন, আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে ধন উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে

সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।' সেই কারণেই জমিদারিতে তিনি ঐকত্রিক চাষ, অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কৃষি ব্যাঙ্ক বসিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনোটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। ঐকত্রিক চাষ সম্পর্কে তিনি বলছেন: "কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে? আমি যদি বলতে পারতুম 'এ ভার আমিই নেব' তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী? এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব—সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।"

সমবায়নীতি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের একই খেদ। তিনি তাই বলছেন: "আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।" তার কারণ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল: "কো-অপারেটিভ যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে,আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি, ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে, তা হলে কোনো বিপদ নেই।"

সমবায় পদ্ধতিতে পতিসরেই তিনি বসান কৃষিব্যাংক। ১৯০৫ সালে। তিনি দেখলেন, মহাজনদের কাছ থেকে চাষীদের মুক্ত করতে না পারলে দেশের দুর্গতি দূর হবে না। কৃষি বা কুটিরশিল্পের জন্য যে টাকা দরকার তা তারা কোনো-দিনই সংগ্রহ করতে পারবে না। চাষীদের অল্প সুদে টাকা দিতে তাই খোলা হল পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে। নোবেল প্রাইজে তিনি যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পান তাও ঢালা হয় ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্কের টাকায় প্রজাদের দারুণ উপকার হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনের দেনা শোধ করে দেয়। কালীগ্রাম থেকে মহাজনরা ব্যাবসা গুটিয়ে

অন্যত্র চলে যায়। এই ব্যাঙ্ক চলেছিল পুরো কুড়ি বছর। তার পর ফেল, রবীন্দ্রনাথ আরো ঋণগ্রস্ত।

ব্যাঙ্কের আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে চালু করেন ব্যবসা। ১৮৯৫ সালে। কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হয় টেগোর অ্যান্ড কোং। এই ঠাকুর কোম্পানি চাষীদের ধান ও পাট কিনে বাজারে ছাড়ার দায়িত্ব নিল। আখ মাড়াই কলও তিনি বসান কুষ্টিয়ায়। কিন্তু ম্যানেজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ায় এই কোম্পানিও ফেল পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবসা ছাড়লেন এবং আর-এক দফা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—কমপক্ষে ৭০।৮০ হাজার টাকা দেনা।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু আর সুরেন্দ্রনাথের বীমা ব্যবসায়ে মনোযোগও ব্যবসা ফেল পড়ার কারণ। কারণ একা রবীন্দ্রনাথ সব দিক সামলাতে পারছিলেন না। এই ব্যবসা সম্পর্কে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন: "সম্প্রতি কলকাতার একজন মারোয়াড়ী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের—তারা নিজব্যয়ে কলকাতার Establishment চালাবে আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়া চালাব—আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে··· এ বৎসর কালীগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি— কেবল আখের কল পূর্ব্ববৎ চলচে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই ব্যবসা গুটিয়ে একজন কর্মীকে তা সামান্য খাজনায় দান করেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মচারীটি পরে বিরাট ধনী হন।

কারবারে লোকসানের দায় এসে পড়াতে বন্ধু লোকেন পালিতের কাছ থেকে তিনি আবার ঋণ করলেন। মারোয়াড়ী মহাজনদের কাছ থেকেও ধার করেন। প্রিয়নাথ সেনকে জানিয়েছেন, তিন বছরের মেয়াদে আট-পারসেণ্ট সুদে কুড়ি হাজার টাকার ধার পাওয়া গেলে তিনি লোকেন ও মারোয়াড়ীর ঋণ শোধ করতে পারবেন।

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা আর-একটি চিঠির অংশ: "লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েচি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই—বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। কোন ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না, এটা নিশ্চয়।"

টাকার জোগাড় হয় নি। টাকা লোকেন পালিতের ছিল না, ছিল বন্ধুর পিতা তারকনাথ পালিতের। সেই টাকা শোধ করেন ১৯১৭ সালে, তখনকার মালিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে।

সেরেস্তার কাজেও গোড়া থেকেই আধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সাক্ষ্যে অনেক তথ্য মেলে। বিরাট শ্রমসাপেক্ষ জমাওয়াশিল কাগজের বদলে কার্ড ইনডেক্স প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন পুত্র রথীন্দ্রনাথের পরামর্শে। চাষীদের বেশির ভাগ ছিল মুসলমান। তারা বারবার বরকন্দাজের কাজ করত। আমলার পদ ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, এই ব্যবস্থায় মুসলমান প্রজারা মনে মনে ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ দূর করতে রবীন্দ্রনাথ কিছু শিক্ষিত মুসলমানকে আমিন মুহুরি ও তহশিলদারের চাকরি দিলেন। এতে মুসলমানরা খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দু আমলারা গেলেন চটে।

হিন্দু আমলারা নানাভাবে অসহযোগিতা করায় রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী রায়, ভূপেন রায়, চন্দ্রময় সান্যাল প্রমুখ শিক্ষিত যুবকদের আমলার কাজে নিয়োগ করেন। কালীমোহন ঘোষ ও অতুল সেনকে নিয়ে এসে গ্রামসংস্কারের দায়িত্ব দেন।

শচীন অধিকারী জানাচ্ছেন: "আমি···শিলাইদহ সদর কাছারিতে সহকারী মুন্সিরূপে জমিদারি কাজে শিক্ষানবিশী করি। আমাকে ম্যানেজারবাবু রবীন্দ্রনাথের আমলের পুরো নথিপত্র পড়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন। ···আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১. একখানা খুব বড় মরক্কো চামড়ায় বাঁধা খাতায় জমিদারি ব্যবস্থার আদায় তহশিল জরিপ জমাবন্দী মামলা-মোকদ্দমা জমিজমা বন্দোবস্ত, হিসাবপত্র ও শাসন-সংরক্ষণাদি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিল। পরবর্তীকালে ঐসব নিয়মাবলীর সংশোধন অথবা নূতন বিধির শ্লিপ যথাস্থানে আঁটা দেখি। আমি বুঝলাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ওয়ার্ডস ম্যানুয়েলের এ যেন একটা সংস্করণ জমিদারিতেও; ২. কোন্ সময়ে কোন্ নূতন ফসল চাষ করতে হবে, তার প্রকরণ কী, সার কী ইত্যাদি বিবরণ খুব সহজ ভাষায় ছাপিয়ে সার্কুলারের মতো মহালে বিলি করা হত। এমনি ছাপা সার্কুলার আমি দেখেছি; ৩. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বরাদ্দ তৈরি হত ইংরেজি কায়দায়। তার মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বিবরণ থাকত; ৪. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই সদর মফস্বল সমস্ত কাছারির সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর মাসিক বেতন (নতুন নিয়োগ), বেতন বৃদ্ধি, সদর মফস্বলে যাতায়াত, খোরাকির হার, বার্ষিক পার্বণীর বিবরণ স্বয়ং জমিদারের দ্বারা পাস করানো হত। পার্বণীর টাকা পুজোর ছুটিতে দেওয়া হত; ৫. জ্যৈষ্ঠর মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ সেরে আষাঢ়ের কোন শুভদিনে সদর শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হত;··· ৬. বার্ষিক কত মুনাফা, কত কিস্তিতে জমিদার বাড়িতে ইরসাল করতে হবে, মফস্বল ডিহিদারগণকে বারো মাসে কার কি বরাদ্দমতে টাকা সদরে ইরসাল করতে হবে, তার হিসাব থাকত; ৭. বৎসরে দুই বার (আশ্বিন, চৈত্র) জমিদারির স্বাস্থ্য, জলবায়ু, ফসলের বিবরণাদি সম্বলিত আর্থিক অবস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ

রিপোর্ট দিতে হত। এই রকম রিপোর্ট আমরা কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এও একবার দিতাম। খাজনা সেলামি খাতের রেমিশন স্টেট্‌মেণ্ট পাঠানো হত; ৮. পেশকারবাবু প্রতি বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করে কলিকাতা আপিসে রিপোর্ট পাঠাতেন। প্রত্যেক স্বত্বের মামলা দায়ের করার আগে মামলার বিবরণ পাঠিয়ে জমিদারের মঞ্জুরি নেওয়া হত; ৯. কর্মচারী নিয়োগ বরখাস্ত রিপোর্ট করে মঞ্জুর নিতে হত; ১০. ম্যানেজারবাবুর কৃতকর্মের বা বিচারের বিরুদ্ধে প্রজাগণ জমিদারবাবুর নিকট আপিল করতে পারত ও বিচার হত।

পল্লী সংগঠনের অন্যান্য কর্মের সূত্রপাতও শিলাইদহে। লাঠিখেলা ও শক্তি-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের উদ্‌বুদ্ধ করেন। মেছের সরদার নামে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একজন লাঠিয়ালের উপর ভার পড়ে শিলাইদহ গ্রামের ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাবার। কাত্যায়নীমেলা নাম দিয়ে তিনি স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর পুজো ও পনেরো দিনের মেলা চালু করেন ১৯০২ সালে। এখানেই স্বদেশী মেলার গোড়াপত্তন। রাখীবন্ধন উৎসবের সূত্রপাতও এইখানেই।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ছিলেন অন্যতম কর্মী। তিনি জানাচ্ছেন: তাঁদের কর্মধারা ছিল প্রধানত তিনটি—১. হাতে-কলমে কৃষিশিক্ষা; ২. আদর্শ গ্রাম তৈরি ও ৩. ব্রতী-বালক গঠন। বিদ্যালয় স্থাপন, শরীরচর্চা, জঙ্গল সাফ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদিও ছিল কর্মধারার অঙ্গ। তা ছাড়া গ্রামের মানচিত্র নদীনালা ইত্যাদির নকশাও তৈরি করতে হত। শিলাইদহ সংলগ্ন লাহিনী মৌজায় স্থাপন করা হয় আদর্শ গ্রাম। প্রস্তাবিত উপনিবেশের সঙ্গে রেলপথ ও নদীর ধারে বাজার বসিয়ে বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একটা ছক তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ। গৃহস্থ চাকুরে চাষী তাঁতী কুমোর জেলের জন্যে আলাদা আলাদা প্লট। কিন্তু এই আদর্শ গ্রাম নিয়ে বিবাদ বাধে নলডাঙার রাজাদের সঙ্গে, শুরু হয় মামলা। রেষারেষি এমন স্তরে পেঁছিয় যে, লাহিনী বাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-কাজকর্ম সম্পর্কে পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জবানিতে জানা যায়, কুঠিবাড়িতে প্রতিদিন আমলারা রবীন্দ্রনাথের কাছে খাতাপত্র নিয়ে আসতেন। তবে আমলাদের কথায় চোখ বুজে কখনো কোনো চিঠি বা কাগজ সই করতেন না। সকালবেলায় হিসাব দেখা হয়ে গেলে আর চিঠিপত্র লেখা হলে প্রজাদের দরবার বসত। তারা আসত, কখনো নালিশ করতে, কখনো সুখদুঃখের কথা বলতে।

এই সুখ-দুঃখের কথা শুনতে রবীন্দ্রনাথ নিজে পায়ে হেঁটে গ্রামে বেড়াতে বেরোতেন। বরকন্দাজরা পিছু নিলে তাদের সরিয়ে দিতাম। তা ছাড়া বোটেই থাকুন, আর কুঠিবাড়িতেই থাকুন, যে কেউ যখন খুশি আসতে পারতেন তাঁর কাছে। কোনো নালিশ থাকলে প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতেন। এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর।

সে সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রাও ছিল সহজ। তখন তিনি পেতেন মাত্র দুশো টাকা মাসহারা। জমিদারির ভার নেওয়ার পর আরো একশো টাকা বাড়ে। ঐ টাকা দিয়েই মৃণালিনী দেবী সংসার চালাতেন, এমনকি, রবীন্দ্রনাথের বই কেনার বিলও মেটাতেন। রথীন্দ্রনাথ বলছেন: সে সময় ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া, লাঠি-সড়কি খেলা, সাঁতার কাটা ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের দারুণ উৎসাহ ছিল। রবীন্দ্রনাথই পুত্রকে সাঁতার শেখান। শিখিয়েছিলেন বোটের উপর থেকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভালো সাঁতার জানতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "গোরাই নদীর এপার ওপার করতে তাঁকে অনেকবার দেখেছি।"

তবে সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় মণ্ডলীপ্রথার প্রবর্তন। এই প্রথাই রবীন্দ্রনাথকে বিপর্যস্ত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন আমলা নায়েব ইত্যাদি নিয়ে কাছারিগুলিতে এলাহি ব্যাপার। তার ছিল ৯টি ডিহি কাছারি এবং কোন ব্যাপারের জন্য পৃথক সেরেস্তা। খরচ ও ঝামেলা কমাতে তিনি বিরাহিমপুর পরগনায় প্রথমে করলেন ৫টি বিভাগীয় কাছারি। তারই নাম মণ্ডলী। এর ফলে জমিদার শুধু খাজনা আদায়ের পাত্র রইলেন না, প্রজা-জমিদার-সমবায় গঠিত হল বলিষ্ঠ এক শক্তি। কিন্তু তাতে সবচেয়ে বিমর্ষ ও বিরক্ত হলেন আমলারা। কারণ তাঁদের অপ্রতিহত প্রতাপ ও অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ চলে গেল। তারা বিদ্রোহী হলেন। উপেক্ষিত প্রজারা অবশ্য আনন্দিত, কিন্তু নতুন ক্ষমতা হাতে পেয়েও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ তাদের অনেক বোঝালেন, আমলাদের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করলেন এবং চর মহালে নতুন ১টি বিভাগীয় কাছারি খুললেন। কিন্তু বাকি দুটিতে উপযুক্ত আমলার অভাব। কারণ অনেক ধূর্ত আমলা ইতিমধ্যে বিতাড়িত। জোতদাররা মনে করলেন এটা বাবুমশায়ের টাকা আদায়ের নতুন ফন্দি। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আমলারা। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বোঝালেন এবং আরো কিছু শিক্ষিত আমলা নিয়োগ করে আরো ২টি কাছারি খোলালেন এবং চাষীদের স্বমতে আনলেন। কালীগ্রামে এলেন অতুল সেন, শিলাইদহে কালীমোহন ঘোষ।

কালীমোহন ঘোষ সেকালের নামকরা একজন স্বদেশী। পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরে বাড়ি, অসাধারণ বাগ্মী। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন শত শত যুবককে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিতে। তা ছাড়া তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন অনুরক্ত পাঠক। লোকচেনার পাকা জহুরী রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুকে প্রথমে নিয়ে আসেন শিলাইদহে। একই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়েও তিনি কর্মী নিযুক্ত হন। পরে যখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হল, সেখানকার সকল উন্নয়নকর্মের প্রাণপুরুষ ছিলেন এই কালীমোহন ঘোষ। ১৯৪০ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পল্লী সংগঠনের মাধ্যমে মূঢ় ম্লান মূক মানুষের

সেবা করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। সেই স্নেহের সঙ্গে ছিল আস্থা। এমন জনপ্রিয় গ্রামকর্মী এদেশে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কালীগ্রামের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অতুল সেন ছিলেন বাগনানে একটি হাই ইস্কুলের হেডমাস্টার। তিনিও দীর্ঘকালের স্বদেশী। তার পর হঠাৎ তাঁর একটা-কিছু করার বাসনা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হল। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে কালীগ্রাম পরগনায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীমঙ্গলের কাজে এগিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের স্বদেশী সমাজকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে জীবনপণ করেছিলেন এই অতুল সেন আর কালীমোহন ঘোষ—দুজনেই ইংরেজের রোষে ঘরছাড়া ঘোর স্বদেশী। অতুল সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিতে জমিদার রবীন্দ্রনাথের, কর্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। প্রথম চিঠিতে তিনি লিখছেন: "কালীগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল—এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি ঐ কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেছি তাই কয়েক দিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত হয়েছে তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারছি নে। কাজকর্মের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বসে মোকাবিলায় ঠিক করা যাবে।"

হিসাবপত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত সাবধান ছিলেন, তার পরিচয় পাই ১৩২২ সালের ৬ মাঘ কলকাতা থেকে লেখা আর-একখানা চিঠিতে: "তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন audit হইবে তখন সকলপ্রকার ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে সুরেনের হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ো—হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।"

কিভাবে কী মনোভাব নিয়ে গ্রামের কাজ করতে হবে সেই সম্পর্কে ১৩২২ সালের ২১ ফাল্গুন শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিঠি:

"সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও, তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনি মনে খটকা বাধিবে যখনি মন বিমুখ হইবে। অবশ্যকর্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়া যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, কিন্তু ওখানকার লোকেদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে যে তুমি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য,তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদূরে চলিয়া যাইবে। অতএব কোমর

বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণ আসন তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে।"

কাজের ধারা সম্পর্কে অতুল সেনকেই লেখা আর-একখানা চিঠি :

"তোমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সাধারণের হিতের জন্য প্রত্যেককে নিজের সামর্থ্যে খাটাইবার অভ্যাসটি যদি কোনোমতে পাকা হইয়া যায় তাহা হইলেই তোমার সকল চেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার কোথাও ইহার শুরু হইলেই ইহা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

"আমার একটি কথা বলিবার আছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা বড়োই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণে উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের লইয়া বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আর একটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটীরের আঙিনায় দুই চারিটি বেলফুল, গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

"বিচালিভরা যে মাদুরের নমুনা পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে বিচালি আরো ঘন করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া দরকার—নহিলে বসিতে বসিতে মাঝে মাঝে গর্ত হইয়া যাইবে।

"ম্যানেজার আমাকে আরো কিছু কাঁথা আলপনা প্রভৃতি পরে পাঠাইবেন আশা দিয়াছিলেন—সে আশা যদিচ কালক্রমে দুর্বল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো মরে নাই সে কথা তাঁহাকে জানাইবে। ওখানে বাখারির চাঙারি চুপড়ি প্রভৃতি বিশেষ কোনো দ্রব্য বা মাটির কোনো পাত্র যদি পাও তবে পাঠাইয়া দিয়ো। কুঁড়েঘরের নমুনা পাঠাইবার কথা ছিল ম্যানেজারবাবুর তাহা মনে নাই কিন্তু আমার মনে আছে।"

কালীগ্রাম পরগনার ভারপ্রাপ্ত কর্মী অতুল সেনের কাজকর্মে রবীন্দ্রনাথ খুশি। তাঁকে লেখেন : "এই তো চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্তিতে আছে—এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল।" কিন্তু এই প্রসন্ন পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ চলে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। অতুল সেন

অন্যান্য প্রায় সব কর্মী সহ অন্তরায়িত হলেন ইংরেজদের রোষে। কাজে ভাঁটা পড়ল।

অতুল সেনকে লেখা চিঠির সঙ্গে ১৩২২ সালের ১৩ মাঘ তারিখে লেখা আর-একখানি চিঠি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। চিঠিখানা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা :

"পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০৲ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে' কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃংখলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্মচারারা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপরে গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহার খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে।"

চিঠিগুলিতে গ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনের কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি কী চান, তাও জানা গেছে। তা ছাড়া আর একটি জিনিস বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নীরস পড়াশোনাকে সরস করে তুলতে দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের সুর জাগাতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন উৎসবের ভিতর দিয়ে সকলকে সম্মিলিত করতে, ঠিক তেমনি গ্রামোন্নয়ন-কর্মের ভিতরও প্রাণের শুষ্কতা দূর করতে এবং কাজের সঙ্গে আনন্দ যুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, দেশব্রতী একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়োগ করা সত্ত্বেও জমিদারিতে সংঘাত থামে নি। 'মণ্ডলীপ্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই সংঘবদ্ধ হল।

ম্যানেজার বিপিনবিহারী বিশ্বাস চাকরি ছেড়ে দেন। বিপন্ন পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন রথীন্দ্রনাথ। কিছুদিন ম্যানেজারি করে পালালেন এডওয়ার্ড সাহেব, পরে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে আসেন জামাতা প্রমথ চৌধুরী।

মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একদিকে আমলাতন্ত্রের একাধিপত্য হটালেন, অন্য দিকে চাষীদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে বিশ্বস্ত আমলাদের নানা নির্দেশ দিতে লাগলেন। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে তিনি এই সম্পর্কে লিখছেন : "আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি।

বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ-স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।"

এই ব্যবস্থা চালু হয় ১৯০৮ সালে। বিরাহিমপুর পরগনায় পাঁচটি মণ্ডলী হল এইভাবে: ১. শিলাইদহ: নায়েব বিপিনবিহারী বিশ্বাস, ২. জানিপুর-বনগ্রাম: নায়েব নলিনী চক্রবর্তী, ৩. কুমারখালি-পান্টি: নায়েব ভূপেশচন্দ্র রায়, ৪. কয়া-কালোয়া: নায়েব রতিকান্ত দাস, ৫. সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর: নায়েব সতীশচন্দ্র ঘোষ। প্রতি মণ্ডলীতে নায়েব বাদে চারজন প্রজা সভ্য—দুজন হিন্দু, দুজন মুসলমান। এঁরাই প্রতি সপ্তাহে একবার সভা করে সব ব্যবস্থা নিতেন। ফলে শিলাইদহ সদর কাছারির গুরুত্ব কমে গেল।

একই ব্যবস্থা চালু হল কালীগ্রাম পরগনায় তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করে এবং গোটা জমিদারির চেহারা গেল পালটে। বড়ো বড়ো রাস্তা হল, গোপীনাথ মন্দির ও খোরশেদ ফকিরের দরগার সংস্কার হল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জানিপুরের বিরাট গঞ্জ পান্টিব সুতাহাটা-গোহাটা জেঁকে বসল, ঘরে ঘরে তাঁত চালু হল, মক্তব মাদ্রাসা স্কুল টোল বসল। কিন্তু অসন্তোষের দানা বাঁধল ভিতরে ভিতরে। আমলারা তলে তলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন জমিদারের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলীপ্রথা ও জমিদারি পরিচালনা নিয়ে অন্যতম মণ্ডলী-ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে ১৯০৮ সালে যে তিনখানি চিঠি লেখেন, তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ১৩১৫ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তিনি লিখছেন:

"ডাক নজর অনুসারে জমির নজরখানা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায়-তহশিল করা শ্রেয়। এ সম্বন্ধে ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য আমাকে জানাইবে।

"সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। নূতন ফসলের প্রবর্তনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা

করিবে। ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি যে-মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।

"প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীন কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারীদের কোনো প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনোই মার্জনা করিব না। যাহাতে তোমার অধীন তোমার আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে না পায়, এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে। কর্মচারীগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহারা পুরস্কৃত হইবে।"

দ্বিতীয় চিঠি ১৩১৫ সালের ২ আষাঢ় লেখা বক্তব্য বিষয় একই, কর্তব্যে কঠোর, আর প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া চাই :

"তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবে না। যাহাতে প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এই দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। আদায় তহশিলের কার্যে যদি অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হয় তবে রিপোর্টের দ্বারা আমাকে জানাইলেই তাহার প্রতিকার হইবে। তোমার বেতনের যে অংশ কাটা গিয়াছে এবারকার মতো তাহা মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

"শরৎ সরকারকে মণ্ডলীর সেরেস্তা গঠনের জন্য পাঠানো গিয়াছে। যেভাবে কাজ করিতে হইবে শরৎ তাহার উপদেশ দিবে এবং কার্যনির্বাহের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করিবে। যাহাতে জমা সুমার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কর্মই মফস্বল সেরেস্তায় সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরকম বন্দোবস্ত করিবে।" .

তৃতীয় চিঠিতেও একই উপদেশ। চিঠিখানি ১৩১৫ সালের ১৯ শ্রাবণ লেখা :

"তোমার সাধ্যমতো এবং উচিত মতো কাজ করিবে। শৈথিল্যও করিবে না, অন্যায়ও হইতে দিবে না। ইহাতে অসন্তোষের কোনো আশংকা করিও না। উজির ও ছাবের বরকন্দাজদিগকে যেরূপ শাস্তি দিয়াছ, এবার তাহাদের শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা কর্তব্য হইবে।

"যদি খয়রাতুল্লাকে কালীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর লইতে পারিবে কিনা লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ কিছু না জানিতে পারে।"

জানকী রায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত ম্যানেজার। এমনিতে কড়া, কিন্তু দয়াশীল। তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে নামেন এবং বহু অত্যাচারিত

নমঃশূদ্রকে ঢাকা থেকে এনে জমিদারিতে বসান। তা ছাড়া তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। জমিদারির বহু কঠিন সমস্যা তিনি বুদ্ধিবলে সমাধান করেছেন। সংস্কার চেষ্টায় জানকীবাবুর সহযোগী ছিলেন ভূপেশ রায়, শান্তিনিকেতনের সতীশ রায়ের ভাই। ঐ ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীকে লেখা আরো কয়েকখানি চিঠিতে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ১৩১৫ সালের ২৯ চৈত্র জানকীবাবুকে তিনি লিখছেন :

"আমি জমিদারিকে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্যপালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহার অনেক কর্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে। তোমাদের কর্ম ধর্মকর্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব।...তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারি যেন সকল দিক হইতে ধর্মরাজ্য হইয়া উঠে। আমাদের লাভই কেবল দেখিবে না, সকলের মঙ্গল দেখিবে।"

জানকীবাবু যখন জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন, তখন শিলাইদহের সদর কাছারিতে আমলা-মহলে বিদ্রোহ চলছিল। সম্পন্ন প্রজাদের নিয়ে দলাদলিও সৃষ্টি হয়। জানকীবাবু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সত্যকুমার মজুমদার ছিলেন সদর কাছারির সেক্রেটারি, তাঁর সঙ্গে জানকীবাবুর মনান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালের ২৪ ফাল্গুন এক চিঠিতে লেখেন :

"সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমরা ভুল ধারণা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিও না।...আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এরূপ পত্র লিখিতে পারিলাম। তোমার চিত্ত নির্বিকার থাকে ইহাই দেখিতে আমার আনন্দ।"

চিঠিগুলিতে প্রমাণ : প্রজাদের মধ্যে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী রবীন্দ্রনাথ নিজের লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা না করে শুধু প্রজাদের মঙ্গল সাধনে কৃতসংকল্প। শুধু তাই নয়, অসৎ আমলাদের শাস্তিদানেও তিনি বদ্ধপরিকর। তবে তিনি যে অনেক সময় সব অন্যায় জেনেও কাউকে কাউকে ক্ষমা করেছেন, তার দৃষ্টান্তও আছে।

জমিদারি পরিচালনাকালে রবীন্দ্রনাথ বহু মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। নথিপত্র নিয়ে কৃষ্ণনগরের আদালত এবং কলকাতার হাইকোর্টে তিনি কম ছোটাছুটি করেন নি। আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণে তিনি নিজেই পারদর্শী হয়ে

ওঠেন। চিত্তরঞ্জন দাশ একবার বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ উকিল হলে আমাদের হারিয়ে দিতেন।' রবীন্দ্রনাথ দেওয়ানি মকদ্দমা ভালো বুঝতেন। বলতেন, মামলা জিনিসটাই খারাপ, তবে দেওয়ানি বুদ্ধি ও কৌশলের খেলা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ফৌজদারি মামলা হলে রেগে যেতেন। কোনো প্রজা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁর নামে মামলা করলে অবশ্য বিরক্ত হতেন না। প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য তিনি নিজেও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, কিন্তু জয়ের পর তিনি ক্ষমাশীল। এই ক্ষমাশীল-তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সেরকান্দির বাজার নিয়ে মামলা। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে কুমারখালির ধনী ব্যবসায়ী ফটিক মজুমদার। মামলাটা জিদের এবং টাকার শ্রাদ্ধও তদনুরূপ। পত্তনিদার ফটিক মজুমদারের কাছ থেকে পত্তনি খাজনা আদায় নিয়েই এক জিদের মামলা। ফটিক ধনী, কিন্তু ঠাকুরবাবুদেরই প্রজা। নিম্ন আদালতে ফটিক জয়ী হলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দমলেন না, আপিল করলেন হাইকোর্টে। উকিল দিলেন রাসবিহারী ঘোষকে। উকিল তো রইলেনই, কিন্তু কার্যত মামলা পরিচালনা করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, বড়ো উকিলেরও বাড়া। সব নখদর্পণে। পরাজয় জেনে ফটিক মজুমদার জোড়া-সাঁকোয় এলেন মিটমাট করতে। রবীন্দ্রনাথ রাজি নন। তবে শেষে জয়ের পর মামলার খরচের কয়েক হাজার টাকা মাফ করে দিলেন নিজ ঔদার্যগুণে। ফটিক মজুমদার তার বদলে প্রতিশ্রুতি দিলেন সেরকান্দি বাজারের উন্নয়নে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করেছিলেন।

নলডাঙার রাজাদের সঙ্গে এবং কুঠিবাড়ির সংলগ্ন একটি আমবাগানের স্বত্ব নিয়েও দীর্ঘদিন মামলা চলেছে স্থানীয় অধিকারীবাবুদের সঙ্গে। আর-একটি বিখ্যাত মামলা তেরো ছটাকের মামলা। রবীন্দ্রনাথ ও নড়াইলের প্রতাপান্বিত জমিদার উভয়ের জমিদারির সীমানাগত ঐ তেরো ছটাক জমির জন্য বহুদিন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ জয়ী হন এবং দুই জমি-দারের মিটমাট হয়ে যায়। ঐ মামলায় দ্বারিকানাথ বিশ্বাস নামে এক ভদ্রলোক তদারক নিযুক্ত হন। মামলা চালাবার সময় তিনি অন্যায় অনেক কাজ করেছিলেন এবং গোপনে নিজের জন্য অনেক জমিজমা করে নেন। মামলা শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসকে শাস্তি দিতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ক্ষমা করেন। সেই সময়কার দুখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি জানকী রায় ও দ্বিতীয় খানি ভূপেশ রায়কে লেখা। চিঠি দুটিতে প্রজানুরঞ্জক রবীন্দ্রনাথের আর-একটি দিক দেখা যায়:

"কর্মের নিয়ম অনুসারে দ্বারিক বিশ্বাসকে যেভাবে চালনা করিতে হইবে তাহা দৃঢ়ভাবেই স্থির করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে আমি কোনো শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোনো কাজ না করা হয়। স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরীর অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরি দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে

চাতুরির প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরি প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে, আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

"দ্বারিক বিশ্বাসকে আমি তোমার কাছেই ফিরাইয়া দিব, নিজে কোনো হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্তব্যবোধ করিবে তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে এ আমি সংগত মনে করি না। ইতি ১৮ আষাঢ় ১৩১৩।"

জমিদারির শৃঙ্খলা রাখতে জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বারিক বিশ্বাসকে কর্মচ্যুত করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি দ্বারিক বিশ্বাসের প্রতি ছিল। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখলেন ছলচাতুরি করে যে লোক তাঁকে মামলায় জিতিয়েছে, সে যদি একই পন্থায় নিজে সম্পত্তি করে, তা হলে দ্বিতীয়টি অন্যায় হলে প্রথমটিও অন্যায়। কিন্তু তা না করে প্রথম কাজের জন্য দ্বারিক বিশ্বাস প্রশংসার পাত্র হয়েছে। তা হলে দ্বিতীয়টির জন্যই বা শাস্তি কেন? ভূপেশ রায়কে ১৩১৫ সালের ৮ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

"দ্বারিক বিশ্বাসের জোত পাঁচশত টাকায় অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কারণ আমি দ্বারিককে নিজের মুখে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, তুমি এই জোত ইস্তাফা দিলে জোত হইতেই আমাদের দেনার টাকা বন্দোবস্ত নজর ইত্যাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া তোমারই সহিত বন্দোবস্ত করিব। তোমার বিনা এতেলায় স্বেচ্ছামত কুঞ্জদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাতে আমার পক্ষে একান্ত লজ্জার কারণ ঘটাইয়াছ। আমি এরূপ আশা করি নাই।"

এই পত্রে কাজ হয়। দ্বারিক বিশ্বাস ঠাকুরবাবুদের দেনা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পান এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকেন।

প্রজাদের ক্ষমা ও অসৎ আমলাকে আমল না দেওয়ার আর একটি নিদর্শন পাওয়া গেল কলকাতা থেকে শিলাইদহের ম্যানেজারকে ১৯১৫ সালে লিখিত একটি চিঠিতে:

"কুঠিবাড়িতে কোনোমতেই দুশ্চরিত্র লোক রাখা চলিতে পারিবে না। অতএব··· এ কার্যে নিযুক্ত করিয়ো না। ওখানকার লোকেদের কথা চিন্তা করিয়া দেখিব। আপাতত বাছের ও মালীকে দিয়া গাছ কাটানো ও চারিদিকের

জঙ্গল সাফ করানোর কাজ করাইতে থাকিবে। জিনিসপত্র ঠিকমত রাখার জন্য বাছেরই এখনকার মত দায়িক রহিল।

"আমার একটা টেবিল দেখিলাম গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই—তাহার কি দশা হইল ও তাহা কবে পাওয়া যাইবে জানিতে ইচ্ছা করি।

"মহিম সরকারকে কালোয়ায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমি তাহাকে গোপালের অধীনে সদরে খাজাঞ্চি সেরেস্তায় নিযুক্ত করিতে চাই। এখানে বিশ্বাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। উহার স্থানে মৈজদ্দি মোল্লাকে রাখিলে যদি ক্ষতি বোধ না কর তবে রাখিতে পার। সে আমাদের প্রজা অতএব তাহাকে ক্ষমা করিয়া chance দেওয়া অকর্ত্তব্য নহে, কিন্তু বিদেশী লোক সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা নহে। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২২।"

এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি থেকে কিছু জবানবন্দিও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: "১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তখনকার দেশনেতারা কলকাতা এবং বড়ো বড়ো শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন—কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশি করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন কেবল আন্দোলন করলেই হবে না, ভিত থেকে কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই সময় পাবনা কনফারেন্সে তাঁকে যখন ডাকা হল, এই কথাই তিনি দেশবাসীকে জানালেন তাঁর ভাষণে। কেউ যখন কিছু করলেন না তখন তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারেন সেই কাজে নেমে গেলেন। বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম—এই দুই পরগনা তাঁর হাতে ছিল—তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য একটা প্ল্যান করলেন। বিচারের ব্যবস্থা, আগে থেকেই ছিল। মহাজনের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করা, চাষের উন্নতি করা, ঘরে ঘরে ছোটোখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি গ্রামোন্নতির নানা দিকে চেষ্টা যাতে হয় তার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। বাইরে থেকে অজস্র টাকা ঢেলে কোনো কাজই করা যাবে না, গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে, এইটেই ছিল বাবার উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতন থেকে [সত্যেশ্বর নাগ, বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও] কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে পতিসরে নিয়ে এলেন। কাজ আরম্ভ করে দেখলেন পতিসরেই উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাবে— শিলাইদহের আশেপাশে প্রজাদের মধ্যে তেমন ঐক্যবন্ধন ছিল না। কালীমোহনবাবুকে শান্তিনিকেতনে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল বলে তাঁকে শীঘ্রই ফিরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা অনেকদিন পর্যন্ত পতিসরে গ্রামোন্নতির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

"কালীগ্রাম পরগনাকে কাজের সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হল। পল্লী সংগঠনের কাজ একটি সাধারণ সভার হাতে ন্যস্ত করা হল। প্রজারা স্বেচ্ছায় একটা কর দিতে রাজি হল। খাজনা আদায়ের সময় প্রতি টাকায় এক আনা করে সকল প্রজাই দিত, সেই টাকা সাধারণ ফান্ডে জমা হত। এই উপায়ে

ফাণ্ডের যা আয় হত সাধারণ সভা বাজেট করে স্থির করত সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে। একে একে প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হল, আর পতিসরে স্থাপিত হল একটি মাইনর ইস্কুল—পরে সেটা হাইস্কুলে পরিণত হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে পতিসরেই কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব হয়। পরে তিন বিভাগে ডাক্তার বসানো হয়েছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে থাকল, পানীয় জলের ব্যবস্থা হল। বয়নশিল্প শেখানোর জন্য শ্রীরামপুর থেকে একজন ভালো তাঁতিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রজাদের উৎসাহ যেমন বাড়ল, এই-সব কাজেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিছু-দিন পর বাবা দেখলেন প্রজাদের সাধারণ সভা একটি কাজ করতে অসমর্থ— সে হচ্ছে মহাজনের ঋণ থেকে তাদের মুক্ত করা। ঋণমুক্ত না হলে তারা কোনো বিষয়েই উন্নতি করতে পারবে না। কৃষির বা শিল্পের জন্য যেটুকু মূলধন দরকার তা তাদের হাতে কখনো থাকবে না। এইজন্য বাবা নিজেই পতিসরে একটি ব্যাংক খুললেন। কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাংকের কাজ আরম্ভ হল। পরে বাবা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন এক লাখের উপর, সব টাকাটাই এই কৃষিব্যাংকের কাজে দিলেন। ব্যাংক যা সুদ দিত বহু বছর ধরে সেটা শান্তিনিকেতন ইস্কুলের একটা প্রধান আয় ছিল। কৃষিব্যাংক হয়ে প্রজাদের খুব উপকার হল। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনদের দেনা সম্পূর্ণ শোধ করে দিতে পেরেছিল। কালীগ্রাম এলাকা থেকে মহাজনরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিল।”

রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে আরো জানাচ্ছেন :

“কালীগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়—প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে।...সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কী কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভায় এই দুটি হল প্রধান কাজ। আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।”

তা ছাড়া ১৩৪৬ সালে শ্রীনিকেতনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর

জমিদারি পরিচালনা এবং তৎকালীন পল্লীসমাজের চমৎকার একটি বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন :

"আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা আদায়, জমা-ওয়াশিল—এতে কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলুম না ; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অংক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

"কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময়ে আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি, পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

"আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমনভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

"প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত—সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে-ব্যক্তি বালক কাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথ নির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

"যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম, ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা বিলের মধ্য দিয়ে—তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ-দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসা করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'...

"আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

"ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না। তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, 'ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।' এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না, তাই প্রকৃত জনকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন বিস্তর। বেদনাদায়ক অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর ঝুলিতে ছিল। অন্য জমিদাররা দু হাতে টাকা বিলিয়ে কোনো দাবী হয় মঞ্জুর করেছেন, নয় 'না' বলে দিয়ে দায়িত্ব-ক্ষালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিপরীত, তিনি প্রজাদের যুক্ত করতে চেয়েছিলেন সব ব্যাপারে। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যায়। তিনি 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে বলছেন—

"আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এযে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে—ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব।'

"আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পার।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব, আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতে সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন···যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম।"

১৯৩০ সালের রাশিয়ার চিঠিতেও বলছেন, "একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম! মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা আমিই এ কাজে লাগব।"

রবীন্দ্রনাথ যে-সব নূতন রীতি চালু করলেন, তার প্রায় সব কটিই নানা বিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘদিন চলেছিল। ব্যর্থতা ছিল কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে শিলাইদহে। কিন্তু সাফল্যও কম নয়। এই সাফল্যের রূপ, আগেই বলেছি, সর্বাধিক চোখে পড়ে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে রথীন্দ্রনাথ পতিসরে যান। তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে 'পল্লীর উন্নতি' নামক প্রবন্ধে।

"সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম—নৌকার পর

নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশোনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মেটিয়ে দেন। যে-সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা ফাঁদ ব্যবহার করা হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানারকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গবর্নমেণ্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষিরা কেবল অনুযোগ শোনাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরো ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?' ১৩১৫ সালে বাবা লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায়, ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়—তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'—তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।"

আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কাজের ফল সম্পর্কে অবহিত। কিঞ্চিৎ বেদনা নিয়ে ১৯৩৪ সালে তিনি বলেন, "য়ুরোপের মতো আমাদের জন সমূহ নাগরিক নয়—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা—বলে শেষ করা যায় না। এই-খানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি—না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার—ঐ গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন, অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল—এ কথা আমি বারবার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতিসংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিললে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না।

আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো, পাবনা কনফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনে প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে—ফলের কথা আজ কে বিচার করবে?"

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ কল্পনা বিহারী কবি, ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁরা জেনেশুনে সব ভুলে থাকেন। তাঁরা জানেন না যে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলেত পারেন, 'এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী' প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে।'

তবে গ্রামের উন্নতি চাইলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো চান নি গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। তিনি বলেন, "গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপ্ত হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত্ত না রাখা হয়।"

অনেকে বলেন, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু সাহিত্যে তার প্রতিফলন কোথায়। যাঁরা এই প্রশ্ন করেন, ধরে নিতে হবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোনো বই পড়েন নি। গোরা মুক্তধারা কালের যাত্রা ইত্যাদি তো নয়ই। পড়লে স্বচ্ছচিন্তার ক্ষেত্রে এ দেশে এত দুর্দশা হত না এবং এত রবীন্দ্র-বিদ্বেষও থাকত না। আবার অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাধারা পেলেন কোন্ বই পড়ে, কার কাছ থেকে? আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেন এ-সব ভাবতেও পারেন না।

৬

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মযজ্ঞকে দ্বিখণ্ডিত করে একভাগ নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে, অন্যভাগ রইল তাঁর নিজস্ব জমিদারি পতিসরে। এই দ্বিখণ্ডী-করণের প্রধান কারণ অবশ্য মণ্ডলীপ্রথার ব্যর্থতা। আমলারা এতই ক্ষমতাশালী, তাদের কূটবুদ্ধি এতই প্রখর এবং সম্পন্ন প্রজাদের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, মণ্ডলীপ্রথা বেশিদিন টিকতে পারে নি। কিন্তু তাঁর মনে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে ছিল—শিলাইদহ-পতিসর।

শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্মযজ্ঞ প্রসারিত করার কয়েক বছর পর ১৯২৮ সালে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতেও সেই জমিদারির কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন "আমার সেই সময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই

ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ আমি জনতার মধ্যে নিরাশ্রয়—আমার বাসা ভাঙিয়াছে।"

এই আক্ষেপের কথা তিনি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে জানান। বলেন, "আমার পক্ষে এ বিচ্ছেদটি সামান্য নয়—যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই।" তাই শান্তিনিকেতনে বানপ্রস্থ নিয়েও শিলাইদহ-পতিসরকে মন থেকে তিনি সরিয়ে নিতে পারেন নি, বারবার গিয়েছেন, সেখানকার উন্নয়নে সর্বস্ব পণ করেছেন, যদিও তিনি জীবনের শেষ দিকে আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, "সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না।"

একদিকে বিশ্বের আহ্বান, অন্য দিকে গ্রামলক্ষ্মীর ডাক। একদিকে বীরভূমের বিশ্বভারতী, অন্য দিকে রাজশাহী-নদীয়ার জমিদারি—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন। আগেই বলেছি, তিনি শিলাইদহে শেষ যান ১৯২২ সালে, সে বছরই শ্রীনিকেতনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। পতিসরে তাঁর শেষ যাত্রা ১৯৩৭ সালে, যখন বয়স ছিয়াত্তর। ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯১ সালে প্রথম যখন জমিদারিতে যান, তখন যেমন উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ, তেমনি এই শেষ যাত্রাও পুণ্যাহ উপলক্ষে।

শিলাইদহে শেষযাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন সি. এফ. এন্ডরুজ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রামবাসীরা কবিকে সেবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বহু প্রজা। চোদ্দ-পনেরো মাইল দূর থেকে ওঁরা আসেন বাবুমশাইকে নজরানা দিতে। স্থানীয় মুসলমান মহিলারা রবীন্দ্রনাথকে একটি কাঁথা উপহার দেন। সেটি এখনো আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে। সেবার কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তা পাঠ করেন স্থানীয় মাইনর স্কুলের এক শিক্ষক। মানপত্রের রচয়িতা শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। "জগৎপূজ্য কবিসম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়" সম্পর্কে বলা হয়—"এসো গো হৃদয়রাজ, এসো ঋষি, বাণীর অমর পুত্র, হে কবিসম্রাট; তীর্থ এ শিলাইদহ, ভক্ত প্রাণে আজ একি আনন্দ বিরাট!"

শিলাইদহ কাছারির পক্ষ থেকে আবেদনপত্র পেশ করা হয়। রচনা করেন পেশকার শরৎ সরকার। পাঠ করেন হেড মুনসি বিজয়ভূষণ রায়। কাছারির কর্মচারীরা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঁচ দফা আবেদন করেন। মোদ্দা কথাটা হল 'জমিদার, কর্মচারী ও প্রজা-সাধারণ যাহাতে সকলেই সকলকে বুঝিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে তিনটি সম্প্রদায়ই একসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া একমনে সকলেই দেশের কাজ করে এইরূপ উপদেশ প্রার্থনা।'

শিলাইদহের প্রজাবৃন্দের পক্ষে আবেদনপত্রে প্রার্থনা জানান "একান্ত অনুগত ক্ষুদ্র প্রজা শ্রীমেহেরালী বিশ্বাস সাং চর কালোয়া।" তিনি বলেন, 'আজ

আমাদের কী আনন্দের দিন···সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শতবেণুরবে গাইছে—ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।'

বিরাট এই প্রার্থনাপত্রের শেষ দিকে বলা হয়—'সমুদ্রমন্থন করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিয়া অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে অনন্দটুকু পেয়েছি, তার যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে :

১. গৃহস্থেরা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, তবু তাহাদিগকে দুমুঠো ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিরূপে তাদের এই দুরবস্থা দূর হইতে পারে এই সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

২. দেশ থেকে হাজার হাজার মণ শস্য সস্তা দরে বিদেশে চলিয়া যাচ্ছে, আর বিদেশ থেকে যা আসছে তা তাহাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হচ্ছে। তার প্রতিকারের উপায় কি, এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৩. বর্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকের কি কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৪. দেশের গরিবের ছেলে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে সহায় অভাবে জীবনে উন্নতির দিকে যাইতে পারে না জন্য ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

অতএব প্রার্থনা, অধীনগণের এই ক্ষুদ্র আকিঞ্চন গ্রহণ করিলে জীবনে ধন্য হইব। নিবেদন ইতি। ১৩২৮। ২১ চৈত্র।"

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা জানতে পারি নি। কিন্তু এটুকু জানি সেই শেষ যাত্রা হলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিলাইদহ তাঁর হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। শিলাইদহে তবু আর যান নি কেন? ১৯৩৮ সালে জনৈক শিলাইদহবাসীর কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন: "অনেকবার শিলাইদহ দর্শন করে আসবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি।"

শিলাইদহে শেষ যাত্রার বারো বছর পর পতিসরে তাঁর শেষ যাত্রা। সেটাই তখন তাঁর একমাত্র নিজস্ব জমিদারি। সেবার তিনি বোটে ছিলেন। তখন ম্যানেজার বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। সেখানকার শতকরা ৮০ জন প্রজাই মুসলমান ও চাষী।

কবির সঙ্গে ছিলেন একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত

ম্যানেজার ও শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও ভৃত্য বনমালী। রাজশাহীতে তখন জেলাশাসক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনিও এসেছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে।

পুণ্যাহসভার পর অভিনন্দন। প্রজাদের আনন্দের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথও খুশি। তিনি বললেন, "সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের দেখে যাব—আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমরা এগিয়ে চল।"

বিকালে কাছারিতে সম্বর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথ বোট থেকে পালকিতে এলেন। "কালীগ্রাম পরগনার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে মোঃ কফিলুদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল" সেই সভায় "মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরগনায় শুভাগমন উপলক্ষে" শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন এই বলে—

"প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি / দেবরূপে এসে দিলে দেখা / দেবতার দান অক্ষয় হউক্ / হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা।"

রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, "সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল—এইটিই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি—কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সে-সব কথা মনে হলে বড় দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ—এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে এসে, তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমাদের সবার মঙ্গল হোক—তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

কবির কথা শুনে প্রজাদের চোখ ছলছল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে বললেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"

রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। বললেন, "তোমরা আমার বড়ো আপন জন, তোমরা সুখে থাকো।"

বিরাট জনতা নীরব। খানিক থেমে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, "তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। ওর নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।"—

কবির সঙ্গী-সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলছেন: "অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল করে উঠেছে

আনন্দের অশ্রুবাষ্পে। এ দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারি নি।···সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমানবহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা যতটা বুঝবেন—চোখে যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা শক্ত।"

ওদিকেও বিদায় নেবার সময় হয়েছে। বোট প্রস্তুত। কবিকে নিয়ে বোট ছাড়ল পতিসর কাছারির ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী তিনি পেরোলেন। নদীর দুধারে প্রজাদের সারি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর পরিচিত জনপদ, প্রত্যেকটিতে যেন তাঁরই লেখা সেই অসামান্য গল্পটির মতো সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির, ভঙ্গি নিরাসক্ত। উন্নতদর্শন দীর্ঘ চেহারা ঈষৎ ন্যুব্জ। শেষ নমস্কার তিনি জানালেন করজোড়ে।

সাদাচুল ও দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, উড়তে চাইছে বাদামী জোব্বা। ওদিকে পালেও লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বোটের ভিতরে চলে এলেন, এলেন স্মৃতিভারে উদবেল মন নিয়ে। সেখানেও জানালা দিয়ে শেষ দেখা দেখতে লাগলেন কৈশোর থেকে বার্ধক্য—দীর্ঘদিনের সঙ্গী তাঁর প্রিয় মানুষ আর প্রিয় প্রকৃতিকে। পোস্টমাস্টার গল্পের সমাপ্তির মতো ওদিকে—

"নৌকা ছাড়িয়া দিল। বর্ষা-বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

কবি ও সন্ন্যাসী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ

শ্রীযুক্তা ইলা ঘোষ

পর্যায়ক্রম

কবি ও সন্ন্যাসী

১৮৮১ সাল। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। পাত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র। রাজনারায়ণের অনুরোধ, এই বিবাহোৎসবের জন্য নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সংগীত রচনা করেন। কবি হিসাবে তিনি তখন খ্যাতিমান। বাল্মীকি প্রতিভার রচনা ও অভিনয় সে সময় আলোড়ন তুলেছে কলকাতার বিদ্যোৎসাহী সমাজে। ভানুসিংহের পদাবলী এবং ব্রহ্ম সংগীতকার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ সমাজে সমাদৃত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। সুদর্শন, দেহকান্তি সুপুরুষ। যেমন গানের গলা তেমনি লেখার হাত। অভিজাত ঠাকুরবাড়ির নবরত্নসভায় তিনি মধ্যমণি। রাজনারায়ণের অনুরোধে তিনটি গান লিখে তিনি সংগীতে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানান নরেন্দ্রনাথ নামক যুবককে।

জোড়াসাঁকো অঞ্চল থেকে মাইলখানেক দূরে শিমুলিয়ার অভিজাত দত্ত-পরিবারের অনিন্দ্যদেহকান্তিময় সন্তান নরেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মতো শিমুলিয়ার দত্ত পরিবার ধনী নয়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা আভিজাত্যে সমাজের অগ্রে। জোড়াসাঁকো বাড়ির মতোই সাহিত্য এবং সংগীতের চর্চা আছে দত্তবাড়িতেও।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর আর শিমুলিয়ার দত্তদের আদি নিবাস বর্ধমান। ঠাকুররা কুশগ্রাম আর দত্তরা কালনার লোক। ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ যশোর ঘুরে কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হন। আর দত্তরা একই উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন সোজাসুজি। ঠাকুর পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন রবীন্দ্রনাথ, দত্ত পরিবারের নরেন্দ্রনাথ। চেহারায় ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে দু'জনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কলকাতায় পরিচিত নাম। পরিচিতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ বেশি! তাঁর পিতা ভ্রাতা পিতামহ ছিলেন সেকালের কলকাতায় খ্যাতির শীর্ষে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যকাল থেকে বহু গুণের আধার।

দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। মাত্র দেড় বছরের ব্যবধান। একজনের জন্ম ১৮৬১ সালের মে মাসে। অন্যজনের ১৮৬৩ সালের জানুআরিতে। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু। সেই সূত্রে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ঠাকুরবাড়িতে। দ্বিপেন্দ্রনাথের

আসরে নরেন্দ্রনাথ আসেন নানা বিষয়ে আলোচনা ও গল্প করতে। তিনি এলেই 'কী হে নরেন' বলে শিবপুবাবু তাঁকে সাদর আহ্বান জানান। দুই বন্ধুতে বড় মধুর সম্পর্ক।

নিত্য যাতায়াতের ফলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই পুত্রতুল্য এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হন। নরেন্দ্রনাথও দেবতুল্য এই মহর্ষির ধর্মাচরণ ও নীতিনিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি ধর্মপিপাসু। সংগীতে তাঁর আগ্রহ, কালোয়াতি গান তিনি চর্চা করেছেন প্রচুর পরিশ্রমে। স্কুল কলেজেও তিনি ছিলেন সেরা ছাত্র, কিন্তু মন বরাবর অস্থির। লোকহিত এবং ঈশ্বরচিন্তা তাঁকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। দেবেন্দ্রনাথের মতো একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ মহাত্মার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের অস্থিরতা আপাতত শান্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথের স্নেহের পরিবর্তে তিনি তাঁকে নিবেদন করলেন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাতায়াতের সময়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের বন্ধু হিসাবে নয়, একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম এবং সুকণ্ঠ সংগীতবিদ হিসাবে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তিকালের দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মধ্যে প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল, তার কোন প্রামাণিক বিবরণ কোথাও নেই; তবে একথা নানা সূত্রে জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সংগীতের একজন পারদর্শী গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর যৌবনের সূচনাতেই। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উপাসনায় তিনি নিয়মিত ব্রহ্মসংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রিয় গানগুলি ছিল—

সখি আমারি দুয়ারে কেন,
মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে পিত
আজ বহিছে বসন্ত পবন
তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন

স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যাওয়ার পরও রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে ধরা ছিল। এমন কি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও নানা সময়ে তিনি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শুনিয়েছেন। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ জুলাই শোনান 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।'

সংগীতে নরেন্দ্রনাথের পারদর্শিতার কথা জানা ছিল বলেই রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহে নবরচিত সংগীত সমবেতকণ্ঠে পরিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তিনটি গান লিখেছিলেন—

'দুই হৃদয়ের নদী', 'জগতের পুরোহিত তুমি' এবং 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে।' রবীন্দ্রনাথ নিজে এই তিনটি গান নরেন্দ্রনাথকে শেখান এবং বিবাহসভায় সুন্দরীমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্ধ চুণীলাল প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ গলা মিলিয়ে গান করেছিলেন উদাত্তকণ্ঠে। শোনা যায়, মহড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ যখন অর্গান বাজাতেন, নরেন্দ্রনাথ বসতেন পাখোয়াজ নিয়ে। কল্পনা করুন সেই দৃশ্য, পরবর্তী কালের বিশ্বপথিক দুই মহাপুরুষ সংগীতের ছন্দে কী ঘনিষ্ঠতায় একসূত্রে গ্রথিত! দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিত। 'এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।'

এক হবার জন্যে দু'জনে চাইলে কী হবে, পরবর্তী কালের ইতিহাস কিন্তু অন্য রকম—দু'জনের জীবন মোড় নিল দু'দিকে, দুই হৃদয়ের নদী এক সঙ্গে গিয়ে সাগরে পড়ল না। দুজনের উৎস একই,—সেই গঙ্গোত্রী; মোহানা একই—সেই বঙ্গোপসাগর; অথচ গতিপথ রইল পৃথক্, মোহানার মুখ রইল পৃথক্, অশান্ত অশ্রান্ত দু'দিকে ছুটে মিলল গিয়ে একই শান্তির পারাবারে। তবু পদ্মা রইল পদ্মা, গঙ্গা রইল গঙ্গা।

উত্তর কলকাতার এক মাইল পরিধির এলাকা থেকে সমসাময়িক দুই বঙ্গ সন্তান হলেন জগৎ-বরেণ্য; জননী সারদাদেবীর সন্তান বিশ্বখ্যাত হলেন সারদা-সরস্বতীর বরপুত্র কবি হিসাবে, আর জননী ভুবনমোহিনীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভুবনবিজয় করলেন সন্ন্যাসী হিসাবে। এই কবি আর সন্ন্যাসী চিন্তানায়করূপে ভারতবর্ষকে দিলেন নতুন মহিমা, ভারতবাসীর মনন ও জীবনকে দিলেন নতুন চরিত্র, ভক্তি জ্ঞান ও কর্মে খুলে দিলেন নতুন দিগন্ত; কিন্তু এত কাছাকাছি থেকেও বিবেকানন্দের জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত দুই মহাপুরুষ একে অন্যের সম্পর্কে আশ্চর্য রকমভাবে প্রায় নীরব। কাব্যে গানে নাটকে উপন্যাসে গল্পে রবীন্দ্রনাথ তখনই স্বদেশে খ্যাতিমান। ৩৯ বছর বয়সে ১৯০২ সালে মৃত্যুর আগেই বিবেকানন্দ দেখতে পেয়েছেন গল্পগুচ্ছের বহু গল্প সমাদৃত, মানসী, রাজা ও রাণী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা নবযুগের সূচনা করেছে, অথচ সর্ববিষয়ে সমান আগ্রহী, নানা গ্রন্থ পাঠে সদামগ্ন স্বামীজি প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু উচ্চারণ করেননি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে। যদি বা করে থাকেন, তবে তা শ্রুতিবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ হয়নি—একটি দুটি উক্তি ছাড়া। 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ তখনই লিখেছেন অনেক সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ; স্বদেশের হিত সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্ট ও যুগান্তকারী। স্বামীজির শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও সাহিত্য জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনি স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কাবুলিওয়ালা গল্প। স্বামীজি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আদৌ অপরিচিত নন, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা বা উক্তিতে প্রায় অনুপস্থিত।

আর রবীন্দ্রনাথ? স্বামীজি যতদিন জীবিত ছিলেন, নিন্দা বা প্রশংসা

কোথাও কোন লিখিত উক্তি করেননি বিবেকানন্দ সম্পর্কে। করে থাকলেও তার কোন রেকর্ড নেই। বিশাল কর্মময় জীবন স্বামীজির। তাঁর অভীমন্ত্রে সারা বিশ্ব তোলপাড়, পরাধীন ভারত নব আশায় বলীয়ান, আসমুদ্র হিমাচলের সর্বত্র স্বামী বিবেকানন্দ নামটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে, আমেরিকা জয়ের পর কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনা, কিন্তু সর্ববিষয়ে সদাজাগ্রত রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে যেন তেমন অগ্রণী নন। তাঁর কলম দিয়ে অজস্র রচনা অনর্গল উৎসারিত হচ্ছে, সভাসমিতি অনুষ্ঠানে তিনি একজন প্রখর বক্তা, তবু সমসাময়িক কোন রচনা বা বক্তৃতায় বিবেকানন্দের নাম সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর।

এই প্রহেলিকার উত্তর স্পষ্টভাবে আজও কেউ দিতে পারেন নি। নানাজনে নানা কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বটে, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলে নি। হয় জোড়াতালি দেওয়া গোঁজামিল, নয় পক্ষপাতপূর্ণ বিকৃত বিশ্লেষণ। এক পক্ষের উকিল সেজে এমন সব কারণও কেউ কেউ দেখিয়েছেন, যাতে একজনের গৌরববৃদ্ধি দূরে থাক, অপমান হয়েছে দুই মনীষীরই। এই প্রসঙ্গে রসনাতৃপ্তিকর জনশ্রুতিও ক্ষতি ঘটিয়েছে দুইজনের সম্পর্কে আপাতপার্থক্যের মূল অনুসন্ধানে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এককালে জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্বামীজি নাকি ঠাকুর পরিবারের কোন সুন্দরী রমণীর পাণিপ্রার্থী হয়ে বিফল হওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বিষ্ট হন। আবার অন্য দিকে রটনা করা হয়ে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বামীজির খ্যাতিতে এতই ঈর্ষান্বিত হন যে, উদাসীন থেকেই তিনি সেই খ্যাতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা করেছেন। এ সবই অপপ্রচার, সবই অমূলক।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই উদাসীনতা অবশ্য সাময়িক। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত উক্তি অজস্র। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব কবি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু জানি না কেন বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় তিনি কোন উক্তি প্রকাশ্যে করেন নি। এমন কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, নিবেদিতা সম্পর্কে যতটা উচ্ছ্বসিত, ততটা বিবেকানন্দ সম্পর্কে পরেও তিনি নন। তার কারণ অবশ্য অস্পষ্ট নয়। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য পছন্দ করতেন না। তাছাড়া বিবেকানন্দের বিজয় বৈজয়ন্তী যখন শহর থেকে শহরে উড়ছে তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামে। স্বামীজীর মৃত্যুর পরই আবার তিনি ফিরে আসেন গ্রাম ছেড়ে শান্তিনিকেতনে কলকাতায়। কাগজপত্র ঘাঁটলে পরিষ্কার জানা যায়, বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তীকালে রচিত রথের রশি নাটকে কবি ও সন্ন্যাসী নামে দুটি চরিত্র আছে। কবি কবি নিজেই। আর সন্ন্যাসী চরিত্রটি যে বিবেকানন্দের আদলে গড়া, চালচলন ও সংলাপেই বোঝা যায়। সন্ন্যাসীর কথা যেন স্বামীজীরই ভাষা। অথচ দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথেরই, দীর্ঘদিন ধরে একটা অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে তিনি

বিবেকানন্দ সম্পর্কে বরাবর সম্পূর্ণ নীরব এবং এই নীরবতাই যেন রবীন্দ্রনাথের নীচতার লক্ষণ। তর্কের খাতিরে বলা যায়, বিবেকানন্দ সম্পর্কে কোন কিছু না বললেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কমে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কোন দাসখৎ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি যে, তাঁকে তাঁর পূর্বসূরী উত্তরসূরী সমসাময়িক—সকলের সম্পর্কে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করতে হবে।

বিবেকানন্দ অবশ্য পরোক্ষভাবে এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম খোলাখুলি না করলেও বোঝা যায় 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি যে সব কবিকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন। তিনি লিখছেন—'ঐ যে এক দল দেশে উঠেছে, মেয়ে-মানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন-হোসেন' করেন।'

বিবেকানন্দের এই উক্তি একপেশে, তবে অকারণ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সে সময়কার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা পরে লিখেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন, সে সময় কিছুকালের জন্য তাঁর একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এতো একটা সাময়িক ব্যাপার। স্বামীজি-অন্ত প্রাণ ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। নিবেদিতা মারফৎ স্বামীজি কি রবীন্দ্রনাথের তেজস্বী রচনাবলী পড়েন নি? আর মেয়েলিপনার কথাই যদি ধরা যায়, স্বামীজির প্রিয় 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' গানে তো তেজস্বিতার নামগন্ধও নেই। ক্ষিতিমোহন সেন নিজে কাশীতে স্বামীজির মুখে এই গানটি শুনেছিলেন। তাছাড়া স্বামীজি সম্পাদিত 'সংগীত কল্পতরু' গ্রন্থে এই রকম বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত স্থান পায়। তবে এগুলো বাইরের ব্যাপার, কর্মব্যস্ত বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে যদি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ নাও করেন, তাতেও বিবেকানন্দের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হওয়ার আগেই স্বামীজি মহাপ্রয়াণ করেন।

তবে এহো বাহ্য, এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ স্মরণীয়। রোমাঁ রোলাঁর ভারতবর্ষের দিনপঞ্জী গ্রন্থে আছে, ওকাকুরা গঙ্গার ধারে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করলে স্বামীজি তাঁকে বলেন, এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই; এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। আপনি রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি জীবনের মধ্যে আছেন। ওকাকুরাকে বিবেকানন্দের কাছে পাঠান রবীন্দ্রনাথ। আবার সেই ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে বলেন বিবেকানন্দ।

আমাদের আর একটি জিজ্ঞাস্য; নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-আলাপ অনেকবারই হয়েছে বটে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের মিলন কোথাও হয়েছে কি? জানা যায়, হয়েছে। তার আগে বলা দরকার,

নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ কী করে হল? রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে নরেন্দ্রনাথ নাম নেন, বিবিদিশানন্দ। নাম পরিবর্তনের পিছনে একটি জনশ্রুতি আছে। কেশবচন্দ্র সেনের অনুচর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'নববৃন্দাবন' নাটকের বিবেক চরিত্রে অভিনয় করেন নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালের ১৮ জানুআরি। সম্ভবত এই স্মৃতি থেকেই বিবিদিশানন্দ বিবেকানন্দ হন।

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সাক্ষাতের কথা বলছিলাম। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় ফেরেন, তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান নগরবাসী। ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার বাড়িতে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এই উপস্থিতির কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে অমল হোমকে বলেছিলেন। তাছাড়া ১৮৯৯ সালের ২৭ জানুআরি একটি চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ মিলিত হন। দু'জনে কী কথাবার্তা হয়েছিল জানা যায় নি, তবে নিবেদিতার এক চিঠিতে জানা যায় ওই আসরে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান করেন। তাছাড়া হয়তো আর দু-এক জায়গায় সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। নিবেদিতা ছাড়াও কবিবন্ধু দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গেও স্বামীজির অন্তরঙ্গতা ছিল।

স্বামীজি দেহরক্ষা করেন ১৯০২ সালে। তাঁর প্রয়াণের পর কলকাতায় একটি শোকসভা হয় ভবানীপুরে। ১৯০২ সালের ১২ জুলাই এই সভায় বক্তৃতা দেন ভগিনী নিবেদিতা; আনন্দচরণ মিত্র প্রমুখ এবং সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলায় স্বামীজির জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। আক্ষেপের বিষয়, তাঁর এই মূল্যবান বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ আজো জানা যায় নি। তবে ১৯০২ সালের ১৫ই জুলাই 'বেঙ্গলি' দৈনিকে এই সভার একটি বিবরণ বেরিয়েছিল। সংবাদদাতা লেখেন—

On Saturday (12 July 1902) last the Excelsior Uunion of Bhowanipur held a meeting to do honour to the memory of the Late Swami Vivekananda. There was a larger gathering of the student of the locality in the spacious hall of the South Suburban School, and Babu Rabindranath Tagore presided. The speaker of the evening Sriman Ananda Charan Mitra, one of the Vice-Presidents of the Union, gave expression to the deep regard in which the Swamiji was held by the whole community and exhorted his admirers to worship his memory not in the Western way of erecting a statue or hanging a portrait but by treasuring up his teaching in the recesses of their hearts and endeavouring to live up to that exalted ideal which had so moved even the materialistic West. At the request of the secretary Sister Nivedita explained to the meeting the secret of the Swamiji's success in the Western world

and emphasised in her own inimitable way that absolutely fearless patriotism which was the most striking feature of the great Swamiji's character bringing into strong contrast the ague fits by which the average Bengali is convalsed at the last imaginings of any danger into which his country's cause may lead him. The president having summed up the Swamiji's work and teachings on much the same line in Bengali, the meeting was brought to a close.

সংবাদদাতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে শাশ্বত ভারতের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ১৯০৮ সালে স্বামীজি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় বলেন 'অল্প দিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভাতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' (দ্রষ্টব্য ঃ পূর্ব ও পশ্চিম —প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫)

ডাঃ সরসীলাল সরকারকে ১৯২৮ সালের ৯ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতেও (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশস্তি-বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্পর্কে তিনি লেখেন—'আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে, তখনই শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে-সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।

স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত এক পত্রে বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধের সীমার বাইরে মানুষের

আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখান। এতে কোন বিশেষ আচরণের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়।" (কিশোর বাংলা, ১৩৪৮ পৌষ)।

ডঃ আলেকস আরনসন লিখিত 'রোলাঁ্যা অ্যান্ড টেগোর' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্পর্কে রোলাঁ্যা এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই অনেক আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার তফাৎ কোথায় এবং বিবেকানন্দের বক্তব্যের মূল সুর কী, ব্যাখ্যা করেছেন। রোলাঁ্যাকে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দের আইডিয়া ছিল জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করা। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা —যেখানে সৎ অসৎ কিছুই নেই—তার উপরে উঠতে চায়-ই। সৎ-অসৎ বা ভালমন্দের বাইরে আসতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কহীন ধর্মীয় অনেক আচার অভ্যাস বিবেকানন্দ মেনে নিতে পারতেন। সত্যের প্রতি আমার মনোভাব একটু আলাদা রকমের। যা স্পষ্টত মন্দ, তাকে সত্য বলে মানা যায় না। সূর্যের আলোতে বিষ-বীজাণু থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে একটি সুস্থ অসহিষ্ণুতার অভাবে আজ আমাদের ধর্মজীবন প্রগতিশীল বা সৃজ্যমান হতে পারছে না। বরং এক ধরনের অনীশ্বরতাবাদ ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হতে পারে। কারণ আমি জানি যে, আমাদের দেশ এই অনীশ্বরতাবাদকে কখনই চিরকালের জন্যে গ্রহণ করবে না। এই সুস্থ বলিষ্ঠ মতবাদ ধর্মারণ্যের অবাঞ্ছিত আবর্জনারাশি উচ্ছেদ করবে এবং মহীরূহরাই অক্ষত থেকে যাবে।'

জাপানী মনীষী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারতবর্ষকে বুঝতে, ভারতবর্ষকে জানতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষকে যদি জানতে চান, বিবেকানন্দকে জানুন' ;—If you want to know India, study Vivekananda. There is in him, everything positive, nothing negative.

এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজির বাংলা রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন, তার প্রমাণও আছে। স্বামীজির প্রায় সব ক'টি বই তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন। শুধু চিন্তাধারার জন্য নয়, তাঁর প্রাঞ্জল গদ্যরীতিও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি বইগুলির গুণের কথা অনেকবার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দীনেশ সেন মশায়কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে এক চিঠিতে লেখেন, "আপনি এখনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।" (উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৫৪ মাঘ)। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম

বিশ্বভারতীতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠেও গিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে সেই বিখ্যাত 'বহু সাধকের বহু সাধনার-ধারা' কবিতা রচনা ছাড়াও ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। মালঞ্চ উপন্যাসে নীরজার ঘরে ঠাকুরের ছবি টাঙিয়ে বার বার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের আগে পরে অনেকবার স্বামীজী গিয়েছেন ভক্তের মতো। দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নানা সময়। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, তার সবই শ্রদ্ধাপূর্ণ। শুধু তাই নয়, কিশোর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ মিশনের দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি পদব্রজে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপতা থাকলে নিজের নাবালক ছেলেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের পথে তিনি পাঠিয়ে দিতেন না। রামকৃষ্ণ কথামৃত চতুর্থ খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি কাশীশ্বর মিত্রের বাগান বাড়ি নন্দন কাননে ১৮৮৩ সালের ২মে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন তাঁকে গান গেয়েও শোনান। শ্রীম লিখছেন, "ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটা বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সংগীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে বিবেকানন্দগতপ্রাণ নিবেদিতা কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতো ঘনিষ্ঠ হতে পারতেন? তাছাড়া আরো স্মরণীয়, সন্ন্যাসী হওয়ার পরও স্বামীজি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে যান। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন, 'আমার মনে আছে শিকাগো পার্লামেন্ট অব রিলিজিওন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকো এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন। পাশ্চাত্য বিজয়ের সংবাদে উল্লসিত মহর্ষিও বিবেকানন্দকে একখানা সস্নেহ পত্র পাঠান।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নব্য হিন্দু ধর্মের যে জোয়ার বাংলা দেশের দুই কূল প্লাবিত করেছিল, তার মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। আর ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম, বিবেকানন্দ কায়স্থ সন্ন্যাসী,—জীবনদর্শন ও ধর্মচিন্তার দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'জনই হিন্দুত্বের জয়গান গেয়েছিলেন। দু'জনেই ছিলেন জাতিভেদের বিরোধী, কিন্তু বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেন। তাঁদের যুক্তির পিছনে ছিল ইতিহাস সমাজদর্শন ও আধ্যাত্মিকতা। দু'জনেই জাগ্রত করতে চেয়েছেন

আত্মশক্তিকে। মূঢ় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুয়ানি বা আর্যামির পরিহাসে দু'জনেই সমান প্রখর। স্বদেশের হিত কোথায়, তার বিশ্লেষণে কবি ও সন্ন্যাসীর মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। শাস্ত্রের শাসনে আড়ষ্ট সমাজ ও ধর্মকে মুক্তি দেবার জন্যে কলম ধরেছেন দুই মনীষী। বিবেকানন্দ এই মুক্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে জনসেবাকে করলেন মুখ্য হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চেয়েছিলেন সেবা নয়, সংস্কারের মাধ্যমে। রিলিফ নয়, রিফর্ম। এই সংস্কার আবার কোন প্রতিষ্ঠান করে নয়, মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা বলতে চেয়েছেন ওই একটি কথা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।'

১৯০২ সালে স্বামীজির মহাপ্রস্থান। সেই বছরই রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ। তিনি তখন ব্যক্তিগত শোকের ভিতর দিয়ে আরো নিঃসঙ্গ। তারপর পর পর মৃত্যু—কন্যা রেণুকা, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও পুত্র শমীন্দ্রনাথের। ১৮৮৭ সালে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হন। তাঁর কর্মকাল মোটামুটি পনেরো বছর। স্বল্পায়ু জীবনের স্বল্প পরিসরে তিনি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন দেশে বিদেশে।

তিনি যখন পরিব্রাজক হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভারতের গৌরব-গাথা, বেদান্তের মহিমা এবং সমাজ রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম নিয়ে প্রবল বেগে আবেগের সৃষ্টি করে চলেছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামে। তাঁর চিন্তা অন্যত্র প্রসারিত। সারা পৃথিবী যখন স্বামীজির প্রেরণায় তোলপাড়, ঠিক সেই সময় স্বামীজির কর্মযজ্ঞের সেই পনেরোটি বছর তিনি অন্য এক নীরব কর্মযজ্ঞে হাত দিয়েছেন শিলাইদহে, পতিসরে, সাজাদপুরে। তিনি তখনই প্রথম দেখলেন প্রকৃত ভারত মাতাকে, জানলেন ভূমি-লক্ষ্মীকে। গ্রামকে না বাঁচালে যে দেশ বাঁচে না, শহরে বসে কথার ফুলঝুরি না ছড়িয়ে চাষীদের মূঢ় ম্লান মুখে হাসি ফোটানোই যে বেশি জরুরী, একথাটা রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন সেই সময়টাতে এবং সমবায় কৃষিব্যাঙ্ক, ট্র্যাক্টর মন্ডলীপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে তিনি তখন মহাব্যস্ত। শিলাইদহের পর ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে শুরু করেন নতুন এক কর্মযজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ এবং ভারতীয় প্রথায় শিক্ষা—এই দুটি প্রাথমিক কর্তব্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন প্রবল উৎসাহে। দুটি কর্তব্য পালনের মূলে ছিল স্বদেশবাসীকে চিন্তায় ও কর্মে বলীয়ান করা, ভিখারীর মনোভাব পাল্টে আত্মশক্তির উদ্বোধন করা।

রবীন্দ্রনাথ আপন মনীষা, কর্মশক্তি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে যে নতুন জগতের সন্ধান পেলেন, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল তাঁর চিন্তাধারা ও রচনায়। ইতিমধ্যে স্বামীজিও তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় তৃতীয় নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন স্বদেশের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে। বিভিন্ন চিঠি রচনা ও বক্তৃতায় তিনি দেশহিত সম্পর্কে যা বললেন, তা অনেক পরে প্রায় একই ভাষায় বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে যা

বলেছেন, তার অনেক আগে স্বামীজি তা বলেছেন তার 'হিস্টিক্যাল ইভলিউশন অভ্ ইণ্ডিয়া' নিবন্ধে। বিশ্লেষণ ও বিচারে কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। স্বামীজি বলেছেন—"প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ব যুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড)। আর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্‌স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের', তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।...ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম। তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, 'আমি গুরু নই', তেমনি বিবেকানন্দ বলেছেন, তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নন, দার্শনিকও নন, সাধকও নন—'আমি গরিব, আমি গরিবদের ভালোবাসি।' কারণ তিনি জানতেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।' বিবেকানন্দ পুজা করতে চেয়েছেন নরনারায়ণকে। নানা সময়ে নানাভাবে বারবার এই দরিদ্র ভারতবাসী, অপমানিত ভারতবাসী, বঞ্চিত ভারতবাসীর কথা অতিশয় বেদনার সঙ্গে তিনি বলেছেন। বিক্ষিপ্ত সেই বিবেকবাণী রবীন্দ্রনাথ পরে কবিতার আকারে বলেছেন একই বেদনার সঙ্গে। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

'শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার'
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার'

—তখন মনে হয় বিবেকানন্দের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম 'নরনারায়ণের' কথা বলেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন, সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।...এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' একই কথা রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন অন্যভাবে। 'রথের রশি' নাটকে তিনি ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, জগন্নাথের রথ নড়িয়েছেন শূদ্রের হাতের টানে। বিবেকানন্দ উচ্চ বর্ণের লোকদের বার বার বলেছেন, অসহায় নির্যাতিতের সহযাত্রী হতে, নইলে তাদের ক্রোধে সব জ্বলে

পুড়ে খাক হয়ে যাবে। মুচি মেথর চন্ডাল দুঃস্থ দরিদ্রকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসার জন্যে তিনি বারবার বলেছেন। বলেছেন অপমানিতের সঙ্গে একাসনে বসতে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের বাণী কাব্যের আকারে গেঁথে বলেছেন—

'যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

স্বামীজির মৃত্যুর আট বছর আগে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে', কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল। তিনি বলেন—

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বন্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি।
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এই একই কথার প্রতিধ্বনি পংক্তিতে পংক্তিতে।

'ভারততীর্থ' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা বিবেকানন্দেরই বাণী। যেন তাঁরই উদাত্ত রচনার কাব্যরূপ। উদার ছন্দে পরমানন্দে নরদেবতারে নমস্কার করে সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে তিনি ব্রাহ্মণকে যেমন মন শুচি করে সকলের হাত ধরতে বলেছেন, তেমনি পতিতদেরও আহ্বান জানিয়েছেন সব অপমানভার অপনীত করে এগিয়ে আসতে। তাছাড়া বিবেকানন্দের মতোই তিনি এই মহাভারতে মহামানবের সাগর তীরে পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিয়েছেন, বলেছেন,—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।'

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি যে অসম্ভব এবং ভারতের প্রাণ পল্লীগ্রামেই—একথা নগরে লালিত কবি ও সন্ন্যাসী একই সুরে বলেছেন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে দু'জনের মনোভঙ্গী এক। শিল্পকলা, শিক্ষা, লোকসংস্কৃতি, নারীজাগরণ, সংগীত, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে দু-জনের যেমন সমান আগ্রহ, তেমনি আগ্রহ বিজ্ঞান সম্পর্কে। তাছাড়া দু'-জনেই মনে করতেন সমস্ত শিক্ষা আনন্দময় হওয়া উচিত, হওয়া উচিত স্বয়ম্ভরী।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চারিত্রিক তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠ কথাবার্তায় স্বামীজির ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজি বলেন—'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে।' অন্যদিকে গোরার উক্তি—'ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই। হঠাৎ ইংরাজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পন্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।'

কবি ও সন্ন্যাসী দু-জনের মুখেই চরৈবেতি মন্ত্র। বিবেকানন্দ বলেন, 'তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত।...পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে।' রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

'চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন।
হেরিব না দিক।
গণিব না দিনক্ষণ,
করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে স্বামীজি বলেছেন, 'অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ।' নৈবেদ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মুখে একই কথা—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

স্বামীজি বলেন,—

বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলে—

যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজির বক্তব্য--The only service to be done for our lower classes is to give them education to develop their lost individuality আর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—'দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে।'

তবু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, তবু বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ। দুই মনীষীর জীবন রেলপথের মতো সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে, কখনো পরস্পর এক সূত্রে মিলিত হয় নি। না হওয়ার মূলে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। চিন্তাধারার মিল আছে বটে, কিন্তু একজনের জীবনধারা অন্যজনের জীবনধারার অনুরূপ নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সন্ন্যাসীর ছায়া বারবার পড়লেও তিনি আজীবন কবিই থেকে গেছেন, জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাঁশি বাজিয়েই গিয়েছেন এবং প্রাণের কান্না হাসি গানে গানে গেঁথেই মানবজীবন ধন্য করেছেন।

আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিত্তে কবির ছায়াপাত ঘটলেও তপস্যার আসন থেকে তিনি কখনো সরে আসেন নি। একজন মূলত সৌন্দর্যের পূজারী, অন্যজন তপস্বী সাধক। এতো নৈকট্য, এতো সাদৃশ্য সত্ত্বেও কবি আর সন্ন্যাসীর মূলগত পার্থক্য তাই কখনো ঘোচেনি। দেশপ্রেমী, মানবপ্রেমী হয়েও বিবেকানন্দের অধিষ্ঠান যোগাসনে। আর রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।' বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চান না। মুক্তির স্বাদ তিনি পেতে চান মহানন্দময় অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে।—তিনি বলেন 'মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।'

যদিও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দু-জনেই একবাক্যে বলেছেন,—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে
যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার আদেশে।'

তবু সকল কর্মের অবসান ঈশ্বরের কাছে, দু-জনের প্রার্থনা দু-রকম।

কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ বাণী প্রচার করেছেন, কবি জীবনে তা স্পষ্টত প্রকাশ পায়নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের দূত, রবীন্দ্রনাথ জীবন-শিল্পী। তাঁর আদর্শ ধর্মপ্রচার নয়, গুরুবাদও নয়। সন্ন্যাসের নীরস আধ্যাত্মিকতা তাঁর শিল্পী-সত্তাকে জাগ্রত করতে পারেনি। ধর্মশক্তি ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর পৌরুষের পিছনে অনবরত বেজেছে সংগীত।

আর্যামির নিন্দায় দু'জনেই প্রখর, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দু'জনেই খড়্গহস্ত, বীররসে দু'জনেই দীপ্যমান, প্রাচীন ভারতের গৌরব-প্রচারে দু'জনেই মুক্তকণ্ঠ, পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণে দু'জনে সমান উদার, এবং স্বদেশের হিত দু'জনের চিন্তার পুরোভাগে—সবই সত্য; কিন্তু ধর্মাদর্শ ও জীবনদর্শনে দু'জন দুই কোটির মানুষ। বিবেকানন্দ ভাবপ্রবণ হলেও ভাব নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, সংগীত ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু সংগীতের মূর্ছনায় মূর্ছা যেতেন না। কঠোর শৃঙ্খলাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক হয়েও ধর্মসম্প্রদায় গঠনে উৎসাহী ছিলেন না। বিবেকানন্দের মতো কোন নির্দিষ্ট মতবাদ তিনি প্রচার করতে চান নি। নানা বিশ্বাস নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তিনি অবশেষে জয়গান করেছেন মানুষের ধর্মের। রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাব তো নয়ই, ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ মতবাদের মধ্যেও তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই দিকটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখছেন—

'স্বদেশ ও ধর্মের জন্য বিবেকানন্দের অনির্বাণ প্রেমবহ্নি বাংলাদেশের যুবমনকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। ত্যাগের জন্য কর্মের জন্য একদল মানুষ সর্বদাই উন্মুখ। কেবল আহ্বানের জন্য তাহাদের প্রতীক্ষা। তাহারা নেতৃত্ব করিতে চাহে না, তাহারা নেতাকে অনুসরণ বা গুরুকে অনুসরণ করিয়া সার্থকজীবন করিতে চাহে। সেই নির্ভরশীল নেতা অনুগামী কর্মপিপাসুরা গভীর আন্তরিকতা লইয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাহারা 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' বলিয়া অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা উদ্দীপ্ত। আবার একদল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া বলিয়াছিল—

'এবার চলিনু তবে
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায় বা দল গঠনে যে সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ছিল। মানুষকে পরম আত্মীয় করিবার জন্য যে পরিমাণে হৃদয়াবেগ থাকা নিতান্ত প্রযোজন, কবির মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে ছিল না। একটা জায়গা পর্যন্ত তিনি মানুষকে কাছে টানিতে পারিতেন, সেটি সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁহার সঙ্গে কেউ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না। কবির এই নৈর্ব্যক্তিক মানবপ্রীতির জন্য তাঁহার অন্তরে কেহ স্থায়ী বাসা বাঁধিতে পারে নাই। যাহাদের কথা সাহিত্যে বারে বারে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারা তখন আইডিয়া মাত্র। ইহাতেই ছিল কবির মুক্তি, ইহাই ছিল কবির সাধনা।'

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিবেকানন্দ করেন বেলুড় মঠ। দুটি প্রতিষ্ঠানেও আছে মূলগত পার্থক্য। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মিলন। কিন্তু এই তপোবন যতটা যাজ্ঞবল্ক্য বা ভরদ্বাজ মুনির ছায়ায়, তার চেয়ে বেশি কবি কালিদাসের কল্পনায়। কালিদাসের তপোবন আর উপনিষদের আরণ্যক আশ্রমের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠা হয় এই আশ্রম। অন্যদিকে বেলুড় মঠ হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মসমন্বিত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করে বেদান্তের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেলুড় হল ধর্মসমন্বয়ের কেন্দ্র, কর্মীরা হলেন সন্ন্যাসী। বেলুড় মঠ আজও এই রকম আছে। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কোন গণ্ডিবদ্ধ ধর্মমতে আবদ্ধ থাকতে পারতেন না, সেহেতু তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর আশ্রমও একই সঙ্গে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়েছে।

রূপস্রষ্টা কবি ও ধর্মগুরু সন্ন্যাসীর কর্মজীবন তাই দ্বিধারায় প্রবাহিত। চিন্তায় সামঞ্জস্য সত্ত্বেও, বক্তব্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও, দুজনে কাছাকাছি আসতে পারেন নি। শুধু সম্পর্কের আদিতে তাঁদের একসূত্রে বেঁধেছিল সংগীত, অন্তে বাঁধে বিজ্ঞান। আপাতদৃষ্টিতে কবি বা সন্ন্যাসী কারো সঙ্গেই বিজ্ঞানের সম্পর্ক

থাকার কথা নয়; কিন্তু দু'জনের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তাঁদের বিশ্লেষণ এতো স্বচ্ছ, এতো আকর্ষক। তাছাড়া প্রাচ্যের গৌরবে গরীয়ান হয়েও ওই বিজ্ঞানের জন্যই দু'জনে পাশ্চাত্যের দিকে মুখ না ফেরাতে বারবার বলেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতবর্ষও যাতে বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী হয়, সেদিকে আগ্রহ ছিল দু'জনের। তার প্রমাণ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ দু'জনেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং দু'জনেই চেয়েছিলেন বাঙালী বিজ্ঞানীর কীর্তি বিদেশে স্বীকৃত হোক। জগদীশচন্দ্রের যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখাতে বিলাত যাওয়ার কথা হয়, তাঁকে সর্বাধিক সাহায্য করেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে তাঁর কী আকুলতা। নিজে অগ্রসর হয়ে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে জাহাজ-ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করেন এবং কলকাতার ঘাটে বিজ্ঞানীবন্ধুকে জাহাজে তুলে দিয়ে আশ্বস্ত বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ এক প্রান্তে যাঁকে তুলে দিলেন বিদেশের পথে, অনা প্রান্তে তাঁকে তুলে নিলেন বিবেকানন্দ। কবির হাত থেকে সন্ন্যাসীর হাতে গেলেন বিজ্ঞানী। প্যারিস প্রদর্শনীতে যে সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ দেখান, সেখানে সূচনা ভাষণ দেন বিবেকানন্দ।

কিন্তু সব শেষে সেই আগের কথাই টিঁকে থাকে। উৎস আর মোহানার ক্ষেত্র এক হলেও কবির পদ্মা আর সন্ন্যাসীর গঙ্গা খানিক দূর এক সঙ্গে এগিয়ে দুই খাতে বয়ে গিয়েছে। দু'জনের চিন্তায় অজস্র মিল, কিন্তু দু'জন দুই পথের পথিক। মনের দিক থেকে যত কাছাকাছি থাকুনই না কেন, জীবনচর্যায় দু'জন দুই মেরুতে। ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ হয়ে দু'জনেই জয়গান গেয়েছেন মানুষের। কিন্তু দু ভাবে। আর এই দু'জনকে পাশাপাশি রেখেই আমাদের ইতিহাস গৌরবময়। বিরোধ নেই, বিদ্বেষ নেই সমান্তরাল দুর্বার গতি নিয়ে দু'জনে সাগরমুখী। দু'জনেই দুরকম ভাবে আমাদের বলেছেন—

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যর পদে
মানব মর্যাদা-বিসর্জন,
নিষ্ঠুর আঘাতে নিঃসংকোচে।

কিন্তু হায়, আজো আমরা না পারলাম নিঃসংকোচ হতে, না পারলাম নিষ্ঠুর আঘাত হানতে। শুধু দুই সমসাময়িক মহাপুরুষের পূজা করেই কর্তব্য সারলাম। চিত্তের দাসত্ব দূর করার উদ্যোগ কোথায়?

মহাকবি ও মহাপ্রভু

এই বাংলাদেশ বহু মনীষীর জন্ম দিয়েছে। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম আমাদের প্রেরণা দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের পরিচয়ে আমাদের পরিচয়। জয়দেব, চণ্ডীদাস, মধুসূদন সরস্বতী, রঘুনাথ শিরোমণি, অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, মাইকেল, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলার মাটি পুণ্যবতী! বাঙালী জাতিসৃষ্টির গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে কত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, কত লোকোত্তর প্রতিভা এই শ্যামল জনপদকে গৌরব-মণ্ডিত করেছেন। তাঁদের অকৃপণ দানেই আমরা, উত্তরসূরীর বাঙালী হিসাবে উন্নতশির। কিন্তু সব ছাড়িয়ে সব ছাপিয়ে দু'জন মহাপুরুষের নাম উজ্জ্বল। কীর্তিতে বা খ্যাতিতে অন্য কেউই ছোট নন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা হয়ত তুলনামূলক ভাবে বেশি; তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভাবপ্রবণ সংস্কৃতিবান, রুচিবান বাঙালী জাতি বলতে আজ যা বোঝায়, ভালো মন্দ মিলিয়ে সেই জাতির মানসগঠনে সর্বাধিক প্রভাব সেই দু'জনের— পৌনে চারশ' বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও যাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। একজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অন্যজন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী জাতির জীবনে ও মননে প্রভাবের বিচারে চৈতন্যদেব আবার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বহু যোজন ঊর্ধ্বে। গত প্রায় পাঁচশো বছর ধরে চৈতন্য মহাপ্রভু ধনী দরিদ্রের ঘরে, অভিজাত অবজ্ঞাতের হৃদয়ে, নগরে পল্লীতে সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। আমাদের নিত্যকর্মপদ্ধতিতে কিংবা কোন প্রকার ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর নাম বাঙালীর জিহ্বাগ্রে। মহাপ্রভুর কৃপাতেই রাধা এবং কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের ঠাকুর। সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা রুচি জীবন-যাপন ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বহুবিস্তৃত, কিন্তু এখনো নগর ছাড়িয়ে পল্লীর জনপদে জনপদে তিনি তেমন পৌঁছনান। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও চিন্তাধারায় নগরবাসী বিপুলভাবে প্রভাবিত, যাঁরা মুখে রবীন্দ্র-বিরোধী, তাঁরাও এই সর্বমুখী প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর প্রভাব দিন দিন বিস্তারিত হচ্ছে শিক্ষার আলো বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙালী হিন্দুর

বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিনে অপরিহার্য কীর্তন গানের পাশে ধীরে ধীরে ঠাঁই নিচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। শোকের সময় চৈতন্যদেবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আনন্দের দিনেও দুজনে পাশাপাশি। দোলের দিনে আমরা রাধাকৃষ্ণের গানের সঙ্গে গীতবিতানের ঋতুসংগীত মিলিয়ে দিচ্ছি। তবু রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব কীর্তনগানের সুবিশাল প্রভাবের তুলনায় নগণ্য। চৈতন্যদেব কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার। তাঁর সঙ্গে কোন মানবের তুলনা চলে না। তবু লৌকিক এবং ঐতিহাসিক বিচারে ভাগবতীতনু রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেব থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয়। চৈতন্যদেবই প্রথম এবং আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী, যিনি দীর্ঘকাল একটি জাতির ধর্ম-কর্ম-জীবন-মনন চৈতন্যময় করে রেখেছেন। তার পরেই স্থান রবীন্দ্রনাথের। চৈতন্যদেবের পরেই আমরা তাঁর কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের বাহন চৈতন্যদেবের মতো ভক্তিমার্গী ধর্ম নয়, তাঁর সৃষ্টি মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য, তবু আমাদের ভাবাবেগ, আমাদের সৌজন্যবোধ, সৌন্দর্যসম্ভোগে রুচি সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতিতে আগ্রহ—সবই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দান।

মহাপ্রভু আর মহাকবি। দুই মহাপুরুষের জীবনেও কী আশ্চর্য মিল। অপূর্ব দেহকান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করেন সেকালের কলকাতা নবদ্বীপে। আর রবির আলোর মতো উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের জন্ম একালের নবদ্বীপ কলকাতায়। দুজনেরই আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে। চৈতন্যদেবের আয়ুষ্কাল ৪৮ বৎসর। তার অর্ধাংশ কেটেছে বাংলাদেশে। বাকি অর্ধাংশ অন্যত্র। ২৪ বছর বয়সে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে পুরী শ্রীক্ষেত্রকে নতুন কর্মক্ষেত্র করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছেন আশী বছর। তিনিও জীবনের ঠিক অর্ধাংশ কলকাতায় কাটিয়ে ঠিক ৪০ বছর বয়সে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করেন শান্তিনিকেতনে। চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনেন তাঁর মহিমান্বিত প্রভাবে। তাঁর জীবন অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বিশাল জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী পায় নূতন প্রেরণা। তাঁর আবির্ভাবের পরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবের সূচনা। ঐশ্বর্যবান বাংলা সাহিত্য সম্ভারের গৌরচন্দ্রিকা সেই সুসময়েই। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় 'চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যৌবন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরে। তিনি নিজে স্রষ্টা, তাছাড়া তাঁকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের সৌরজগৎ। সেকালের বাংলা সাহিত্য যেমন চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত, একালের বাংলা সাহিত্য তেমনি রবিকরোজ্জ্বল। সাহিত্যের পর সংগীত। চৈতন্যদেব আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন দুটি সম্পদ—কীর্তন আর রবীন্দ্রসংগীত। বাঙালী জাতির সবচেয়ে গর্ব এই দুটি জিনিস নিয়ে। দুটিই

বাংলার প্রাণ। তাছাড়া দু'জনেই উপলব্ধি করেছিলেন, সংগীত যেখানে নিঃশেষ, সেখানেই শুরু নৃত্যের। ভাষাহীন সুরহীন নৃত্য-ছন্দ স্বর্গের সুষমা আনে। দু'জনেই যেন বলেছেন 'নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে'। তাই বারবার দেখি মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম করতে করতে ভাবাবেশে নৃত্য শুরু করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও অন্ধ বাউল বা ঠাকুরদার ভূমিকায় নেমে গানের সুরের সঙ্গে মঞ্চে হঠাৎ নৃত্যের ছন্দ তোলেন। নাচকে এমন মর্যাদা চৈতন্যদেব আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দেননি।

চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন পতিত উদ্ধারিতে, নামগান প্রচার করেন সবার অধম সবহারাদের মাঝে। রবীন্দ্রনাথও জন্মগত ভাবে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তবু অনায়াসে ঘোষণা করেন, 'আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন।' দু'জনেই মধুর রসের পথিক, কিন্তু বলিষ্ঠ মতের প্রচারক। দু'জনেই ছিলেন দীর্ঘদেহী গৌরাঙ্গ। দু'জন দুই পথের পথিক হয়েও দুইভাবে বিপ্লবী। এই বিপ্লব প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী না হয়েও সুদূরপ্রসারী। আনন্দময় উৎসবকে দু'জনেই প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনে। তার মধ্যে বসন্তঋতুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দু'জনের। একজন বলেন দোললীলা, অন্যজন বলেন বসন্তোৎসব। দু'জনেরই যিনি উপাস্য, তাঁর বর্ণ শ্যামল। একজনের শ্যামল কৃষ্ণ, অন্যজনের শ্যামল প্রকৃতি।

চৈতন্যদেব তবু শীর্ষে। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং লৌকিক জীবনে তাঁর অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যজীবন এবং তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা যেন শুধু উপনিষদকেন্দ্রিক। উপনিষদ নিশ্চয়ই তাঁর প্রেরণার অন্যতম উৎস, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য যে তাঁকে কতটা প্রেরণা দিয়েছিল, সেই সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, উপনিষদ আর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঋণের কথা। ১৯২১ সালে বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্যের জীবনের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সেই বাল্যকাল থেকে। বিভিন্ন সময়ে তিনি চৈতন্যদেবের জীবনী পরম আগ্রহে বারবার পড়েছেন। ১৯১০ সালে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, 'বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অল্প বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' ১৯৩৬ সালে হেমন্তবালা দেবীকে আর একখানা চিঠিতে লিখেছেন—'প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার

ঘনিষ্ঠ পরিচয়।' তাই আমরা দেখতে পাই প্রেমিক চৈতন্য, বিপ্লবী চৈতন্য, মানবদরদী চৈতন্য এবং বাঙালী জাতির ভাষার ও সাহিত্যের উদ্বোধক চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ এতো শ্রদ্ধাশীল।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আইন অমান্য আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিলের সংগঠন, আপামর জনসাধারণকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নেওয়া, প্রেমধর্মের প্রচার ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর রচনাবলীতে মহাপ্রভু সম্পর্কে মহাকবি লিখছেন—'আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন! তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আপনাপন আহ্নিক তর্পণ ও চন্ডীমন্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কেমন করিয়া বাহির হইল—'মার খেয়েছি। না হয় আরো খাব তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়।'—একথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপনাপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটির মনসা-সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহবান করিল, এবং সে আহবানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল? একজন বাঙালী আসিয়া একদিন বাংলাদেশকেও পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালী একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালীরা সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।'

চৈতন্যদেবের সংগ্রাম ছিল সবরকম ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। তাঁর অস্ত্র ছিল প্রেমধর্ম। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। কাজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল আইন অমান্যের প্রথম নিদর্শন। রাজধর্ম ইসলামের অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রথম বাধা পায় তাঁর হাতে। সাম্য ও ভক্তির মিশ্রণে গঠিত তাঁর প্রেমধর্ম হরিনাম সংকীর্তনের সম্মোহনী শক্তিতে আকৃষ্ট করেছিল সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে পতিত অবহেলিত সমাজের লোকদের। এই বলিষ্ঠ অথচ প্রেমময় ভাববন্যার বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসির কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসির কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ

রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি বলি, তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপনাপন গর্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক কে করে বল।'

প্রেমধর্মের আদর্শনিষ্ঠা এবং তাঁর বহুমুখী আবেদন রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন মুগ্ধ রেখেছিল। 'সমূহ' গ্রন্থের 'দেশহিত' প্রবন্ধ বাংলা দেশের স্বাদেশিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি চৈতন্যদেবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, 'চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কাম জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন, তাহা তাহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে পেমধর্মের আদর্শ ছিল, তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপে নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশংকায় তাহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

চৈতন্যদেব বাঙালী জাতিকে সংযুক্ত করেছিলেন বিশ্বচেতনার সঙ্গে। অখন্ড ভারতবোধ জাগ্রত করার পশ্চাতেও তাঁর দান অনেক। তিনি দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতকে যুক্ত করেছিলেন পূর্ব-ভারতের সঙ্গে। কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নয়, প্রেমধর্মের মাধ্যমে। সাম্য, মৈত্রী ও ভালবাসা ছিল তাঁর প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র। আর একটি মন্ত্র ছিল তাঁর। নামসংকীর্তন। সমবেত কণ্ঠে সংগীতের ধ্বনিতে ভগবদ্ উপাসনার এমন দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাই লেখেন—চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক কণ্ঠবিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব, তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর —অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।'

রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের তিনজনকে সর্বাধিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর রচনাবলীতে। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব ও রামমোহন। বুদ্ধদেবকে তিনি বলেছেন 'নরোত্তম'। চৈতন্যদেবের মূলবাণী তাঁকে শ্রদ্ধাবনত করেছিল। মুক্তবুদ্ধির

জন্য রামমোহনও তাঁর কাছে ছিলেন প্রণম্য। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনায় আচার্যের ভাষণে তিনি এই তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন বারবার। ১৯১১ সালের ১৪ মার্চ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে একটি ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন 'একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন। সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই। আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেছেন। সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই।'

'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতিয়েছিলেন মহাপ্রভু।' তিনি বলেছিলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তপরায়ণঃ।' হরিভক্তির মাধ্যমে তিনি বাঙালীর মনে জাগিয়েছিলেন ভারতবোধ। এই আচারের শাসন থেকে মুক্ত একটি আনন্দময় সমাজের জয়গান বরাবর গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময় সম্পর্কের কথাও তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতায় ও গানে। এই আনন্দময় সমাজ ও প্রেমময় ভগবদ্ভক্তির উদ্গাতা স্বয়ং চৈতন্যদেব। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে এতো বিপুল আকারে, এতো গভীর আবেগে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। বয়স যখন বারো তেরো, তখন থেকেই পদাবলী তাঁর প্রাণ। সেই কারণেই অলস অন্যমনে কিশোর কবি হঠাৎ লিখে ফেলেন, 'গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে'। সেই হঠাৎ রচনা থেকেই সৃষ্টি ভানুসিংহের পদাবলী। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের কবিতা তিনি এমন আত্মস্থ করেছিলেন যে, অনায়াসে ব্রজবুলির মধুর পদ উৎসারিত হয়েছে তাঁর কলম থেকে। যে-দুটি বৈষ্ণব পদে তিনি সুর দিয়েছেন, তাও বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' এবং 'সুন্দর রাধে আওয়ে বনি।' এ দুটি গান তিনি সব সময় গাইতেন। গাইতেন আরো অনেক পদও। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন' পদটি সাহিত্য আলোচনায় বহুবার দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, তার অনুকরণে সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন' এবং সানাই গ্রন্থের 'মানসী' কবিতাটিও লিখেছেন। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনা। তিনি লেখেন—'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।'

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীতে এতো মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর যৌবনেই পদরত্নাবলী সংকলন করেছিলেন। ছিন্নপত্রাবলী বা অন্যান্য চিঠিপত্র পড়লে

জানা যায় বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী ও কীর্তনগানের জন্যে তাঁর কী আগ্রহ। একটি চিঠিতে লিখেছেন—'প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়। এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে, সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।' শিলাইদহ থেকে আর একখানা চিঠিতে দুঃখ করে বলছেন—'বরাবর বৈষ্ণব কবি ও সংস্কৃত বই আনি। এবার আনিনি। সেইজন্যে, ঐ দুটোর আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।'

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা আর একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরো স্পষ্ট—'প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেছে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি।'

পঞ্চভূত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের একটা ব্যাখ্যাও করেছেন, বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—

> সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
> কবির চোখের কাছে
> কোন একটি মেয়ে ছিল,
> ভালোবাসার কুঁড়িধরা তার মন।
> মুখচোরা সেই মেয়ে,
> চোখে কাজলপরা,
> ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
> নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা।
>
> (শ্যামলী, ম.ন)

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ওই একই কথা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে। প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

শুধু ধর্মের ব্যাখ্যা নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ভাষা ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন আলোচনা করেছেন। গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির নাম তাঁর কবিতার পঙক্তিতে প্রবেশ করেছে অনেকবার। বর্ষা প্রেম প্রীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এলেই বৈষ্ণবপদকর্তারা রবীন্দ্রনাথের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হয়েছেন। তাঁর নিজের লেখা গানে তো বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব অজস্র। সখি ওই বুঝি বাঁশি বাজে, ওগো শুন কে বাজায়, এখনো তারে চোখে দেখিনি, বুঝি বেলা বয়ে যায়—উদাহরণ অসংখ্য। আর কীর্তন গান তো ছেয়ে আছে রবীন্দ্র সংগীতের আকাশ। আর কোন সংগীত এতো প্রভাব বিস্তার করেনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে। কীর্তনগানের ভাব নাটকীয়তা এবং কথার গুরুত্ব রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য হয়েছে পরে। সোজাসুজি কীর্তন ভেঙে তিনি যেমন অনেক গান রচনা করেছেন, তেমনি কীর্তনের ছায়ায় রচিত অনেক রবীন্দ্রসংগীত। ওহে জীবনবল্লভ, আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, আমার মন মানে না দিন রজনী, সে আমার গোপন কথা, রোদনভরা এ বসন্ত ইত্যাদি। এগুলিকে বলা হয় রবি-কীর্তন। কীর্তনগান সম্পর্কে ১৯৩৬ সালে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে বলেছেন—

'কীর্তনসংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তারই মধ্যে ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।'

কীর্তনগান ভালো লাগার আর একটি কারণ আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন—'কীর্তনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব-ভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডেমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।'

রবীন্দ্রনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের রসে এমন মজেছিলেন যে, তার পরকীয়াতত্ত্বের স্বরূপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। প্রেমের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে (তীর্থংকর) বলছেন—'পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যে নয়। তার মানেই হচ্ছে পরকীয়া নারী

আমার বাধ্য নয় বলেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্যে বিবাহ যখন বর্বর যুগে স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে, তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে। তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশি হবে। বিবাহে নিজে স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া সাধনের যুগ এসেছে বলেই আশা করি।

লোকসাহিত্য গ্রন্থে পরকীয়া তত্ত্ব নিয়ে কবির বক্তব্য এই রকম—'বৈষ্ণব কাব্য-শাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে, সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মরণ, বিশ্ববিস্মৃতি নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য তাহার বন্ধনহীনতা সমাজসংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই এক বাক্যে নিন্দিত, সেই অসতী কলংকচূড়ার উপরে বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

এ তো গেল পরকীয়াতত্ত্বের দিক। কিন্তু এটাই সব নয়, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর পেয়েছিলেন সর্বজনীন মহান সত্য। তাই 'সাধনা' গ্রন্থে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

The Vaishnava relegion has boldly declared that God has bound Himself to love and in that consist the greatest glory of human existence.'

তাই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে জানান, 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা' এবং বৈষ্ণবধর্মের উদারতার মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়ে বলেন—আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ভালোবাসা যেমন মানুষে মানুষে, তেমনি ভগবানে এবং মানুষেও। বৈষ্ণবদের মতে ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। তিনি আনন্দময় ভগবানরূপে ভক্তের সঙ্গে লীলা করতে ভালোবাসেন। ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি লীলারস আস্বাদনের জন্যে ভগবানেরও প্রয়োজন ভক্তকে। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানের দুটি পংক্তিতে নিবেদন করেছেন সরলতম ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

'তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নিচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'—

তখন মনে হয় 'রাধিকার ভাবমূর্তি' যে মহাপ্রভুর অন্তর, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব যেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই কথাগুলি বলিয়ে নিয়েছেন। কলিযুগের গৌরাঙ্গরূপী অবতার—যিনি কৃষ্ণ এবং রাধিকার যুগল আধার, তাঁর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন 'মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

সেই ইচ্ছারই বিকাশে গৌরাঙ্গ অবতারের আবির্ভাবের কথা ভক্ত বৈষ্ণবের মতো তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন—

'তাইতো প্রভু, যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

মহাপ্রভুর চরণে মহাকবির এই প্রণামে দেবলোক ও নরলোক, ভক্ত ও ভগবান, সেকাল ও একাল বাঁধা পড়ে গেছে। বন্ধনীতে এসে গেছে নবদ্বীপ শান্তিনিকেতন। দুই বিপরীত কোটির জগৎ হয়েও প্রেমের জোয়ারে সব একাকার।

হিসাবের আড়ালে

হিসাবের আড়ালে চাপা পড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্রজীবনের নানা উপকরণ এখন গুছিয়ে গাছিয়ে যত্নে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে। খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পাওয়া গেছে ঠাকুরবাড়ির হিসাবের খাতা। মহর্ষির আমল থেকে তার নাতি রথীন্দ্রনাথ অবধি। খাতার পর খাতা। পাহাড় প্রমাণ। সব খাতায় আছে ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের পাই পয়সার হিসাব। খাজাঞ্চিদের লেখা, কিন্তু পাতায় পাতায় সই দেবেন্দ্রনাথের বা রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ সই করেছেন আর. টি. ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে। এই হিসাবের খাতার মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে অনেক ঘটনা, অনেক তথ্য। তার বেশির ভাগই নতুন। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা, শমীন্দ্রনাথ—সবাই রয়েছেন খাতার পাতার আড়ালে।

যেহেতু আমার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথে, তাই খাতার পাহাড় থেকে মাত্র কয়েকখানি নাড়াচাড়া করেই বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা রবীন্দ্রজীবনীকারদের কাজে লাগবে। তথ্যগুলি পর পর সাজালে বেরিয়ে আসবেন নতুন এক রবীন্দ্রনাথ। শৈশব থেকে বার্ধক্য---নানা সময়ের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ওই হিসাবের মধ্যে। জমাখরচ মারফৎ শিশু রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন, তার জামাকাপড়ের জুতোর মাপ পালটেছে, পড়ার বই পালটেছে, তিনি যুবক হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, পুত্র কন্যার পিতা হয়েছেন, যৌবন ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন এবং অবশেষে বৃদ্ধ হয়ে মহা-প্রয়াণ করেছেন। তিন বছরের শিশু রবীন্দ্রনাথের জন্যে কেনা হয়েছে বারো আনায় এক ডজন ইজের। সেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুবক হয়ে কিনলেন জোব্বা এবং পাগড়ি। তার দাম পড়ল সাড়ে তিন টাকা। সবই তারিখ দিয়ে লেখা।

রবীন্দ্রনাথ কোন্ সময়ে কী বই কিনেছেন, কলকাতায় থাকাকালে কবে কার বাড়ীতে গিয়েছেন তার সাক্ষ্যও বহন করে ওই খাতাগুলো। তার কারণ বইয়ের দাম বা যাতায়াত বাবদ ভাড়া গোমস্তাদের ক্যাশ বইয়ে লিখে রাখতে হয়েছে। কোন্ দরজি তাদের জামা-কাপড় বানাত, বই কেনা হত কোন্ দোকানে, গয়না আসত কোথা থেকে, কার অসুখে কোন্ ডাক্তার এসেছেন, কত ফি নিয়েছেন

—কিছুই বাদ যায় নি খাতা থেকে। খাস চাকর কার কে ছিল, রবীন্দ্রনাথের কোন্ বই কত বিক্রি হয়েছে, জামাই ষষ্ঠীতে কত টাকা খরচ করেছেন, স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ কত—অসংখ্য তথ্যে বোঝাই ওই খাতার পাহাড়।

তাছাড়া আর একটি ব্যাপারেও খাতাগুলি মূল্যবান। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে কোন্ জিনিসের কী দাম ছিল, রেলের ভাড়া, ট্রামের ভাড়া, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া, কী রকম ছিল তার নির্ভুল বিবরণও পাওয়া যায় ওই খাতাতে। শুধু রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাস নয়, সেকালের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসও খানিকটা মেলে হিসাব থেকে।

সবথেকে পুরনো যে খাতা আমি উদ্ধার করতে পেরেছি, সেটি ১২৭১ বাংলা সনের। অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬৪-৬৫ সালের। খাতাখানা দেবেন্দ্রনাথের। উপরে লেখা 'নিজ হিসাবের কেস বহি।' আকার দৈনিক খবরের কাগজের মতো। বিশ্বভারতীর দেওয়া নম্বর ২৫১! এই খাতা থেকে জানা যায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে পেতেন (বিজয় কিসন গোস্বামী ১০ টাকা), শান্তিনিকেতন খাতে যেত মাসে ১৩০ টাকা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার খাতে দশ টাকা।

১২৭১ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে মহর্ষি-কন্যা 'সুকুমারী-সুন্দরীর' নবকুমার হওয়ায় বাটী হইতে আশীর্বাদ বাবদ ষোল টাকা, এবং শ্রীমতী সুকুমারী সুন্দরীর নবকুমার হওয়ার সংবাদ দেওয়া লোকের বকশিস দশ টাকা। ওই তারিখেই রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী অসুস্থ হওয়ায় বাড়িতে ডাক্তার আনা হয়। '—শ্রীমতী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পীড়া হওয়ায় নিলমাধব ডাক্তারকে আনা ও তাঁহার ফিচ—৪ টাকা।'

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী সেকালের নামকরা গাইয়ে, নামকরা সংগীতকার। তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে! '—অজুধ্যানাথ পাকড়াশির সন হালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাহার মাহিয়ানা—১০০ টাকা।' আর যাঁরা যাঁরা কাজ করতেন নায়েব থেকে ফরাস—কে কী পেতেন তাও জানা যায় খাতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' শ্যাম নামক এক চাকরের কথা লিখেছেন, সে ছিল তাঁর নিজস্ব এবং সারা দিনমানের সঙ্গী। কিন্তু তারও আগে যে আরও একজন খাস চাকর ছিল তার উল্লেখ অন্যত্র কোথাও নেই। ওই হিসাবের খাতাতেই দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিন, তখন তিনি ও তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথের জন্যে আলাদা একজন চাকর বরাদ্দ ছিল—যার নাম কালীদাস। তার মাসে মাহিনা সাড়ে তিন টাকা। তখন বাড়ির নাপিত ছিল বংশী—মাসে পেত তিন টাকা, দরজির নাম মোজাফফর খলিফা—মাসে পেত আড়াই টাকা। তাছাড়া জনে জনে চাকর ছাড়াও ছিল তোসাখানার চাকর ঈশ্বর দাস, বোলাকি হরকরা, কিনু সিং হরকরা, কেবল জানকি তুলসি বেহারা, বাটির মধ্যে জলতোলা ভারী, লালদীঘির ও গোয়ালের

জলতোলা ভারী, রসুই ঘরের চাকর, দুধের ঘরের চাকর, বাগানের মালী, বলবন্ত সিং দারোয়ান, মদন সিং দারোয়ান, বাদল ফরাস, বেণী ফরাস, ঝকড়ু বেহারা এবং হারমোনিয়াম বাজানোর চাকর গোপাল দাস—প্রতি মাসে যার বেতন দু' টাকা।

নাপতিনী আসত বাড়ির মেয়েদের পায়ে আলতা পরাতে। মাসে নয়, গোটা বছরে সে পেত দুই টাকা। ধোপার নাম কাশীনাথ—মাস মাহিনা ২০ টাকা। মহম্মদ কোচম্যান, রহমৎ সহিস, শ্রীধর মেথর—কত লোক। সেই সঙ্গে গাইয়ে বিষ্ণু চক্রবর্তীর নামও আছে। তিনি পেতেন ১০ টাকা করে। সারদা দেবীর খাস দাসী প্যারী—যার কথা অনেকবার আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-কথায়। সে মাসমাহিনা পেত এক টাকা। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রতি মাসে বেতন পেতেন ৩৫ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ যে ফরাসী ভাষা শিখতেন তার প্রমাণ 'হেমেন্দ্রনাথবাবুর ফ্রেঞ্চ শিখিবার পড়িবার খরচ ৫০ টাকা'। ১২৭১ সালের ১৫ আষাঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। সেই বাবদ 'হরি এক খরচ ৮২।৯৩ পাই।' ১২৭১ সালের ২২ ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ছোটছেলেদের জন্য প্রথম পড়ার বই আসে প্রথম ভাগ দুইখানা। সারদা দেবীর জন্যে আসে দেড় টাকা দামের আয়না এবং একখানা চৈতন্যচরিতামৃত। রবীন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের জন্য প্রথম পড়ার বই আসে বর্ণপরিচয় ২ খানা, শিশুশিক্ষা ২ খান। তারিখ ১৮৬৫ সালের ৬ জানুআরি তাছাড়া 'সেজোবাবু (হেমেন্দ্রনাথ) মহাশয়ের হুকুমে বাটির জন্য কেতাব খরিদ—ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ খানা, ব্যাকরণ কৌমুদী ১ খানা, ঋজুপাঠ ২ খানা।'

১২৭৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাসোহারা ছিল ৩০০ টাকা। ওই সালের ৪ অগ্রহায়ণ বিয়ে হয় স্বর্ণকুমারীদেবীর। মোট খরচ ৩০০১ টাকা ৮ আনা ৬ পাই। শরৎকুমারী দেবীর সাধভক্ষণ হয় ২৫ চৈত্র। ওই উপলক্ষে শাড়ি কেনা হয় ১৬ টাকা ১০ আনা দিয়ে। রামতনু লাহিড়ীর মেয়ের বিয়ে হয় ২রা ফাল্গুন। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিয়েতে কৃষ্ণনগর যান দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যাতায়াত ও যৌতুকের গিনিবাবদ খরচ হয় ৭৯ টাকা। ১২৭৪ সালের ৪ঠা ফাল্গুন জন্ম হয় গগনেন্দ্রনাথের। গগনেন্দ্রনাথের মুখ দেখে কর্ত্রীঠাকুরাণী সারদা দেবী দেন ৪ টাকা এবং কর্তা মশায় দেবেন্দ্রনাথ দেন ২৬ টাকা ১১ আনা।

জামাকাপড় গয়নাগাটির ব্যাপারে দেখেছি মোজাফফর খলিফার হিসাব—'বড়বাবুজী মহাশয়ের (দ্বিজেন্দ্রনাথ) কাপড় তৈয়ারি ২১ টাকা ২ আনা, শ্রীমতী বড়বধু, মধ্যমবধু, সেজবধু ও সৌদামিনী ঠাকুরাণীদিগের কাপড় তৈয়ারী—১৯ টাকা ১১ আনা, শরৎকুমারী সুন্দরীর কাপড় তৈয়ারী—১৩ টাকা ১১ আনা, স্বর্ণ-কুমারী সুন্দরীর কাপড় তৈয়ারী—১২ টাকা ১ আনা, বিছানা তৈয়ারী—৫ টাকা,

সোমেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র রবীন্দ্রবাবুরদীগের ৭ টাকা ২ আনা। রবীন্দ্রনাথের জন্য ১২ টা ইজের তৈয়ারী বাবদ সেলাই খরচ পড়ে ১৫ আনা। 'বিনামা খরিদ রবীন্দ্রনাথ ১ জোড়া—১২ আনা। বড় বধূ ও মধ্যম বধূর ৯ হাতি ধুতি একজোড়া ২ টাকা ১৪ আনা।' ৯ হাতি ধুতি সম্ভবত গায়ে তেল মাখার ও স্নানের।

তখন সোনার ভরি ছিল সাড়ে এগারো টাকা। নীলমণি স্যাকরা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী সর্বসুন্দরী দেবীর জন্যে ডায়মন্ড কাট গোট তৈরি করে নেয় ২৩৮ টাকা ৮ আনা এবং সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্যে নারকেল ফুল লবঙ্গকলি তৈরি করে নেয় মোট ২২৭ টাকা। স্যাকরা ডেকে গয়না না বানালে সোজাসুজি কেনা হত ইসফানি হিপাতুল্লা অ্যান্ড কোং থেকে। মোজাফফর খলিফার পর আসে ফতেউল্লা দর্জি। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটো পাগড়ি বানান পাঁচ টাকা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে বানান ১২ টা পাজামা ১২ টা পানজাবি!

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রের নাম অরুণেন্দ্রনাথ। তার অন্নপ্রাশন ১৮৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। খরচ হয় ৮২ টাকা ১১ আনা ৯ পাই। সেপ্টেম্বরেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক পার্টি হয়। তার খরচ ৩৯ টাকা ১২ আনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন তার প্রমাণ প্রতি মাসে ১০০ টাকা চাঁদা দেওয়ার হিসাবে। সত্যেন্দ্রনাথকে বিলেতে কত টাকা পাঠানো হত তাও আছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাড়ে তিন, তখন তাঁর জন্য এক ডজন মোজার দাম পড়ে ৩ টাকা ১২ আনা। রবীন্দ্রনাথের ১২ টা ইজেরের দামও ১২ আনা। রবীন্দ্রনাথের জন্য ১২ টি পিরান কেনা হয় ৫ টাকা ৫ আনা ৬ পাই দিয়ে। আর একই দিনে কেনা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বনাতের চাপকান। দাম ৩ টাকা এবং প্যান্ট ১ টা ১ টাকা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরতেন বনাতের মেরজাই। সেলাই বাবদ প্রতিটি পাঁচ আনা হিসাবে ৯টির খরচ পড়ে ২ টাকা ১৩ আনা। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কোর্তা-ঘাগরা পরতেন সেকালে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের দিদি সুকুমারীর জন্যে ১৪টি কোর্তা ১৩ টাকা ৫ আনা ৬ পাই দিয়ে এবং ৭টি ঘাগরা ১১ টাকা ৬ আনা ৯ পাই দিয়ে কেনা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির খরচ, সোমপ্রকাশ পত্রিকা কেনার খরচ, ১৮৬৫ সালের ১০ জানুআরি মঙ্গলবার 'কর্তা মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার শুভাগমন' বাবদ খরচ ১২৩ টাকা ১০ আনা; 'জ্যোতিরিন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতন গমন করেন, এজন্য বস্ত্রাদি পাঠানোর টিনের তোরঙ্গ' ২ টাকা ১২ আনা। শ্রীযুক্ত কর্তাবাবুর মেদিনীপুর যাতায়াতের খরচ ৪০২ টাকা ৩ আনা ৫ পাই।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের বিস্তারিত খরচের বিবরণ আছে ১৮৮৩-৮৪ সালের ক্যাশ বইয়ে। বিয়েতে মোট খরচ হয় ৩২৮৩ টাকা ৩ পাই। বিয়ে উপলক্ষে হীরে

কেনা হয় ১৭১২ টাকা ১ আনায়। হীরে আনতে গাড়িভাড়া লাগে ১ টাকা ৫ আনা। নতুন বৌয়ের জন্যে কাপড় আসে ৭০ টাকা দিয়ে। পৌনে একুশ ভরির দু'গাছি সোনার বালা ৩৬৮ টাকা ৭ আনায় বড়বাজারে বিক্রি করে তার থেকে তৈরি করা হয় আংটি, তাগা ইত্যাদি। কন্যাপক্ষের লোকদের বিদায় প্রণামী দেওয়া হয় ৯৬ টাকা। বউয়ের শাল কেনা হয় ১৭৫ টাকায়, গরদ ৩০ টাকায়। চেলির দাম পড়ে ৭০ টাকা। হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন সম্ভবত ছিলেন পুরোহিত। তাঁকে দক্ষিণা দেওয়া হয় ৮ টাকা। বিয়ে হয় কন্যা-আহ্বানে। তাই রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ির লোকদের কলকাতা আনিয়ে আলাদা বাড়িতে রাখা হয়। শ্বশুর বেণীমাধব রায়ের জন্য বাড়ি ভাড়া দেন কন্যাপক্ষই। তাঁর পথের ও বাসখরচা বাবদ দেওয়া হয় আলাদা [illegible] টাকা।

পরবর্তী ১৮৮৪-১৮৮৫ সালের খাতায় নববধূ মৃণালিনীর লরেটো স্কুলের পড়ার খরচ রয়েছে। বোর্ড ও টিউশন বাবদ মাসিক খরচ হত ১৫ টাকা।

বিশ্বভারতীর মার্কা দেওয়া ২০৬ নম্বর খাতায় রয়েছে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির খরচের হিসাব। মহর্ষি তখন জোড়াসাঁকো ছেড়ে থাকতেন ওখানে। সঙ্গে বিধবা বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী। মহর্ষি যে নিয়মিত অডিকলোন ব্যবহার করতেন, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের ১২ ফাল্গুন পনেরো টাকায় দেড় ডজন ফাইবর্স অডিকলোন কেনা হয়। 'কর্তাবাবু মহাশয়ের জন্য।' ১২৯৪ সালের ৪ পৌষ রবিবার মহর্ষিদেবের নাতি নীতিন্দ্রনাথ হিতেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ ঋতেন্দ্রনাথ রণেন্দ্রনাথ জ্যোৎস্না ঘোষাল—এই ৮ জনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয়। সেই উপলক্ষে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ভুরি-ভোজনের আয়োজন করেন দেবেন্দ্রনাথ। আহারের মোট ব্যয় পাঁচ টাকা পনের আনা।

ওই বাড়িতে নিয়মিত আসত বিয়ার ও পাঁঠার মাংস। না, দেবেন্দ্রনাথের জন্যে নয়। হিসাবে লেখা আছে—'শ্রীযুক্তবাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিয়ার খরিদের মূল্যশোধ ৮ টাকা এবং প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য পাঁঠার মাংস তিন আনা।' এই দু'জন ছিলেন পার্ক-স্ট্রীট বাড়ির নিত্য অতিথি। মহর্ষির জন্যে রোজ রোজ আসত সোডা ওয়াটার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দিবানিদ্রা সেরে তিনি খেতেন। তাছাড়া খুব খেতেন পামরুটি পুডিং আর মোহনভোগ। মোহনভোগ তৈরি হত কাঁচা পেঁপে দিয়ে।

অক্ষয় মজুমদার ও [illegible]চরণ সেন প্রায়ই যেতেন দেবেন্দ্রনাথকে গান শোনাতে। তাঁদের ট্রামভাড়া দেওয়া হত যাতায়াতের।

১২৯৪ সালের ৫ পৌষ কর্তাবাবুর জন্য যেসব জামাকাপড় আসে, তাতে লেখা—'গেরুয়া রংয়ের কাসমেরি কোট ১টা—৬ [illegible] ৮ আনা, সাদা দাস্তানা ১ জোড়া—৪ আনা, ১০ টা নেংটির জন্য জিন কাপড় ৩ গজ—১২ আনা, কামিজের জন্য নয়নসুখ কাপড় দেড় গজ—১২ আনা, একটি চোগা ২টা কোট ৯টা কামিজ অলটার করার মজুরি ৪ আনা হিসাবে।'

সৌদামিনী দেবী বিধবা। ব্রাহ্ম হয়েও একাদশী পালন করতেন নিয়মিত। একটি পাতায় দেখছি লেখা আছে 'বড়দিদি ঠাকুরাণীর একাদশীর ফল ১ আনা ৯ পাই। পেঁপে ১ আনা, পেয়ারা ২ আনা, ফুল ১ আনা, শশা ৬ পাই, শাঁকালু ৬ পাই।

দেবেন্দ্রনাথের এমনি আরও অনেক খাতা রয়েছে। প্রত্যেক খাতাতেই নানা রকম তথ্য। নানাজনের আহার বিহারের মেজাজ মর্জির নানা বিবরণও নানা-ভাবে ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের আমলের খাতাতেও প্রায় তাই। এই সব খাতাতে আবার খরচের হিসাব ভাগ করা ঃ—(১) দান ও সাহায্য (২) মাহিনা (৩) বিদ্যাভ্যাস (৪) বাজে খাতা (৫) গাড়িভাড়া (৬) জিনিস খরিদ (৭) কাপড় খরিদ (৮) অনুষ্ঠান (৯) চিকিৎসা এবং (১০) লৌকিকতা খাতা।

গাড়ি ভাড়া খাতাতেই রয়েছে যাতায়াতের খবর। ১৩০৪ সালের ৯ ফাল্গুনে রবীন্দ্রনাথ যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি গিয়েছিলেন তার হদিস রয়েছে ওই হিসাবে। কেননা সেই বাবদ গাড়ভাড়া লেগেছে আড়াই টাকা। ঠিক তেমনি জানা যায় মৃণালিনী দেবী কেশব সেনের বাড়ি গিয়েছিলেন ১৩০৪ সালের ৩০ ফাল্গুন। মৃণালিনী দেবীর মা যশোর থেকে শেয়ালদা হয়ে জোড়াসাঁকো আসেন ১৯০০ সালের ১৮ জানুআরি। ১৮৯৮ সালের ৯ জুন গৃহশিক্ষক মিঃ লরেন্স বোলপুর যান। এবং যাতায়াত বাবদ খরচ হয় দেড় টাকা। রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন যেতেন নিমতলা ষ্ট্রীটে—তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে। অন্য একটি হিসাবের খাতায় দেখছি তাঁর আট দিনের যাতায়াতের খরচ দেড় টাকা। তাছাড়া কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন বিডন স্ট্রীট, বালিগঞ্জ ও জোড়াগির্জা অঞ্চলে। সাধারণত চড়তেন ট্রাম। মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি। কদাচিৎ পালকি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা প্রায়ই যেতেন বোলপুর। আর যেতেন পুরী। তখন হাওড়া-পুরী তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া চার টাকা চৌদ্দ আনা। ১৯০০ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি যশোর যান রবীন্দ্রনাথ। যশোরের কোথায়? শ্বশুরবাড়িতে? নাকি পূর্বপুরুষের ভিটা দেখতে?

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ক্যাশ বহি অনেকগুলো। ১৩০৭ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দের একখানি বিরাট জাবদা খাতার গোড়াতেই দেখতে পাচ্ছি ১৯০০ সালের ২৭ এপ্রিল শুক্রবার ছোট বধূ ঠাকুরাণী অর্থাৎ মৃণালিনী দেবীকে হাতখরচ বাবদ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ টাকা, 'কণিকা' বই ছাপানোর জন্যে কাগজ কেনা হয়েছে ১৮ টাকা ৮ আনা ৯ পাই দিয়ে, 'কল্পনার জন্যে কাগজ কিনতে হয়েছে ২৭ টাকা ২ আনা ৬ পাইয়ের, ১৯ মে তারিখে খোদ বাবু মহাশয়ের জন্য গরদের সাদা ধুতি একটা ও টুইল চাদর একখানা মূল্যে ২৫ টাকা ১২ আনা, লরেন্স সাহেবের জন্য কটন ড্রিল কুড়ি গজ ৭ টাকা ১৩ আনা, বিলাতী জুতা এক জোড়া ৪ টাকা ১২ আনা, বিডন স্ট্রীট ও বালিগঞ্জ যাতায়াত গাড়ি ভাড়া ৪ টাকা ১০ আনা ৬ পাই, ৫ রোজ ধর্মতলায় যাতায়াতে ১ টাকা ১৩ আনা, ৬ রোজ

বালিগঞ্জ যাতায়াতে ৩ টাকা ২ আনা, দান ও সাহায্য বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত ২ টাকা, দয়ার মা ২ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বই কিনতেন থ্যাকার স্পিংক থেকে, স্টেশনারি জিনিস আনতেন চন্দ্র ব্রাদার্স থেকে। প্রসাধন দ্রব্য আসত বাথগেট থেকে। রবীন্দ্রনাথ গায়ে মাখতেন ভিনোলিয়া সাবান, (দাম ১ টাকা ১৪ আনা।) মাথায় কুন্তলীন। থ্যাকার স্পিংক থেকে ১৯০০ সালের ১২ জুলাই তিনি বই কিনেছেন ১০২ টাকার। ছেলেমেয়েদের জন্য দাঁত মাজার টুথপেস্ট কেনা হত না। আসত দন্তমঞ্জন। রথীন্দ্রনাথের জন্যে ৬ কৌটা দন্তমঞ্জন কেনা হয়েছে ৬ আনা দিয়ে। আর এসেছে তিলের তেল। জামাকাপড় আসত জি. সি. মল্লিকের দোকান থেকে। বাংলা বই আসত সিটি বুক সোসাইটি থেকে। এই দোকান থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বই—আনন্দমঠ দুর্গেশনন্দিনী চন্দ্রশেখর দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি এবং শিশু শিক্ষা প্রথম ভাগ ও চাইল্ডস গ্রামার কিনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদা পাঠিয়েছেন ওখানকার স্কুলের জন্য। বাড়িতে আসত সোমপ্রকাশ ও বীণাবাদিনী পত্রিকা। আসত অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৮৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে অমৃতবাজার পত্রিকার চাঁদা দেওয়া হয়েছে ১০ টাকা। তলায় লেখা ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৮ সালের আগস্ট। ১৯০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল থেকে রবীন্দ্রনাথ আনান লাইব্রেরি অভ ফেমাস লিটারেচার। মাসিক চাঁদা ১০ টাকা।

ঔষধ আসত জুবিলি ফার্মেসি এবং বটকৃষ্ণ পালের দোকান থেকে। অ্যালোপ্যাথ কবিরাজ হোমিওপ্যাথ—তিন রকম ডাক্তারই আসতেন ঠাকুরবাড়িতে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ প্রতাপ মজুমদার, ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জি, ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, ডাঃ ডি. এন. রায়, ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ বসন্তকুমার সেন, ডাঃ অঘোরনাথ ভাদুড়ি, ডাঃ জে. এন. মজুমদার প্রমুখ।

খাওয়া-দাওয়া প্রধানত হত বাড়িতে। মাঝে মাঝে ওরা যেতেন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। পূর্বে বর্ণিত অরুণেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনের পর একবার বড় খাওয়া হয় গ্রেট ইস্টার্ণে। তারপর দেখছি ২৮।১।৯১ তারিখে নাটোরের মহারাজাকে আপ্যায়িত করা হয় ৬১ টাকা ৩ আনা খরচ করে। ১২৭৪ সালের ৬ ফাল্গুনের আর একটি হিসাবে লেখা আছে উইলসন হোটেলের বিল ৫৬ টাকা। তাছাড়া ৩।৭।৯৭ তারিখের খাতায় লেখা আছে লোকেন্দ্র পালিতের জন্য হুইস্কি এক বোতল ২ টাকা ১২ আনা।

রবীন্দ্রনাথের শাশুড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি যশোর ফুলতলা থেকে এসে পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে দেখতে আসতেন মেয়ে মৃণালিনী দেবীকে। ফুলতলা মামার বাড়ি থেকে কবি সন্তানদের জামা কাপড় খাবার-দাবারের পার্সেলও আসত ডাকে। ১৮।২।১৯০০ তারিখে লেখা 'শ্রীমতী

বেলাদেবীর নামে যশোর ফুলতলা হইতে পার্সেল আসার বাড়তি মাশুল ৪ আনা, ভাগ্যিস বাড়তি মাশুল লেগেছিল, তাই মিলল এই তথ্য। ১৯০০ সালের ২৭ জানুআরি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাশুড়ির জন্যে কিনেছেন র‍্যালির থান।

চন্দ্র ব্রাদার্স থেকে রবীন্দ্রনাথ কিনেছেন কাগজ পেন হোলডার ও মাপের ফিতা দোয়াত কুন্তরবৃষ্য তৈল। ছোট খোকাবাবু শমীন্দ্রনাথের জন্য জুতো কিনেছেন ১ টাকা ৯ আনা দিয়ে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' হাজার কপি বাঁধাই বাবদ খরচ হয়েছে মোট ১৪ টাকা ৬ আনা। বিশ্বকোষ পুস্তকের ১৬ বারের চাঁদা দিয়েছেন ২০ টাকা। লৌকিকতা খাতে নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিকের পুত্রের বিবাহের আইবুড়ো ভাতে কিনেছেন বেনারসী জোড় ২২ টাকায়। তারই মাঝখানে বিক্রির জন্যে ২৯ অকটোবর গুরুদাসের দোকানে ক্ষণিকা ২৫ ও কণিকা ২৫ খানা পাঠানোর মুটে ভাড়া লেগেছে এক আনা। মধ্যম কন্যা রেণুকার জন্যে বিলাতী শাড়ী দু জোড়ার দাম পড়েছে ৫ টাকা ৪ আনা, কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর জন্য লং ক্লথ ৭ আনা এবং রবীন্দ্রনাথের দুটি পাগড়ির জন্যে খরচ পড়েছে ৫ টাকা ৮ আনা। শমীন্দ্রনাথের জন্যে এসেছে শ্লেট ও পেন্সিল।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে কেনেন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। দাম পড়ে ১৩ পাউন্ড ১৩ শিলিং—অর্থাৎ ২০৫ টাকা। পরের সালের তেসরা জানুআরির হিসাবে লেখা রথীবাবুর জন্যে নিমের তেল ২ টাকা এবং দন্তমঞ্জন ছয় কৌটা ছয় আনা। সেই বছরই রথীবাবু কৃষ্ণনগরে গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফি দিতে হয় ১০ টাকা। তারিখ ১৯ জানুআরি। অন্য খরচ পড়ে ৪৪ টাকা ১২ আনা ৯ পাই। সেই দিনই রেণুকার অসুখ। হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায় আসেন। তাঁর ফি ৮ টাকা। রথীবাবুর তখন ছিল দুর্বল স্বাস্থ্য, তাই ১৪।২।১৯০৩ তারিখে কডলিভার তেল কেনা হয়েছে সওয়া টাকায়।

তার কিছুদিন পরেই জামাইষষ্ঠী। বড় জামাই শরৎকুমার চক্রবর্তীর কাছে মজঃফরপুরে পাঠানো হয় ১০০ টাকা। সেই দিনই ডোয়ারকিন সন্সে হারমোনিয়াম মেরামতিতে খরচ লাগে ১৫ টাকা। মাধুরীলতা বাজাতেন সেতার ও এসরাজ। ১৮৯৮ সালের ৯ জুন এই দুই যন্ত্রের মেরামতি বাবদ খরচ পড়ে ৪ টাকা।

৩৬৩ নং খাতায় ১৩০৩-১৩০৪ সালের হিসাবে ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের চাঁদা দেওয়া হয়েছে ৬ টাকা। সেই বছরেই কর্তাবাবু মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীমতী ছোট বধূঠাকুরাণীর ৩ জ্যৈষ্ঠ পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত বাবদ খরচ এক টাকা দশ আনা।

১৮৯৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের জন্যে পেশোয়ারী জুতো দু জোড়া কেনা হয়েছে সাড়ে তিন টাকায় এবং সেই দিনই 'রথীন্দ্রবাবু ও বেলা দেবীর চৌরঙ্গীতে তামাসা দেখতে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া দেড় টাকা।' তামাসা দেখবার ব্যয় ১০ টাকা! কী তামাসা? থিয়েটার, না সার্কাস? নাকি অন্য কিছু? তার কয়েক মাস পর ৪ জুন রবীন্দ্রনাথের বালিগঞ্জ বাড়িতে থিয়েটার দেখতে

যাওয়ার গাড়ি ভাড়া ২ টাকা। কী থিয়েটার? তাঁর নিজের লেখা, না অন্য কারও?

বিদ্যাভ্যাস খাতায় রবীন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের জন্য আসত নানা রকম জিনিস। শমীন্দ্রনাথের জন্য ড্রয়িং বুক, নিব ও হ্যাণ্ডেল, রেণুকার জন্য কথামালা, রথীন্দ্রনাথের জন্য ভূ-প্রদক্ষিণ ও ইউরোপের ম্যাপ, মাধুরীলতার জন্য বীণাবাদিনী পত্রিকা, মীরা দেবীর জন্য শিশুশিক্ষা ও পেনি এটলাস। চিত্তরঞ্জন দাসের বোন মৃণালিনী দেবীর সই, নামকরা গাইয়ে অমলা দাসের জন্যে এসরাজ কেনা হয়েছে ৬ টাকা দিয়ে। জুতো কেনা হয়েছে পৌনে দু টাকায়। রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন মিঃ লরেন্স। তাঁর যাবতীয় জিনিসপত্র, জুতো, জামা বিছানা, কেনা হত বারোয়ারি হিসাব থেকে। তার মাস মাইনে ছিল ৫০ টাকা। অন্য গৃহশিক্ষক শিবধন বিদ্যার্ণব এবং জগদানন্দ রায়েরও মাস মাইনে ৫০ টাকা। গান শেখাতেন শ্যামসুন্দর নামে গায়ক।

১৯১৫ সালের সাহায্য খাতায় দেখতে পাচ্ছি ১৬ ফেব্রুয়ারি শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-কে দেওয়া হয়েছে ৪৭ টাকা। অজিতকুমার চক্রবর্তীর কিছু টাকা জমে ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। তার থেকে ১৯২২ সালের ২৮ এপ্রিল দেওয়া হয়েছে ১০০ টাকা। ১৯১৫ সালের ১৮ মার্চ হয় শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব। সেই সময়ে লেখা—২৬ ফাল্গুন তারিখে যে উৎসব হয় সেই সময় ক্রান্তি সিংহের পাগড়ি বাসন্তী রং দ্বারা রঞ্জিত থাকায় ভুলক্রমে তাহা উৎসবের কাপড়জ্ঞানে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, এজন্য তাহার মূল্য দেওয়া হয় আড়াই টাকা।'

১৯২১ সালে হোমরুল লীগে রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের চাঁদা দেন ২০ টাকা। এণ্ডরুজ সাহেব সেবার বৃন্দাবন যান। সেই বাবদ দেওয়া হয় ৫০ টাকা। বিদ্যালয় খাতায় নন্দলাল বসুকে দেওয়া হয় ৫০০ টাকা এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ৪০০ টাকা। বিদ্যালয় চালাতে ধার নেওয়া হয়েছিল দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও নেপালচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। সেই বাবদ সুদ দেওয়া হয় যথাক্রমে ৫৩ টাকা ৫ আনা ৪ পাই, ৩০ টাকা এবং ৭০ টাকা।

শান্তিনিকেতনের ছেলেরা একবার বাঘ শিকার করতে যায়। নেপালী ছাত্র নরভূপ রাই আহত হন বাঘের আঁচড়ে। ১৯১৭ সালের ১২ জুলাই তার অপারেশনের ক্লোরোফর্ম কেনা হয় ২ টাকা ১৪ আনা দিয়ে। মাধুরীলতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চালু করেন মাধুরীলতা বৃত্তি। প্রথম প্রাপক শশধর সিংহ, পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাংবাদিক। বৃত্তির পরিমাণ ২৫ টাকা। ১৯১৯ সালের ডাকঘর নাটকের প্রোগ্রাম ছাপানো হয়। ২৫ টাকা দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৬ টাকা দেওয়া হয় ডাকঘর নাটক অভিনয়ের জন্য।

শশিকুমার হেস নিয়মিত যাতায়াত করতেন ঠাকুরবাড়িতে। ১৮০১ সালে তাঁর আপ্যায়নের জন্য আনা হয় ১ টাকার সন্দেশ। মতিচাঁদ নাখোদার কাছ থেকে

ধার নেওয়া হয় ৪০ হাজার টাকা। শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে তাঁকে সুদ দেওয়া হত। ১৯০১ সালের অক্টোবরে এক মাসের সুদ দেওয়া হয় ২৩৩ টাকা ৫ আনা ৩ পাই। নতুন বাড়ি বিচিত্রা তৈরির খরচও আছে খাতাতে।

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হন ১৯০২ সালে। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে কলকাতা আনা, ডাক্তার নার্স আনা, ওষুধ পথ্য কেনা ইত্যাদি প্রতিদিনের হিসাব থেকে জানা যায়, মৃণালিনী দেবী কীভাবে শেষ শয্যা নেন। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি নষ্ট হয়, তিনি চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে নেন চিরবিদায়।

১৯০২ সালের আগস্টে দেখতে পাচ্ছি ছোট বধূঠাকুরাণীর সংসার খরচ বাবদ ১৮৩ টাকা, অতিথি সেবা বাবদ ১১৫ টাকা ৭ আনা ৬ পাই এবং গাভী ক্রয় বাবদ ১৯ টাকা। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ছোট বধূর ঔষধ ক্রয় ৩ টাকা এবং অজীর্ণের ওষুধ ১২ আনা। সেই মাসেই তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় আসেন। বোলপুর থেকে হাওড়া খরচ পড়ে ৪০ টাকা। হাওড়া থেকে জোড়াসাঁকো ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ২ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।

পরের মাস অক্টোবর। মৃণালিনী দেবীর জন্যে এসেছে সেণ্ট র‍্যাপল ওষুধ ২ টাকায়। তারপর একের পর এক ওষুধ কেনা হচ্ছে দোকান থেকে। ডাঃ ডি. এন. চট্টোপাধ্যায়ের ওষুধের বিলও মেটানো হচ্ছে। একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন মধ্যম কন্যা রেণুকা। তাঁর জন্যেও আসে ওষুধ ও থার্মোমিটার। মৃণালিনী দেবীর জন্যে আসে রেঞ্জার্স ফ্রুট ১ বোতল ১ টাকা দিয়ে। কেনা হয় হোমিওপ্যাথির ওষুধ। ৮ রোজের ৮ পুরিয়ার দাম ৪ আনা। তাছাড়া এ্যালোপ্যাথি ওষুধ আসে বাথগেট থেকে।

ওই মাসেই রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বোলপুরে। কয়েকদিন পর ৩ নবেম্বর আবার টেলিগ্রাম করে তাঁকে আনা হল কলকাতায় মায়ের কাছে। তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর একজন শিক্ষক—শিবধন বিদ্যার্ণব।

নবেম্বর মাসে অবস্থার আরও অবনতি। ওষুধের পরিমাণ বাড়ল, ডাক্তারদের আনাগোনা বাড়ল, বাড়ল রবীন্দ্রনাথের ছোটাছুটি। গোলাপমোহিনী সরকার নামে একজন নার্সকেও আনা হল। ডাক্তার থাকেন বিডন স্ট্রীটে। তাঁর বাড়িতে রোজ যেতেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্বেগ নিয়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে।

১৩ নবেম্বর মৃণালিনী দেবীর ভাইকে টেলিগ্রাম করা হল চলে আসতে। ডাঃ ডি, এন, রায় এবং ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জি আসছেন রোজ। আসছেন ডাঃ জে, এন, মজুমদার। পথ্য হিসাবে আসতে লাগল কমলালেবু ও বার্লি। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি দুটোই চলছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দিচ্ছেন বায়োকেমিক ওষুধ। মৃণালিনী দেবীর মাও অসুস্থা কন্যাকে দেখতে রোজ আসছেন পাথুরিয়াঘাটা থেকে। আসছেন পালকিতে। প্রতি খেপে ভাড়া আট আনা।

মৃণালিনী দেবী আর বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। এল বেড প্যান,

অয়েল ক্লথ। এল এসেন্স অব চিকেন, ওষুধ খাওয়ার পেয়ালা, মেজার গ্লাস। আনা হচ্ছে ভেড়ার দুধ। দারোয়ান রোজ নিয়ে আসে অন্য কোথাও থেকে। ট্রামে চড়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন খাতার পাতা খালি। ১৯০২ সালে ২৩ নবেম্বর মৃণালিনী দেবীর জীবনাবসান। সংসার খরচের জন্যে টাকা যাচ্ছে তাঁর জ্ঞাতি পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে। মৃণালিনী দেবী খাতায় আর নেই।

না, আছেন। আছেন পারলৌকিক ক্রিয়ায়। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিছানা তৈরি হয়েছে ৪১ টাকা ৮ আনায়, জিনিস খরিদ হয়েছে ৯ টাকা ১১ আনা ৬ পাইয়ে। তারপর স্বর্গীয়া ছোট বধূঠাকুরাণীর ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রাত্রে মৃত্যু হওয়ায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় ১ ফর্দ ২৮ টাকা ৬ পাই। শ্রীমতী বেলা দেবীর চতুর্থী শ্রাদ্ধ ও হবিষ্য করেন তাহার ব্যয় ২২ টাকা ১৫ আনা ৩ পাই। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবু মহাশয় শ্রাদ্ধ করেন তাহার ব্যয়—১৪২ টাকা ১২ আনা ৩ পাই। হবিষ্য করার ব্যয় ১৯ টাকা ১ আনা ৬ পাই।'

পুনশ্চ আর একটি সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ মৃতা স্ত্রীর ছবি সযত্নে বাঁধিয়ে আনছেন বাইরে থেকে। তারই একখানা পাঠালেন বড় মেয়ে বেলার কাছে মজঃফরপুরে:—'ঐ ছবি বেলা দেবীর কাছে পাঠানোর পার্সেল ব্যয় ১ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।

তথ্য নীরস, নীরস টাকা আনা পাইয়ের হিসাব। কিন্তু সংখ্যা ছাড়িয়ে হিসাব ছাড়িয়ে সেও অনেক কথা বলে, বলে হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। আমরা চেনা মানুষকে নতুন করে চিনি, তাদের সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হই। ঠাকুরবাড়ির হিসাবখাতার পাহাড়ে কৌতূহল জাগানো এমনি আরও কত তথ্য লুকিয়ে আছে পাতাবন্দী হয়ে।

ছাত্র রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছেন, 'ইস্কুলপালানো ছেলে।' সেই ইস্কুলপালানো ছেলেই পরে ইস্কুল খুলেছিলেন ভুবনখ্যাত ভুবনডাঙার মাঠে। তিনি শুধু তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিলেন না, নিয়মিত শিক্ষকতা করেছেন দিনের পর দিন। ক্লাসে এসে রুটিন মাফিক একসঙ্গে ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত পড়িয়েছেন ছাত্রদের। তাছাড়া শিলাইদহে পুত্রকন্যাদের জন্যে যে-গৃহবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, সেখানে পিতাকে শিক্ষকের ভূমিকা নিতে হয়েছে বারবার। মাস্টারমশাই হিসাবে তাঁর অনন্যতার সাক্ষ্য দিতে পারেন একালে বৃদ্ধ, সেকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা! জীবনস্মৃতির বিবরণ অনুযায়ী বাল্যে তাঁর প্রথম ছাত্ররা হল জোড়াসাঁকো বাড়ির বারান্দার রেলিং। একটি বেত হাতে তাদের সামনে বসে মাস্টারি করতেন। সেই নীরব ক্লাসের উপর ভয়ংকর মাস্টারি চলে বেশ কিছুকাল।

এই শিক্ষক রবীন্দ্রনাথও এককালে ছাত্র ছিলেন। কেমন ছাত্র ছিলেন, তাঁর বিস্তারিত বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন নানা স্মৃতিকথায়। ডিগ্রি না হয় না'ই ছিল, ছাত্র যখন ছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষকও নিশ্চয় ছিলেন অনেকে। তাঁরা কারা? এঁদের সুসংবদ্ধ কোন পরিচয় তালিকা নেই, তবে নানা সূত্রে নানা জনের নাম সংগ্রহ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশ করতে পারেন নি কিংবা আদৌ পরীক্ষা দেন নি। তবু অনেকগুলি বিদ্যালয়ে তাঁকে কিছুদিন করে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়েছে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, ব্রাইটনের পাবলিক স্কুল ও লন্ডন ইউনিভার্সিটি। সবার আগে অবশ্য পাঠ নিতে হয়েছে তাঁদের বাড়ির ঠাকুর দালানের পাঠশালায়। গুরুমশাই ছিলেন মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আনুষ্ঠানিক-ভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়েছিল কিনা জানা নেই, তবে তার জন্যে সর্বপ্রথম কী বই কেনা হয়, সম্প্রতি উদ্ধার করেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এক হিসাবের খাতা থেকে। ওই হিসাবে বিদ্যাভ্যাস খাতা নামে আলাদা একটি অংশ আছে। তাতে ১৮৪৫ সালের ৬ জানুআরির হিসাবে লেখা আছে, দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জন্যে বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষা কেনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স

তখন সাড়ে তিন। পরবর্তীকালের আর একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে "সেজোবাবু (হেমেন্দ্রনাথ) মহাশয়ের হুকুমে বাটির জন্য কেতাব খরিদ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ খানা, ব্যাকরণ কৌমুদী ১ খানা, ঋজুপাঠ ২ খানা।" এই বইগুলিও, অনুমান, রবীন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের জন্যে কেনা। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁর এই ছোট দু' ভাইয়ের পড়াশোনার ভার নিজে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের লেখা 'বোধোদয়' ছিল তাঁর আদিপাঠ্যের অন্যতম।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাপড়ার ইতিহাস শুরু করেছেন এইভাবে—"আমরা তিনটি বালক (দাদা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ও নিজে) একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল।" এই পাঠশালার বিবরণ আছে ছেলেবেলা বইয়ে। —"পাড়াগাঁয়ের আরও একটি ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ওখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়ই। আমিও নিশ্চয় ওখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ-র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোন দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই। তারপরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার —বোধকরি সীসের-ফলকে-খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।"

রবীন্দ্রনাথের আরো মনে পড়েছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নামে একটি বাক্য। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনের এইটিই আদিকবির প্রথম কবিতা।" সেই "আদিকবি" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং "কাব্যগ্রন্থ" বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। কিন্তু এই উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে। বিদ্যাসাগরমশাই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' লেখেন নি, বর্ণ পরিচয়ে আছে 'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে।'

ইংরেজী পড়াতেন আর এক মাস্টারমশাই। প্রথম বই ফার্স্ট বুক। ছেলেবেলায় তার বিবরণ আছে।—"মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথম উঠত হাই তারপর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হত মাস্টারমশাইয়ের অন্য ছাত্র সতীশ সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সেকথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মূর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম।"

এই মাস্টারমশাই সম্ভবত অঘোরবাবু। ছেলেবেলা-র আর এক জায়গাতে আছে—"অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢলঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি, তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।"

এই পোশাকী মাস্টারমশাইরা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আদিশিক্ষা ভৃত্য ও দাসীদের কাছে। তাদের কাছে তিনি শুনেছেন চাণক্য শ্লোক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত। ভৃত্যদের অন্যতম ঈশ্বর ছিল আগে গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই। সন্ধ্যেবেলা রেড়ির তেলের বাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরের কাছে বসে তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী গোগ্রাসে গিলতেন। বাড়ির ভৃত্য-দাসী ছাড়াও গোমস্তা খাজাঞ্চিদের কাছে শুনতেন ছড়া আর রূপকথা। ছড়ার ছন্দ আর রূপকথার কাহিনী গোটা বাল্যকাল তাঁকে উন্মনা করে রেখেছিল। দুই খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যে এবং কিশোরী চাটুজ্জে এই ব্যাপারে ছিলেন দুই প্রধান শিক্ষক। অতি দ্রুত ছড়া এবং দাশুরায়ের পাঁচালি পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তাঁরা আলোড়ন তুলতেন। রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন —"শিশুকালের সাহিত্যরস-ভোগের এই দুটি স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদেয় এলো বান।' ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

বাড়ির পড়াশোনা সাঙ্গ হল "কান্নার জোরে" সরকারীভাবে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সামান্য ইতিহাস আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি জানাচ্ছেন—"একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনও উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিঁকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাত সহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্যে যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে বেশি কাঁদিতে হইবে।' সেই শিক্ষকের নাম-ধাম আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই আমার মনে নাই; কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতোবড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।"

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তিনি ছাত্র ছিলেন অল্পদিন। সেখানকার স্মৃতি

বিশেষ মনে ছিল না। শুধু মনে ছিল একটি শাস্তির কথা—পড়া বলতে না পারলে ছাত্রকে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে তার দুই ছড়নো হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলো স্লেট একসঙ্গে চাপিয়ে দেওয়া হত।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির পর নর্মাল স্কুল। এই স্কুল অনেকটা একালের গুরু-ট্রেনিংয়ের মতো। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংলগ্ন মডেল স্কুলের ছাত্র। তখন তাঁর বয়স সাত কি আট। এই স্কুল শুরু হয় বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়, সংস্কৃত কলেজের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে এই স্কুলের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই স্কুলে শিশুদের মনোরঞ্জনে রোজ একটি ইংরেজি কবিতা গানের সুরে আবৃত্তি করতে হত। রবীন্দ্রনাথের তা ভালো লাগেনি। সেই আবৃত্তির চোটে 'ফুল অভ গ্লী, সিংগিং মেরিলি মেরিলি মেরিলি' বাক্যটি কীভাবে বিকৃত হয়ে উচ্চারণে 'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং, হয়েছিল, তার সরস বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

নর্মাল স্কুল রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সেখানকার সহপাঠী ছাত্রদের সংস্রব তাঁর কাছে "অশুচি ও অপমানজনক।" তাছাড়া শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের কুৎসিত ভাষা তাঁকে পীড়া দিত। ফলে তিনি কোনদিন পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব দেন নি। বার্ষিক পরীক্ষায় কিন্তু তিনি সকলের চেয়ে বেশি নম্বরই পেতেন বাংলাতে। পরীক্ষক ছিলেন মধুসূদন বাচস্পতি। ক্লাস-টিচার হরনাথ পণ্ডিত নালিশ করলেন, পক্ষপাতিত্ব করে বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষায় বসতে হল রবীন্দ্রনাথকে। এবার স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি নিয়ে বসেন। এবারও রবীন্দ্রনাথ ফার্স্ট।

কিন্তু নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের বেশিদিন থাকা হল না। বোধহয় বছর চারেক ছিলেন। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পর্যন্ত পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন ফিরিঙ্গি স্কুল বেঙ্গল একাডেমিতে। নর্মাল স্কুলে শেখানোর চেষ্টা হল বাংলা, বেঙ্গল একাডেমিতে ইংরেজি। তাছাড়া ছিল বাড়িতেই পড়াশোনা। নানা বিদ্যায় তাঁকে পারদর্শী করে তুলতে চাইলেন কয়েকজন গৃহশিক্ষক। সর্বোপরি মাথার উপরে ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিদ্বান করার সব রকম দায়িত্ব নেন। এই সম্পর্কে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার ভিত তৈরি করে দেন হেমেন্দ্রনাথ। তিনিই বুঝেছিলেন বিদেশী-ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রাধান্য দিলে সমূহ বিপদ। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, তাঁর শিক্ষাজীবনে বাংলা বুনিয়াদ গড়ার জন্যে তিনি তাঁর সেজদাদার কাছে ঋণী।

বেঙ্গল একাডেমিও রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একাডেমির ফিরিঙ্গি ছাত্ররা 'দুর্বৃত্ত'। তিনি কোন স্কুলেই সহপাঠীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ঠাকুরবাড়ির পোশাক ভাব ভাষা চালচলন—সব

ছিল আলাদা। অভিজাত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনভিজাত অন্য ছাত্রদের মানসিক দূরত্ব ছিল শতযোজন। তাই রবীন্দ্রনাথ সহপাঠীদের আচরণ আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন নি।

বেঙ্গল একাডেমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ক্লাস কামাই করতেন। ইস্কুলপালানোর শিক্ষা এই একাডেমিতে শুরু। স্কুল কর্তৃপক্ষও নিয়মিত ছাত্রবেতন পেতেন বলে কামাই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। একাডেমির এক বাংলা ছাত্র—নাম হরিশচন্দ্র হালদার—রবীন্দ্রনাথের জীবনে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হালদার হ. চ. হ. নামে পরিচিত ছিলেন এবং ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। বেঙ্গল একাডেমিতে পড়ার সময়ই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় এবং উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করেন। বাইরে থেকে ফিরে আবার কিছুদিন ক্লাস করেন একাডেমিতে। কিন্তু ক্লাসে আর মন টেঁকে না, পালাতে পারলে বাঁচেন।

ইতিমধ্যে ছাত্র রবীন্দ্রনাথ অভিভাবকদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ বালককে উদ্ধার করতে উদ্যোগী হলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতারা। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকা নিলেন শিক্ষকের, রামসর্বস্ব পণ্ডিত সংস্কৃত শেখাতে লাগলেন বাড়িতে। তিনিই সর্বপ্রথম শকুন্তলা নাটকের কাব্যরস উদ্ঘাটন করেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাজনারায়ণ বসুও রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্কুলের পড়ায় বাঁধতে না পেরে সাহিত্যরস পরিবেষণে উদ্যোগী হলেন। ভট্টাচার্য-মশাই কুমারসম্ভব আর ম্যাকবেথ নাটক বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। ঔষধে ফল হল, রবীন্দ্রনাথের সামনে নতুন জগৎ খুলে গেল। রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় এতো উৎসাহিত হলেন যে, সমগ্র কুমারসম্ভব মুখস্ত করে ফেলেন, ম্যাকবেথ পুরো অনুবাদ করে ফেলেন বাংলায়। অন্য গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত। তাঁর ছাত্র ম্যাকবেথ পুরো অনুবাদ করেছেন জেনে পাণ্ডুলিপিসমেত বালক-অনুবাদককে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে হাজির করেন। মেট্রোপলিটন স্কুলের আর একজন শিক্ষক ব্রজনাথ দে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-প্রতিভার খবর পেয়ে গোল্ডস্মিথের ভিকার অভ ওয়েক-ফিল্ড তর্জমা করতে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে উৎসাহিত হন নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭২ সালে বেঙ্গল একাডেমি ছাড়েন এবং ১৮৭৪ সালে ভর্তি হন সেণ্ট জেবিয়ার্স স্কুলে। মাঝের এক বছর নানা বিদ্যায় পারদর্শী হতে থাকেন গৃহবিদ্যালয়ে। কুস্তি সংগীত চিত্রকলা গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি চলল এক সঙ্গে। প্রধান নির্দেশক হেমেন্দ্রনাথ। ভোরবেলা লেঙ্গট পরে হীরাসিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি, তারপর সেই মাটিমাখা শরীরে জামা পরে পড়াশোনা। সকাল ছয়টা

থেকে নয়টা। শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল। পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ ও পদার্থবিদ্যা, রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচার, সাতকড়ি দত্তের প্রাণিবৃত্তান্ত ও মাইকেলের মেঘনাদবধ। তাছাড়া জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোলের বই। বিকেলে ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক শিক্ষক আসতেন শিক্ষাদানে। সন্ধ্যার পর ইংরেজি পড়াতেন অঘোরবাবু এবং সংস্কৃত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। রবিবার সকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা এবং সীতানাথ ঘোষের কাছে যন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞানশিক্ষা। ইংরেজির শিক্ষক অঘোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি একদিন মৃত মানুষের কণ্ঠনালী এনে স্বরযন্ত্রের সমগ্র ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহে যান শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানবিতরণের জন্য। ক্যাম্বেল (বর্তমান নীলরতন) মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র আসতেন অস্থিবিদ্যা শেখাতে। এই কারণে একটি আস্ত নরকঙ্কাল রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। হেরম্ব তর্করত্ন নামে এক পণ্ডিত মুগ্ধবোধ পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলছেন—"অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলো এবং বোপদেবের সূত্র দু'য়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল ঠিক বলিতে পারি না। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।"

ওদিকে অঘোরবাবু প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক ও সেকেন্ডবুকের পর মকলক্‌স কোর্স অভ রীডিং শ্রেণীর একখানা বই রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দেন। বইটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। ডিকেন্সের ওল্ড কিউরিওসিটি শপ পড়ে কিন্তু খুব ভালো লাগল। পিতার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাংলা অক্ষরে ছাপা জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েও তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে কনিষ্ঠপুত্রকে অনুষ্টুপছন্দে বাল্মীকির পুরো রামায়ণ পড়ে শোনান। তাছাড়া হিমালয়যাত্রার সময় পিতা পুত্রকে জ্যোতির্বিদ্যা শেখাতেন, নক্ষত্র চেনাতেন এবং প্রক্টরের 'সরল জ্যোতিষ্ক' বই পড়ান।

১৮৭৪ সালে আবার ইস্কুল। এবার সেন্ট জেবিয়ার্স। সেখানে ছিলেন দুই বছর। স্কুলের প্রগ্রেস রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য ছিল 'ইরেগুলার'। এই স্কুলে তিনি ক্লাসে প্রমোশন পেলেনই না। তবে স্কুলটির কয়েকজন অধ্যাপকের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। যেমন ফাদার ডি পেনেরান্ডা ও ফাদার হেনরি। এঁরা ছিলেন সহৃদয় এবং সত্যিকারের শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ একবার ক্লাসের পরীক্ষা দেবার সময় হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। ক্লাস টিচার পেনেরান্ডা দেখলেন, তাঁর ছাত্রের কলম সরছে না। তিনি এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, "টাগোর, তোমার শরীর কি ভাল নেই?" এই সামান্য একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় পান।

১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ।

মাতৃহীন বালক, তাই বিশেষ প্রশ্রয় পেতে থাকলেন বাবা দাদা ও বৌদিদের কাছে এবং তাঁদের পরোক্ষ সমর্থনেই রবীন্দ্রনাথ অতঃপর স্কুলে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে তখন গান বাজনা অভিনয় ছবি আঁকা সাহিত্য চর্চা, আর স্বাদেশিকতার আবহাওয়া। গণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বদেশী হিন্দুমেলার রেশ তখনও চলছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখছেন স্বপ্নপ্রয়াণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজাচ্ছেন পিয়ানো, গুণেন্দ্রনাথ শুরু করেছেন উদ্যান চর্চা, নাটক লেখা অভিনয় দুই-ই চলছে সমান তালে। রবীন্দ্রনাথ স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে নিজেকে যুক্ত করলেন সেই আবহাওয়ায়। সাকরেদী শুরু হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, রামনারায়ণ তর্করত্ন নিয়মিত আসেন জোড়াসাঁকোয়। তাঁদের সঙ্গে কবি পরিচিত হন। যদুভট্ট এসে শেখান গান। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জন করতে লাগলেন কবি ও গাইয়ে হিসাবে। বাড়ির ভিতরে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর উৎসাহ এবং বাড়ির বাইরে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য রবীন্দ্রনাথকে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম করে তুলল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সামনে খুলে যেতে লাগল নতুন নতুন দিগন্ত। ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার শিলাইদহে গিয়ে শিখে নিলেন সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালনা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো, অভিভাবকদের ইচ্ছে হল তাঁকে বিলেত পাঠানোর। রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিলেন লন্ডন। মাঝখানে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর কর্মস্থল আমেদাবাদে রইলেন কিছুদিন। মেজদাদা স্বয়ং ভার নিলেন ভাইকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের চমৎকার লাইব্রেরী। খোপে খোপে সাজানো বই। রবীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন টেনিসনের কাব্যসংগ্রহ এবং ডাঃ হের্বার্লিনের সংকলিত সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ। তাছাড়া পড়লেন টেন-এর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। শিখলেন মারাঠী ভাষা কিছু কিছু। পড়লেন দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া। আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশে মারাঠী তড়খড়-পরিবারে শিক্ষা নিলেন পাশ্চাত্য সহবতের। তারপর বিলাত। রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে। প্রথম দিনেই স্কুলের প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হোয়াট এ স্‌প্লেন্ডিড হেড ইউ হ্যাভ।' এই স্কুলে সহপাঠী ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। বিদেশী বলে অনেক সময় তাঁর পকেটে কমলালেবু বা আপেল গুঁজে দিয়ে তারা পালিয়ে যেত।

এই পাবলিক স্কুলে রবীন্দ্রনাথ বেশি দিন পড়েন নি। তারকনাথ পালিত স্কুল থেকে সরিয়ে এনে লন্ডনে এক বাড়িতে একলা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দেন। বাড়িটি রিজেন্ট পার্কের কাছে। এই বাড়িতেই একজন শিক্ষক এসে রবীন্দ্রনাথকে লাতিন ভাষা শেখাতেন। কিন্তু লাতিন ব্যাকরণে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না। তারপর মিঃ বার্কার নামক একজন শিক্ষকের কাছে তিনি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা

শুরু করেন। প্রসঙ্গচ্ছলে উল্লেখ করছি, রবীন্দ্রনাথ পরে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখেন।

তারপর লণ্ডন ইউনিভার্সিটি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ মাস তিনেক পড়াশোনা করেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিত। ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরীতে দুই বন্ধুতে পড়তে যেতেন। কিন্তু পড়াশোনার বদলে আড্ডা হত বেশি। তবে ইংরেজী সাহিত্য ও বাংলা শব্দতত্ত্ব নিয়ে দু'জনে আলোচনাও হত প্রচুর। বিলাতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীত ও পাশ্চাত্য নৃত্যচর্চা করে দুটি বিষয়েই পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইংরাজির অধ্যাপক হেনরি মর্লি শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেন। মর্লির অধ্যাপনা-রীতি তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করায়। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে রাণী চন্দকে তিনি ১৯৪১ সালের ১৭ এপ্রিল বলেছেন—"হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নতুন ধরনের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য-বিষয় তিনি ক্লাসে এমনভাবে আবৃত্তি করে যেতেন, যাতে করে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তার আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন, তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তার পরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোন কষ্ট হত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি। তিনি আর একটা করতেন—সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল।" এই মর্লিই রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার প্রশংসা করেন। এবং রচনাটি তিনি ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিষয় ছিল ইংরেজদের নিন্দা। রবীন্দ্রনাথের মনে ভয় ছিল, না জানি মর্লি কী বলেন। হঠাৎ একদিন বন্ধু লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের পিঠ চাপড়ে বলেন, ওহে তোমার জয় জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।" রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে পরে বলেছেন, "সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি।"

কিন্তু এত সত্ত্বেও তবু গ্র্যাজুয়েট হওয়া রবীন্দ্রনাথের কপালে ছিল না। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার বিলেত যাত্রা করেন ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে। কিন্তু এমনই কপাল, সেবার বিলেত যাওয়াই হল না। বিলেতের পথে মাদ্রাজ

থেকেই ফিরে এলেন। ব্যারিস্টার হওয়াও জীবনে ঘটল না। ভাগ্যিস ঘটে নি, নইলে আমরা হয়ত আর একজন আশু চৌধুরী বা তারক পালিত পেতাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না।

ছাত্র জীবনের এইখানেই ইতি। ভিত আগেভাগেই তৈরি, ধীরে ধীরে নির্মিত হতে থাকলো রবীন্দ্রপ্রতিভা-সৌধ। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করলেন।

কবির স্বপ্নপ্রয়াণ

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য লেখেন, সারা জোড়াসাঁকোর বাড়ি স্বপ্নপ্রয়াণের পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল।—"বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।" কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনও অনেকটা ওই স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের মতো। জীবনভর তিনি বহু স্বপ্ন দেখেছেন ;—তার অনেকটাই বাস্তব হয়েছে, বাকিটা বসন্তের ঝরেপড়া আমের বোলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে অকালে। সাহিত্যের জন্য, দেশের জন্য, মানুষের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ যে-স্বপ্ন দেখেছেন কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। বহুক্ষেত্রেই তা পারে নি। এই না-পারার বেদনা থেকেই জন্ম হয়েছে নতুন সৃষ্টির। স্বপ্নবিলাসী নন, তিনি ছিলেন স্বপ্নাভিসারী।

এই অভিসার তাঁর সারা জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডে এবং বাল্য থেকে বার্ধক্যের রচনায় প্রবাহিত। সেই কারণেই তাঁর অবিরাম যাওয়া-আসা ছিল অতীতে আর ভবিষ্যতে। আবার কখনো-কখনো অতীত আর ভবিষ্যতকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন বর্তমানে এবং মেলাতে না-পারায় মাঝে মাঝে স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেছে।

স্বপ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু আলোচনাও করেছেন। রাণী চন্দকে তিনি ১৯৪১ সালের ২৫ মে (দ্রঃ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ) মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেন—

"স্বপ্ন বলে একটা পদার্থ আছে, বারবার মানুষ সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। আমার হাতেই তা আছে যা পাইনি। শিল্পী তুলি নিয়ে বসল, আপন অন্তরের যা রূপ ফুটিয়ে তুলল। যা বিধাতা পারেননি, আমার হাতে ভার ছিল, তাই দেখিয়েছি। বাস্তবে আছে দারিদ্র্য দুঃখ অন্যায়, আছে মলিনতা। সেটার জায়গা হচ্ছে সমাজনীতিতে, সাহিত্যে নয়।...শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র আলাদা। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, তাঁরা মহাপ্রাণ। মানুষের দুঃখ, মানুষের দারিদ্র্য ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখে দূর করা যায় না—ত্রৈমাসিক বার্ষিকী বের করে দূর করা যায় না— চাই কাজ, কোমর বেঁধে কাজে লাগা চাই।...স্বপ্ন মানুষের যেখানে,

সেখানে সে কবি : সেখানে সে সাহিত্যিক। সাহিত্য ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি যেখানে সাহিত্যিক সেখানে ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছি। সে আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি ইতিহাস উত্তীর্ণ হয়েছি বলেই আমি রবীন্দ্রনাথ। আমি একক বলেই আমি কবি।"

কিন্তু এতো গেল স্বপ্নের ভাবের দিক। আক্ষরিক অর্থেও স্বপ্ন ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার একটা অংশ জুড়ে রয়েছে। বারবার তিনি স্বপন পারের ডাক শুনেছেন, আহবান করেছেন স্বপ্নস্বরূপিণীকে, বিহবল রাতে পেয়েছেন মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস, মায়ালোকের ছায়া তরণী ভাসিয়েছেন স্বপন পারাবারে এবং দূর-রজনীর স্বপন নূতনের হাসিতে মিশিয়ে স্বর্গের কৌতুক-মেলায় স্বপ্নের সাথীর সঙ্গে মেতে উঠেছেন। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন চলেছে বারবার এবং ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে বাণী ধ্বনিয়া উঠেছে স্বপ্নে। কারণ তিনি কেবলই স্বপন-বপন করেছেন এবং স্বপনতরীর নেয়েকে ডাক দিয়ে বলেছেন, আমি স্বপনে রয়েছি ভোর।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিজীবনের শুরু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ দিয়ে আবার অন্তিমে শেষ লেখায় বলেছেন, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন অমৃত সমান স্বপ্নমঙ্গলের কথা, হিং টিং ছট কবিতায়। কল্পনায় তিনি স্বপ্নে চলে গিয়েছেন দূরে বহু দূরে, উজ্জয়িনীতে এবং কলকাতার কিম্ভুতকিমাকার চেহারা সম্পর্কে বলেছেন : একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিনু। স্বপ্ন-সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাও অনেক রকম। কখনো বলেছেন,

> স্বপ্ন আমার জোনাকী
> দীপ্ত প্রাণের মণিকা
> স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
> উড়িছে আলোর পাখা ;

কখনো বলেছেন,

> ঘুমের আঁধার কোটরের তলে
> স্বপ্ন পাখির বাসা
> কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের
> খসে পড়া ভাঙা বাসা

এবং সর্বশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—

> জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
> স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

কবিতায় ও গানেও স্বপ্নের বাহুল্য যে-কোনো রবীন্দ্ররচনানুরাগীই আবিষ্কার করতে পারবেন। বিশেষ ক'রে প্রেমের গানে অঙ্গেঅঙ্গে স্বপ্নের বাঁশি বেজেছে। তাই তিনি বলেন, 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' কিংবা 'আধেক ঘুমে নয়নচুমে

স্বপন দিয়ে যায়।' কিন্তু সৃষ্টির দিক ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবন নামক একটি বস্তু আছে। সেখানে প্রত্যেকে রক্তমাংসের মানুষ। চেতনার সঙ্গে মিশে আছে অবচেতন মন। বাস্তবের সঙ্গে মিশে আছে স্বপ্ন। এমন মানুষ কেউ নেই, যে কোনোদিন স্বপ্ন দেখেনি। আহার-নিদ্রাদির মতো স্বপ্ন প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র দিকের পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু তিনি কী স্বপ্ন দেখতেন, তার বিবরণ বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের দেখা স্বপ্নের সন্ধানে ঘুরছি অনেকদিন। সন্ধানকার্য ব্যর্থ হয়নি। তাঁর চিঠিপত্র এবং অন্যের রবীন্দ্রস্মৃতি-কথায় কিছু স্বপ্নের হদিস মিলেছে। রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁর জীবনে যে-বৈশিষ্ট্য, তা তাঁর দেখা স্বপ্নেও থাকার কথা। এই স্বপ্ন থেকে এক নতুন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর মা প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু স্বপ্নে তিনি মাকে প্রায়ই দেখতেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্যের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত একটি স্বপ্নের কথা বলেন। এই স্বপ্ন তাঁর মাকে নিয়ে। তিনি বলেন, "আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, 'তুমি এসেছ।' এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।"

১৮৯০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বিলেত যাওয়ার পথে ম্যাসালিয়া জাহাজ থেকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠি লেখেন, তাতে এক স্বপ্নের উল্লেখ আছে। প্রথম সন্তান মাধুরীলতা—ডাক নাম বেলা। রবীন্দ্রনাথ আদর ক'রে ডাকেন বেলি। প্রবাসে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে এই বেলির কথা। সেই জন্যই তাঁকে তিনি স্বপ্নেও দেখেন। স্ত্রীকে তিনি লিখছেন—"কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম। সে যেন স্টিমারে এসেছে। তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্ছে সে আর কী বলব। দেশে ফেরবার সময় বাচ্চাদের জন্যে কী রকম জিনিস নিয়ে যাব বল দেখি।"

স্ত্রীকে তিনি জানান আর একটি স্বপ্নের কথা। তাও চিঠিতে ১৯০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে শিলাইদহে লিখছেন—"কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ এবং কী সব নিয়ে

আমাকে বকছ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখলেই হয়। সংসারে জাগ্রত অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে। আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলে আর তো পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালে মনটা কী রকম খারাপ হয়ে গেল।"

ছিন্নপত্রে ইন্দিরা দেবীচৌধুরীকে চিঠিতে তিনি এক স্বপ্নের কথা বলেছেন। ১৯১১ সালের জুন মাসে সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাড়িঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কান্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে পার্ক স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখলুম সেণ্ট জেবিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু-হু করে বেড়ে উঠছে। সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তারপরে ক্রমে জানতে পারলুম একদল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এইরকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে। তাদের দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা। সরু গোঁফ, গোটা দশ-বারো দাড়ি মুখের এদিকে-ওদিকে খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো ক'রে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন। তাঁরা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কী আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তারপরে কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙেচুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কী করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল। বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখেশুনে মনে হল এসব শয়তানী কান্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা দেখছেন ব্যাপারটা। আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্র মনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব। কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব—সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল। এত দেশ থাকতে জেসুয়িটদের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?"

১৯১২ সালে আমেরিকার আর্বানা থেকে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে এক চিঠি লেখেন। তাতেও একটি স্বপ্নের কথা আছে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা স্বপ্নের মতো উদ্ভট নয়। একেবারে বিপরীত মধুর স্বপ্ন। সেদিনটা ছিল সাতই পৌষ। দূরে আমেরিকায় থেকে নিশ্চয়ই তাঁর বারবার মনে পড়ছিল শান্তিনিকেতনের কথা, সাতই পৌষের সকালের মন্দিরের কথা। তাই ছয়ই পৌষ রাত্রে তিনি স্বপ্নে চলে যান শান্তিনিকেতন। সেদিন তিনি ছিলেন অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। সেই ব্যথা নিয়ে রাত্রে ঘুমোতে গেলেন। পাশের ঘরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। সাতই পৌষ ভোরে ঘুম থেকে জেগে অজিত চক্রবর্তীকে তিনি জানান স্বপ্নটির কথা—"কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম তোমাদের সকাল-কার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, কিন্তু কেউ জানে না। তুমি তখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী।' আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মত যাচ্ছি। তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব। তোমরা কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি। জেগে উঠে ঐ গানটা আমার মনে স্পষ্ট বাজতে লাগল। হায়রে, এদেশে কি তেমন সকাল হয় না? সেই অমৃতের অধিকারের মধ্যে জেগে উঠবার গান এখানকার আকাশে কি ঠিক সুরে বেজে উঠতে চায় না?…সেই স্বপ্নে যখন ভোরের রাগিণীতে শুনলুম 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী', তখন আমার মনে হল আমি যেন একেবারে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছি। ডাঙা থেকে আমার ডাক আসছে—সেই ডাঙা যেখানে সূর্যের আলো আকাশভরা, যেখানে মাঠ মিশে গেছে নীলের কোলে, যেখানে পুজোর ফুল ফুটে ঝরে পড়েছে, যেখানে উদাস হাওয়া খ্যাপার মত বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেছে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুকে করে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলোয়, আকাশ কপালে চুমো খায়—সমস্ত যেখানে বুকের কাছাকাছি—জগৎ যেখানে বন্ধুর মত গলাগলি করে।"

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায়। ১১ সেপ্টেম্বর বালি দ্বীপ থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন—"সেদিন বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীর মুখে আমাকে এককোণে ডেকে নিয়ে বললে, ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই। কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা ক্রনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা। শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বললুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্তব্য আলোচনা করতে লাগলুম। ডাক্তারটি বাঙালী। কিন্তু তাকে চিনি নে। জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয়ত হাঁপানি এবার বেশি প্রবল

হয়েছে, তাই এই রকম স্বপ্ন দেখলুম। যাইহোক এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবছি ফিরে গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব। আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে।"

আর একটি স্বপ্ন। সাজাদপুরে দেখা। ১৮৯২ সালের ২ জুলাইয়ের। পরদিন তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—"কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেফটেনেন্ট গভর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গাইছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন। একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এ রকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। বাইরে থেকে তাঁর সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল। পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুলুকের লেফটেনেন্ট গভর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই।"

রাণী চন্দের আলাপচারি রবীন্দ্রনাথে ১৯৪১ সালের ৫ জুন রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা বলেছেন।—"কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম। সূর্যলোকে ঝড় উঠেছে। সে অবর্ণনীয়। দাউ দাউ করে চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা। গেলুম গেলুম রব। একটা যেন প্রলয় কাণ্ড, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নরকের এমন একটা বীভৎস রূপ, সে কল্পনায়ও দেখা যায় না। হয়ত সেদিন শীগগীরই আসছে। আমি আগে থাকতেই দেখে নিলুম।"

আর একটি স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন রাণী চন্দ। আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ বইয়ে। ১৯৪১ সালের ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কাল একটা র‍্যাশনাল স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সব—কী যেন কার ছেলে মারা গেছে—মানত করেছে দেবতার কাছে—যদি দয়া করে ইত্যাদি। আমি বললুম, কেন এই সব হাতজোড় করে দেবতার উপর ভক্তি দেখিয়ে তাঁকে অপমান করো। প্রকৃতির নিয়ম সব। 'দেবতা' 'দেবতা' বলে চিৎকার করা হয় বৃথা, তারা নিস্পৃহ। মানুষের

দুঃখ মানুষই দূর করতে পারে—এই সব বলে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ শুনলে না। রাত্রিবেলা নাস্তিকতা করার সুবিধে আছে।"

নয়টি স্বপ্ন উপহার দেওয়া হ'ল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আশী বছরের জীবনে তিনি ওই ক'টি মাত্র স্বপ্ন দেখেছেন। নিশ্চয়ই তালিকা বৃহৎ, কিন্তু তার রেকর্ড নেই, যে-নয়টি স্বপ্ন উল্লেখ করা হ'ল নয়টিই বিচিত্র ধরনের। কোনোটি উদ্ভট—অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ। মজার ব্যাপার এই, উল্লেখিত দুটি উদ্ভট স্বপ্নে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রন'থ উপস্থিত। কোনোটি আবার বড় মধুর। যেমন মায়ের স্বপ্ন। যেমন সাতই পৌষের স্বপ্ন।

এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ এই সব স্বপ্নকে কোনো গুরুত্ব দিতেন কিনা। দিতেন। তার প্রমাণ আছে। ১৯২৭ সালে বালীদ্বীপ থেকে প্রতিমা দেবীকে এক স্বপ্নের কথা লিখেছিলেন। তারই জের টেনে ১৯৩৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, "রথী, বৌমার জন্যে এতদিন আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। মনে পড়ল অনেক দিন আগে স্বপ্নে দেখেছিলুম, কে একজন বললে, ওঁর ব্যামো হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, পদ্মার চরে গিয়ে থাকলে সেরে যাবে। স্বপ্নটাকে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী।"

স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথকে আরো নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কিছু কাহিনীও তিনি পেয়েছেন স্বপ্নে। যেমন রাজর্ষি। বইয়ের সূচনায় তিনি বলেছেন, "এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।" স্বপ্নটা এই রকম—"রাজনারায়ণবাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরোনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না। ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলাম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম, একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বারবার করুণস্বরে বলতে লাগল, 'বাবা এত রক্ত কেন!' বাপ কোনমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়। মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'দেবী'। প্রভাতকুমার নিজেই বলেছেন, তার আখ্যানভাগ তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং গল্পটি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে পান। প্রভাতকুমার প্রমুখ কয়েকজন শিষ্যবন্ধুর কাছে তিনি স্বপ্নে-পাওয়া ওই কাহিনীর কথা বলেন। শোনামাত্র কাহিনীটি প্রভাতকুমার নিজে লিখবেন ব'লে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

স্বপ্নে-পাওয়া গল্প রবীন্দ্রনাথের আরো আছে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তিনি নিজেই রাজর্ষি-প্রসঙ্গে বলেছেন—"স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।"

বিপ্লবের কবি

রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য, এখনো তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি নাকি যথেষ্ট পরিমাণ স্বদেশসেবা করেন নি, তিনি নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বিশ্ব-মৈত্রীর জয়ঢাক পিটিয়েছেন, তিনি নাকি দেশপ্রেমের বাণী দিয়ে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে অপরিচিত ব্যক্তিদের মুখেই এমন অসত্য উক্তি শোভা পায়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে রচনা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের আরো দুর্ভাগ্য, জন্মসূত্রে ধনীর সন্তান বলে তিনি বুর্জোয়া কবি হিসাবেই চিহ্নিত রইলেন একালের বিপ্লবীদের কাছে। যাঁরা তাঁর মূর্তির শিরশ্ছেদ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর বহ্ন্যুৎসব করেন, তাঁরা একটিবার ওই ছিন্ন দগ্ধ রচনার কিয়দংশ স্থিরবুদ্ধিতে পড়ে দেখলে জানতে পারতেন তাঁদেরই মনের কথা রবীন্দ্রনাথ নামক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা কবি কত স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন। আর কেউ নয়, 'দিনবদলের পালার' জয়গান তাঁর মুখেই শোনা গিয়েছে প্রথম, তিনিই তো দামামা বাজিয়েছেন বিপ্লবের মশাল হাতে নিয়ে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত হানা জরদ্গব সমাজের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে নতুন সমাজ গড়ার কথা এখনো তো কোন সাহিত্যিক তাঁর মত বলতে পারেন নি। বাঁধ ভেঙে দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের শুকনো গাঙে জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক আনতে তিনিই ধ্বনি দিয়েছেন। উচ্চকণ্ঠে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন সেই মন্ত্র—'ভাঙনের জয়গান গাও।' ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালার নির্দেশও তো তাঁর।

অথচ কিছু বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ এবং সঞ্চয়িতা-গীতবিতানের মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অপরিচিতই থেকে গেলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর রাজপ্রাসাদে আমাদের প্রবেশ খিড়কি দুয়ার দিয়ে, সম্মুখের সিংহদ্বারগুলি যেন অর্গলবদ্ধ। অনর্গল হলেও সাধারণত সেদিকে আমরা প্রবেশের চেষ্টা করি না। ফলে ওই সুবিশাল সুবিন্যস্ত রাজপুরীর খণ্ডমাত্র দেখে তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে বসি। আমরা না পড়ি তাঁর শেষবেলাকার কবিতা, না পড়ি প্রবন্ধ, না পড়ি তাৎপর্যপূর্ণ সব নাটক। ভগবান, প্রকৃতি আর যৎকিঞ্চিৎ প্রেমে মাখা কিছু কবিতা আর গান এবং কথা ও কাহিনী বেশির ভাগ পাঠকের রবীন্দ্র-চর্চার সম্বল। এই খণ্ডচিত্র একালে কবিমনীষীর স্বরূপ উদ্ধারে বরাবর বাধার সৃষ্টি

করে এসেছে। সোনার তরী কল্পনা খেয়া গীতাঞ্জলি বলাকার কবি শেষ জীবনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়ে হতাশায় ও বিক্ষোভে কীভাবে জর্জরিত হয়েছেন, তার খবর আমরা রাখি না। রবীন্দ্রনাথের বাইরে ঋষিপ্রতিম সৌম্য মূর্তিটাই আমরা কেবল দেখেছি, তাঁর বিপ্লবী দৃপ্ত মূর্তি আজো অপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই থাকেন একজন সদানন্দময় পুরুষ—যিনি কখনো ঠাকুরদা, কখনো দাদাঠাকুর, কখনো ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁদের হাতে বাউলের একতারা থাকলে কী হবে, আলখাল্লার ভিতর লুকিয়ে থাকে তরবারি। এই সব চরিত্রে সর্বদা অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। মুক্তধারা বা পরিত্রাণে ধনঞ্জয় বৈরাগী আইন অমান্যের নেতৃত্ব দেন এবং অচলায়তনে দাদাঠাকুর উপস্থিত হন যোদ্ধার বেশে। তাঁর সঙ্গীরাও অস্ত্রধারী। তাঁরা মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছ দল। ব্রাহ্মণ উপাচার্যদের গুরু এই দাদাঠাকুর অন্ত্যজ দর্ভকদের গোসাঁই। তিনি অচলায়তনের দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নতুন সৌধ গড়েন। লাল পতাকা ওড়ে তাঁর হাতে। ফাল্গুনী নাটকে নবযৌবনের চিৎকার করে বলে,

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে সকল অনাসৃষ্টি,
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনি দৃষ্টি।'

তাদের খেলা বড় অদ্ভুত, তারা বলে, 'খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা এবং তাদের যে সর্দার তাঁর আচার-আচরণ সুখী নিশ্চিন্ত সমাজের পক্ষে ভয়ানক। তিনি বলেন 'আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি এই আমার সর্দারি।'

একালের কিছু রাজনৈতিক নেতা যখন আমাদের সংকট থেকে সংকটে নিয়ে যান, তখন আমরা শঙ্কিত হই, কিন্তু নবযৌবনের দলের সর্দারকে সমস্যা নিষ্পত্তির ভার না নিলেও যে চলে, একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলে গিয়েছেন। কোন মার্কামারা ইজমের চর্চা না করেও 'বাঁশরি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ পিনাকে টংকার লাগান এবং বলতে পারেন 'লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার।' তাসের দেশ নাটকে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন 'অশান্তি মন্ত্র' এবং জীর্ণ পুরাতনকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বাধ্যতামূলক আইনের বিরুধে জেহাদ ওই তাসের দেশ নাটকেই, 'চলবেনা চলবেনা' স্লোগানও ওই নাটকেই প্রথম। জড় পুরাতনকে চুরমার করার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছেন তাসের দেশে আসা রাজপুত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই সব বিদ্রোহী বিপ্লবীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন যাঁরা কায়েমী স্বার্থের দুর্গ ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

তাই তিনি তপোভঙ্গ কবিতায় বলেন—

বিদ্রোহী নবীন বীর
স্থবিরের শাসন-নাশন,

বারে বারে দেখা দিবে,—
আমি রচি তারি সিংহাসন
তারি সম্ভাষণ।

যাঁরা বঞ্চিত, যাঁরা অত্যাচারিত, তাঁদের জন্যে শুধু দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের হাতেই নেতৃত্ব দেবার কথা বার বার বলে গিয়েছেন। 'রথের রশি' নাটকে জগন্নাথের রথ চলেনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের টানে, চলেনি ক্ষত্রিয় রাজার টানে, চলেনি বৈশ্য শ্রেষ্ঠীর টানে। অবশেষে চলল ব্রাত্য অন্ত্যজ শূদ্রদের সম্মিলিত শক্তিতে। এই জগৎ চালনার ভার এখন তাদের হাতেই। কিন্তু কায়েমী স্বার্থ এবং রক্ষণশীলতার প্রতিনিধিরা তাতে বিস্মিত। সত্যদ্রষ্টা কবি এসে বলেন, ঠিকই হয়েছে, যার পরে ভর দিয়ে চলছে এই জগৎ সংসার, যারা বলরামের চেলা, তাদের কব্জির জোরেই তো গতি আসবে। তারপর—

একদিন ওরা ভাবলে
রথী কেউ নেই,
রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই
শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল
লাঙল চরকা তাঁতের—

শূদ্র অন্ত্যজদের হাতে দ্রুত ছুটে চলা রথটি দেখে পুরোহিতরা বিস্মিত। শঙ্কিতও। যদি কোন দুর্দৈব ঘটে, যদি আগুন লাগে। কবি তখন বলেন—

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিকে যায় তাই নিয়ে
সৃষ্টি হয় নবযুগের।

যুগাবসানের প্রলয়ঙ্কর দিকটা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ অবহিত। পুরাতনকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে কিংবা জলে ভাসিয়ে দিতে তিনি পরাঙ্মুখ নন। তাই বলেন ঃ

হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের ঘরে
আনবে নূতন খেতে
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে
কী যাবে কী রইবে।

তবে রবীন্দ্রনাথ. অগ্রবর্তী অন্য জায়গায়। তরুণ জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত নন। কেননা তিনি জানেন, নূতন পাওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার অসম্ভব নয়। হঠাৎ হাতে আসা স্বাধীনতাকে তাই বাঁধতে হয় সংযমের শাসনে। বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় গঠন। তখন হতে হয় স্থিতধী। সেই কারণেই অচলায়তন নাটকে দাদাঠাকুর ছটফটে শোন-পাংশুদের বসতে শেখাতে চান, বলেন, 'ওরা স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে। কিন্তু জানে না স্থির হয়ে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়।' এবং সবশেষে বিপ্লবের রক্ত-পতাকা আকাশে ওড়ানোর পর দাদা-ঠাকুরের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নতুন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে। লাগো তোমাদের কাজে।'

ভাঙনের পর গঠন। কাজ। নইলে বিপ্লব কিসের? তাই 'রথের রশি' নাটকে কবি বলেন, শূদ্রদের হাতে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটেচলা রথ নতুন-পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দে উদ্দাম। এই বিপ্লবী গতিকে সংহত না করলে পরে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তখনই প্রয়োজন কবির। কবি মানেন ছন্দ। ছন্দ মানেই শৃঙ্খলা। হলধরের মাতলামিতে জগতটা যাতে টলমলিয়ে না যায়, তার জন্য ডাকতে হয় কবিকে। কবি বলেন—'গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।' তারপর!

> তারপর কোন এক যুগে
> কোন একদিন
> আসবে উল্টো রথের পালা।
> তখন আবার নতুন যুগের
> উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই বোঝাপড়া চলছে যুগে যুগে। যুগাবসান হয় বিপ্লবে। সেই বিপ্লবের ধ্বজা তুলে ধরে নির্মম নির্ভীক তরুণের দল। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি অপমানিতের বঞ্চিতের সমব্যথী, একমাত্র তিনিই সহজ মনে সত্যকে স্বীকার করে নেন। যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নূতন যুগের ভোর দূর থেকেই দেখেছিলেন, জেনেছিলেন একদিন না একদিন হাজার কণ্ঠের ধ্বনি নির্ঝরে ঘোষিত হবে ইহলোক জয়ের সংকল্প এবং তখন দেখা যাবে 'মৃত্যু বিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।'

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পে

শৈশব থেকে বার্ধক্য—শোক রবীন্দ্রনাথের সদা-সহচর। নিজে ছিলেন দীর্ঘায়ু কিন্তু একের পর এক মৃত্যু তাঁর সারা জীবনে ছায়া ফেলেছে। সেই জন্যেই তাঁর রচনাবলীতে মৃত্যু নিয়ে এত কবিতা এতো গান। বিদায় নেবার আগে দুঃখের আঁধার রাত্রি বারেবারে আসা সত্ত্বেও নিজের জীবনে তিনি দেখেছেন মৃত্যুর নিপুণ শিল্প আঁধারে বিকীর্ণ। শোকের আঘাত কবির সৃষ্টিকে দিয়েছে নতুন মহিমা, তাঁকে শিখিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মহামন্ত্র। তাই একমাত্র তিনিই অনায়াসে বলতে পারেন, 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে, যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিন, মারা যান তাঁর ছোট ভাই বুধেন্দ্রনাথ। কিন্তু সে শোকের স্মৃতির কোন উল্লেখ নেই। জননী সারদাদেবীর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ। সেই দুঃখের দিনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম, তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।' সেই তাঁর প্রথম বড় আঘাত এবং এই আঘাতের জের চলল জীবনজুড়ে।

তাঁর বিয়ের দিনেই মারা গেলেন বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি থাকতেন শ্বশুরালয় ঠাকুরবাড়িতেই। বিয়ের কয়েক মাস পরেই তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে হল স্থায়ী পরিচয়। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হলেন উদ্‌ভ্রান্ত। পত্নী মৃণালিনী দেবী বিদায় নিলেন যখন কবির বয়স একচল্লিশ। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার মৃত্যু পরের বছর। ১৯০৫ সালে পিতৃদেব মহর্ষির মহাপ্রয়াণ। ১৯০৭ সালে প্রাণাধিক কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু। তারপরও চলেছে প্রিয়জনের মৃত্যুর মিছিল। জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতা, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। পুত্রোপম ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে। সর্বশেষে নিজের মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর এক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সালে আর এক বাইশে শ্রাবণে বিদেশে মৃত্যু ঘটে একমাত্র দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের।

কিন্তু এতো গেল পারিবারিক শোক। বাইরে আরো অনেক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেছে। কত বন্ধুবান্ধব, কত প্রিয়জন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিষ্যদের মধ্যে কবির জীবদ্দশাতেই মারা যান শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন দত্ত, সতীশ রায়, অজিত চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ এন্ডরুজ পিয়ার্সন, সন্তোষ মজুমদার, সুকুমার রায়। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, অনাত্মীয় কয়েকজন গুণগ্রাহীর শেষ শয্যার শিয়রে গিয়েও তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে জীবনের নানা সময়ে। মৃত্যুর পূর্বে শেষ দর্শনের ইচ্ছা পূরণ করতে বারবার অনাত্মীয় মুমূর্ষুর কাছে যেতে হয়েছে পৃথিবীতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই। ব্যক্তিগত শোকের উপর সহ্য করতে হয়েছে অন্য শোক। মৃত্যুকালে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী বা অন্য কোন প্রিয়জনকে দেখতে চাওয়ার ঘটনা রয়েছে প্রায় প্রতি পরিবারেই, কিন্তু পিতা নয়, পুত্র নয়, এমনকি কুলগুরুও নয়, সাহিত্য-গুরু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাওয়ার মধ্যে অসাধারণত্ব আছে। মৃত্যুকালে কবি দর্শন-প্রার্থী এই রকম তিনজন বিখ্যাত বাঙালী আছেন।—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুকুমার রায় ও রজনীকান্ত সেন।

অবশ্য তার আগে বিলাতে সম্পূর্ণ এক অপরিচিতার রোগশয্যায় শোকবিলাপের এক 'প্রহসন' করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে—সতেরো বছর বয়সে প্রথমবার বিলাতে থাকার সময় ভারতের এক ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিধবা স্ত্রীকে একটি ইংরেজি বিলাপ গান বেহাগ রাগে অনবরত শোনাতে হত। বেহাগ রাগের সংযোজন স্বামীশোকাতুরার পরামর্শেই। নিতান্ত ভালো মানুষের মত রবীন্দ্রনাথ ভদ্রমহিলার অনুরোধ রক্ষা করেন। তবে এটাই শেষ নয়। একদিন ওই মহিলাটির জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে শহরতলিতে তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যেতে বাধ্য হন। সেই রাত্রি নানা দুর্ভোগে ওই বাড়িতে কাটানোর পর সকালবেলা ভদ্রমহিলা সেই বেহাগ রাগের ইংরেজি বিলাপ আর একজন মৃত্যুপথযাত্রিণীকে শোনানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ ভালোমানুষের মতো নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হলেন এই অতিরিক্ত আবদারে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে লিখছেন—'আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, 'যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ. শয্যাগত। তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।' সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, 'ওই ঘরে তিনি আছেন।" আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ রাগিণীতে গাহিলাম। তাহার পর রোগিণীর কী অবস্থা হইল, সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পারি নাই।'

এতো গেল পরিহাসের দিক। অন্য তিনজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি

ছিল পরম সান্ত্বনার। ১৯১০ সালে কবি রজনীকান্ত সেন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মৃত্যু যখন অবধারিত ও আশু হয়ে উঠল, তাঁর বাসনা হল রবীন্দ্রনাথকে দেখবার। রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান কান্তকবিকে দেখতে। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে রোগের যন্ত্রণায় কাতর রজনীকান্ত আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রিয় বই 'রাজা ও রাণী' নাটক থেকে ক্ষীণকণ্ঠে পড়ে শোনান একটি অংশ—

……………এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদে রোগীর যন্ত্রণা কমে যায়। বড় তৃপ্ত হন রজনীকান্ত, তাঁর শেষবেলাকার ডাকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দ্রুত সাড়া দেবেন তিনি ভাবতেই পারেননি। প্রণামের পর রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিতেই তিনি লেখেন একটি গান—

'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব করিতে চুর।'

গানটি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ফিরেই রজনীকান্তকে এক দীর্ঘ চিঠি দেন। তিনি বলেন, 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনো মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। …শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিস্যাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে। মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর প্রাক্‌কালেও বারবার রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি উচ্চারণ করেন, মনে মনে প্রণাম জানান কবিগুরুর চরণে।

রবীন্দ্রনাথকে সামনা-সামনি শেষ প্রণাম জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুজনের বয়সের ব্যবধান খুব বেশি নয়, তবু

রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই একনিষ্ঠ আদর্শবাদী সাহিত্যসেবীর প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ছাড়েন ১৯১৯ সালে। তার কিছুদিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর লোকান্তরিত হন। মৃত্যু আসন্ন জেনে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে, অনুরোধ করেন একটিবার তাঁর শেষশয্যার পার্শ্বে আসতে। তিনি বলেন 'আমি উত্থানশক্তি রহিত। আপনার পায়ের ধুলো চাই।'

সংবাদ শোনা মাত্র রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসেন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। তখন প্রভাতকাল। রবীন্দ্রনাথকে দেখে রামেন্দ্রসুন্দেরর উৎফুল্ল মুহূর্তে রোগযন্ত্রণার কষ্ট মুখ থেকে দূর হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে বিছানার পাশে বসিয়ে তিনি অনুরোধ করেন, জ্বলন্ত দেশপ্রেমের স্বাক্ষরনা ইটহুড ত্যাগের সেই চিঠিখানা যেন তাঁকে একটিবার পড়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা আনিয়ে তাঁর দৃপ্ত অথচ স্নিগ্ধ কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দরকে শোনান। শুনে রামেন্দ্রসুন্দর তৃপ্ত, মুগ্ধ। এই তাঁর জীবনের শেষ শ্রবণ।

বিদায় নেবার আগে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "আপনার পদধুলি চাই। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাতে অপারগ। আপনার শ্রীচরণ আমার মাথার কাছে এগিয়ে দিন।" রবীন্দ্রনাথ পা এগিয়ে দিলেন এবং প্রণাম জানিয়ে কৃতার্থ হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই তাঁর শেষ প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ চলে যেতেই তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন। সেই নিদ্রাই হল মহানিদ্রা। রবীন্দ্রনাথকে শেষ দেখার পর পৃথিবীর আর কোন কিছুর দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি। এই তাঁর শেষ দর্শন।

১৯২৩ সাল। দুরন্ত কালাজ্বর রোগে আক্রান্ত সুকুমার রায়। বাঁচার আর কোন আশা নেই। তিনি শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্ত্রী সুপ্রভা দেবীর কাছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথ এলেন। যেমন এসেছিলেন প্রিয়শিষ্য এই সুকুমারের বিবাহ সভায়। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতেই মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে শয়ান রোগী আনন্দিত। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। কিন্তু সুকুমার অতৃপ্ত। আবার ফরমাস করলেন, 'দুঃখ এ নয়, সুখ নয়গো, গভীর শান্তি এ যে' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। একবার নয়, দুবার। সারা ঘরে ধ্বনিত হল—'এত কালের ভয়ভাবনা কোথায় যে যায় সরে, ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে।' সুকুমার রায়ের হৃদয়ও ভরে উঠল। সুকুমার রায় প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার অবসান এবং কিছুদিন পরেই জীবনাবসান।

রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, "জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে। যে কোন মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে

সুস্পষ্ট করে তোলেন। অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমার পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি, এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্য দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

মৃত্যুর সঙ্গে বার বার মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অমৃতলোকের কথা বলে নিজেও সান্ত্বনা পেয়েছেন। দীর্ঘজীবনে বহু মৃত্যুশোক অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কিন্তু তিনি আঘাতে ভেঙে পড়েন নি কোনদিন। এমনকি ব্যক্তিগত শোককে সামাজিক শোক করার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন। ১৯৩২ সালে জার্মানিতে কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র এবং তাঁর একমাত্র দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পেঁছিলে পূর্ব নির্দিষ্ট বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়ার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করে দেন। বর্ষামঙ্গল যথারীতি হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন। আবার ১৯২৯ সালে জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ এলে তিনি 'তপতী' নাটকের রিহার্সেল বন্ধ করে দেন। তারপরই এই মৃত্যু উপলক্ষে 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি তৎক্ষণাৎ লিখে তপতী নাটকের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই গানে তিনি বলেন, 'মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।' —একথা শোকে অবিচল, দুঃখে অকাতর রবীন্দ্রনাথেরই।

দুর্ভাগা রবীন্দ্রনাথ

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র দুই শতাব্দীর লোক। তাঁর আশী বছরের জীবনের অর্ধাংশ কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। বাকি অর্ধাংশ বিংশে। রামমোহন ছাড়া সেকালের কীর্তিমান বাঙালীদের—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রামকৃষ্ণদেব, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের তিনি দেখেছেন। প্রায় সমসাময়িক সব খ্যাতিমান—বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যদুনাথ সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অথবা পরিচিত। উত্তরসূরী কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র বসু, শিশির ভাদুড়ি, ফজলুল হক, নজরুল ইসলাম, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র এবং আরো অসংখ্য লোক পেয়েছেন তাঁর স্নেহ। তাছাড়া রবীন্দ্র পরিমণ্ডলীর ভিতর যাঁরা ছিলেন, যেমন সত্যেন্দ্র দত্ত, অমল হোম, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রভাত মুখার্জি—তাঁদের কথা তো স্বতন্ত্র।

এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান। বিচিত্র সব প্রতিভাধরের সঙ্গে পরিচয় তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বিচারে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেউ। অল্প দু-চারজন ব্যতিক্রম যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেন, বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরী বা সমসাময়িক সকলেই কেমন যেন নীরব কিংবা নির্মম।

যেমন ধরুন, ডি. এল. রায়ের কথা। সমবয়সী দুই কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছেন। তাঁর সব রচনার তিনি গুণগ্রাহী। এমন কি দ্বিজেন্দ্রবিষয়ক যে বইয়ে রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত শ্রাদ্ধ করা হয়েছে, সেখানেও তিনি ভূমিকা লিখে দেন বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। তার পরিবর্তে ডি. এল. রায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। চিত্তরঞ্জন দাশকে রবীন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, নিজের বাড়িতে এনে তাঁর প্রিয় লুচি-মাংস খাওয়াতেন। আর সেই চিত্তরঞ্জনই ভাড়াটে লেখক লাগিয়ে তাঁর নারায়ণ কাগজে রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন।

সুরেশ সমাজপতিকে স্নেহবশত তিনি বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ও গবেষণা দান করে দিয়েছিলেন। আর সেই সমাজপতিই রবীন্দ্রনাথকে হেনস্থা করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবিতা লিখেছেন, তাঁর পণ্ডিচেরি আশ্রমে গিয়েছেন, আরো অনেক শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন। কিন্তু অরবিন্দ ওগুলি প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করেছেন, প্রতিদানে কিছু দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। অন্যে পরে কা কথা, জগদীশচন্দ্র বসু বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা যদুনাথ সরকার—এই তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত শ্রদ্ধাশীল, কত আন্তরিক। কিন্তু ওই তিন বন্ধু তো ততটা নন!

জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁর কত চেষ্টা। কিন্তু জগদীশ বসু মশাই প্রতিদানে কোথায় কী করেছেন বা কী বলেছেন জানা যায় না।

যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বই উৎসর্গ করেছেন, সর্বত্র তাঁর জয় ঘোষণা করেছেন, অথচ যদুনাথ সরকার পরে রবীন্দ্রবিরোধীর দলেই যোগ দিয়েছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল তো প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রপরবর্তী বহু প্রতিষ্ঠিত বাঙালীরও একমাত্র পবিত্র কর্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা করা। এখনো সেই ধারা সমাজে চলেছে। হয় নিন্দা, নয় অস্বীকার।

অস্বীকারে আপত্তি নেই, কিন্তু নিন্দা কেন? তাঁর অপরাধ?

রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনা সম্ভারের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা বা স্নেহ জানিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ বা সপ্রশংস মন্তব্য। এই তালিকায় আছেন বিদেশের শেকসপীয়ারও। আছেন দেশবিদেশের সব গুণিজ্ঞানী। কারো সম্পর্কে তিনি লিখেছেন বিরাট প্রবন্ধ, কারো সম্পর্কে লিখেছেন কবিতা। শ্রীঅরবিন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামকৃষ্ণদেব, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর কবিতা তো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেষ জীবনে চরম দারিদ্র্যের মুখে পড়েন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তাঁর সীমিত আয় থেকে প্রতি মাসে অর্থ সাহায্য করে হেমচন্দ্রের সংসার খরচ মেটাতেন। তবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের একটি প্রশংসা বাক্যও উচ্চারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তো এমন কিছু খারাপ লেখেন নি, এমন কিছু মন্দ মানুষও নন, তবু বিখ্যাত বাঙালীর অনেকেই এতো নিষ্ঠুর এতো শীতল কেন? নাকি এর পিছনে আছে পরশ্রীকাতরতা, আছে ঈর্ষা, আছে অহম্মন্যতা?

তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার নিজের একটি নালিশও আছে। পূর্বসূরী, স্নেহভাজন সামসাময়িক উত্তরসূরী,বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কত লোক সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পৌত্র সম্পর্কেও তাঁর লেখনী মুখর। একমাত্র ব্যতিকম সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী প্রিন্স দ্বারকানাথ। পৌত্রসুলভ দু-একটি পরিহাস ছাড়া তিনি তাঁর পিতামহ সম্পর্কে আদৌ কিছু লেখেন নি বা বলেন নি। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচনায় তিনি মুক্তহস্ত। সেটা স্বাভাবিক। অথচ বিচিত্র প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী দ্বারকানাথ সম্পর্কে তাঁর নীরবতা অস্বাভাবিক ও অরাবীন্দ্রিক।

নতুন দাদার সঙ্গে

সহস্রাধিক রেখাচিত্র, শতাধিক সংগীত, অর্ধশতাধিক গ্রন্থ এবং একটি পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখনো বঙ্গবাসীর কাছে বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ শুধু তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা নয়, জীবনের সায়াহ্নে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনও। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং প্রাণবান এই সুদর্শন গুণধর কেন শেষ জীবনে রাঁচির মোরাবাদী শৈলে অগস্ত্যযাত্রা করলেন, কেন তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের সহচর, প্রিয়তম কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আজও তা জিজ্ঞাসু গবেষকদের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর। একদিকে বীরভূমের শান্তি-নিকেতন, অন্যদিকে রাঁচির শান্তিধাম—দুই 'শান্তি'র মাঝখানে ভৌগোলিক দূরত্ব যত অল্পই হোক না কেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ তালিকায় রাঁচি নামক মনোরম ভূখণ্ড কখনো স্থান পায়নি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—অধ্যাপক সিলভা লেভিকে নিয়ে রাঁচি যাওয়ার। কিন্তু তা'ও পরে হয়ে ওঠেনি। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে কতবার তিনি গিয়েছেন শান্তিনিকেতন, কিন্তু তারপর একবারও এই আশ্রম তাঁর প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তিরূপে ধরা দেয়নি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সবচেয়ে আনন্দিত হওয়ার কথা যাঁর, সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি অভিনন্দন বার্তা পর্যন্ত পাঠাননি। পারিবারিক কলহ? খ্যাতির ঈর্ষা? কাদম্বরীদেবীর আত্মহত্যা? না, কোন কারণই দুই ভ্রাতার চারিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ১৯১২ সালে কলকাতার কয়েকজন সাহিত্যিক যখন রাঁচিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান, প্রথম দর্শনেই তিনি আচমকা বলে ওঠেন, 'আপনারা আমাকে রবি ভাবেননি তো?'—এই অসতর্ক উক্তির মধ্যে ঈর্ষার বীজ লুকিয়ে থাকার ইঙ্গিত কেউ কেউ করলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের সঙ্গে এই রিপুটির সম্পর্ক আদৌ স্থাপন করা যায় না। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বেলায়। তাছাড়া তিনিই তো কথাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রা অসুস্থতাহেতু স্থগিত হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং মৃত্যুর আগে রবিকে দেখার জন্যে দিনরাত ছটফট

করেন। শোনা যায়, শেষ দেখার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রাঁচিতে আহ্বান জানান চিঠিতে। কিন্তু সে চিঠি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয় না। নইলে জ্যোতিদাদার শেষ ডাকে তিনি কখনই নীরব থাকতে পারতেন না।

এই জ্যোতিদাদাই তো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সব। বয়সের ব্যবধান বারো বছরের, কিন্তু মনের দিক থেকে দুইজনের কোন ব্যবধান ছিলো না। অযাচিত প্রেম ও অকৃপণ প্রশ্রয় তিনি পান এই সর্ববিদ্যাপারঙ্গম সর্বজনপ্রিয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। চিত্রে সংগীতে নাট্যে অভিনয়ে সাহিত্য রচনায় ভাষা শিক্ষায় ব্যবসায়ে সংগঠনে স্বাদেশিকতায় এই অসাধারণ রূপবান মানুষটি সহজ প্রতিভার দীপ্তিতে ঠাকুরবাড়ি জ্যোতির্ময় ক'রে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন, তা'হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম। সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'তো, কিন্তু, আমার মতো একেবারেই হ'তো না।' তাই প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের উৎসর্গে তিনি লেখেন, 'ভাই জ্যোতিদাদা, ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চোদ্দ, তখন থেকেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছায়াসঙ্গী। "সরোজিনী" নাটকের প্রুফ পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয় উপসংহারে একটি সংগীত থাকা দরকার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে পিয়ানোয় আঙুলের ঝড় তোলেন, আর রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুতের চমক লাগিয়ে মুখে মুখে সুরের কথা জোগান—'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরান সঁপিবে বিধবাবালা।' কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিস্ময়কর পারদর্শিতায় মুগ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, 'সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় চৌধুরী রবি ও আমি।' ওই সময়ের সুখস্মৃতিচারণা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি ক'রে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।'

এইভাবেই তৈরি হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের শেষ গান 'আয় তবে সহচরী', তৈরি হয়েছে বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ার গান এবং এইভাবেই আরো অন্তত কুড়ি পঁচিশটি রবীন্দ্রসংগীতের জ্যোতিরিন্দ্র-সুর চাপা

পড়ে আছে স্বরবিতানের পাতায়। দুই ভাই মিলে শুরু করেছিলেন সংগীতদ্রোহিতা। হিন্দুস্থানি বৈঠকী গানের গৎ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বিলিতি সুরে, তৈরি হয়েছে স্কচভ্ পালী কিংবা ইতালিয়ান-ঝিঁঝিট। গানের পর গান, পালার পর পালা। এই গানের ঝরনাতলাতেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসংগীত। জন্ম নিয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত এবং মারাঠি সাহিত্যে সুপণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি, আর সেই ধারায় নিত্য স্নান ক'রে নতুন রসের সন্ধান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ছবি আঁকা আর অভিনয়ও চলেছে সমান তালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের নাটক মানময়ীতে ইন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়ায় দশরথ, রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটকে নটী। প্রতি নাটকের কনসার্ট দলে হারমোনিয়াম বাজাতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাছাড়া সমান দক্ষতায় বাজাতে পারতেন বেহালা, সেতার এবং অতি অবশ্যই পিয়ানো। সংগীত সাহিত্য চিত্রকলা ও অভিনয় চর্চার ষোলকলা পূর্ণ হ'লো কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শুভবিবাহের পর। ছিলেন দুই, হলেন তিন, মধ্যমণি রইলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

১৮৪৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যখন জন্ম, তখনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দানসাগর যজ্ঞের জোয়ারে প্রিন্স দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রচুর বৈভব এবং প্রচুরতর বিলাসের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশব কাটে। ঐশ্বর্যবান ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে রূপবান এই বালকের আদি শিক্ষা বাড়ির ঠাকুরদালানের পাঠশালায়। সেই সঙ্গে চলে হীরা সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিক্ষা মুগুর-ভাঁজা, এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে সংগীত চর্চা। কুস্তি এবং সংগীতের পাশাপাশি চলে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া এবং বন্দুক চালনা। চিত্রাংকন-বিদ্যার হাতেখড়িও সেই সময়ে। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল একটি পিয়ানো। সেটি নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি আয়ত্ত করেন কটি বিলিতি বাদ্যযন্ত্রের যাবতীয় কলাকৌশল। বেহালা আর হারমোনিয়াম বাজানোতেও হাত পাকালেন অল্প বয়সে। ঠাকুরদালানের পাঠশালা থেকে তিনি গেলেন সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে। তারপর মন্টেজ একাডেমি ও হিন্দু একাডেমি। অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেখানে তাঁর সহপাঠী কবি নবীনচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তের উদ্বোধন ঘটান যেমন নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিকাশ ঘটে আই. সি. এস. মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। প্রবাসী সত্যেন্দ্রনাথের ডাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনো যান বোম্বাই, কখনো পুনা, কখনো কারোয়ার। সেখানে তাঁকে নানাবিদ্যায় কুশলী করতে সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নিজে এবং বন্ধু মনমোহন ঘোষ ভাইকে শেখান ফরাসি ভাষা, মারাঠী পণ্ডিত রাখা হয় মারাঠী ভাষা শেখাতে এবং একজন গুজরাটি ওস্তাদ নিয়মিত শেখান সেতার। অবনীন্দ্রনাথের জ্যাঠামশাই গণেন্দ্র-

-নাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

১১.৫.৬৭ঃ জ্যোতি আমার নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু জ্যোতি পারিবে কি না জানি না।

২.৬.৬৭ঃ জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪.৯.৬৭ জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত চর্চা নিয়ে চমৎকার একটি ছড়া বাঁধেন। সেই সময়—

বেহালা কী মিঠে অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটিতে শুনায়
পিয়ানো ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং
সেতার গুণগুণায়।

মহারাষ্ট্র-প্রবাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে ভিত্তি তৈরীর কাল। মলিয়ের, গতিয়ের, কালিদাস, শেক্সপিয়ার, তুকারাম থেকে এতো অনুবাদ এবং সংগীতে ও চিত্রাঙ্কনে এতো বৈচিত্র্য সত্যেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্ব না থাকলে এতো অনায়াসে হ'তো না। তাছাড়া সংগঠন শক্তির শিক্ষাও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার তালিকা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিপুল। তিনি ছিলেন আদি ব্রহ্ম সমাজের সম্পাদক, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সারস্বত সমাজের ও ভারত সংগীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারণের জন্য সঞ্জীবনী সভার পৃষ্ঠপোষক। 'ভারতী' পত্রিকা তাঁরই সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নামে সম্পাদক। যাবতীয় পরিকল্পনা ও কাজকর্মের ভার ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে। কল্পনা বালক সাধনা এবং ভারতীতে তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। প্রথম হিন্দু মেলায় পড়েন উদ্বোধন ন্মক কবিতা, দৃপ্তকন্ঠে সভাস্থলে বলেন—জাগ জাগ জাগ সব ভারত সন্তান, মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান। হাটখোলায় পাটের আড়ত খুলেছিলেন তিনি, শিলাইদহে শুরু করেছিলেন নীলের চাষ। তাছাড়া বরিশালে স্বদেশী স্টিমার চালাতে গিয়ে হন সর্বস্বান্ত। বিলিতি কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে যাত্রী ভাড়া কমাতে কমাতে অবশেষে যাত্রী আকর্ষণের জন্য ভাড়া নেওয়ার বদলে মাথাপিছু টাকা দেওয়া শুরু হ'ল তখনই ধ'রে নেওয়া হয়েছিল এই স্টিমার কোম্পানিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বনাশ ঘটাবে। স্বদেশিয়ানা দেখানোর জন্যে বাড়িতেই তিনি দেশী তাঁতে খোলেন এবং সেই তাঁতে প্রস্তুত নৈকষ্য স্বদেশী একমাত্র গামছা মাথায় বেঁধে তিনি আনন্দে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। শোলার টুপি ও পাগড়ি লাগানো এবং পাজামা-ধুতির মিশ্রণে তৈরি স্বদেশী পোশাকও তাঁর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলেছেন 'জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন। আত্মীয় এবং বান্ধব,

দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত। তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।'

নাট্যরচনা, রঙ্গালয় স্থাপন ও অভিনয়—এই তিনদিকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা প্রসারিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা এবং অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ। দুজনে ছিলেন হরিহর আত্মা। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর গুণীভাইদের নিয়ে যে-কবিতা রচনা করেন, তাতেও গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশাপাশি—

তাতে যেথা সত্য হেম মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। সেখানে অভিনীত হয়েছে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, নাটুকে রামনারায়ণের নব নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী, পুরুবিক্রম, এমন কর্ম আর করব না ইত্যাদি। প্রত্যেকটি নাটকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরুষ বা নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। 'অলীকবাবু' চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক দেখেই নিয়মিত দর্শক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন, 'এরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ যদি নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।' শুধু নাটক প্রচার নয় সংগীত প্রচারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন সংগীতবিষয়ক দুখানি পত্রিকা—বীনাবাদিনী এবং সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। দ্বিজেন্দ্রনাথ সৃষ্ট বাংলা স্বরলিপি মার্জনা ক'রে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিও প্রচার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই বিষয়ে প্রথম বই তাঁরই 'স্বরলিপি গীতিমালা'।

পরিণত বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান আলোচ্য ছিল ফ্রেনলজি বা শিরোমিতিবিদ্যা। 'সাধনায় তিনি প্রবন্ধ লেখেন 'আধুনিক মস্তিষ্কবিদ্যা ও ফ্রেনলজি' বালকে তাঁর প্রবন্ধ 'মুখচেনা। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের চরিত্র বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাঁদের মুখের ও মাথার গড়ন দিয়ে। এই বিদ্যার অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি এঁকেছেন শতশত রেখাচিত্র। তাছাড়া আরো শতশত ছবি প্রাণবন্ত হয়েছে তাঁর তুলিতে বা পেনসিলে। বাছাই করা সেই সব ছবির একটিমাত্র এলবামই বেরিয়েছে বিলেতে। সংকলক রটেনস্টাইন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, আই নো অভ্ ফিউ মডার্ন ড্রয়িং হুইচ শো গ্রেটার বিউটি অ্যান্ড ইনসাইট।' এই এলবামু প্রকাশের পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ।

এতসব কর্মকাণ্ডের মাঝখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়েছেন কটক, গিয়েছেন শিলাইদহ। হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি বন্দুক হাতে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন বাঘ শিকারে। পদ্মায় সাঁতার কাটা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। পিয়ানো বাজানোর মতো ঘোড়ায় চড়া ছিল তাঁর একটি সাবলীল প্রক্রিয়া। ১৮৬৮ সালে কাদম্বরী দেবীকে বিবাহের পর নববধূকে ঘোড়সওয়ার ক'রে তিনি গড়ের মাঠে যেতেন হাওয়া খেতে। গানবাজনা নাটক অভিনয় সাহিত্য শিক্ষা শিকার ব্যবসা এবং বিদুষী রূপসী সহধর্মিনীতে উজ্জ্বল। এই জীবনে একমাত্র অভাব ছিল সন্তানের। সে অভাব পূর্ণ হয়েছিল স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আর ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কিন্তু এতো সুখ কারো জীবনে সহ্য হয় না। ১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবী করলেন আত্মহত্যা। রবীন্দ্রনাথ হলেন উদভ্রান্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হলেন আত্মস্থ। ১৯০৫ সালে পিতৃবিয়োগের তিন বছর পর তিনি চিরকালের মতো চলে গেলেন রাঁচিতে। এবং সতেরো বছরের নিঃসঙ্গ একক জীবনের সমাপ্তি ঘটল ১৯২৫ সালে।

এই স্বেচ্ছানির্বাসন কালেও তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল পিয়ানো। এই যন্ত্রটি যদৃচ্ছা মন্থন করে তিনি সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতেন ওই নির্জন শৈলশিখরে। তাঁরই ভাষায়, 'আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই। এখন কোনো রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা। এ একটা ব্যাধির মতো দাঁড়াইয়াছে।' তাঁহার সে সময়কার দেহচিত্রের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন—'দেখিলাম দীর্ঘ ঋজু কৃশ গৌরবর্ণ একটি মূর্তি আমাদের সম্মুখে। সে মূর্তি প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল কোমল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ স্নেহভরা। ললাট প্রশস্ত, নাসা উন্নত, মুখশ্রী সৌম্য, সরল এবং প্রতিভাদীপ্ত। সেই সুস্পষ্ট স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র পাযজামা এবং পাঞ্জাবী পরিহিত, ততোধিক স্নিগ্ধ ও কান্তবর্ণ মূর্তি দেখিয়া স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব মনে করিয়া আমরা দুইজনেই কিছুক্ষণ বাক্য হারাইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।'

স্ত্রী-বিয়োগ, পিতৃবিয়োগ, তারপর একের পর এক শোকের আঘাত মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, বড়দিদি সৌদামিনী দেবী এবং ছোটবোন শরৎকুমারীর পর পর মৃত্যু জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিমর্ষ ক'রে তোলে। তিনি বোন স্বর্ণকুমারীকে এক চিঠিতে লেখেন 'মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন। একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। পুরাতন বন্ধু-বান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা।'

আবার একটু পিছন ফিরে তাকাই। ১৭৭০ শকের শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : গত ২৩ আষাঢ় ব্রহ্মসমাজের প্রধান আচার্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চমপুত্র শ্রীমান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্যভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন উনিশ এবং নববধূ কাদম্বরীর বয়স নয়। অসামান্য সুন্দরী এই বালিকা বধূ জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্দর মহলে এসে পেলেন প্রচুর আদর, প্রচুর ঐশ্বর্য এবং সাত বছরের বালক দেবর রবীন্দ্রনাথকে। রূপবতী গুণবতী কাদম্বরী মুহূর্তে হয়ে গেছেন নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সর্বকর্মের সহচরী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিনজনে মিলে তৈরী হ'ল নতুন জগৎ—ঠাকুর বাড়ির মধ্যে আর এক বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউ ঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা। বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা, তখনও তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্যডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিনের বেলা থাকেন বাহির মহলে। অন্দর মহলে তখন নতুন বৌঠান আর ছোট দেওরে সখ্য। স্নেহ ভালোবাসার ভিতর দিয়ে ওঁরা দুজনে বড়ো হন। নতুন বৌঠানকে খুশি করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নতুন নতুন কবিতা, গেয়ে শোনান গান। 'বউ ঠাকরুণ এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল। পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হ'তো সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোন একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনও কখনও কিছু জুড়ে দেবার জন্য আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত—কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ্য করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

'দুপুর বেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলার কাছারিতে। বড় ঠাকরুণ ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রূপার রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাঁপড়ি গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তাল শাঁস বরফে-ঠাণ্ডা করা। সমস্তটার উপরে একটা ফুল কাটা রেশমের রুমাল

ঢেকে মোরাদাবাদী থুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।'

বাইরে বেড়াতে বেরোলেও ওরা একসঙ্গে তিন সঙ্গী গঙ্গার ধারে চন্দননগরে কিংবা শৈলশিখর দার্জিলিঙে কিংবা সুদূরে বোম্বাইয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যান রবীন্দ্রনাথ। তিনি দাদা-বৌদির আনন্দসঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন—'গঙ্গার ধারের প্রথম যে-বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতালা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারের বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা' হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের ক'রে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদলদিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষা গানের সিন্দুকটাতে। মনে পড়ে থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লেগেছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেঁধে গেছে ডালে-পাতায়, ডিঙি নৌকোগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপরে। বউ ঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোল কি সতেরো।......

'ঐ মোরান-বাগানের কথাও মনে পড়ে—এক একদিন রান্নার আয়োজন বকুল গাছ তলায়। রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে, পইতের সময় বউঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।'

রবীন্দ্রনাথ গেলেন বিলেত। সেখানেও ঘুরে ফিরে স্মৃতিতে আসেন জ্যোতিদাদা আর বউঠাকরুণ। বিলেত থেকে ফিরে আবার আশ্রয় নিলেন দাদা-বৌদির স্নেহক্রোড়ে। সাহিত্যে সংগীতে আমোদে প্রমোদে বল্গাহীন উদ্দাম জীবন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র তখন আরো প্রসারিত। নাটক লেখা ছবি আঁকা জমিদারি পরিচালনা নিয়ে তিনি বাইরে মহাব্যস্ত। নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবীকে অহোরাত্র সঙ্গ দেন দেবর রবীন্দ্রনাথ। ওদিকে আই. সি. এস. মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতলাওয়ের বাড়িতে আর একটি আনন্দআসর। সেই আসরের মধ্যমণি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সকল আনন্দের উৎসাহদাত্রী গৃহকর্ত্রী মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক সময় কাটে মেজবৌঠানের স্নেহছায়ায় বিরজিতলাওয়ের বাড়িতে। জোড়াসাঁকো বাড়িতে তিন সঙ্গী তখন দুই সঙ্গী হয়ে যান। তারপর রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। তেতলার সেই গৃহে সংসার পাতলেন কবিপত্নী মৃণালিনী। নতুন জীবন, নতুন আনন্দ। কাদম্বরী দেবী

হ'লেন আরো নিঃসঙ্গ। এমন সময় ঠাকুরবাড়িতে ঘটল মহাঅঘটন। ভরা যৌবনে মাত্র প'চিশ বছর বয়সে কাদম্বরী দেবী করলেন আত্মহত্যা, শোকের আঘাতে কাদম্বরী দেবীর সুখের সংসার ভেঙে হয়ে গেলো চুরমার।

কেন এই আত্মহত্যা? এই নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা নানা গবেষণা। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে কাদম্বরী দেবী আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এই অসামান্য নারী ছিলেন যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেনটিমেণ্টাল এবং আরো বলিব ইনট্রোভার্ট, মিজোফ্রেনিক। অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। পত্নীর প্রতি যতটা মনোযোগী থাকিলে তাঁহার নিঃসন্তান জীবনের সঙ্গীহীন শূন্যতা কিছুটা পূরণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে উদাসীনতাই দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনের নাট্যকার ও অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চের নটনটীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া অপবাদ শোনা যায়। জানিনা, এইরূপ কোনো সন্দেহের বশবর্তী হইয়া এই অভিমানিনী রমনী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা।'

প্রভাতকুমারের এই অনুমান সত্য ব'লে মনে হয় না। তবে উদাসীনতার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা নিয়ে নানারকম জল্পনা আগেও ছিল, এখনো আছে। এ সম্পর্কে অমল হোম একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বিবরণটি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেইদিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলি চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি কাদম্বরী দেবী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়।

কাজি আবদুল ওদুদের অনুমান অন্যরকম। তিনি বলছেন 'ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে-মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী দেবী আরও একবার (রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।'

কে এই মহিলা? কোথাও কোন সদুত্তর নেই, সবই অনুমান। তেমনি আর একটি অনুমান, মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর সন্তানদের নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন স্টিমার ভ্রমণে যান। কথা ছিল সন্ধ্যার মধ্যে ফেরার। কিন্তু স্টিমার চরায় আটকে যাওয়ায় তিনি ফিরতে পারেন নি। সেই অভিমানেই প্রাণত্যাগ করেন কাদম্বরীদেবী।

অনুমানে অনুমানে ঠাকুর পরিবারের এই দুর্ঘটনা নানারকম সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এমনকি একথাও বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এই আত্মহত্যার কারণ। অতি অবান্তর প্রগলভ উক্তি। তবে একথা সত্য রবীন্দ্রনাথ সংসারী হওয়ার পর কাদম্বরী দেবীর নিঃসঙ্গতা বেড়ে যায়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে আমি নিজে আর একটি ভাষ্য শুনেছি। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে ইন্দিরা দেবীর বয়স ছিলো তেরো। সুতরাং সে সময় তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন না। তিনি বলেছেন, আত্মহত্যার কিছুদিন আগে কাদম্বরী দেবীর জন্মদিন ছিল। তিনি স্বামীকে বলেছিলেন সেই রাত্রে বাড়িতে থাকতে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি যথারীতি অন্যান্য দিনের মতোই বিরজিতলাওয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বাড়িতে চ'লে যান এবং ফেরেন বেশ পরে। এবং ফেরার পরও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য স্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। জন্মদিন ব্যাপারটাই তিনি বিস্মৃত হয়ে যান। অভিমানিনী কাদম্বরী দেবী প্রচণ্ড আঘাত পান, সম্ভবত অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং সেদিনের ঘটনার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। কাদম্বরী দেবী গোপনে বিশু নাম্নী এক কাপড়ওয়ালির মারফৎ সংগ্রহ করেন আফিম এবং তাই খেয়ে একদিন সব জ্বালা জুড়ান। ইন্দিরা দেবী একথাও বলেন, 'জ্যোতিকাকা মশাই বিরজিতলাওয়ে আমাদের সঙ্গেই বেশিক্ষণ কাটাতেন। নতুন কাকিমা (কাদম্বরী দেবী) হয়ত সেটা খুব পছন্দ করতেন না।'

মোট কথা, শেষদিকে স্ত্রীর প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদাসীনতা আত্মহত্যার কারণ ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগের অন্যতম কারণ হয়তো নিঃসন্তানতা। তাই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর সন্তানদের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এতো আকর্ষণ ছিল। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরও দেখি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে স্টীমার ভ্রমণে বেরিয়েছেন। উদ্দেশ্য শোকের আঘাত লাঘব করা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সমবয়সী। বিবাহের পর থেকেই দুজনে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বিবেচনা ক'রেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবরকে সঙ্গদান করা কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করেছিলেন।

সে যাইহোক, ঠাকুরবাড়ির এই শোকের আঘাত সামলে উঠতে অনেকদিন লেগেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক গুটিয়ে নিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত হলেন জমিদারি পরিদর্শনে। শিলাইদহ থেকে অবশেষে শান্তিনিকেতনে। কনিষ্ঠভ্রাতাকে অনুসরণ করলেন জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ স্টোর রোডে গৃহ নির্মাণ করে জোড়াসাঁকো থেকে নিজেকে করলেন বিযুক্ত। ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের দেখা দিলো মস্তিষ্ক

বিকৃতি। সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথও আক্রান্ত হলেন মানসিক ব্যাধিতে। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কার্যত নিঃসঙ্গ পড়ে রইলেন বিশাল পরিবারের বিশাল বাড়িতে। পিয়ানোর ঝংকার স্তব্ধ, বেহালা ধূলিমলিন, সাহিত্য বা নাটকের সূত্রে সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রও অনুপস্থিত। নিশিদিনের সঙ্গী হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে আমৃত্যু রয়ে গেল শুধু চিত্রাংকন। তবু মহর্ষি যতদিন জীবিত ছিলেন, জোড়াসাঁকোর সঙ্গে বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি তাঁর পুত্র কন্যাদের।

মহর্ষির মৃত্যু হ'ল ১৯০৫ সালে। ঠাকুরপরিবারের বন্ধন এবার শিথিল হয়ে গেলো। পিতার উইল অনুযায়ী জমিদারির মালিক হলেন মাত্র তিন পুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। নিঃসন্তানতা হেতু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাসোহারা নির্দিষ্ট হ'লো মাত্র বারোশত টাকা। সেই সামান্য অর্থ সম্বল ক'রে পিতার মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯০৮ সালে তিনি চিরবিদায় নিলেন জোড়াসাঁকো থেকে, বানপ্রস্থ নিলেন রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে নবনির্মিত শান্তিধামে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিঃসঙ্গতা, নিয়ে গেলেন স্মৃতি।

সেই নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে শান্তি দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর দুই পৌত্র পৌত্রী—সুবীরেন্দ্রনাথ ও মঞ্জুশ্রী। এই দু'জন ছিলেন তাঁর বার্ধক্যের সম্বল। তাছাড়া দু' একবার গিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু যৌবনের আনন্দসহচর, শিষ্য, ভ্রাতা, বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। শান্তি-ধাম ও শান্তিনিকেতনে কোন সম্পর্কই রইল না। এমন কি পত্রালাপও হয়ে গেলো বন্ধ। স্বামীর উদাসীনতা হেতু নতুন বৌঠানের আত্মহত্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ কি জ্যোতিদাদাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেন নি? নাকি সাহিত্যে সংগীতে স্নেহের রবির জ্যোতিহীন একক প্রয়াস ও খ্যাতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অভিমানী করেছিল অন্তরে অন্তরে?

কিছুই জানার উপায় নেই। কোন তথ্যই কেউ রেখে যাননি কিসের অভিমানে জীবনের শেষ সতেরোটি বছর রাঁচির নির্জনতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্পণ করলেন। ১৯২৫ সালে মৃত্যুর প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মতো দেখার ব্যাকুলতা, 'রবি রবি' বলে বিলাপ রবীন্দ্রনাথের কানে কেনই বা পৌঁছে দেওয়া হ'লো না? কিংবা জেনে শুনে কেন রবীন্দ্রনাথ পাষাণ হয়ে রইলেন? অথচ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পর পরলোকচর্চাকালে মিডিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা করেছেন নতুন বৌঠানের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয় কিনা। জ্যোতিদাদার কাছে তাঁর ঋণের কথা, জ্যোতিদাদার স্নেহের কথাও তো নানা স্মৃতিকথায়, নানা চিঠিপত্রে বারবার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ জীবনের উক্তিতেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্নেহের অভাব নেই। তবু না জানি কী ছিল বিধাতার মনে, দুই প্রিয় ভ্রাতার মধ্যে বিচ্ছেদ

বিষণ্ণ ক'রে রেখে দিয়েছে শেষ জীবনের কয়েকটি বছরকে। বিষণ্ণ করেছে আমাদেরও।

তবু তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল প্রতিভায় বিশ্বের বিচিত্র কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে দিক্ হ'তে দিগন্তরে ছুটে চ'লে যান জীবনশিল্পী হয়ে; আর প্রিয়জনবিযুক্ত বৈভববিমুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শৈলবাসী সন্ন্যাসী সেজে তিলে তিলে নিজেকে ঠেলে দিলেন আত্মবিলোপের দিকে। এ-ও তো এক প্রকার আত্মহত্যা!

জগৎ কবিসভায় রবি

রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তার আগে তিনি একজন বাঙালী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশখ্যাত এই কবি কী ভাবে বিশ্বখ্যাত হলেন, কীভাবে ইউরোপের গুণিসমাজ তাঁকে বরণ করে নিলেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রাক্কালে কী ঘটনা ঘটল, জানতে হলে আমরা ফিরে যাব ১৯১২ সালের ১৬ই জুনে। কবি এই তৃতীয়বার এলেন লণ্ডনে। সেই কবে যৌবনে এসেছিলেন দু'বার।—বিয়ের আগে সতেরো বছর বয়সে প্রথমবার বিদ্যার্থী হিসাবে, দ্বিতীয়-বার বিয়ের পর ঊনত্রিশ বছর বয়সে বেড়াতে। এবার অন্য চিত্র। আগেকার সেই প্রগলভ কিশোর বা ভাবুক যুবকের চিহ্নমাত্র নেই, এখন তিনি দীর্ঘ-শ্মশ্রুসমন্বিত পঞ্চাশোত্তীর্ণ খ্যাতিমান পুরুষ, প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আশ্রমগুরু, বরেণ্য সাহিত্যিক। যৌবনের চোখ দিয়ে দেখা সেই লণ্ডনও আর নেই। কবিরূপমুগ্ধা কিশোরী লুসি-র দেখা নেই, নেই পূজনীয় শিক্ষক প্রফেসার মর্লি, নেই সেই নাচের আসর গানের আসর।

এবার সঙ্গে এসেছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী। পাঁচ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পত্নী পরলোকে, পরলোকে মধ্যমা কন্যা রেণুকা, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এবং পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ। বাংলাদেশ তখন রবীন্দ্রানুরাগী আর রবীন্দ্রবিরোধী দুটি ভাগে আলাদা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিয়েছেন কবি। কলকাতা-বাসের পাট কার্যতঃ তুলে দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন শিলাইদহে আর শান্তিনিকেতনে, সোনার তরী চিত্রা কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে উত্তীর্ণ হলেন গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যের অধ্যাত্মস্বর্গে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় আর জমিদারী পরিচালনার সঙ্গে সমানতালে চলেছে সংগীতরচনা। এমন সময় এল বিদেশের ডাক। কবি পাড়ি দিলেন ইংলণ্ডে।

রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে এলেন, তখন কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী বাঙালী ছাত্র হিসাবে লন্ডনে রয়েছেন। সুকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ, কেদার চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দমোহন বসু। তা ছাড়া নানা কাজে উপস্থিত নববিধান সমাজের ভাই প্রমথলাল সেন, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন এবং বন্ধু। তা ছাড়া লণ্ডনে আছেন আর

একজন পরিচিত। তিনি বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী রটেনস্টাইন। অনেকদিন আগে তিনি এসেছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে। তিনি এই ইংরেজ চিত্রশিল্পীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের খুল্লতাত হিসাবে। তাছাড়া মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতা অনূদিত কাবুলিওয়ালা গল্প পড়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং পরে আক্ষেপ করেন, প্রথম পরিচয়ের সময়ই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মাল না কেন।

লণ্ডনে পোঁছেই রবীন্দ্রনাথ হ্যাম্পস্টিড হীদে ২ নং হলফোর্ড রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করলেন এবং রটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দিলেন একখানা পাণ্ডুলিপি। জাহাজে আসার সময় এবং আগে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য খেয়া নৈবেদ্য থেকে বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সরল গদ্যে স্বচ্ছন্দে ভাষান্তর। 'সঙ্স্ অফারিং' নামাঙ্কিত এই পাণ্ডুলিপি রটেনস্টাইনকে উৎসর্গ করা।

পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে ইতিমধ্যে এক কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পাতাল রেলে কোথা থেকে যেন আসছিলেন। রথীন্দ্রনাথের হাতের এটাচিতে ছিল ওই পাণ্ডুলিপি। নির্দিষ্ট স্টেশনে তাড়াহুড়ো নামার সময় রথীন্দ্রনাথ ট্রেনের কামরাতেই ফেলে গেলেন পাণ্ডুলিপি সমেত এটাচি কেস। খেয়াল হল বাড়িতে ফেরার পর। রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা না জানিয়ে সারা রাত ছটফট করে কাটান রথীন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ, যদি ফেরত না পাওয়া যায়? তাহলে তো কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত! পরদিন সকালে দুরু দুরু বক্ষে পাতাল রেলের অফিসে বৃত্তান্ত পেশ করার পর মিসিং ডিপার্টমেন্টে পেয়ে গেলেন সাত রাজার ধন এক মানিক মহা মূল্যবান ওই এটাচি।

সে যাই হোক, ইতিমধ্যে রটেনস্টাইন ইংরেজি গীতাঞ্জলির কয়েকখানা টাইপকরা কপি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে। তার মধ্যে আছেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্। ইংরেজি সাহিত্য ও ইংলণ্ডের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘদিনের। এবার তিনি পরিচিত হতে চাইলেন সমসাময়িক চিন্তাবিদদের সঙ্গে। রটেনস্টাইনের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র এইচ. জি. ওয়েলস এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। ওয়েলস রবীন্দ্রনাথ থেকে বয়সে কিছু ছোট। দুজনে পরিচিত হলেন নৈশভোজে। রবীন্দ্রনাথ তার আগেই ওয়েলসের অনেক বই পড়ে ফেলেছেন। প্রথমে কবির মনে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল না জানি কী ভাবে ওয়েলস তাঁকে গ্রহণ করবেন। পরে দেখা গেল ওয়েলস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথও পরে বললেন, ওয়েলসের প্রখরতা চিন্তায়, প্রকৃতিতে নয়।

কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে তখন আছেন অধ্যাপক লোয়েস ডিকিনসন তাঁরই লেখা 'জন চীনাম্যানের পত্র' নামক বইয়ের সহৃদয় সমালোচনা বঙ্গদর্শনে

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ডিকিনসনের সঙ্গে পরিচয়ের পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "যে দুই দিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে, তেমনি অশান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল।" তখনই পরিচয় হয় রাসেলের সঙ্গে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাসেল ও ডিকিনসনের সঙ্গে আলাপ সম্পর্কে লেখেন—"গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া যায়, কাহার মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটি আমার কাছে সবচেয়ে সরল লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম। সেখানে একদিন রাত্রি এগোরাটা পর্যন্ত প্রাচীন তরু-সভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম।...নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদুকণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।"

ডিকিনসন নিজেও এই মিলন-সভার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন পরে ঃ—It is a June (1912) evening in Cambridge garden Mr, Bertrand Russel and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness. Then Russel begins to talk, coruscating like lighting in the dusk. Tagore falls into silence. But afterwards he said it had been wonderful to heat Russel's talk. He had possed into a higher state of consciousness and heard it as it were, from a distance. What, I wonder, had he heard ?

ওদিকে রটেনস্টাইন গীতাঞ্জলির টাইপকরা কপি বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন প্রতিক্রিয়ার। শেক্সপীয়ারের অসামান্য সমালোচক ব্রাডলে পাণ্ডুলিপি পড়ে লিখে পাঠালেন—It looks as though we have at last a great poet among us again. যশস্বী লেখক স্টপফোর্ড ব্রুক জানালেন—I sent back the poems. I have read them with more than admiration ; with gratitude for their spirtual held, and for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell, I wish I were worthy of them.

ব্রুক ছিলেন মহারাণী ভিকটোরিয়ার পুরোহিত। ধর্মশাস্ত্রী ছাড়াও তিনি পরিচিত ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ ব্রুকের

সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকতে ব্রুকের প্রচুর লেখা পড়েছেন। ব্রুকও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহী। রটেনস্টাইনের মধ্যস্থতায় দুই মনীষীতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে পরে লিখেছেন—"ইহার শরীর মনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইহার নবীনতা। আমার বারবার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায়, তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস।"

ওদিকে রটেনস্টাইনের বাড়ির সাহিত্য আসরে ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে তুফান চলছে। ১৯১২ সালের ৭ই জুলাই একটি সাহিত্যসভা বসল। সভার মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন ইয়েটস্, আর্নেস্ট রাইজ, মিস সিনক্লেয়ার, এভেলিন আনডারহিল, রবার্ট ট্রেভেলিন, ভক্স-স্ট্রাংওয়েজ, এজরা পাউন্ড, মিজ্যাল, এন্ডরুজ এবং আরো অনেক বাছা বাছা সাহিত্যরথী ও সমালোচক। ইয়েটস্ গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি কবিতা নিজেই পড়ে শোনালেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ, সকলেই বাক্‌শূন্য। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, নতুন তারকার আবির্ভাব হয়েছে পূর্বাকাশে।

সাহিত্যিক মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। সেই আলোড়ন আরো ব্যাপ্ত হল ১২ই জুলাই ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রোকাডেরো হোটেলে বিরাট রবীন্দ্রসম্বর্ধনার পর। এই সোসাইটিই তার কিছুদিন পর ইংরেজি গীতাঞ্জলির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের কবিকে পরিচিত করে দেন। ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হ্যাভেল, রটনস্টাইন, মিঃ ও মিসেস হেরিংহাম, টমাস আর্নলণ্ড, রজার ফ্রাই প্রমুখ। ইন্ডিয়া সোসাইটির দিন দুই আগে অবশ্য ইউনিয়ন অব ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট নামক সমিতির উদ্যোগে এমার্সন ক্লাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 'ভান্ডার' পত্রিকা সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী কেদারনাথ দাশগুপ্ত।

ট্রোকাডেরো হোটেলের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতি ছিলেন কবি ইয়েটস্। উপস্থিত ছিলেন সেকালের সব সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক। এইচ. জি. ওয়েলসও এসেছিলেন। ইয়েটস্ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—"একজন শিল্পীর জীবনে সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন সেইটি যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব তিনি আগে জানতেন না। আমার কাব্যজীবনে আজ একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত। আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্ধনা ও সম্মান জানাবার ভার পেয়েছি। তাঁর লেখা প্রায় একশটি গীতিকবিতার অনুবাদের একখানি খাতা আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমকালীন এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না—যিনি এমন কোন রচনা ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন—এই কবিতাগুলির সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইয়েটস্ সভাতেই অনূদিত তিনটি কবিতা পড়ে শোনান—শ্রাবণঘন গহন মোহে, জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে এবং মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। রবীন্দ্রনাথও একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি, সে ভাষায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নেই। আশা করি, আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে, তবু আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবতে পারি এবং অনুভব করতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা গৃহিণীর মতো বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবি করে আসছেন এবং তার রাজ্যে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেননি। সেইজন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন, তা আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে, আমি প্রকাশ করে বলতে পারি না।"

এই বক্তৃতার পর সাড়া পড়ে যায় সারা ইংলণ্ডে। হাউস অভ কমনসে তৎকালীন সহসচিব, পরে সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া মণ্টেগু ভারতের বাজেট আলোচনাকালে কবির বক্তৃতার উল্লেখ করেন। দৈনিক টাইমস লেখেন উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয়, মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান মন্তব্য করেন—"রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশের সম্মান, সম্ভ্রম, প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এবং রসিক-সমাজে যে সাড়া পড়েছে, এমন এ যুগের লোকের জীবদ্দশায় কোন প্রাচ্য অতিথির জন্য হতে দেখা যায়নি।"

চারদিকে স্তুতি, চারদিকে প্রশংসা। ইংলন্ডের যেখানে যান,সেখানেই কবিকে নিয়ে ভীড়। এই খ্যাতির বিবরণ ইউরোপে আমেরিকায় পৌঁছয়। একে রবীন্দ্রনাথের ঋষিপ্রতিম উন্নতদর্শন মূর্তি, তদুপরি একেবারে ভিন্নজাতের অসাধারণ লেখা—সব মিলিয়ে রাতারাতি তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মানে অধিষ্ঠিত করে ফেলল।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক গ্রামে গেলেন জনৈক পাদরির অতিথি হয়ে। নিমন্ত্রণকর্তা সিপাহী বিদ্রোহের যুগের ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল উট্রামের পুত্র। বাটার্টন গ্রাম থেকে কবি গেলেন গ্লস্টারশায়ারে রটেনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে চ্যালফোর্ড নামক গ্রামে। আগস্টে ফিরলেন লন্ডন। ফ্ল্যাট নিলেন অ্যালব্রেড প্লেসে। সেখানেই ঘনিষ্ঠতা হয় এন্ডরুজের সঙ্গে। ইতিমধ্যে গীতাঞ্জলি ছাপার ব্যবস্থা সম্পূর্ণপ্রায়। ইয়েটস্ লিখলেন ভূমিকা। ভূমিকা পড়ে রবীন্দ্র-নাথ লজ্জিত, বলেন, "এটা আমার মূল্যবান অলংকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার।"

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবিতা ও বইয়ের অনুবাদও শুরু করেন।

দালিয়া গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত এবং নাট্যরূপ দেন নামকরা নাট্যকার জর্জ কলডেরন। 'দি মহারাণী অব আরাকান' নামে দালিয়া গল্প অভিনীত হয় এলবার্ট থিয়েটারে। চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, রাজা ও ডাকঘরের অনুবাদও চলছে। 'গার্ডনার' নাম দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন বই। সম্বর্ধনা আর রচনায় রবীন্দ্রনাথ মহাব্যস্ত। রটেনস্টাইন এসব নাটকের অনুবাদ রবার্ট ট্রেভোলিয়ানকে দেখতে দেন। রাজা অনুবাদ করেন তখনকার কেমব্রিজের ছাত্র, পরে জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এবং ডাকঘর অনুবাদ করে অক্সফোর্ডের ছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ হলেন অসুস্থ। অর্শের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। এলোপ্যাথ অপারেশনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আমেরিকার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ ডাঃ ন্যাসের চিকিৎসার জন্য অক্টোবরে পাড়ি দিলেন মার্কিন মুলুক। সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ। সেই প্রথম তাঁর আমেরিকায় যাত্রা। নিউইয়র্কে কিছুদিন থেকে গেলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্ষেত্র ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্বানায়। সেখানে পরিচিত হলেন বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে। বক্তৃতাও দিলেন নানা বিষয়ে নানা জায়গায়। আর্বানায় থাকতেই খবর পেলেন 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছে এবং এবার আর ইন্ডিয়া সোসাইটি নয়, ম্যাকমিলান কবির সব বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। গীতাঞ্জলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হই-হই পড়ে গেল। টাইমসের লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সমালোচনা লিখলেন গীতাঞ্জলির।

আর্বানা থেকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন শিকাগো। সেখানে অতিথি হলেন হ্যারিয়েট মনরোর। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলেন কয়েকটি বক্তৃতা। মনরো সম্পাদিত 'পোয়েট্রি' পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় গীতাঞ্জলির ছ'টি কবিতা ছাপা হয়। এজরা পাউন্ড মনরোকে লেখেন—"ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ উইথ মাস্টারি অভ ক্যাডেন্স।"

শিকাগো থেকে রচেস্টার। সেখানে আলাপ হয় জার্মান দার্শনিক রুডলফ ক্রিস্টোফার অয়কেনের সঙ্গে। রচেস্টার থেকে আবার নিউইয়র্ক। সেখানে অতিথি মিসেস মুডির। মুডির সঙ্গে গেলেন বস্টন। পাশেই ক্যামব্রিজ। সেখানে বক্তৃতা দিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে দেখা করতে আসেন ব্রিটিশ কবি আলফ্রেড নয়েস। বস্টন থেকে আবার শিকাগো।

আমেরিকায় ছয়মাস কাটিয়ে কবি ফিরলেন লন্ডনে। গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। ডাকঘর অভিনয় হচ্ছে আইরিশ থিয়েটারে। রাজা লিটল থিয়েটারে। এসেই তিনি ক্যাক্সটন হলে দিলেন ছয় সপ্তাহে ছ'টি বক্তৃতা। এই বক্তৃতাবলীই 'সাধনা' নামে পরে প্রকাশিত। কর্ণি আর্নেস্ট রাইজের ভাষ্যেই জানা যায়, এই ছয়টি বক্তৃতা ইংলন্ডের শিক্ষিত সমাজে কী আলোড়নই না তুলেছিল।

এই বিপুল অভ্যর্থনার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ অর্শের অপারেশনের জন্য ভরতি হোলেন নার্সিং হোমে। আমেরিকার হোমিওপ্যাথি কাজ দেয়নি। দু'সপ্তাহ

তিনি হাসপাতালে ছিলেন। ফুলের মালা আর অতিথির ভিড় লেগে থাকত হাসপাতালে। সে সময় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিলাতে আসেন। তিনি রোজ যেতেন 'রবিকাকা'কে দেখতে।

১৯১৩ সালে জুলাইয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই তিনি ঠিক করলেন জার্মানি যাবেন। কবি কাইজারলিং নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু জার্মানি যাওয়া হল না। দেশের জন্য মন আকুল হয়ে উঠল। ১৯১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কবি সিটি অভ লাহোর জাহাজে দেশে রওনা হলেন লিভারপুল থেকে। সঙ্গে কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার রায়। ৪ অক্টোবর জাহাজ ভিড়ল বোম্বাইতে। ৬ অক্টোবর কবি ফিরলেন কলকাতা।

কবি তো চলে এলেন। ওদিকে ইংরেজি গীতাঞ্জলী নিয়ে হইচই চলেছে ইউরোপে। টাইমসে সমালোচনা লিখছেন এডমন্ড গস, পোয়েট্রিতে লিখলেন এজরা পাউন্ড। পাউন্ডের অভিমত 'ইংরেজি কাব্যে, এমন কি পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে গীতাঞ্জলির প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে লিখলেন লাসেল আবেরকোম্বি। ফ্রান্স, জার্মানিতেও একই উচ্ছ্বাস একই সমাদর।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেকে আবার সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন, ইংরেজিটা সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের কিনা। এত ভালো একজন বাঙালী লেখেন কী করে? কেউ কেউ বললেন, নাম আছে বটে রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু আসল লেখক স্বয়ং, ইয়েটস্। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অজস্র সাক্ষ্যের দরকার নেই, রটেনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন শোনা যাক। তিনি বলছেন—I knew that it was said in India that the success of Gitanjali was largely owing to Yeats's rewriting of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original manuscript of Gitanjali in English and in Bengali is in my prossession. Yeats did here and there suggest slight changes, but the main text was printed as it came from Tagore's hands.

সে যাই হোক গীতাঞ্জলী নিয়ে উত্তেজনার ঢেউ পৌঁছল সুইডেন। ১৯১২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় ইংরেজি গীতাঞ্জলি। তার ঠিক একবছর পর ১৯১৩ সালের নভেম্বরে ঘটল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। লন্ডনের রয়্যাল একাডেমির সদস্য স্টার্জ মুর নোবেল প্রাইজের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করলেন সুইডিশ একাডেমির কাছে, ফরাসী সাহিত্যিকরা নাম পাঠালেন এমিল ফগে-র। একাডেমির সদস্যদের মধ্যে দেখা দিলে মতানৈক্য। কিন্তু বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। সুইডিশ লেখক পার হলস্টর্মের ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার পান। তাছাড়া আর একজন খ্যাতনামা সুইডিশ কবি হাইডেনস্টাম জোর ওকালতি করলেন গীতাঞ্জলির জন্য। তিনি একাডেমির সভায় বক্তৃতা

দিয়ে বললেন—Now that we have finally an ideal poet of really great stature, we should not pass him over. For the first time and perhaps for the last for a great long time to come, it would be vouchsafed us to discover a name befor it has appeared in all the newspapers. If this is to be achived, however, we must not tarry and miss the opportunity be waiting till another year.

একাডেমির অন্যতম সদস্য এজাইজ টেগনার। তিনি বাংলা পড়তে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। সব মিলিয়ে অবশেষে একাডেমির কাছে বিচারের জন্য হাজির হল একমাত্র গীতাঞ্জলিই। কমিটির সভাপতি ডঃ হারাল্ড হর্নে সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন, গীতাঞ্জলিকে ১৯১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

তারপরের ঘটনা সকলের জানা। দেশ বিদেশে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য। ইংরেজ কেউ কেউ বললেন, হার্ডি বেঁচে থাকতে কালা আদমি রবীন্দ্রনাথ কেউ? ফ্রান্সের বক্তব্য, আনাতোল ফ্রাঁস বাদ গেলেন কেন? জার্মানের অভিযোগ, তাদের রোজেগ্‌গের বাতিল হলেন কোন্ দোষে? অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং প্রাইজ পাওয়ার পর ধনীদের মুখপত্রের গলা অন্য রকম হয়ে গেল।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল দেশেও। অনেকে বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ ঘুষ দিয়ে পুরস্কারটা মেরে দিয়েছেন। কেউ বললেন, তিনি অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজেদের লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ করে সুইডেনে পাঠাতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন, তবে ওঁরা নয় কেন? অবশ্য রবীন্দ্র-অনুরাগীদের মধ্যে হই-হই পড়ে গেল। নতুন ভক্তও সৃষ্টি হল সেই মুহূর্ত থেকে।

অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের পুরো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাঁর জমিদারি পতিসরে চাষীদের সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে সব খুইয়েছেন। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে শান্তিনিকেতন গিয়ে কলকাতার অতিথিরা কবির তিক্ত ভাষণ শুনে বিষণ্ণ হয়ে ফিরে যান, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না, কলকাতাবাসীর কাছে সুসংবাদটি প্রথম পরিবেষণ করেছিল কে? করেছিল 'এম্পায়ার' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক। ১৩ নবেম্বর কাগজটি লেখে—It is the first recognition of the indigenous literature of this Empire as a world force ; it is the fiirst time that an Asiatic has attained distinction at the hands of the Swidhish Academies and this is first occassion upon which the £8000 prize has been award to a poet who writes in a language to entirely forign the awarding country is to Sweden.

রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন? তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে। ৯ নবেম্বর বিদ্যালয় খুলেছে পুজাবকাশের পর। ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গ পেয়ে কবি আনন্দিত। ১৫ নবেম্বর তিনি রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথকে নিয়ে মোটরে চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে যাবেন বলে স্থির করেছেন, এমন সময় টেলিগ্রাম এল কলকাতা থেকে—১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ তিনি পেয়েছেন। টেলিগ্রাম প্রেরক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শুভবার্তাটি প্রথমে খোলেন কবির কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রান্নাঘরে ছাত্র, অধ্যাপক, আশ্রমিক সবাই যখন খেতে বসেছেন, তখনই তিনি ঘোষণা করলেন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারা আশ্রমে তৎক্ষণাৎ আনন্দ-উৎসবের শুরু।

তিনদিন পর, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের ১৮ নভেম্বর রটেনস্টাইনকে লিখলেন একখানা চিঠি। পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদে সর্বাগ্রে মনে হয়েছে এই বন্ধুটির কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—যখনই নোবেল প্রাইজের খবর পেলাম, তখনই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় ধাবিত হয়েছিল। আমি জানি, আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সংবাদে আপনার মতো তৃপ্ত আর কেউ হবেন না……।

এই চিঠিতেই তিনি আরো লেখেন—গত কয়েকদিনের টেলিগ্রাম ও চিঠির চাপে আমি শ্বাসরুদ্ধ। যে সব লোকের আমার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বা যারা আমার রচনার একটি লাইনও পড়েন নি, তাঁরাই আনন্দজ্ঞাপনে বেশী মুখর। এই সব উচ্ছ্বাস আমাকে যে কী পরিমাণ ক্লান্ত করছে, আমি তা বলতে পারি না। এই অবাস্তবতার আধিক্য ভয়াবহ।

আম্রকুঞ্জের সম্বর্ধনা সভায় এই ধরনের রবীন্দ্র-অজ্ঞ বা রবীন্দ্রবিদ্বেষী লোকদের প্রথম সারিতে দেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই তিক্ত ভাষণে বলেছিলেন —"এই সম্মানের সুরাপাত্র ওষ্ঠে ঠেকাব, কিন্তু এই মদিরা অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না।"

সে অন্য ইতিহাস। নোবেল প্রাইজ পাওয়া নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলল আলোড়ন, কবি নিজে শান্ত সমাহিত। রূপলোক আর রসলোক আবর্তিত হয়ে তিনি আপনমনে করে যান সৃষ্টির পর সৃষ্টি। বঙ্গকবি ততদিনে বিশ্বকবি। জগৎকবিসভায় আমরা বাঙালীরা গর্বিত।

———

রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল

উৎসর্গ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রফুল্ল রায়

পাগলা ফাইলের খোঁজ দিতে সাহায্য করেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুরজিতচন্দ্র সিংহ, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, রবীন্দ্রভবনের অবেক্ষক সনৎ বাগচি এবং রানী চন্দ্র। এঁদের কাছে আমি ঋণী। আর ঋণী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নন্দন বৈশ্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনীষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।—

অ. চৌ.

পর্যায়ক্রম

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

মহাশয় আপনি নাকি ভালো পেঁপের বীজ করেন। তাড়াতাড়ি পাঠান। ডাকখরচ আমি দিব।

সবিনয় নিবেদন, আপনার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার টেকনিক অতি সত্বর জানান। তাহা হইলে আমি যদি প্রাইজ পাই, মোট প্রাপ্য টাকার অর্ধাংশ আপনাকে দিব!

হে কবিবর, আমাদের হাতেলেখা পত্রিকায় যদি আপনি লেখা ছাপাতে চান, তাহলে সাত দিনের মধ্যে পাঠান।

ডিয়ার স্যার, বড় সমস্যায় পড়েছি। আমি বাল্য বিবাহের শিকার। আমার বালিকা পত্নীকে তালাক দিয়ে আর একটি বিয়ে করব কি?

মাই ডিয়ার স্যার, একটা ছোট ইনজিন বানিয়েছি, রেজিস্ট্রি করব কোথায়?

শ্রীচরণেষু, আজ এত কাছে এসেও তোমার গায়ের পরশ লাগাতে পারব না—একথা যে ভাবতেও পারছি না।

প্রিয় কবিবরেষু, প্রচুর টাকার দরকার, কিছু দিলে কৃতার্থ হব।

এই বিচিত্র আবেদন নিবেদিত হয়েছে একটিমাত্র মানুষের কাছে। দু-চারটি নয়, এই রকম শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। যাঁর কাছে এসেছে, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, ইওরোপ আমেরিকার নানা শহর থেকে এমনি অসংখ্য চিঠি ভারাক্রান্ত করেছে কবির খাস দপ্তর। বিখ্যাতদের পাশাপাশি অখ্যাতদের দল—এক কৌতুককর সমাবেশ। তবে এই সব চিঠির প্রায় কোনটিরই জবাব দিতে হয়নি কবিকে। যদিও পত্রদাতা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বিস্ময়। এই বিপুল সৃষ্টি আর বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্যেও একজন মানুষের পক্ষে এত চিঠি লেখা অভাবিত। বিশ্বভারতী খণ্ডে খণ্ডে তাঁর চিঠিপত্র প্রকাশ করছেন। কিন্তু যে ঢিমে তালে এই প্রকাশনা চলছে, তাতে শুধু বাংলা চিঠি ছাপাতেই কবির দ্বিশতবার্ষিকী এসে যাবে। তারপর ইংরেজী চিঠির পাহাড় তো পড়েই আছে।

ছোট বড় মাঝারি কত চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার সংখ্যা নিরূপণ দূরে থাক, নানা জনের কাছে ছড়ানো হাজার হাজার চিঠির সন্ধান আজও মেলে নি।

অথচ এই চিঠিগুলি রবীন্দ্র সাহিত্যের মল্লিনাথ, রবীন্দ্রজীবনের বসওয়েল। ইন্দিরা দেবীকে লেখা ছিন্নপত্র না পড়লে তো রবীন্দ্রনাথকে জানাই হয় না।

এ তো গেল পত্র রচনার দিক। অন্য দিক থেকে দেখলে এত চিঠিও বোধ হয় পৃথিবীর কোন মনীষী কোন কালে পাননি। রোজ এত চিঠি, এত পার্সেল, এত বই ও এত সাময়িক পত্রিকা আসত যে, শুধু 'রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়ে পুরো একটা ডাকঘর চালানো যেত।

আগেই বলেছি পত্রদাতাদের তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন অখ্যাতরাও। তাছাড়া আছেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং সাহিত্যিকগোষ্ঠী। একদিকে যেমন গান্ধীজীর চিঠি আসছে স্বরাজের ব্যাখ্যা নিয়ে, তেমনি শান্তিনিকেতনের কোন প্রাক্তন ছাত্র আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানে। রমাঁ রলাঁ হয়ত লিখছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের স্মারকলিপিতে কবির স্বাক্ষর দানের সম্মতি চেয়ে, বার্টাণ্ড রাসেল জানতে চাইছেন সুন্দর শব্দের সংজ্ঞা কী, জওহরলাল অনুমতি চাইছেন কোন গোপন পরামর্শে শান্তিনিকেতনে আসার এবং তারই সঙ্গে কেউ চাইছেন তাঁর নবজাতক পুত্রের নাম, নতুন কবিতার বইয়ের ভূমিকা কিংবা উপন্যাস সম্পর্কে মতামত। আবার একই ডাকে আসছে পতিসর থেকে কোন গরিব প্রজার আবেদন কিংবা কোন পরিচিত জনের শোকে সমবেদনা জানানোর কাতর অনুনয়। সেই সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকরা চাইছেন নতুন নতুন রচনা, প্রিয়জনরা চাইছেন ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে—কবিতা। আবার তারই ফাঁকে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে আসছে নানা রকম পারিবারিক সমস্যার চিঠি।

সেইসব চিঠির জবাব দিতে কবি পরাঙ্মুখ নন। সকলের প্রার্থনা সারাজীবন মঞ্জুর করেছেন কল্পতরু সেজে। মেয়ের নাম, বাড়ির নাম, বিয়ের আশীর্বাদ, বইয়ের ভূমিকা, বই সম্পর্কে মতামত—কোন কিছুই বাদ পড়ছে না এই সদাব্যস্ত জীবনে। তার মধ্যে কোন কোন চিঠিতো প্রবন্ধকেও ছাড়িয়ে গেছে, কত নতুন তথ্য ও তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে চিঠির অক্ষরে অক্ষরে।

এই উল্লেখযোগ্য চিঠি ছাড়াও প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে আসত যে শত শত চিঠি, সেগুলিই শুধু সংখ্যায় বেশী নয়, বৈচিত্র্যেও এইসব চিঠির জুড়ি নেই। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকেই এই ধরনের চিঠি বেশী আসতে থাকে। ১৯৩৩ সালে অনিলকুমার চন্দ কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার পর জবাব না দেওয়া এই চিঠিগুলি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। অনিলকুমার চন্দ ও সুধীরচন্দ্র করের দূরদর্শিতায় ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১—এই আট বছরে কয়েক হাজার চিঠি জমা হয়ে অছে।

এই চিঠিগুলিকে অনিলকুমার চন্দ বলেছেন, 'ছিটগ্রস্ত লোকদের অবান্তর চিঠি।' যে ফাইলে এই সব চিঠি রাখা হত চলতি কথায় তাকে বলা হয় 'পাগলা ফাইল।' এই পাগলা ফাইল নিয়েই আমার এই রচনা। গান্ধীজী,সুভাষ বসু,

জওহরলাল, বার্নাড শ, বুদ্ধদেব বসু, দিলীপ রায়, প্রিয়নাথ সেন, রামানন্দ বাবুদের লেখা চিঠির খবর আমরা রাখি, কিন্তু পাগলা ফাইলের অবান্তর চিঠির কথা সকলে জানেন না।

এই চিঠির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবতেন? খুব অপছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। তবে বাড়াবাড়িতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হতেন। এই সম্পর্কে রাণী চন্দকে কী বলেছেন শোনা যাক:

"যে সমস্ত কাজে অকাজে এতকাল জড়িত বিজড়িত ছিলুম তার জাল কেটে একেবারে ফাঁকায় বেরিয়ে পড়বার জন্য চিত্ত উৎকন্ঠিত। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালা মেসেজ চায়, কবি চায় অভিমত, জননী চায় কন্যার নাম, মুসলমান চায় তাদের প্রভুর নামে স্তবগান, মাদ্রাজী গ্রন্থকর্তারা চায় গ্রন্থের ভূমিকা, ডাকযোগে পত্র আসছে প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায়, মাসিকপত্র গদ্যে পদ্যে রসদের নিয়মিত বরাদ্দ দাবি করে, পাতানো নাতনীরা অভিমান করে, সুধীর কর আসেন পা টিপেটিপে প্রুফ নিয়ে, নানা প্রস্তাব নিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হল আমার বড়ো হবার শাস্তি। বেশ ছিলেম পদ্মার তীরে তীরে নদীর স্রোতে। সহজ আনন্দের দিন ছিল তখন। সেইদিন কি আর ফিরে পাব?"

শুধু কি চিঠি, কত রকমের লোকই না আসতেন তাঁর কাছে। রাণী চন্দের 'গুরুদেব' বই থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিই: "বিচিত্র রকমের অতিথি আসত গুরুদেবের কাছে। তাঁদের সবাইকে তিনি সয়ে নিতেন। একবার এক মান্যগণ্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক এলেন সস্ত্রীক। গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, ভদ্রমহিলাও বুঝি ভাবলেন কিছু একটা বলা উচিত, তাঁদের কথার মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, রবিবাবু, আপনি এখনও কবিতা টবিতা লেখেন? আমরা তো শুনে থ। গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে নিমীলিত নেত্রে বললেন, 'তা, হ্যাঁ—এখনও একটু লিখি বৈকি।' পাগল—পাগল আসত কত রকমের। এত রকমের পাগল যে আছে সংসারে, গুরুদেবের কাছাকাছি থেকে না জানলে তা' ভাবতেই পারতাম না কখনও। উন্মাদ, সাজা-উন্মাদ, সে কত রকমের। কাউকে তিনি কাছে আসতে বাধা দিতেন না। সকাল হতে একদিকে চলত গুরুদেবের লেখার কাজ, আর এক দিকে বইত লোকজনের অনবরত আসা যাওয়ার স্রোত। বিরাম ছিল না এর। অবারিত দ্বার। কেউ দেখা করতে এসে ফিরে গেছে শুনিনি কখনও। আশ্রমেরও ছোটো বড়ো সকলে কাজে অকাজে দিনে কত বার আসছে যাচ্ছে, কখনও বিরক্ত হতে দেখিনি তাঁকে। দূর দূরান্ত দেশ-দেশান্ত হতেও কত শতজন আসতেন। সময় নেই অসময় নেই, হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য নানা সময়েই নানা রকম পাগলের সঙ্গে থাকতেও হয়েছে। শান্তিনিকেতনে পাগলের প্রাদুর্ভাব ছিল সব সময়েই। প্রমথনাথ বিশী তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বইয়ে 'মণিকবি' প্রমুখ দু'চার জন পাগলের

সরস বর্ণনা দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সব পেয়েছি'র দেশে' বইয়েও এই রকম কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিছু শোনানো যাক—

খুব নাটুকে সুরে গদ্যে পদ্যে মেশানো কতগুলো বিলাপ শোনা গেল—মা জননী, আমি কি তোর সন্তান নই, আমাকে কি খেতে দিবি না ?, ইত্যাদি। একটু থামে, তারপর আবার শুরু হয়। মিনিট পাঁচেক চুপ করে শুনলুম, ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার ঠেকল না। অথচ ব্যাপারটা তলিয়ে না-দেখে তো শোয়া যায় না।

…আস্তে আস্তে লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। শীর্ণ চেহারা, শীর্ণ কাপড়, হাতে হাতকড়া আছে, কিন্তু আটকানো নেই। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই, লোকটি প্রকৃতিস্থ নয়। কবি আর পাগল এক জাতের জীব একথা সর্বদাই শুনি, কিন্তু এই স্তব্ধ নির্জন রাত্রে একে ঠিক আত্মীয়ভাবে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না। এমন কি একে দেখে খুব যে খুশি হলুম, তা'ও বলতে পারিনে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী চাও এখানে ?' 'আমি ঠাকুরকে দেখতে এসেছি।' 'কোন ঠাকুর ?' 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' আমরা বললুম, 'তিনি তো এখানে থাকেন না। ঐ যে বড় বাড়ি দেখছ, সেখানে থাকেন বলে শুনেছি।' কথাটা এই আশায় বললুম যে উত্তরায়ণ অঞ্চলের কাছাকাছি গেলেই সে হয়ত প্রহরীর নজরে পড়বে। কিন্তু ও-কথা শোনা মাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার উৎসাহ যেন একদম মিইয়ে গেল। বলল, 'আমাকে কিছু খেতে দেবেন ?'

বুদ্ধদেব বসু আর এক পাগলের কথাও বলেছেন সেই সময়কার শান্তি-নিকেতনে।—সে সময় বোধ হয় পাগলামির একটা হাওয়াই এসেছিল। কারণ পরের দিনই আর এক পাগলের পায়ের ধুলো পড়েছিল উত্তরায়ণে। ইনি মেয়ে। বর্ধমান থেকে এসেছেন কোলে একটি পোষা বেড়াল, রেলগাড়িতে কাপড়ের তলায় ঢেকে এনেছেন শিশুর মত করে। এসে খবর পাঠিয়েছেন, 'বৌঠানকে গিয়ে বল জোড়াসাঁকো থেকে সরলা দেবী এসেছেন।' প্রতিমা দেবী এসে অবাক। পাগল হলেও তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, খোঁজ খবরও রাখেন দেখা গেল, তাছাড়া ঘরের নানা সামগ্রীর উপর বেশ একটু দৃষ্টিও নাকি ছিল। শূন্য হাতে তিনি ফিরে যাবেন, এমন বোধ হল না, তাই কিছু টাকা দিয়ে পাগল বিদেয় করা হল।

শুধু কি শান্তিনিকেতনে, জোড়াসাঁকো বাড়িতেও ছিল পাগল ও ছিটগ্রস্তদের আড্ডা। রবীন্দ্রনাথের দুই দাদা—বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন উন্মাদ-রোগগ্রস্ত। বলেন্দ্রনাথের বাবা বীরেন্দ্রনাথের উন্মাদরোগ দেখা যায় বিয়ের পর, একেবারে মত্ত অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাকে বন্দী রাখতে হয় ঘরে। অনেক সময় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেও হত। বীরেন্দ্রনাথ যে ঘরে বন্দী থাকতেন, তার চার দেয়ালে দেখা যেত অঙ্ক আর অংক। গণিতের কঠিন সমস্যার সমাধান তিনি করতেন দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে।

সোমেন্দ্রনাথও ছিলেন পাগল। বিয়ে করেননি। পিঠোপিঠি ভাই, ভাই রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে অন্যদের বলতেন, দেখ, দেখ, আমাদের বাড়ির কেরাণীকে দেখ, বসে আবার বসে কেবল লিখছে। আবার নাতিদের ফিসফিস করে বলতেন, জানিস্ তো, গীতাঞ্জলির সব কটি কবিতাই আমার লেখা।

বীরেন্দ্রনাথ বা সোমেন্দ্রনাথ তো বাড়ির ছেলে, অনেক বাইরের পাগলেরও যাতায়াত ছিল ঠাকুরবাড়িতে। প্রতিভা ও পাগলামির এমন বিচিত্র সহাবস্থান আর কোথাও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপু বাবুতো পাগল পুষতেন। বাইরে থেকে অনেক পাগল আসত, আর বখশিস নিয়ে যেত। সেই পাগলরা সত্যিকারের পাগল কিনা, তা' যাচাই করতেন সোমেন্দ্রনাথ।

দ্বিপেন্দ্রনাথের মত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা সুধীন্দ্রনাথেরও পাগল পোষার শখ ছিল। একজন আসতেন মেমসাহেবের গাউন পরে, আর একজন আসতেন শুধু সেমিজ গায়ে। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডিচরণ ব্যানার্জির ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ ছিলেন পাগল। তিনি ওই আসরে আসতেন এক খেলনা মেশিনগান নিয়ে; এসেই রবীন্দ্রনাথের ঘরের দিকে তাক করে বলতেন, এই মেশিনগানের গুলিতে রবি ঠাকুরকে ঠান্ডা করে দেব।'

রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। এই রকম একজন পাগল রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে হাজির। বললেন তাঁর সমস্যার কথা। দশখানা লুচি খেলেই তাঁর পেট ভরে যায়, অথচ "আমার স্ত্রী আমাকে রোজ পনেরো খানা লুচি খাওয়াবেনই। এখন কী করা যায় বলুন তো?" রবীন্দ্রনাথকে ভদ্রলোকের পরবর্তী বক্তব্য—"শুনেছি এই বাড়িতে নানারকম সমস্যার সমাধান হয়, তাই চলে এলাম।" রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, "ঠিকই শুনেছেন, ঠিক বাড়িতেই এসেছেন, তবে ঘরটা ভুল হয়ে গেছে। আপনি সিঁড়ি বেয়ে ডান দিকে গেলেই এক বিরাট বৈঠকখানা দেখতে পাবেন। সেখানে গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক (দ্বিপুবাবু) বসে আছেন, তাঁকে বলুন, তিনিই আপনাদের মত লোকদের নাড়াচাড়া করেন, তিনি আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবেন।"

এই পাগলামির পরিবেশে থাকলে পাগলাদের চিঠি যে অনেক আসবে, তাতে বিচিত্র কী। সেই চিঠি সংখ্যায় এত বেশি যে রবীন্দ্র রচনাবলীর মত খণ্ডে খণ্ডে ছাপানো যায়। সেই পাগলা ফাইল থেকে আমি বেছে নিয়েছি যাট পঁয়ষট্টিখানা চিঠি। সেই চিঠিগুলিই উপহার দিলাম পাঠকদের কাছে।

এই পাগলা ফাইলের ভিতরেই বন্দী হয়ে পড়েছিলেন হেমন্তবালা দেবী। খদ্যোৎবালা দেবী জোনাকী দেবী নাম দিয়ে যেসব মজার মজার চিঠি তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখতে শুরু করেন, তা সুধীরচন্দ্র কর মশাই পাগলা ফাইলে চেপে দেন। তারপর খদ্যোৎবালা আত্মপ্রকাশ করলে পাগলা ফাইল থেকে আগেকার

চিঠিগুলি বের করে আনা হয়। জীবনের শেষ দশ বছর এই হেমন্তবালাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠদের একজন।

হেমন্তবালার ছদ্মনামী পত্র ছাড়া পাগলা ফাইলের একখানা চিঠিও প্রকাশিত হয় নি। গত জুন মাসে সেই ফাইলের সন্ধানে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। উপাচার্য সুরজিতচন্দ্র সিংহ এবং রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্তের আনুকূল্যে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদনে ফাইলটির খোঁজ করি। অবেক্ষক সনতকুমার বাগচি কিছু চিঠি বের করে দেন। কিন্তু দেখলাম, সংখ্যায় তা যথেষ্ট নয়। তারপর শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের বাড়িতে গিয়ে ফাইলটির কথা উল্লেখ করতেই তিনি বের করে দেন পেটমোটা বিরাট দুটি চিঠির ফাইল। কবির একদা-সচিব অনিলকুমার চন্দ অতি যত্নে সাজিয়ে রেখেছেন ছিটগ্রস্ত লোকদের অবান্তর চিঠি। ফাইল খুলে আমি অবাক। এত চিঠি। কমপক্ষে হাজার দুই। আর বিষয় বৈচিত্র্য? অসাধারণ।

চিঠি গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বদ্ধ উন্মাদের চিঠি (২) আধ-পাগলার চিঠি এবং (৩) ছিটগ্রস্তের চিঠি। আবার চিঠির বক্তব্যও মোটামুটি চার রকমের—(১) কবিতা সংশোধন করে দাও, (২) কিছু টাকা পাঠাও, (৩) অটোগ্রাফ বা রচনা দাও এবং (৪) অর্থহীন প্রলাপ। তারই মধ্যে বহরমপুরের সুবাস নামধারী এক বদ্ধ উন্মাদ মহিলা নিজেকে কবির বিবাহিতা অথচ পরিত্যক্তা পত্নী হিসাবেই চিঠি লিখে বসে আছেন! সর্বাধিক চিঠি আবদুল মজিদ নামে এক ভদ্রলোকের। সে সব চিঠির মর্মার্থ উদ্ধার করা কঠিন। তবে তিনি পুরো পাগল নন, আধপাগলা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দীতে লেখা কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। তাছাড়া নানা ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের অনুরোধও কবিকে করেছেন অনেকে।

এই সব চিঠির জবাব রবীন্দ্রনাথ না দিলেও তার ব্যক্তিগত সচিবরা যে প্রত্যেকটি চিঠি পড়েছেন তার প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয় কোন কোন চিঠি বা তার সারাংশ রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনান হয়েছে! অর্থসাহায্যপ্রার্থী জনৈকের চিঠির কোণে কবির নির্দেশ দেওয়া আছে—'অনিল জবাব দেবেন।'

চিঠিতে অদ্ভুত অদ্ভুত ঠিকানাও রয়েছে। বিলেত থেকে প্রায়ই লেখা হত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইণ্ডিয়া।' একজন লেখেন প্রোফেসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্কোয়ার, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই।' সেই চিঠি ডাক ছাপে বোঝাই হয়ে আসে জোড়াসাঁকো। জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন! শান্তিনিকেতন থেকে অবশেষে কালিম্পং। মাঝখানে ডেড্‌লেটার অফিসের ছাপ। আর একখানা চিঠির খামের সারা গায়ে কবিতা লেখা। ভেরি ভেরি আর্জেণ্ট আখ্যা দিয়ে বেয়ারিংয়ে পাঠানো এই চিঠির সম্বোধন হল—হিজ ম্যাজেস্টি দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোর। তার উল্টো দিকে খামের গায়েই লেখা—

শক্তি বিরাজে কল্যাণীর

প্রেমময় হৃদয়ে

যুদ্ধ কর প্রাণপণে
লভিবার তরে।
অকালে মাতা করিলেন
প্রতিষ্ঠা দেবের
চিত্তপদ্ম কুড়ায়ে নিলেন
অর্চিতে তারে।
সব যাহা ফুটেছিল ভারত ভিতর
ভ্রমরেও গুঞ্জন করে
মধু লয়ে তার।
আমি দেখি না তারে
হেরিয়া হিয়ায়
মনে মনে এই কথা
মনে পড়ে তায়
স্বপনের ফুলমালা
দিল তব কণ্ঠে
বলেছিল হেসে মরে
দিব আমি বটে।
ভগবান যদি
সকলের আশা পূরণ করতো তবে
জগতে দুঃখী কে হত ?
সকলেই সুখী হত।

এই তো কবিতার ছিরি। এমনি কবিতার ছড়াছড়ি পাগলা ফাইলে। শুধু কবিতাগুলি আলাদা করেই একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করা যায়। তবে প্রকাশের কাজ শেষ হওয়ার পর সংকলক সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

সে যাই হোক, চিঠির তাড়ার মাঝখানে দিশেহারা হয়ে প্রথমেই একখানা খাম খুলে দেখি, কবেকার এক গোছা সোনালী চুল। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। প্রেরক জনৈকা পর্তুগীজ সুন্দরী। তার নাম মারিয়া এলিজা দ্য কামপোজ আলকুকার্কি। নিবাস লিসবন, পর্তুগাল। ঠিকানা মেরিদা-আবেনিদা আলমিজানতে রেইজ। চিঠিতে ডাকছাপ ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসের। তিনি কী লিখেছেন পর্তুগীজ জাননেওয়ালারা ভাল বলতে পারবেন। মাছিমারা কেরাণীর মত তুলে দিলাম তার চিঠির বয়ান—

Senor pedia a V. O. favor de me enviar rue horoscopio O she muni to agradee.

ব্যস ওইটুকুই। মহিলাটি রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা দিয়েছেন—ওমরখৈয়াম

স্ট্রীট—৩৫ হায়দরাবাদ। অনেক জায়গা ঘুরে, অনেক ডাকছাপ বুকে নিয়ে দীর্ঘ দিন পর সকেশ পত্রখানি শান্তিনিকেতনে পেঁছিয়।

১৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, পশ্চিমাংশ, একতলা, কলকাতা থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৪, ১৩৪২ তারিখে ছোট একখানা চিঠি : রবীন্দ্রনাথ, আমার ব্যথায় কে? শ্রীবেচারাম দত্ত।

সাভার, ঢাকা থেকে লিখছেন অমল রায় : আজ বড় আশা মনে নিয়ে আপনার নিকটে কবিতা পাঠাতে মনস্থ করেছি। আপনি নাকি প্রেরিত প্রবন্ধাদি কারেক্ট করে দেন। তাই আমার উচ্চাশা।

ভায়া খানাকুল জেলা হুগলি রাজহাটি বন্দর পোঃ সেনহাটি গ্রামের শ্রীশক্তিশংকর পাইন একটি কবিতা পাঠান। আট লাইনের কবিতা। উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ।

অসীম তোমার বিরাট কোলে
বিশ্ব আমার কোথায় দোলে?
আমারা কোথায় তোমার মাঝে
তোমার কোন চরণ তলে?
হে অনন্ত সুনীল বরণ
বুঝার বাইরে তুমি,
তারই প্রতিচ্ছবি বিকাশ
ইহাই কঠোর সত্য মানি।

১৯৩৮ সালের ৫ আগস্ট কলকাতা (৪-৮-আর-এন-টি ক্যাল) থেকে টি. কে. বৃন্দাবন এক টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামের বক্তব্য—'ব্রিং গান্ধী অরবিন্দ টুগেদার।'

জেলা মেদিনীপুর পোঃ নাচিন্দাবাজার গ্রাম রানিয়া থেকে জনৈক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মান্না ১১।৩।৩৫ তারিখে 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানা পোস্ট কার্ড পাঠান। তাতে সামান্য একখানা অনুরোধ আছে। পত্রদাতা কবিকে কেন যে পেঁপে-বিশারদ বলে ধরে নিয়েছিলেন বলা মুশকিল। তিনি লিখেছেন—প্রণাম নিবেদনমিদং মহাশয়, বড় লম্বা সাইজের পেঁপের বীজ বাগানে গাছ করাইবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। আমাদের এ অঞ্চলে ঐ প্রকার পেঁপে অথবা উহার বীজ পাওয়া যায় না। আপনার ওখানে পাওয়া যায় জানিয়া আপনাকে ঐ বীজ কিছু পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি আপনি দয়া করিয়া কিছু বীজ ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি। বিনীত...

পুনশ্চ নিবেদন এই যে, উক্ত বীজ পাঠাইবার ডাক খরচ ইত্যাদি আমি বহন করিব।

ভাগ্যিস এই আশ্বাস দিয়েছিলেন, নইলে রবীন্দ্রনাথ কী করে পেঁপের বীজ

মেদিনীপুরে পাঠাতেন। যেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পেঁপের বীজ তৈরি করা নয়, সমস্যা পাঠানোর ডাক খরচ নিয়ে। পত্রদাতা হয় অতি সরলমতি, নয় পাগল।

আগের চিঠির লেখক পাগল কিনা কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকলেও নিচের পত্রদাতা যে ঘোর উন্মাদ, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৩৪ সালের ২৪ অক্টোবর রংপুর থেকে কে এক মকবুল আমেদ যে চিঠি লিখেছেন, তার ঠিকানা হচ্ছে, 'নির্জন কক্ষে, শূন্য বক্ষে।' তিনি সম্বোধন করছেন 'সম্রাট' বলে। তিনি কবিকে পাঠিয়েছেন কবিতার ধাঁধা। রবীন্দ্রনাথের হাতে তো অঢেল সময়, বেকার বসে থাকতেন সারাদিন, তাই কবিতার পদ পূরণের জন্যে তার চেয়ে ভাল আর কে থাকতে পারে। মকবুল সাহেব লিখেছেন—সম্রাট, সর্বদাই মঙ্গল কামনা করে থাকি তোমার। ভাষাহীন মূর্খ বলে কিছু মনে নিও না। জ্ঞানী তুমি, বিদ্বান তুমি, কবি তুমি, সাত দিনে মিলিয়ে বা পুরিয়ে দাও না লাইন কটি?

স্বর্ণের———
বন্ধুত্বও————
সুখভানু প্রকাশিলে
কতই সুহৃদ মিলে
আসিলে বিপদবাহু সে সুখতপন
কোথা চলে যায় তারা হায় রে
নহে————
সময়ে————
দুঃখের লক্ষণচয়
যেই প্রকাশিত হয়
তোষামোদে
জরাগ্রস্ত————

তারপর নিবেদনঃ সাত দিনের মধ্যে কৃতকার্য হতে না পারলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কারণ অভিশপ্ত আমি, আমার শান্তি নাই। ইতি, সেবক 'মকু।'

এম. এ. আজম, বি-এস-সি (ক্যাল), এম এস সি (আলিগড়) সাহিত্য বিশারদ, থাকেন কলকাতার ১৫ নং চেতলাহাট রোডে। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠান্ডায় তিনি বিয়ে করতে চলেছেন। পাত্রী রওশন আরা। এতবড় একটা যুগান্তকারী সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে না জানালেই নয়। পাত্রপাত্রী দু'জন একসঙ্গে লিখেছেন—

কবিগুরু, আসছে ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার আমাদের বিয়ে। তোমার আশিসবাণী আমাদের এ নতুন যাত্রার আয়োজনকে সর্বসার্থকতায় ভরে তুলবে।

ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করলে তোমায় অভিশাপ দেব কিন্তু। ইতি, তোমার আশিস কাঙাল—

এম এ আজম, রওশন আরা।

নদীয়া জেলার বালিয়াডাঙ্গা সাধন কুটিরের শ্রীমান কেবলানন্দ কেবল একটি অনুরোধ নিয়েই কবির করুণাপ্রার্থী ঃ

পূজনীয় কবিবর, প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং পত্রপাঠ মাত্র জবাব দিবেন আপনার একটি গানের ছন্দের ভাষা বুঝতে পারি নাই। আশা করি সম্পূর্ণ সংগীতটির সরল ব্যাখ্যা করে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। "এবার যদি মরতে না পাই তবু আমার মরণ ভাল।" এই ছন্দটির অর্থ কী? বুঝতে না পেরে বড়ই ধাঁধায় পড়ে গিয়েছি। আশা করি পত্রপাঠ আমার সংশয় ছেদন করে বাধিত করবেন। নিবেদন ইতি।

প্রণত, কেবলানন্দ

পত্রদাতা জীবনকুমার পাল। কেয়ার অভ অনাথবন্ধু পাল। ঠিকানা পোঃ অ্যান্ড ভিল—ভোজেশ্বর,—জিং ফরিদপুর। তিনি ২৪।৪।২০ তারিখে "টু বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার—এই সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথের একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেন এমনিতে। রবীন্দ্রনাথের লেখা তো কেউ ছাপায় না, পাল মশাই তাঁর কাছে কিছু লেখা পাঠাতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি লিখছেন—

সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও আজ একটা আবেদন নিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। আশা করি বিফল মনোরথ হইব না। দয়া করিয়া 'অদৃষ্টের ফের' নাম দিয়া একটি ছোটখাট (ফুলস্কেপ কাগজের ২।৩ পৃষ্ঠা) ঔপন্যাসিক গল্প লিখিয়া পাঠাইবেন। আর আপনার চয়েস মত একটি কবিতা (ছোট) বা গল্পও তৎসহ লিখিয়া পাঠাইতে সংকোচ বোধ করিবেন না আশা করি! আমি একজন আই-এ পাশ স্টুডেন্ট। সেই স্ট্যান্ডার্ড মতোই লিখবেন। যত সত্বর পারেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্প ২টি পাঠাইবেন। ইতি। সঙ্গে এক আনা স্ট্যাম্প দিয়া দিলাম। ২০ বৈশাখের মধ্যেই পাঠাইবেন।

পরবর্তী চিঠিখানা সাংঘাতিক। ভদ্রমহিলা বদ্ধ উন্মাদ। নইলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন অশালীন কটাক্ষ তিনি করতে পারতেন না। বহরমপুর থেকে ৭ আষাঢ় লিখছেন—

প্রিয়তম নাথ, তোমার চিঠি পেয়েছি। এতদিন পরে যে এ দুঃখিনীর কথা মনে করেছ, এই আমার সৌভাগ্য। তবে আবার রাগ করব কেন? আমার দিনগুলো যে কিভাবে কাটছে তা যদি তুমি এতটুকুও বুঝতে পারতে, তাহলে

একখানা পত্র লিখতে এত দেরী করতে না। যাক, তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে? এ বাড়ির সব ভাল আছে। তোমার ছেলে ভালই আছে। তুমি আমার প্রাণভরা ভালবাসা জেনো। চুমো দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ইতি,

তোমারই সুবাস।

পুঃ॥ দিদিমা কাল রাতে এখানে আসবে। চিঠি লিখতে দেরী করো না।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কোন শয়তানের বানানো চিঠি নয় তো? পরে দেখলাম হাতের লেখা সত্যিই মেয়েলি এবং পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব।

আর একখানা 'মহামূল্যবান' চিঠি। পত্রদাতাকে শুধু ছিটগ্রস্ত বললে উচিত মন্তব্য হবে না। তিনি তার চেয়েও বেশি। চিঠিখানা হুবহু তুলে দিলাম—

Arya Nibas

Not a Anarya nibas

28-2-40

Night 11-15 p.m.

My Dear Bura Sahib

Dear Sir,

With due respect and humble submission I beg to bring your notice that I have very sincerly made up my mind to go to your Santiniketan on the 2nd of March and to stay there for a week or more as a non-paying but enjoying guest. This is my prayer.

I, therefore, solicit the favour of your honour's very kindly granting my prayer. I think and hope I shall not prove unworthy of your kind selection. Now I fervently hope that my prayer would be granted for which act of kindness my forefathers will remain grateful to you and I shall ever pray. With kind regards. Yours lovingly 28-2-40.

P. S. I hope, Rathindra's daughter will be present.

পত্রের পুনশ্চতে শান্তিনিকেতনে যাবার আগ্রহ এবং মূল কারণ শেষ লাইনে জানা গেল।

৬৮বি যতীন দাস রোড কলকাতা থেকে ১৯৩৯ সালের ২৩ জুন লিখছেন—

Maharshi Rabindranath Tagore.

In the early part of November 1938 I had a Godvision in

which he told me that he was going to remove me to Calcutta and that my family (wife and five children) would stay in a house by the lake while I would spend the rest of my life in Santiniketan building up men 'for the world'. He threatened to give me illness then death. If disobeyed and refuse to leave my work and go to India within 4-1/2 months the Government forced me to leave pension on the ground of ill health—meaning I was mad.

শেষ বাক্যে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত। কেন যে এটা তিনি আগে বুঝতে পারেন নি, তাই বোঝা গেল না।

দ্বারভাঙ্গার মধুবনী থেকে পত্রদাতা আলী রাজা। তারিখ ২১।৩।৩৮। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ধরে নিয়েছেন বেকার জ্ঞানী হিসেবে। তাই এমন একটি বাক্যের ব্যাখ্যা চেয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে না জানালেই নয়।

Dear Sir,

I shall be highly obliged if you write me the explanation of 'I was born without knowing why I have lived without knowing how and I am dying without knowing why or how." These lines I have seen in the book 'pecae and happiness' I asked several men but I was not satisfied with them. Now I plucked up courage to write you. I hope you will not get angry with me.

মণিপুরের লোকেরা নাচের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তাদের কেউ কেউ যে ইংরেজি কবিতা রচনায় পারদর্শী, তা পাগলা ফাইল খুললেই জানা যায়। ২৫।৩।৩৯ তারিখে ইমফল থেকে ক্লাস ফাইভের এক ছাত্র কবিতা রচনার রহস্য জানবার জন্যে অনবদ্য একটি কাব্য পাঠিয়েছেন কবিকে।

Anxious to learn poetry composing.

Am I to distingushed family belonging.

My examination from 23rd commencing.

And on April 3rd ending.

Your kind reply I receiving.

On 20th April will be leaving Manipur for Santiniketan, pleasing.

Place, as its glory assailing

My eardrum for news collecting to enlist I am requesting. You, my name as student who shall always be prudent of your poetry lesson interesting.

Wish I hope you granting.

I enclose one anna stamp attach herewith. Thanking you in anticipation. I am your most obedient pupil Rajbahadur Kulashrestha. Govt. High School Class V. Manipur.

বকসিবাজার ঢাকা থেকে 'পৃথ্বী' নামক একজন অর্থাভাবে পড়েছেন। তাঁর প্রচুর টাকার দরকার। তাই শরণ নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের।

প্রিয় কবিবরেষু, আপনার শরীর বিষয়ে আমি অজ্ঞাত। প্রার্থনা করি, আপনি যেন আরো বেঁচে বায়ুকে দান করেন। জগত যেন চিনতে পারে, এ বিশ্বাস আছে। এখন আমার বলা। আমি যা করতে যাচ্ছি, তা হয়ে উঠছে না। শিশুকাল থেকে সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম। একটু বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি: অমনিই বিপদ এসে বাধা দিল। যাক্, ঝাড়া দিয়ে উঠেছি। প্রচুর টাকার দরকার। কিছু দিলে কৃতকার্য হব। আমি জোর আশা করি। আপনার এ শান্তিনিকেতন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার। মানুষ চিনবে। বিশেষ লিখলাম না। দুর্বল। ইতি, পৃথ্বী, ৫ই মার্চ।

এত ধানাইপানাইয়ের মাঝখানে জ্ঞানটি টনটনে। 'প্রচুর টাকার দরকার, কিছু দিলে কৃতার্থ হব'—এই বাক্যটিই পত্রের সারাংশ।

জলপাইগুড়ি থেকে ২৩।৮।২৫ তারিখে অর্থসাহায্য চেয়ে আর একখানা চিঠি:

শ্রীচরণকমলেষু, অসংখ্য প্রণামপূর্বক নিবেদন এই যে, বহু দুঃখকষ্টে নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া অদ্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আশা করি, ঈশ্বরকৃপায় তাহা পূর্ণ করিবেন। তিন চার বৎসর ধরিয়া বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিতেছি। কিন্তু অত্যন্ত দারিদ্রতাহেতু শেষ অবধি কৃতকার্য হইয়া উঠতে পারিলাম না। এই দারিদ্রতার সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে একমাত্র আপনার সাহায্য বিনা কোন উপায় ভাবিয়া পাইলাম না। যদি আপনি এই মাতৃপিতৃহীনকে মাসিক কিছু অর্থসাহায্য করিয়া জ্ঞানলোকের পথে অগ্রসর করেন, তাহা হইলে আপনার শ্রীচরণে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীচরণে নিবেদন। ইতি, আপনার ভারি স্নেহের আশু। আমার ঠিকানা শ্রীআশুতোষ সরকার, সোনাউল্লা হাইস্কুল, ৮ম শ্রেণী জলপাইগুড়ি।

এই চিঠির মার্জিনে বাড়তি একটি নোট আছে। নোটটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ। তাতে লেখা 'অনিল জবাব দেবেন।' অনিল মানে অনিলকুমার চন্দ।

এলাহাবাদ থেকে ১৪।৭।৩৫ তারিখে লেখা চিঠিতেও টাকার কথা। সাহায্য নয়, এবার ধার। যেন রবীন্দ্রনাথের মহাজনী কারবার।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনি কিছুদিনের জন্যে ৫০ টি টাকা ধারস্বরূপ আমাকে দিয়া সাহায্য করিতে পারেন, যাহা আমি যথাসময়ে পরিশোধ করিব। কতখানি যে প্রয়োজন তা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যদি পারেন। এসময় হয়ত ভবিষ্যতের পক্ষে আমার অনেকখানি উপকার হলেও হতে পারে। এ প্রস্তাব আপনার কাছে না করলেই ভাল হত। কিন্তু ভালবাসিবার অধিকার পেয়েছি বলে তাই বোধ হয় করতে পারলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি, বিনীত শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ঃ কেয়ার অভ মাতৃভাণ্ডার। ৭৪ জনস্ জানগঞ্জ, এলাহাবাদ।

অর্থ সাহায্যের আর একটি আবেদনের ভঙ্গী চমৎকার

Entally Calcutta.

Dated the 19th Aug. '35

May it please to your Highness Honourable Sir Maharaja Rabindranath Tagore.

Your petitioner beg to remind your Highness his petition dated the 18th April last addressed Calcutta 'palace' unfortunately no reply as yet to hand your petitioner requested your highness to his previous petition for a monthly aid and shelter to any Brahma mission (Bolpur E.I.R. or Calcutta). Your petitioner is now quite helpless state without any means.

Doing this favour asked for your petitioner well for ever grateful to your highness.

Your Highnesss's most obedient servant.

Munshi S. Ahmed Ali

(Faquir Hermit)

Lms. H. M. M. C. (Cal)

নরওয়ে থেকে আর একখানি চিঠিঃ পত্রদাতা ইনগার এইচ সোলবার্গ নামে এক কিশোর। ছেলেটি অটোগ্রাফ শিকারী। টাকা চায় না, সই চায়।

Dear Sir, I am 13 years old living at Slabekk a little place near Oslo, the capital of Norway., I have some years been collecting autographs and I have Lloyd George Thomas Masaryk Rommain Rolland and others. I shall be very glad if might get yours.

৮ আগস্ট ১৯৩৫ সালের চিঠি। ইনি ছিটগ্রস্তের চেয়েও বেশি। এই ভদ্রলোকের অনেকগুলি চিঠি আছে ফাইলে।

শ্রীচরণেষু, কয়েকদিন পূর্বে একখানি পোঃ কার্ড ও অব্যবহিত পরেই একখানি এনভেলপের চিঠি লিখিয়াছিলাম। আশা করি দু'খানি চিঠিই পাইয়াছেন। বোলপুর টাউনে চন্দ্রমোহন দাশ ব্রাহ্ম বিদ্যালয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও এই ধর্মে দীক্ষিত ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য স্থাপিত হইবে। লন্ডন ইউনিভার্সিটির স্ট্যান্ডার্ড পড়ানো দরকার। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দী। হিন্দু ছাত্রী অথবা ছাত্রীদের জন্য সেখানে কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। ছাত্র ও ছাত্রীগণের সংখ্যা প্রথম কম হইবে বটে, কিন্তু তাহাও ভাল। ইতি, আশীর্বাদ-আকাঙ্ক্ষী, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস।

২৭।১০।৩৭ তারিখে ময়মনসিং থেকে লেখা এই সুধীন্দ্রনাথ দাসের পর পর দুখানি চিঠিই গোলমেলে। পত্রদাতা এবার নিজেই আভাস দিয়েছেন তাঁর মাথায় গোলমাল আছে। তিনি লিখছেন—

শ্রীচরণেষু, ময়মনসিংহ জেলার হোসেনপর ধনকুড়া হইতে সর্বসাকুল্যে সাতাইশ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে ; ভাবখানি আপছর (?) সরকারের বাড়ি হইতে আমার হাতের স্প্রিং কেইন ক্লাবটি আজ তিনদিন হইল চুরি হইয়াছে। প্রাচীন মাথাবেদনা ও জ্বরে কাতর। অধিকন্তু অর্থাভাবে অতিকষ্টে দিন যাইতেছে। ছোট কাকাকে টাকা পাঠাইয়া দিতে খবর জানাইলে খুশি হইব। আমার আমানত টাকা হইতে পাঠাইলেই চলিবে। ময়মনসিংহ সরকারি গভঃ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতেছি। ইতি, সুধীন্দ্রনাথ দাস।

পুঃ। ময়মনসিংহ পোঃ আং হইতে ২২।১০।৩৫ তারিখে চিঠি পাইয়া থাকিবেন।

পরের চিঠিতে তিনি স্বার্থপরদের লোকদের যন্ত্রণায় কী ভাবে মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন তারই বিবরণ দিয়েছেন ঃ

জিলা ময়মনসিং পরগণা আলাপ সিং গভঃ কাছারি ফেরিঘাট পরপার ব্রহ্মপুত্র নদী হইতে অনুমান এক মাইল পূর্ব দিকে ফুলপুর থানা অভিমুখে যাওয়ার ভি. বি. রোডের উভয় দিকে বিস্তৃত আনন্দপুর ময়দানের ইন্দারা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে চারি মাইল দীর্ঘ এবং পূর্বে ও পশ্চিমে দুই মাইল প্রশস্ত সমভূমিতে একটি খরিজা তালুক সৃষ্টি করা হইল। ভারত সম্রাট বার্ষিক দুই টাকা খাজনা পাইবেন। প্রোপ্রাইটার মিঃ এস. এন. দাস। এইস্থানে পশ্চিমা লোক যাহারা শস্য উৎপাদন করিতে কর্মকুশল এই প্রকারের প্রজা সাধারণ অস্থিরতর জোতস্বত্ত প্রদান করিয়া দেওয়া হইবে। সেলামী ও খাজনা ক্রমশঃ স্থির করা হইবে। এইস্থানে বাড়ি করিতে হইবে। প্রজাস্বত্বের কবুলিয়ত লেখা না হওয়া পর্যন্ত উহারা চাকরাণ প্রজা উল্লেখে প্রথম কবুলিয়ত লেখা হইবে। এই চারি মাইল দীর্ঘ স্থানে চারিটি নূতন ভাল ইন্দারা ও চারিটি

নূতন টিউবওয়েল জলের কল মালিক তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। ঐ খরচ এই স্থানে উৎপন্ন শস্য হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ভারত সম্রাটের প্রাপ্য খাজানা ও আমার সমস্ত সম্পত্তি ও সর্বপ্রকারের ল্যান্ডলর্ড রাইট ভূমির আয় হইতে সংগ্রহ করা হইবে। খারিজা তালুক মিঃ এস. এন. দাস, আনন্দপুর মধ্যে অনেক বৃক্ষ আছে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে যে বৃক্ষচ্ছেদন নিষেধ। এই আদেশ অন্যথা করিলে প্রত্যেক বৃক্ষের মূল্যের দশগুণ ক্ষতি দিতে হইবে। ভাল কলা, সোনামুগ, সর্বপ্রকারের সব্জী, তরকারী, তিল, তিষি ও সরিষা এবং রোয়া ধান্য উৎপাদন করিবার কথা প্রথম চাকরান কবুলিয়ত পত্রে প্রত্যেক প্রজাকে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। ইক্ষু চাষ করিতে হইবে। এই সম্পত্তির সীমানা—উত্তরে বাইদ নিম্নভূমি, পূর্বেও এই বাইদের কতক অংশ এবং পুরাতন ইন্দারার নিকট মাইল পোস্ট হইতে দেড় মাইল স্থানে চিহ্নিত দক্ষিণে—ঐ স্থান হইতে তিন মাইল স্থানের সীমা ও পশ্চিমে বাহাদুরপুর ও পোয়াইর যাওয়ার ডি. বি. রোড, দীর্ঘ চারি মাইল এবং প্রশস্ত দুই মাইলের কম কিছুতেই নির্দিষ্ট হইতে পারে না। আমি অসুবিধা ও লোকঅপবাদ এবং হিংসুক লোকের গঞ্জনা ভোগ করিয়া অত্র ময়মন সিংহে মনকষ্টে সময় অতিবাহিত করিতেছি। স্বার্থপর লোকের কথাবার্তা অসহ্য মনে আমি আশ্চর্যজনক মনে করিতেছি যে রজনীকান্ত দাশ বি-এ খুল্লতাত কি প্রকারে এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইতি আশীর্বাদআকাঙ্ক্ষী,

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাশ, ময়মনসিংহ।

ঠিকানা অক্সফোর্ড মিশন, বরিশাল ইস্টবেঙ্গল। পত্রলেখক খ্রীস্টান। তাঁর মনোবেদনার কারণ বড় অদ্ভুত। রবীন্দ্রনাথ খ্রীস্টান নন জেনে তিনি বিস্মিত ও দুঃখিত।

পরম পূজনীয়, গুরুদেবের শ্রীচরণে আমার নিবেদন, আমি একজন নগণ্য বাঙালী খ্রীস্টান। আমার ধারণা ছিল জগতে যাঁরা কর্মক্ষেত্রে বড় তাঁরা সকলেই বড় খ্রীস্টান। আপনার সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। সেই ভুলটা আজ আমার ভেঙে গেল। সেই বিষয়টাই আপনাকে জানাচ্ছি। যখনই পড়ি অথবা শুনি যে, আপনি যীশুখ্রীস্টের খুব প্রশংসা করেন, তখনই আমার বুকটা গর্বে দু'হাত স্ফীত হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি খ্রীস্টান। আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি খুব বড়। আরো বিশেষ বুঝেছি যে, আপনি এশিয়া মহাদেশের বড় কবি এবং তারি সাথে বুঝেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই এশিয়া মহাদেশের ঈশ মানবের বড় দাস, বড় খ্রীস্টান হবেন; কিন্তু আজ যখন জানতে পারলাম যে আপনি একজন ব্রাহ্ম, বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভক্তিটাও একটু টলে গেল। যীশুখ্রীস্টের দাস, এই কথাটায় আমি যত বড় গর্ব আর কিছুতেই অনুভব করতে পারি না। আপনি হয়ত মনে মনে যীশুর অনুসরণ করেন। কিন্তু ধরুন আপনি যদি মনে মনে কবি হতেন, প্রেমে প্রেমে বয়ে বয়ে

দেশে দেশে আপনার কবিত্বের প্রতিভা যদি ফুটে না উঠত, তাহলে কি আপনি এত বড় কবি হতে পারতেন ? আমি যীশু খ্রীস্টের ক্রীতদাস, এই কথাই সর্বদাই বলি। আপনাকে এশিয়া ঈশ মানবের দাস বলিয়াছি। আপনি এই দাস কথাটায় নিশ্চয় খুব বিরক্ত হবেন। যীশু খ্রীস্টের দাস, এই নামটি আপনার উপর আরোপ করবার জন্য আমি আপনার কাছে কথা চাইব এবং আরো অনুরোধ করি আপনার কাছে, যেন আপনি আমার জন্য আপনার ব্রাহ্মদেবতার কাছে ক্ষমা চান দয়া করে। বিষয়টি খুব বড়। পড়বেন কি তা জানি না, তবে পড়লে খুবই গর্ব অনুভব করব। ইতি আপনার আশীর্বাদপ্রার্থী যীশু খ্রীস্টের ক্রীতদাস।

রাওয়ালপিণ্ডি মুরী রোডের আর্য মহল্লা থেকে জনৈক মহীন্দর সিং ১৯৩৭ সালের ১১ নভেম্বর 'Your most obedient son' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

My dear Sir,

May I have your kind advice on the following at your early convinience as I am in a fix and could not find any better personality to express my desires ইত্যাদি।

তার বাসনটা হল এই। সূর্যের আলোয় চলে এই রকম একটা ছোট ইনজিন তিনি বানিয়েছেন। সেটা রেজিষ্ট্রি করবেন কোথায় ? প্রদর্শনীতে পাঠাবেন কি ? সরকার কি উৎসাহ দেবে ? এই সামান্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

১৯৩৬ সালের ২৯ অক্টোবর ৪৯ চেস্টনাট স্ট্রিট মাসাচুসেটসের স্পেন্সার শহর থেকে লায়োনেল আনকইন যে চিঠি দেন, তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের অটোফটো অর্থাৎ সইসমেত ছবি চান। তিনি বার্নাডশ পিরানদেল্লো, আইভান বুনিন প্রমুখের অটো-ফটো আগেই নিয়েছেন, এখন চাই রবীন্দ্রনাথের। তিনি নিজেকে পরিচয় দেন 'ইয়োর অ্যাডমায়ারিং আমেরিকান ফ্রেন্ড।'

তারপরেই পত্রদাতার প্রশ্ন—

At present are you still writing poetry or novels ? How are conditions today in India. Have they improved much during the past ten years ?

৯।৩।৪১ তারিখে কবিচূড়ামণি বিমানচন্দ্র ঘোষ, এম. এস. সি, এম. এ, বি. এল, এডভোকেট হাইকোর্ট—'ইন অনার অভ দি ওয়াল্ড পোয়েট' বিরাট ইংরেজি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতার শেষ দু'লাইন হচ্ছে—

Time can't efface your tablet.
Landmarks of indelible dialect.

আর একজন কবি ঢাকার প্রমোদ মুখার্জি। ইনি ইংরেজ নয়, বঙ্গবাণী জননীর দীন সেবক। তিনি লিখছেন,

হে কবি তুমি
আপন মনে
গাহ গীতি
ফুলের বনে
আলোর খেলা নীরব প্রীতি।
ভোরের গানে
হে কবি তোমার
কাব্য মাঝে ঝরনা ধারা।
দিগঙ্গনা
নৃত্য করে চিত্তহরা
আপন মনে।

এই প্রমোদ মুখার্জি'ই আর একখানা চিঠিতে তাঁর মনের আসল কথাটি বলে ফেলেছেন। তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হতে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চান ঃ

হে কবি, আপনি কবিগুরু আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বের বরেণ্য, আমারও বরেণ্য। আপনাকে বুঝাইতে পারি এমন কোন ভাষা আমার নাই। তবে আমিও একজন বাণী জননীর দীন সেবক। আপনার দয়া ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থকারই এদেশে দাঁড়াইতে পারে নাই। আপনার দয়া পাইতে পারি এমন কোন বিশেষ গুণ যে আছে তাহা নহে, তবে আমি একজন জিনিয়াস। আমার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকাতে আলোচনা হইয়াছে। আপনার দয়া ব্যতিরেকে আমার গত্যন্তর নাই। এদেশের লোকেরা এবং বিশেষ করিয়া সম্পাদকমণ্ডলী আমার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন; এমন কি বুঝাইয়া লিখিলেও কান দিবে না। জিনিয়াস কথাটায় ব্যাপক অর্থ আমার সম্বন্ধে প্রমাণ ও ইন্ডিকেশন স্বরূপ শ্রদ্ধেয় মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিয়াছি। ইতি বিনয়াবনত,

শ্রীপ্রমোদ মুখার্জি,
ঢাকা, ৩রা আগস্ট ১৯৩৫।

পরবর্তী চিঠি ঢাকার কাছাকাছি ফরিদপুর থেকে। ঠিকানা খালিয়া, তারিখ ১৭।৬।৪১, পত্রদাতা নাকি রবীন্দ্রনাথের অচেনা প্রেমিক। মহান প্রেমে তিনি আত্মবিস্মৃত। তাঁর বক্তব্য হল—

প্রিয়বরেষু, হে বিশ্বপ্রেমিক! মর্ত্যের অমর কবি, কাব্যনিকুঞ্জের পিকরাজ! চির নবীন! অন্তরতম বন্ধু আমার, সখা আমার, জাগ্রত দেবতা আমার, ঢেলে দিচ্ছি আমার অন্তরের অমিয়ধারার অর্ঘ্য চরণে তোমার। চোখে দেখিনি কভু তবু ছুটে যায় আকুল আবেগে হিয়া আমার তোমার পানে। চরণ সরিও না অপরিচিত বলে। তোমার গান আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তোমায় কী মন্ত্রে অর্চনা করব বুঝি না—ক্ষুণ্ণ হয়ো না বন্ধু আমার। ভাবছন্দহারা

তালহারা বন্ধনহারা তোমার মহান প্রেমে আত্মবিস্মৃত হয়েছি, বোধ হারিয়েছি। তুমি আমার ভাষার অতীত। ভাবের অতীত। জ্ঞানের অতীত তুমি যে কী রত্ন জানি না। আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আশীর্বাদ দাও। অচেনা প্রেমিক তোমার। ইতি, শ্রীনীতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ খালিয়াগ্রাম, ঐ জেলা ফরিদপুর।

নীচের চিঠিখানা উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি শ্রীনিকেতন থেকে কেন এই চিঠি এল বোঝা গেল না। পরিষ্কার মেয়েলি হাতের লেখা।

শ্রীচরণেষু, দূরে থেকে তোমাকে দেখেছি, কিন্তু মন তাতে সবখানি আনন্দ পেল না। তাই অন্তর তার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে তোমার কাছে একটুক্ষণ বসতে চাচ্ছে। তোমার কর্মব্যস্ত পরিপূর্ণ মুহূর্তগুলির নিকট আমার শূন্যহৃদয় কী নিয়ে উপস্থিত হবে। জানি দেবার কিছু নেই। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত দূরে থেকে অন্তরে অন্তরে যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি, আজ এত কাছে এসেও তাতে তোমার গায়ের পরশ লাগাতে পারব না—একথা যে ভাবতেও পারছি না। তাই তোমার কাছে এ দানটুকু আমি চাইছি। বলা বাহুল্য যতটুকু সময়ই তুমি আমায় দেবে সেটুকু কেবল একলা আমারই জন্য ভিক্ষা করব। তোমার শারীরিক অবস্থা স্মরণ রেখেও আমার অনুকূল হৃদয় যে তোমার কাছে এ দানটুকু না চেয়ে পারল না—এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কবে কখন তোমার পক্ষে সম্ভব হবে তুমি জানাবে কি আমায়? ঠিকানা দিয়ে দিলাম। আমি প্রতীক্ষায় থাকব। আমার প্রণাম গ্রহণ কর। ইতি, প্রণতা, রেণু মিত্র, ২৩৷১৷৩৯, শ্রীনিকেতন।

মাদুরা থেকে মিসেস সূর্যনারায়ণ মূর্তি পাঠান ইংরেজি কবিতা। ভিলসা, গোয়ালিয়র থেকে রাম অবতার মাজালা'র প্রেরিত বস্তুটিও তাই—একখানা দশমণী নিরেট থান ইট কবিতা। রবীন্দ্রনাথকে তা পড়ে মতামত দিতে হবে।

১৯৩৬ সালের ৬ জানুআরি ফিলাডেলফিয়ার পুস্তক বিক্রেতা রোবার্ট ডারহাম স্টিভেনস, গান্ধী, ফ্রয়েড, হিটলার মুসোলিনী, রুজভেল্ট, গার্টরুড, স্টাইন, স্টালিন, এইচ. জি, ওয়েলস ও যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে কবির মত জানতে চান। আর লেখেন—

My dear Tagore,

I am writing you this personal letter to tell you I have deep admiration for your work and help to humanity. Why don't you visit America again?

কবিতা আসত সংশোধনের জন্যে। সংখ্যায় বিপুল। যেমন—

Pullela Venkatma East Godavari Dt. Pithapuram.

এই ঠিকানা থেকে চিঠির শুরু এই ভাবে:

Reverend Gurudev, I beg to submit the accompanying

sonnet written in the year 1934 for the favour of your valuable opinion.

ফয়জাবাদের ৫৮১ ঘাম্দারিবাজার থেকে ১৯৩৬ সালের ৬ নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক দুটি ইংরেজি কবিতা পাঠান। তাঁর বক্তব্য।

'I hope Sir, you will patronize me'

আমাদের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন জানতাম, কিন্তু তামিলনাড়ুর আর একজন ভদ্রলোকও যে জাতীয় সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁর পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর চিঠিতেই। তিনি দুটি কবিতা পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্যে। ভদ্রলোক অবশ্য পাগল-টাগল নন, অত্যন্ত সরল পত্রলেখক ও কবি।

N. N. Radnam,
Critic.

MANAMADURA
Ramnad Dt.
30-5-38

O Reverend Father!

Here lay before, your wise, a couple of National Songs from a young, insignificant loving children of Bharata Mata as a humble tribute for your kind acknowledgement and approval.

I beg to remain
Rd: father.
Ever your obedient child
N. N. Radnam

INDIAN ANTHEM

God save our ancient home
Soon free our noble home.
God Save our home!
Set free victorious,
From rule notorious,
Reign ourselves glorious;
God bless all!
Congress gain strength with Cheer.
Congress kings live ever,
Congress gain strength;

Send them sound peace and health,
Full joy pursuit and wealth.
With our courageous strength ;
Congress triumph !
Zeal our flag united rule.
Zeal nev'r religious du'l,
God bless self-rule
With speech one India whole,
Happy, wise, social rude,
Reign ourselves peace prestige !
God save us all.

বিজাপুরের এন. জি. মোগেরি একজন কবি। এবং ইংরেজি ভাষারই কবি। তিনি তাঁর 'ন্যারো পোয়েম' অর্থাৎ ছোট কবিতা রবীন্দ্রচরণে নিবেদন করেছেন সংশোধনের জন্যে।

26-11-33
M. G. Mogeri Etandard IV.
A Govt. High School.
Dt. Bijapur, province Bombay.
Dear and most respected Sir,

I, the undersigned, a mere student of the fourth standard have the pleasure of sending you my narrow poems for your persual which I hope shall kindly be appeared of an 1 returned after due corrections. Yours most obediently,

Mogeri M. J.

World poet Dr. Tagore
Once I heard !
Once I heard !
About a greatest
Poet I heard,
Tagore is his,
Happy name
Who is the Doctor
of our aim ?

করাচীর রূপচাঁদ খিতানি আবার কবিতা পাঠানো নয়, নিজেই ফরমাশ করেছেন কবিতা লিখে পাঠাতে,

20, Jamshedpur Quarter
Karachi 21-11-34
To, Mr. R.N.T.

Sir, I shall be very thankful to you if you kindly write a poem on 'Youth Choses the Youth' and send a copy to me on the following address : Rupchand G. Khithani Matric student, Karachi Academy, Karachi.

আর একজনের ফরমাশ অন্য রকমের। তিনি চান কবির সুপারিশ। ইনি ছিটগ্রস্ত, পাগল-টাগল নন।

Madanapalle College
Chittorh, Dt. Madras Presidency
Affiliated first grade with the University of Madras.
March 6, 1935.
Dear friends,

Messrs Macmillon & Co. are bringing out a series of contemporary poets—short selections in paper covers. Six numbers have been published and others are in preparations. I am sending them a copy of my two volumes—"A published in 1932 and in 1934· by the Roerich Musuem Press, New York with a suggestion that they might include 9 selections from them in their new series.

I shall be greateful, if you can see your way to write to Messrs Macmillon & Co., Ct. Martin's Street, London asking them to consider my stuggestion favourably. Judges of the booklets already issued. I do not think mine would discredit the series.

Yours sincerely,
James H. Cousins.

Copy to
(1) Dr. R. N. Tagore
(2) Dr. W. B. Yeats
(3) Dr. G. W. Russel
(4) Mr. Pabric Colum

পরবর্তী লেখক রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতিষী ভেবে বসে আছেন। তাই তার ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছেন চিঠি দিয়ে।

6-4-38 7 A. M.
Samburcool Estate, Santaveri P. O,
Dt. Kadur.
Prof. Rabindranath Tagore Esqr
Fort Street, Bombay.

Dear Sir,

I should like to know my future through you. I shall be much obliged if you send me my rought. My date of birth 26th March 1892. Name Antony Baby Pints, born at Paladuka Village. Yours faithfully.......

বোম্বাই থেকে যে চিঠিখানা এসেছে, তাতে ফরমাশের ধরন আলাদা। পত্রদাতা সিনেমা কোম্পানি খুলেছেন, অতএব এখন রবীন্দ্রনাথেরই দায়িত্ব কিছু অভিনেতা ও অভিনেত্রী সাপ্লাই দিতে হবে।

Dear Sir,

We have the pleasure to inform you that we are floating the above named film producing company and our motto is to produce films by high character and artistic quality.

We require educated actor of good morals having experience in the line, so we request you to kindly let us know if you can get some actors male and female as well as required by us from your institution. Thanking you in anticipation and awaiting an early favours. Yours faithfully,

S. L. Delma. Manager, Vijaya Movetone,

Bombay No. 2, 23rd July, 1935.

অতঃপর অন্যপত্র অর্থ। সাহায্য নয়, কবিতা সংশোধন নয়, ভবিষ্যৎ গণনা নয়, কোলাপুরের সরল ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থী একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। বেচারা বাল্যবিবাহের শিকার, অতএব সুতরাং রবীন্দ্রনাথকেই স্থির করে দিতে হবে আর একটি উদ্বাহবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হবেন কিনা।

I. Magdum Bldg.
Laxmipur, Kolhapur
15-1-35.

Dear Sir,

I am a man who has been the victim of child marriage.

Even though I have become an M. A. I am at a loss to know the truth whether I should reconcile myself to my present wife or to marry another besides the present one. I am anxiously awaitnig for your valuable reply.

M. G. Naganoor. M.A.

বিচিত্র চিঠির ভাণ্ডারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বুলগারিয়া থেকে লেখা নিচের চিঠিটি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করেন ঠিকই, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, তন্ত্রাচার্য বা যোগাচার্য হিসাবে।

Sofia, 9-11-1933

To the Honourable Teacher

Rabindranath Tagore

Beloved Teacher,

As a follower of an occult society named 'the great occult white fraternity' and knowing that a man can wake in himself beside the senses he now has, one other more developed sense as well as new organs, please be so kind as to inform me of the breathing and meditation toward a final goal—magiase.

I am working upon myself from seven years in the reign of parity. I would consider myself happy if I would have a certain notion about your work there.

I appeal to you if that pleases you to send me some prospectus of your method of work. Remaining grateful for all that you may desire to do for me I greet you only the God's love bring the full life.—Albert. P. S. My address is Albert Calef.

Opaltchenska St. No. 66. Sofia Bulgeria.

মাদ্রাজে রামস্বামী আইয়ার আর এক কাঠি বাড়া। তিনি ভাষাতত্ত্ব দিয়ে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন এবং তা বিশ্বে ঘোষণা করার আগে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের অপেক্ষায়। মিশরের কায়রো আর গুজরাটের কয়রা যে এক, এই চিঠি না পড়লে জানাই যেত না।

Ramaswami Aiyar, B.A. M.R.A.S.
Tiru Salem Lloyd Road
Royapetta, Madras
Royapetta, Madras
Sir,

With the help of a piece of information (regarding the Indian origin of the Jews) passed on to us by Aristotle, I discovered in 1923 that Palestine was originally an Indian Colony and that Aramic (the neither tongue of Jesus Christ), was Aravam (Tamil). During the course of enquiries in the Biblical field (Since Araba–Arava through Vabayora-bhadam) I discovered that Arabia too was a South Indian colony and the Arabic (araba) a dialect of ancient colonical Aravam (Tamil). It is not by accident that a town in Bombay Presidency and in Egypt bear similar sounding names like Palitana–Palastina (Exod XV. IV I & A 29.31) and Kaira–Cairo to mention two instances. Palitana is a Dravidianesed from of Palistana since Sanskrit 'stana' is pronounced 'tana' in Tamil.

Since 1923 I have been contributind articles on the subject in South Indian Press. I have sent to the Visvabharati library through you by bookpost—a set of my publications on the subject in the hope that literature might interest it's scholars as if opens a new field for research work. Trusting you will kindly accept the publication. I remain yours.

Ramaswami Aiyear
Camp Madura
22-8-35

নিচের ভদ্রলোকের সমস্যা সত্যিই গুরুতর। তার সমাধান রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও করা অসম্ভব।

I understand that to divide an angle geomatrically into three equal parts is a problem before the world. Is it a fact? If so I have found out the solution. But I do not know to who and where I should correspondence on the subject. If

you kindly throw light on the subject and give me the name of the institution, where it can be placed for approval.
Latafat Ali (Retired Ziladar P.O. (Mathra), U.P.

এবারে চাকরির জন্যে সুপারিশ চাই। অন্ধ্র প্রদেশের রাজমহেন্দ্রী থেকে ১৬।৩।৩৪ তারিখে একজন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ যেন ডঃ সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে বলে কয়ে তাঁর চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। সামান্য অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের না করার কী আছে।

I thank you very much for your kind letter dated 11-3-34 to my letter along with the letter of Dr. Sir, S. Radhakrishan, our Vice-chancellor of the Andhra University.

I thank you very much for acknowledging my letter dated 6-3-34.

As Mr. C. R. Reddi Ex-Vice-chancellor of the Andhra University has written, in the golden book of Tagore. You are a world figure and one of the lights of the world.

You need not have the personal knowledge of me as written your letter dated 11-3-34. As you are a world figure who has won the Noble Prize for literature in 1913 and subsequently the Government of India has awaken from its slumber and confired upon you the Knighthood was returned back to the Government of India, as a protest against the action of the Government at Jalianwallabagh. 320 millions of India know you and your international fame, through not you know them individually which is a impossibility.

I, therefore, request you to be kind enough to write a letter to Dr. Sir S. Radhakrishnan, our Vice-chancellor of the Ahdhra University about my appointment in the University.

If you have got a doubt about my character and tradition of my family kindly write a letter to Dr. Sir S. Radhakrishnan and to furnish you in detail about all the particulars about my character and the traditions of my family.

After the receipt of a satisfactory reply from Dr. Sir S. Radhakrishnan, you can put a word of recommendation about my job in the Andhra University for which act of my

sympathetic act I shall cherish your name in my memory for ever.

May God, the giver of all things, go with you and shower blessings upon you for your long life so that you may continue as a president of the Visvabharati. With the best regards.

আর একটি গুরুতর প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত। সিলেটিরা অসমীয়া, না বাঙালী, অসমীয়া বলতে তিনি রাজি নন, রবীন্দ্রনাথও পরোক্ষে সিলেটিদের অসমীয়া বলেছেন। কিন্তু কেন?—

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,মহোদয় মহিমাবরেষু—

মহাত্মন,

আমি আপনার পূর্ব পরিচিত নই বা পূর্বে কোনোদিন আপনার নিকট কোন পত্রাদি দিই নাই, তথাপি আজ একটি বিশেষ কারণবশতঃ আপনার নিকট একটি পত্র লিখছি। আশা করি পত্রপাঠ পূর্বক এই অজ্ঞকে যথাযথ উত্তরদানে সুখী করিবেন।

প্রথমতঃ আমার সামন্য পরিচয় আপনাকে দেওয়া উচিত, তাই লিখি যে আমি ধুবড়িস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম মান শ্রেণীতে পড়ি ও আমার বাড়ি সিলেট জিলায়। আমি মনে করি আমার এই পরিচয়ই আপনার যথেষ্ট হইবে।

আপনার নিকট এই পত্রটি লিখার কারণ আপনি বোধ হয় সিলেট শব্দটি পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন।

আপনাকে জনৈক আসামী ভদ্রলোক আসামী বলিয়া দাবি করিলে পর আপনি শ্রীযুক্ত অমলা দত্তের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে যে 'তোমাদের' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আমি কোন রকমেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আশা করি আপনি পত্রোত্তরে উহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

এই পত্রের পরও আপনি অন্য এক পত্রে লিখিয়াছেন 'কুইনিসিলেটি হইলেও আসামের অন্নে পালিত'। ইহাতে বুঝায় যে সিলেটিরা আসামী।

আমার বিশ্বাস আপনিও তাই ভাবিয়া উপরোক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। যদি তাই করিয়া থাকেন তবে আমি বলিতে চাই আপনারা বাঙালী হইয়া আমাদের শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিদের লইয়া বাঙালী বলিয়া গৌরব করেন কেন? তাঁহাদের পিতামাতা বা অন্য কেহ বাঙলার লোক ছিলেন কি? না, তাঁহারা বাংলায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালী। যদি তাই হয় তবে আজকালও অনেক বাঙালী ছেলে পাটনা বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেবেলা হইতে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহাদের কি আপনারা ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানী বা অন্য কোন জাতি বলিবেন? আমার বিশ্বাস সিলেট তখন বাংলায় ছিল বলিয়াই আপনারা ওদের বাঙালী বলিয়া দাবি করেন।

আর আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ সিলেট আসামে আছে বলিয়াই যদি আপনি এখন সিলেটিদের আসামী বলিতে চান, তবে সেই দিন আমাদের বসন্ত দাস মহাশয়কে বঙ্গীয় পার্লিয়ামেন্ট দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হইল কেন? ইহা বোধ হয় ডাঃ রায় মহাশয়ের বোকামি। তিনি বোধ হয় ইতিহাসে ভূগোলে অজ্ঞ, নতুবা এইরূপ করিবেন কেন?

আমরা যদি আসামীই হইতাম তবে দিন কয় পূর্বে আমাদের বিপিন পাল মহাশয়কে বাঙলার গৌরব বলিয়া বাংলার কাগজে কাগজে ছাপান হইয়াছিল কেন? আমাদের অপূর্ব চন্দ মহাশয় বাংলার ডি. পি. আই. হইলে প্রথম বাঙালী ডি. পি. আই. বলিয়া বাংলার কাগজে ছাপান হইয়াছিল কেন?

আপনি যে কী ভাবিয়া আমাদের আসামী বলিতেছেন তা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদের সহিত আসামীদের কী যে সামঞ্জস্য আপনি দেখিতে পাইলেন তা, তো বাংলার অন্য কেউ পাইল না। আসামীরাও কোনদিন পায় নাই, পাইবেও না। আপনি কি আমাদের ভাষার সহিত ওদের ভাষায় কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন? না তাহাদের সহিত আমাদের কোনও পারিবারিক সম্বন্ধ হইতে শুনিয়াছেন? তাহা ছাড়া আপনি যদি পূজা পার্বণ এমন কি খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি একটি কিছুর সহিত ওদের ও আমাদের মিল দেখাইতে পারেন, তবে বুঝিব এই বাণীই ঠিক। নতুবা আমরা আপনার দীর্ঘ-ই-কারের স্থানে হ্রস্ব-ই-কারের ন্যায় ইহাকেও মহান ব্যক্তির আর একটি আর্য প্রয়োগ বলিয়া মানিতে বাধ্য হইব। আমার বিশ্বাস বাংলাও তাই মানিবে। মানিবে কি মানিতেছে। তা না হইলে দিন কয় পূর্বে 'বিপিন পালকে বাংলার গৌরব বলিত না। আপনি হইতেছেন বিশ্বপ্রেমিক, এখন আপনাকে এক চিনা চিনা বলিয়া দাবি করিলে আপনি তাহাতে রাজী হইতে পারেন। তাই কি দেশশুদ্ধ সবই বিশ্বপ্রেমিক? আপনি ইচ্ছা করিলে আবার আসামীও হইতে পারেন, তবে কি সিলেটিরাও আসামী হইবে? আপনি যদি সিলেটিকে বাঙালী বলিতে না চান তবে মনিপুরী বা অন্য জাতির ন্যায় সিলেটিই বলিবেন। তথাপি আসামী বলিবেন না। আপনি বলিলে এ জাতি তাহা সহ্য করিবে না। যদি আসামী বলিতেই চান, তবে উপযুক্ত প্রমাণ চাই। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে তা মানিবই মানিব। কেবল বড় লোকের কথা বলিয়া তা মানিবার দিন এখন আর নেই। এ ভারত আর আগের ভারত নয় যে পণ্ডিত, মৌলবির মুখে যা বাহির হইবে তা অভ্রান্ত ও বিচার-বিতর্কের অতীত বলিয়া স্বীকার করিবে।

আমার বিশ্বাস সিলেট জেলাটি আসামের নিকট থাকায় ও বর্তমানে আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ও প্রধানত ভাষাটি খারাপ হওয়ায় আপনি সিলেটিদের আসামী বলিতেছেন। আপনি যদি ভাষা খারাপ বলিয়াই সিলেটিদের আসামী বলিতে পারেন তবে চট্টগ্রামবাসীদের বার্মিজ বলেন না কেন? ওদের ভাষা বোধ হয়

আমাদের ভাষা হইতে বিশেষ ভাল নয় এবং ঐ জিলাটি বর্মারই নিকট। ইচ্ছা করিলেই তা বলিতে পারেন।

আপনি সিলেটে নাকি বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষের র-র শূন্যটি কাটিয়া 'ভারতবষ' করা উচিত। কারণ ভারতবাসী এখন ঘোর অন্ধকারে পড়িয়াছে। তাহারা যে কী করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। তাহাদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম সিলেটেই সেই ভাবিবার দিন দেখা দিয়াছে। কারণ একদিকে আসামীরা চায় সিলেটিদের তাড়াইতে বাংলায়, আর একদিকে আপনি বলেন এরা বাঙালী নয় আসামী, এমত অবস্থায় আমরা কোথায় যাই? আমরা ঘোর অন্ধকারে পড়িয়াছি। আশাকরি, আপনি এই অন্ধকার মোচন করিবেন।

এই পত্রে আমার অনেক অন্যায় ও ভুল হইতে পারে, তাই এই অজ্ঞকে মাফ' করিবেন। কিন্তু দেশের ও জাতির অপমান সহ্য করা অসম্ভব। তাই অনেক কিছু লিখিলাম। আশাকরি যথাসময়ে পত্রোত্তরে খুশি করিবেন। ইতি, একান্তানুগত শ্রীসুশীলচন্দ্র গুপ্ত,

C/o শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুপ্ত, ধুবড়ি, আসাম।

রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' পড়ে বিস্মিত জনৈক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী মৃত্যুঞ্জয় বা শংকর যা করতে পারে নি, সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর। আসানসোল থেকে তাই তাঁর পত্রাঘাত।

১৬ই জানুআরি, চেলিডাংগা, আসানসোল
C/o. Y. S. Ghatak. M.A.B.E.

শ্রীচরণকমলেষু,

আমি এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। মনটা এরই মধ্যে ঝুনোট হয়ে পড়েছে দিন-রাত পড়ার এক ঘেয়ে চাপে। ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে ভলি-ক্রিকেটে যোগ দিতে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত থাকতে, কিন্তু বাড়ির কড়া শাসন সে-সব ইচ্ছাগুলোকে মাথা তুলতে দেয় না মোটেই। তাই বাংলা বইটা খুলে বসি, আর পুরোনো গল্পগুলোকেই পঁচিশবার করে পড়ি।

আজ হঠাৎ জেগে উঠল বুকে একটা আইডিয়া, ইচ্ছে হল চীৎকার করে উঠি আর্কিমিডিসের মতো 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে। তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন গ্রন্থে গুপ্তধন বলে একটা গল্প আছে। সেটা আপনারই লেখা গল্পগুচ্ছ থেকে তোলা, গল্পটা পড়তে পড়তে ভেতরটা আমার ভিজে টসটসে হয়ে উঠেছিল, মাঝে মাঝে গরমও হয় নি, তাই বা বলি কেমন করে? তবে অপ্রিয় সত্য কিনা, তাই বলতে একটু বাধ বাধ ঠেকে। যাইহোক, গল্পটা শেষ করে মনে হল, ভালোই হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় আর শংকর পায় নি গুপ্তধনের সিন্দুক। এবার আমিই দেখব এক হাত।

আপনি সত্যদ্রষ্টা, আমাদের পণ্ডিতমশায়ও বলেছিলেন তাই। সেজন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ধারাগোলের সন্ধান আর ঐ 'ক্রিটিং' আঁকা সাংকেতিকটির অর্থ। তবে এও বলে রাখি যে, আমি পুরুষাদিক্রমে কালীমায়ের সাধনা করতে পারব না। ও কালোপানা নেংটা দেবীটাকে আমার বড্ডো ভয় করে।

যদিও আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি আপনি তো নন, তাই এই কিছু লিখিতে সাহস পেলুম।

এখন আমি রইলুম আপনারই উত্তরের আশায়, অধীর প্রতীক্ষায়।'

ইতি, প্রণত,

শ্রীসুশীলকুমার ঘটক।

পুনঃ—আপনার শারীরিক ও মানসিক শান্তি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে।

২৪ পরগণার ভাটপাড়া 'অমর' নামধারী বাড়ির অধিবাসী রবীন্দ্রনাথকে কেন আপনি না বলে তুমি সম্বোধন করলেন, তার ব্যাখ্যাতেই পুরো চিঠি কাবার করে দিয়েছেন। তৎসহ প্রার্থনা 'একটি কবিতা চাই।'

শনিবার

৫ই মাঘ, ১৩৪৭

প্রিয় পূজনীয় কবি,

যেখানে দু'জনের মতান্তর হয় সেখানে আরেকজন না এলে তার মীমাংসা হয় না। তাই মনের দ্বন্দ্ব মেটাতে না পেরে আপনার শরণাপন্ন হলাম। এতে আপনার শান্তিতে থাকার পথে অন্তরায় হলাম, কিন্তু আপনি যেন এটাকে আপদ বলে ধরে নেবেন না।

প্রিয়জনকে অথবা প্রিয় বলে যাকে ভাবি তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা যায় কিনা। ব্যাপারটা এই যে, সম্প্রতি আমার এক নবপরিণীতা বন্ধুপত্নীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। তাইতে তাঁকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে 'তুমি' লেখাটা অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু মনে সংশয় হচ্ছে, আমার বিশ্বাস যাকে প্রিয়জনের মত, আপনার মত ভাবা যায় তাকে 'আপনি'র বদলে তুমিও বলা যায়। কারণ নিভৃতে পবিত্রভাবে যখন ভগবানকে ডাকি তখন তাঁকে আপনি বলি না তুমিই বলি। জগতে সবচেয়ে প্রিয় গর্ভধারিণী, স্নেহময়ী মাকেও তুমি বলেই ডাকি। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে যখন আলাপ হয় তখন যদি 'আপনি' না বলে পরস্পর 'তুমি' বলে ডাকি তখন বোধ হয় হৃদ্যতা যেন একটু বেশী প্রকাশ পায়।

ভবিষ্যতে যদি আমি বা আর কেউ আপনাকে সম্ভাষণেই— 'প্রিয় কবি তুমি আমার……'বলি তবে এতে কি আপনার মর্যাদার হানি হবে বা আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন?

এইগুলোর উত্তর আপনার কাছ থেকে পাবার জন্য আমি আগ্রহভরে অপেক্ষা করব আর বিশ্বকবির কাছ থেকে কবিতার মধ্য দিয়ে লেখা চিঠি যে সকলেই পাবার প্রত্যাশা করে তা বোধ হয় নতুন করে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্যে আপনাকে ভগবান আরও দীর্ঘকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখুন, সমস্ত জাতির সঙ্গে তাঁর কাছে এই আমার একান্ত কামনা।

আমার অজানিতে যে সব ভুল ত্রুটি প্রচ্ছন্নভাবে এই চিঠির ভেতর রয়ে গেল, স্নেহবশতঃ ওগুলো ভুল বলে না ধরে আর আমার নমস্কার গ্রহণ করে আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন আমি শান্তিতে থাকতে পারি, আপনার কাছে এই আমার প্রার্থনা।

আপনার কবিতা পড়তে আমার বেশ ভালো লাগে কিনা তাই আমার উত্তরটা কবিতার মধ্যে দিয়ে পেতে চাইছি। এতে আমার প্রশ্নের সমাধান পাব। উপরন্তু আপনার লেখাটা আমার প্রতি একটা উপহারের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদপ্রার্থী

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৭।১।৪১ চিঠির তারিখ। ন্যাকা ন্যাকা কথার মাঝখানে কুমিল্লায় যাবার নিমন্ত্রণ। তাছাড়া পত্রদাতা কবির ছোটখাট ঘটনাও জানতে চান চিঠির জবাবে। আর নন্দিতা কৃপালনির সঙ্গে পত্রদাতার আলাপ করার বড় ইচ্ছে। নন্দিতা কে? —পত্রদাতাই বলেছেন, 'নন্দিতা তোমার যে নাতনি, বুড়ো দাদুর চাটনি।'— এমন উপমা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আলাপ করবার আগে প্রথমেই আসে পরিচয়ের পালা। কিন্তু ভয় হচ্ছে বিশ্বকবি তুমি, তোমার চারিদিকে চলছে যশঃ সৌরভের পুজো, [illegible] শ্রদ্ধার ধূপার্বতি। এর মাঝখানে তোমাকে দেবার মতো আমার কী পরিচয় থাকতে পারে? কিন্তু যদি বলি—

বিশ্বের মাঝে মানুষ আমি
এই শুধু মোর পরিচয়।

তা হলে তুমি কি তা মেনে নেবে না? শুধু এইটুকুই জেনে রাখ যে, আমি পড়ি ক্লাস টেন-এ এবং তোমার লেখার এক পাঠিকা। যাক।

তোমার লেখা পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে দমন করতে পারি নি বলেই, লিখছি। আচ্ছা তুমি সব সময়ই বড় লোকদের নিয়ে লিখ কেন? তুমি যেন ড্রয়িংরুমের কবি। কোথায় বিলেত, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে তুমি গিয়েছ। কিন্তু বাংলার ভেতরটা তুমি কি কখনো দেখেছ? তুমি নিশ্চয়ই লোকারণ্য ভালোবাস বেশি। এক কাজ কর, তুমি এক মাসের জন্যে চলে এস কুমিল্লার এদিকে। দেখবে তোমার কলকাতার চেয়েও কত কিছু আছে যা সত্যিই চমৎকার

এবং যা নাকি তোমার অফুরন্ত কবিত্বের উৎসরূপে বের হতে পারে। আমিও জোর করেই বলতে পারি যে, এ তোমার নষ্ট স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেবে। তুমি হয়ত অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। কিন্তু এসেই দেখ না একবার। মাঝখান থেকে আমারও তোমার মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত লোককে দেখবার সুযোগ পাব। আসবে তো? আমি কিন্তু প্রতীক্ষায় রইলাম। তোমার জীবনের কয়টি ছোট ছোট ঘটনা দিয়ো কিন্তু আমাকে। যা না কি আমার সে জবাবকে করবে কত মূল্যবান।

'নন্দিতা তোমার সে নাত্‌নী
বুড়ো দাদুর চাট্‌নী।'

তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে রইল এবং সে ভার তোমার ওপর। তিনি কি চটে যাবেন শুনলে? আচ্ছা! তুমি কি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি?

আমার চিঠির জবাব দিচ্ছ কবে? আমি কিন্তু আস্‌ছে বুধবারের মধ্যেই চাই। বুঝলে তো? তোমার নিজের হাতেই কিন্তু সব করতে হবে। অসুস্থতার দোহাই দিলে চলবে না। আর বিশেষ কী? সশ্রদ্ধ প্রণাম নিও।

ইতি নীলিমা (সবুজ)
নীলিমা চৌধুরী
কেঃ/অফ কুমুদবিহারী চৌধুরী, বি-এ
কুমিল্লা, গাঙ্গচর,

পি. এস ঃ আসচে বুধবাবের মধ্যে তোমার জবাব পেতে চাই-ই চাই।

পরমারাধ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে 'শ্রীপাদপদ্মে শত সহস্র কোটি নিবেদনমিদং' করেছেন 'দূর আঁধারের জনৈক সেবকাধীন'। তিনটি কবিতা তিনি পাঠিয়েছেন। কবির নাম বসন্তকুমার বিশ্বাস, এম-বি (হোমিও)। ঠিকানা —কালীতলা- তপোবন, নওগাঁ, রাজশাহী। তিনি লিখছেন—

গুরুজী, আজ অনেক দিন হইতে যে ভাবটা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি সেটা পূরণার্থ আমার আবার দোলা ঘরের আকাশপট হইতে বর্ষিত গোটা তিনেক পুষ্পার্ঘ্য আপনার চর্চিত চরণযুগল স্পর্শ করিবার জন্য পাঠাইলাম। ইহারা পরিস্ফুটভাবে রাতুল চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে পারিল কিনা তাহা শুনিবার জন্য এ-দাস একান্তই ইচ্ছুক ও ভাবপ্রকাশে পূজা করিতে সমর্থ হইল কিনা তাও জানাইয়া সেবককে চিরবাধিত করিবেন, পর পত্রে আরও কিছু জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি,
আপনার দূর আঁধারের জনৈক
সেবকাধীন

তারিখ
১৭।১১।৪১

[পত্রদাতার পাঠানো তিনটি কবিতার নমুনা হল এই—]

১নং

শরণ

সে-যে মস্ত কথা হৃদয় ব্যথা
যায় না গাঁথা মনেতে—
আকাশ যেন আপন হারা
বিশ্ব ডুবা নদীতে।
আলোক হারা আঁধার ছাঁওয়া
নিতুই আসে পরের ছাওয়া
ভাসবে কখন জীবন কান্না
সকল ভুলে যাওয়া।
ফুল ফুটান কালের কোলে,
নিশির নীহার দিচ্ছে ফেলে,
চল্‌ছে কত আপন ভুলে,
কে জানে তা কার চাওয়া।
কোথায় তোমার বিশ্ব খোঁজা
দিল দরিয়ার মাঝে মাজা
মাথায় নিয়ে কতই বোঝা
বইছে কেমন টানেতে।

২নং

বর্ণন

কে যে, ডেকেছিল মোরে সমনে
মুগ্ধ প্রকৃতিআগুনে।
কি যে বেঁজেছিল হিয়া চেতনে
শুত হল দিক্ পরনে।
অন্তরে ছুটে অন্তর বাণী
কুলকুলু তানে মাস আগমনী
গেয়ে কল্ কল্, চেয়ে ছল্ ছল্
আঁখি নীরে ভাসে ভাবিনী।
শুন্যে, শুন্যে, দুলিছে দলনী
বর্ণে, বর্ণে, শোভিছে হিমানী
নাচে তরঙ্গে রঙ্গকারিণী
কিবা গতি হের নয়নে।'

মুখরিত হল বনানী
কিভাবে চলিছে তরণী
জলদ-গম্ভীর, অম্বরে, অম্বরে
মেলিছে বিজুলী মরণে।

৩নং

'মরণ'

উৎসব তরঙ্গে নাচে মরণ কাহিনী
অবহেলি জলকেলি মৃদুল গামিনী
শোভে নীলে নীলাম্বর, অম্বর বাদিনী,
করতল স্থিতা যার, মৃত্যুবিরোহিনী।
চিন্তা রাখি দূরে, হের ক্ষুব্ধ মন, ধূলি
ধূসব সন্ধ্যায়, কি বন্দনার্বাত দেয়
সন্ধ্যা, মাতি, প্রকৃতিব কোলে, তুলি তান।
ভৈবব নিনাদে, গতি যার চির স্থির—
বেখে যায়, কালের করাল স্রোতে মিশি
ঠিকবে অবোধ জনে, ভবে সে মরণে।

এবার অন্য প্রসঙ্গ।

'পেটের দায়ে বাংলাদেশ ছাড়া' জনৈক বঙ্গ সন্তান ৮৩, সেমবোদাস স্ট্রীট, রুম নং ১৩, জর্জ টাউন মাদ্রাজ থেকে ৯।২।৩৪ তারিখে জানতে চেয়েছেন কী করে জীবনে তিনি পবিবর্তন আনতে পারেন। পত্রদাতাব সম্বল ভগবানে বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আমি গত সাত আট বৎসর যাবৎ কলিকাতা ছিলাম। আপনার সাথে আলাপ করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও আমাব সে সৌভাগ্য হয নাই। বেঙ্গল-কংগ্রেস ফন্ড রিপোর্ট কমিটির কাজ প্রেসিডেন্ট স্বরূপে আপনার কাজ করার সময় অনেক বারই আপনার আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমিও বাংলাব আরও সহস্র সহস্র যুবকের মত পেটের দায়ে বাংলাদেশ ছাড়িয়া এখানে আছি।

আপনার লেখার ভিতর একটা সত্যিকারের প্রেরণা পাই। হয়তো সব বুঝিতে পারি না বলিয়া সব জিনিস সহজভাবে অনুসরণ করিতে পারি না।

ন্যায় অন্যায়ের কোন গণ্ডি মানিয়া কোন দিন চলি নাই। ভাল মন্দ ঠিক যখন বুঝিবার বয়স হইয়াছে তার পরেও যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছি। প্রতিবারেই অনুতাপ হইয়াছে। সাংসারিক অভাব অনটনও আমাকে মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

ভগবানের উপর আমার অসীম বিশ্বাস আছে। তাঁহাকে ডাকি কিন্তু এ প্রাণে একটা প্রবল সাড়া পাই না। আপনার কাছ থেকে আমি সহজভাবে জানিতে চাই। আমার জীবনের একটা পরিবর্তন আমি কি করিয়া আনিতে পারিব। ২৭।২৮ বৎসরের জীবনেই একটা অশান্তির ভাব আমার জীবনে আসিয়াছে।

আপনার মোটেই সময় নাই বুঝি এবং আমার মত হতভাগ্যের চিঠির জবাব দেওয়ার সময় না হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি বর্তমানে জগতের 'নমস্য' মহামানব। আমার জীবনের একটা পরিবর্তন হয়তো আপনার মহৎ উপদেশের বাণীতে হইতে পারে। যাহা বহি পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইবে না।

শত সহস্র কাজের মধ্যে আপনার একটু সময় আমাদের জন্য ব্যয় হইলেও তাহাকে আমরা আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলিয়া মাথা পাতিয়া নিব।

জগতের সমস্ত লোক আপনার শরীর কেমন জানার জন্য সর্বদাই উৎসুক থাকে, আমিও তাহাদের ভিতরে একজন।

শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করিবেন। প্রণত,

আশীর্বাদকামী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

পুনঃ—এখানে আপনার শীঘ্র আসিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি? ১০।১৫ দিনের ভিতরে আমি আপনার বাণী শুনিতে চাই।

পরবর্তী চিঠিখানি দীর্ঘ।

ধর্ম, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে পত্র দ্বারা লেখক তাঁর অলৌকিক অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে না জানিয়ে পারেন নি। তিনি একদিকে যেমন অনন্ত আকাশে অনবরত এক উচ্চ সুমধুর সুরধ্বনি শুনে আসছেন, অন্যদিকে তিনি অর্ধনারীশ্বর। ভদ্রলোকের নাম হেমচন্দ্র সাহা দাস। ঠিকানা ৭৯ সাউথ শিবাদহ রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা। তারিখ ২৭ শ্রাবণ, সন ১৩৪২।

সবিনয় নিবেদন। মহাশয়, আমি আজ প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ জাগ্রত অবস্থায় দিবারাত্র অনবরত অনন্ত আকাশে এক উচ্চ সুমধুর সুরধ্বনি শুনিয়া আসিতেছি। সর্বশক্তিমান করুণাময়ের কৃপায় তাহা হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া যে আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছি তাহাতে হিন্দুর পবিত্র বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবৎ, মুসলমানেদের পবিত্র কোরান, খ্রীষ্টিয়ানের পবিত্র বাইবেল, য়ীহুদির পবিত্র তওরত প্রভৃতি জগতের ধর্মগ্রন্থ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল অনুভব করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি। আমি জগতের ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ হইতে স্পষ্টত জানিতে পারিয়াছি যে, মানুষ কেন মরে এবং কি উপায়ে মৃতকে জীবিত করা যাইতে পারে। বর্তমান জগতের সকল মনুষ্যই মৃত ব্যক্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কেহই বাঁচিয়া নাই। কারণ ইহারা কেহ হয়ত আজ কেহ হয়ত কাল এবং কেহ হয়ত দুদিন পরে মরিবেই মরিবে। ইহারা সকলেই

মাতৃগর্ভরূপে কবরস্থিত মৃত ব্যক্তি। করুণাময়ের কৃপায় ইহারা সকলে শীঘ্রই পুনরুত্থিত হইবে। কোরান ও বাইবেলে লিখিত কেয়ামত ও পুনরুত্থান কার্য জগতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি উক্ত সুরধ্বনি হইতে অনুভব করিতেছি যে, সর্বশক্তিমান করুণাময় বিশেষ কৃপা করিয়া এ দাসকে, জগতের বর্তমান মনুষ্য জাতিকে পুনরুত্থিত করিবার জন্য প্রেরিত পুরুষরূপে জগতের ইমাম করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। জগতের সমস্ত ধর্মগ্রন্থই অনেক স্থলে দ্ব্যর্থবোধক ও আলংকারিকভাবে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। করুণাময়ের প্রেরিত পুরুষ কিম্বা বিশেষ কৃপার পাত্র ভিন্ন অন্য কেহ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, বীর্য ত্যাগই ধর্মশাস্ত্রে লিখিত মৃত্যু বলিয়া ধারণা করি। উহাকে প্রলয় বলিয়া কথিত হয়।

মুসলমান, খ্রীস্টিয়ান, য়ীহুদি প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে যে মানুষ মরিলে কবরে স্বর্গদূত কর্তৃক প্রত্যেকের কর্মফল লেখার উল্লেখ আছে, উহা প্রত্যেকের মাতৃগর্ভেই হইয়া থাকে। হিন্দুর জন্মান্তর এবং ঐ সকল ধর্মগ্রন্থের পুনরুত্থান একই অর্থমূলক। হিন্দু শাস্ত্রেও বলে যে, মাতৃগর্ভে যখন পিতার বিন্দু পতিত হয় তখনই দেশ, কাল, পাত্র বিচারে প্রত্যেক জীবের শুভাশুভ কর্মফল ব্রহ্মা লিখিয়া থাকেন। আমি করুণাময়ের কৃপায় জগতের ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ হইতে বর্তমান মানবজাতির অমরত্ব লাভের যে সহজ এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা জানাইবার জন্য জগতের সকল ধর্মাবলম্বী মনুষ্যকে অতি বিনীতভাবে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাঁহার বিশ্বাস হইবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া এ অধমের নিকট আসিয়া ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিয়া দেখিলেই আমি বাধিত হইব। (এখানে অমরত্বের অর্থ যে পর্যন্ত বর্তমান জগতে প্রলয় সংঘটিত না হয় ততদিন জীবিত থাকা)।

পবিত্র কোরানে বলে যে, বিশ্বাসীদের জন্যই স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এবং অবিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত নরক। কোরানে আরও বলে যে, জগতে সত্যবাণী প্রচার করা প্রত্যেক নবী বা প্রেরিত পুরুষের কর্তব্য। জগতের কোনও মানুষ নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা মানুষের অমরত্ব লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয় না। সর্বশক্তিমান করুণাময়ের কৃপায় যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে জানেন সেই ব্যক্তিই তাহা অনুভব করিতে পারে। করুণাময়ের কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে এবং অন্ধের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। জগতের সকল ধর্ম গ্রন্থই দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা আলংকারিকভাবে একই মূল বস্তু শক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রে বলে যে, বস্তুতত্ত্ব সূক্ষ্মজ্ঞানে জীবের ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। হিন্দুর ত্রেতা যুগে—রামের চরণস্পর্শে যে পাষাণ মানব হইয়াছিল, বাইবেলে যে যীশুখ্রীস্ট মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং কোরাণের সুরাবকরায় বর্ণিত হ'ত গোর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা হত ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া যে,..

ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন' এই সমস্ত কথা সকলই একই অর্থমূলক এবং ইহা একই বস্তুশক্তির ভিতর নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর ত্রেতাযুগের রাম ও সীতার বনে গমন ও রামের পাদুকা মাথায় লইয়া ভরত রাজা হওয়ার ভাবের সহিত কোরাণ ও বাইবেল লিখিত জগতের আদি পুরুষ আদম ও ইভের (হবার) নিষিদ্ধ বৃক্ষ ফল ভক্ষণ ও মৃত্যুর অধীন হইয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হওয়ার ভাব অক্ষরে অক্ষরে একই অর্থমূলক। হিন্দুর গীতার 'অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্মা' এবং প্রধানা গোপী বা শ্রীরাধার ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন করাও বাইবেলে, কোরানে লিখিত জমজম্ কূপের জল একই অর্থমূলক। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে একই বস্তুতত্ত্ব নানা আলংকারিক ভাবে জগতের নানা ধর্মগ্রন্থে এক-এক ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মানুষ তাহার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া একজন আর একজনের ধর্মের নিন্দা করে এবং জগতে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। জগতে কাহারও ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা নয় এবং কাহারও ধর্মশাস্ত্র শুধু কবির কল্পনাপ্রসূত গল্পগুজব নহে। যদি, বেদ, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি জগতের ধর্মগ্রন্থ সকল ঈশ্বরের বাক্য হইয়া থাকে এবং তাহা যদি ভুল প্রমাদে পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে আমি আশা করি করুণাময়ের কৃপায় আমার প্রত্যেক কথাই ধ্রুব সত্য। সূর্যের উদয়-অস্ত মিথ্যা হওয়া সম্ভব হইলেও করুণাময়েব কৃপায় আমার এই সকল কথার একটিও মিথ্যা হইবে না।

আজকাল আমার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবগণের ভিতর অনেকেই আমার এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে পাগল মনে করিতেছে এবং অনেকে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতেছে কিন্তু তাহাতে আমি একটুও বিচলিত হই নাই। মহাশয় আপনি বিশ্বকবি এবং একজন ভগবৎভক্ত অতএব বিশ্বেব এই অভাবনীয় পরিবর্তনের বিষয় হয়তো আপনি অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন বলিয়া আপনার নিকট এই পত্র লেখা হইল। যদি আপনার বিশ্বাস হয় তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানা মত আমার নিকট একখানা পত্র লিখিলে আমি আপনার লিখিত নির্দিষ্ট সময় মত আপনার শান্তিনিকেতনে যাইয়া দেখা করিয়া আমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইতে পারি। আমি কোন উচ্চ-শিক্ষিত, বা, কোন গ্রন্থলেখক নহি। আমার বর্তমান বয়স পঞ্চাশের কিছু উপরেই হইবে। সাধারণত আমি গ্রাম্যলোক, তবে কলিকাতায় আসিয়াও সময় সময় বাস করি। আমি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জিলাস্থ কোন পল্লীগ্রামে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর একটি বিশেষ গোপনীয় কথা এই যে বর্তমানে গত বার বৎসর হইতে আমার দেহের গোপনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বিশেষ কোন ঘটনাবসত ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ আমি এখন বাহিরে পুরুষের ন্যায় হইলেও ভিতরে স্ত্রীলোকের মত বা একাধারে পুরুষ প্রকৃতিস্বরূপ। যদিও আমার স্ত্রী ও তিন কন্যা বর্তমান। বিনয়াবনত—শ্রীহেমচন্দ্র সাহা দাস।

পত্রদাতার বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এত সব গোপন কথা

রবীন্দ্রনাথকে না জানালেও বোধ হয় চলত। আর একটি কথা। শিবাদহ বোধ হয় শিয়ালদহ।

বিরলকুমার দে বিরল শ্রেণীরই লোক। এমন কি উন্মাদকুলের মধ্যেও। প্রমাণ গদ্যে পদ্যে ইংরেজি বাংলায় মেশানো তার নিজের চিঠি। পরে অবশ্য নিবেদন আছে। তাঁর কবিতাগুলি সংশোধন করে রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের বইয়ে দিয়ে দেন।

My dear Rabindranath babu.

আমার নমস্কার নেবেন। সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। আজ স্বীয় সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়া আপনি ভারতের দুর্দশা নিজ চক্ষে অবলোকন করিয়াও চুপ করিয়া লেখনী হস্তে বিঘোর নিদ্রায় অচেতন আছেন, এটা কি একটা সামাজিক মোহ। না আয়রণ যুগের হ্যাংকার আফটার লাভ এর পিছনে আমার আমার……·। আমার দেশের লোকগুলি ঐ করিয়াই ম'লো। প্রেম কি অন্যান্য জাতির নাই। তারা ত চিরতরে স্বদেশের হিতব্রতে মুক্ত হস্তে, অকাতরে অবলীলাক্রমে স্ব স্ব স্বামী, ভ্রাতা, পুত্রকে দান করেন। ফলের কথা আদৌ ভাবেন নাই। সংসারের আর আর যারা থাকবে কেমনে খাবে পরবে তার চিন্তা করেন নাই।····· হায় ভারত আমার মত আপনার দুর্ভাগ্য আজ দুয়ারে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ভারতের নূতন যুবক যুবতীরা স্ব স্ব স্বামী স্ত্রী পর্যালোচনায় আদান প্রদানে বিভোর হইয়া নতুন আত্মীয়ের প্রতি নীলাম ডাকিয়া গানের সুরে (Burden) আত্মহারা হইয়া গৃহের কোণে কুলোকুলি করিতেছেন। ওদিকে হুস নাই কোথায় তাহারা কারও মাতা কারও পিতা হতে সাধনায় পারেন না তাহাদের (guardian)-এর জন্য। তাই তাহাদের মনের মধ্যে আত্মাগুলি দগ্ধ হইতেছে, পাপের চিহ্ন দেশে বন্যা বহিতেছে। এর কলঙ্ক দূর করিবে কে? সর্বস্বান্ত bankrupt!

মৃত্যুশোক

'শরৎ এসেছিল ভবে শ্যামল ধারা নিয়ে—
যা ছিল দিয়ে গেল, ভারত ছেয়ে
মোদের মন তুষিতে
কবির মন গাঁথিতে'
'আমার দীপশিখা নিভিয়ে দাও
হোক অন্ধকার—
ভবিষ্যতের নিহিত গর্ভে
প্রস্ফুটিত হবে ইহা
ঘুচিয়া আঁধার

ব্যর্থ কি……অব্যর্থ কি ?
অহঃ রহঃ ভাব
চলন্ত তরীখানি
হাতে যেটি তব।'

কবি ঠাকুর আমার কবিতাগুলি শুদ্ধ করিয়া আপনার পুস্তকে লিখবেন—আমি ইহা সানুনয়ে প্রার্থনা করছি। আপনার অনুগত।

ভবদীয়
শ্রীবিরলকুমার দে।

নীচের পত্রখানি আবদুল মজিদ নামক বন্ধ উন্মাদের। পাগলা ফাইলে তাঁর অন্তত দশ বারোখানি চিঠি আছে।

সোনাকান্দার।
সোমবার।

মহর্ষি আদাব, হঠাৎ জ্বর হইয়া পড়ায় বাড়ি যাওয়া হয় নাই। জ্বর দিন সাতেক পর গতকল্য ছাড়িয়াছে। ভাত কালও খাই নাই। ভালয় ভালয় বাড়ি যাইতে পারি। কারণ এ বাড়ির ব্যবস্থা বিশৃংখলায় ভরা। খাইয়াছি। আজও খাইলাম। স্নানও করিলাম—চিঠি লিখার সময় তো বেশ ভালই লাগিতেছে।

আশীর্বাদকারীও যাহাতে এখন—পীরত্ব ও কালমহিমা এই বিশৃংখলতাকেই সম্মানের আসন করিয়াছে।

যাক, তোমার নিকট সেই চিঠি লিখার কয়েক দিন পর ৫ই আগস্ট তারিখে ইউনিভার্সিটির এক চিঠি আসিয়াছে। ফি বাবদ তাহাদিগকে ১৫৲ দিতে হইবে—এটা হল নিয়ম। কাজেই ১৫৲ টাকা দিলে আমার দরখাস্ত পেশ করিবেন।

আমার টাকা-টুকা নাই। এখান থেকে বাড়ি যাবারই খরচ নাই, খরচ হাতে থাকিলে হয়ত জ্বরের মধ্যে পালাইয়া বাড়ি চলিয়া যাইতাম। অতএব লিখিতেছি দয়া করিয়া ১৫৲ টাকা অনিলবাবুর নামে বা আমার নাম দিয়া ইউনিভার্সিটিতে পাঠাইয়া দিবে। এতো আমার ব্যক্তিগত অন্নবস্ত্রের জন্য নয়। এ হলো সাধারণের জন্য। কাজেই ইহাতে তোমাদের মনস্তাপের কিছু নাই। বহুলোকের কাছে তো ব্যক্তি কিছু নয়, সব সমষ্টি।

Reference দিতে হবে।

Regd. No. s 417 ARB dated 3. 8. 37. regarding complaint against the authority of the Magrahat School to cirdubly 8s4Cf. ...y/z m m mfww the arbitration Board.

এইরূপ দিলেও চলবে। টাকা আমার নিকট পাঠাইবার দরকার নাই।

কাল বাড়ি চিঠি লিখিয়াছি। ওরা হয়তো কেউ আসিবে নিতে। জ্বরটা বেশ ভালই হইয়াছিল—অল্পের মধ্যে রক্ষা পাওয়া গেছে।

সমূহ ফকিরি, দরবেশী, নীরী মুরীদী বা ফিকিরি অনেকগুলো চিন্তা

মাথায় ঢুকেছে। সেগুলো বাড়ি গিয়া নিষ্ক্রান্ত করবে। ইষ্ট ও ওয়েষ্ট-এর মধ্যে কোন জায়গায় চিন্তার পার্থক্য এ বিষয়েও অনেক কথা মনে হয়েছে। যারা ভগবানকে প্রিয় তাদের নাকি একটা কঠিন শারীরিক রোগ থাকে তাঁকে স্মরণ করাবার জন্য—এক হাজার কিছুই বুঝতে পারিতেছি না। এখানকার গল্পসল্প থেকে যা শুনি সেই সব কথার কিছু বাড়ি যাইয়া জানাইব। শরীরটা খুব খারাপ! ইতি। তোমার আব্দুল মজিদ।

মজিদ সাহেবের দ্বিতীয় চিঠিও একই ধরনের। অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যে টাকা চাই। চিঠির ধরন এমনই যেন, রবীন্দ্রনাথ তার ইয়ার।

আমিনপুর, ২৮।৮।৩৭
শনিবার

কবি,

আদাবান্তে নিবেদন এই যে তোমার নিকট ইউনিভার্সিটিতে ১৫টা টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাইয়া ও সেই সঙ্গে নিজের অসুখের কথা লিখার ৩।৪ দিন পরেই সোনাকান্দার হইতে বাড়ি আসিয়াছি। বাড়িও আসিয়াছি আজ দশ দিন। এর মধ্যে জ্বরের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও খুব করিলাম তাতে কোনই ফল না হওয়ায় গত বুধবার হইতে এডওয়ার্ড টনিক নামে এক ঔষধ ব্যবহার করায় বৃহস্পতিবার হইতেই জ্বর বন্ধ হইয়াছে ও বর্তমানে ভাত পথ্যই খাইতেছি। সামান্য বাতকপিত্তিক জ্বর এই নিয়েই পুরোপুরি তিন সপ্তাহ কাটিল। প্লীহাটা একটা বড় হইয়া যাওয়ায় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। টনিক-এ প্লীহাটা একটু ছোট হইয়াছে বোধ হয়, এই ঔষধেই জ্বর সারিবে। কিন্তু দু'জনা রোগী মিলিয়া এক বোতল টনিক খাওয়ায় ঔষধ আজই ফুরাইয়া গেল। পুনরায় যে ঔষধ কবে কেনা হবে তাহা খোদাই জানেন। ১৪।১৫ জন জীবের আহার সংগ্রহ এদের পক্ষে আজকাল দুর্দিনের কষ্টকর তারপর রোগীর সাবু বার্লি বা মাছ দুধ পৃথকভাবে জোটান একরূপ অসম্ভবই।

দীর্ঘ দেড় বছরের ব্যর্থ উন্মাদনা ও অব্যক্ত দুঃখের পরিণতিস্বরূপই বোধ হয় সর্বচিন্তা পরিহার করিয়া একটু বিশ্রাম করার জন্যই ভগবান এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন আর কোন চিন্তা নাই, অসুখের চিন্তা ছাড়া। কিন্তু এর মধ্যে ঔষধ ও সাধারণ পথ্যের চিন্তায় বিশ্রামে আনন্দ আসিতেছে না। সংসারের হাহাকারও এখন মনের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারিতেছে না। শরীর এত দুর্বল যে বাহ্য প্রস্রাবের জন্য বিছানা ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন সময় বিছানা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। চারিদিকে জলে ভরিয়া গিয়াছে বৃষ্টিও প্রায় রোজই হইতেছে। ভাল বোধ হইলে ঘরের ভিতরই ২।৪ পা হাঁটিয়া লইতে হয়। মাথাটা সব সময়ে ভারই থাকে—এতদিন তো ৯৯-১০০' জ্বর সব সময়েই থাকিত তারপর অস্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যও শরীর শীর্ণ হইয়া যাওয়ার জন্যই অন্য উপসর্গের আশংকা মনে হইত। এখন খোদার মর্জিতে সে ভয় নাই।

ভগবানের ইচ্ছাই সফল হইবে—তবুও এই দুর্দিনে তোমার কাছে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—এ সময় আমাকে কিছু ভাল রকম সাহায্য তুমি কর, আমি রোগমুক্ত হই। এ অনুরোধ করায় আমার ভরসা একটুও নাই—গতকল্য রাত্রি মা তোমার নিকট লিখিতে বলিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। নইলে জগতের কাছে যে ঘৃণ্য ভগবান ছাড়া তার আর কি আছে?

ইতি,

আবদুল মজিদ

বঙ্গচন্দ্র প্রামাণিকের চিঠিখানা সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মাথা ঠিক রাখতে হলে চিঠিখানা না পড়াই শ্রেয়।

ফাল্গুন ১৩৪০,
দোলপূর্ণিমা

কবি,

এক নূতন রাজ্যে গিয়েছিলুম—বেড়াতে। এইমাত্র সেখান হতে ফিরে আসছি। দেশটার মাঝখান দিয়ে মস্ত বড় এক প্রাচীর—তার এক পাশে থাকে মেয়েরা, আরেক পাশে পুরুষের দল। নিজেদের শাসন তারা নিজেরাই করে—রাজা শুধু তাদের কর্মপদ্ধতি ও চলার পদ্ধতি লক্ষ্য করে যান। তাদের কোন কাজে বাধা দেন না।

বৎসরের পর বৎসর ধরে নাকি সে রাজ্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঝগড়া চলে আসছিল। কেউ কারো সঙ্গে একত্র মানিয়ে থাকতে রাজী নয় পাছে ছোট হয়ে যায়। মেয়েদের আলাদা বাড়ি, আলাদা ক্লাব, আলাদা খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি—যেন সে দেশে পুরুষ একটা নেশন ও নারী আরেকটা নেশন। রাজা এতসব ঝগড়াঝাটিতে বিরক্ত হয়ে দিলেন দেশটার মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দু' দলকে আলাদা করে। কিন্তু এতেও শুনতে পেলুম অশান্তি মেটে নি: পুরুষেরাও নিজেরা স্বস্তিবোধ করছে না, মেয়েরাও না। উভয় দলেরই মেজাজ সব সময় খিটখিটে। (ব্যক্তিগত মেজাজ ও দলগত মেজাজ)।

হঠাৎ ইতিমধ্যে কি করে একটি কৌতূহলী পুরুষ দলকে লুকিয়ে দেয়াল টপকিয়ে অসম সাহসে মেয়েদের রাজত্বে গিয়ে পড়ল। শুধু এই নয় প্রমীলার দেশের মহিয়সীরাও একটি পুরুষ—পক্ষপাতিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে (বিচারে প্রতিপন্ন হয়েছিল। বেচারী পুরুষদের সব দোষ সত্ত্বেও তাদের পছন্দ করে এবং মুখে তা স্বীকার করে—আর তা নারীরাজ্যে প্রচার করে—নম্র হয়েও পুরুষের কোলে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়) তাকে শাস্তি দেয় দেয়ালের উপর দিয়ে বিশ্বাসঘাতিনী দেশদ্রোহিণীকে পুরুষদের নেশনে নিক্ষেপ করে।

এ দুটো ঘটনায় নাকি উভয় দেশেই ভীষণ সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষরা সে নারীকে সিংহাসনে বসিয়ে তার প্রিয়পাত্র হবার আশায় অগম দুর্গম দেশে যাচ্ছে বিষয়ে ডুবছে—মৃত্যু দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করে। লড়াই, রক্তারক্তিও

চলেছে খুব (নারী রাণী তা দেখে কী ভাববে তা জানি না) এদিকে প্রমীলারাও শুনেছি, নিয়মের পর নিয়ম করে পুরুষ বেচারীকে অন্তরীণ, গৃহাবন্ধ—কারাবন্ধ করছে। অথচ গোপনে তার সঙ্গে সব সুন্দরীরাই দেখা করছে বা করতে চাচ্ছে। তাতে বিচার প্রহসন বেড়ে যাচ্ছে, শাস্তির মাত্রা, ফাঁসির সংখ্যা অগুণিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরী হওয়া, সেজে গুজে চলা, অলংকার পরা, বড় চুল রাখা বেআইনী হলেও তা সহস্র চেষ্টায়ও বন্ধ করা যাচ্ছে না। কঠোর শাস্তির নামে পুরুষ বেচারার প্রতি আদরের মাত্রা যেন বেড়ে যাচ্ছে।

যাক ব্যাপারগুলো ভাল করে দেখতে বা জানতে পারলুম না—কারণ, একে বিদেশী তায় পুরুষ তায় আবার সুপুরুষ হলেও বা হত।

রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, বর্তমানে ব্যাপার কী চলেছে। উভয় দেশে, আর ভবিষ্যতেই বা এর ফল কি দাঁড়াবে। তিনি কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসছেন। বিরক্ত হয়ে চলে এলুম। ভাবলুম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে লিখি, সবজান্তা এইচ. জি, ওয়েলসকে জানাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলুম, এ দু' রাজ্যের সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত তদন্ত করে জেনে তার বিশদ রিপোর্ট দেবার ক্ষমতা একমাত্র কবিদেরই আছে। আর তার মধ্যে কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালার কবিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই কবিকে বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন আমাদের হয়ে এ কাজটুকু করেন, আমরা তাঁর রিপোর্ট প্রত্যেকেই এক এক কপি করে কিনব।

পুঃ—ঐ দেশের রাজা কথা দিয়েছেন, শুধু কবির জন্য তিনি সব রকমের সুবিধা করে দিতে রাজি আছেন। ভয় নেই এতে বৃদ্ধ বয়সের ওজুহাত শুনতে আমরা রাজি নই। কারণ আমরা জানি তাঁর পুষ্পক রথও আছে, আবার মনপবনের পাল খাটানো নৌকাও আছে। সে দেশে যেতে তাঁর কোন কষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

ইতি,
প্রণত,
শ্রীবঙ্গচন্দ্র প্রামাণিক

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় বৃন্দাবন থেকে ১৯৩৫ সালের ১৮ নভেম্বর বিশ্বেশ্বর লিখেছেন,

Sir, I am ordered by a sage to rend you the following message by the registered letter and urge you to reply it at your earliest convence. Call Rommain Rollaind. His services are urgently required for the uplift of India. Arvind is Bhagawan's servant. Consult him as well as Mahatma Gandhi and arrange.—

উপরের পত্রটি অসম্পূর্ণ। নিচের চিঠিখানি অসম্পূর্ণ না হলেও অদ্ভুত।

To Rabindranath Tagore

(1) I salute my mother.

(2) I shall given (it) as for as it is within my power to do.

(3) Bow to the preception who is Brahma, Visnu and Mahesh may who is himself even the highest Brahman in care.

Ramkrishna Shambhuseth

powalekar

Ratan House

Tribhuban Road, Bombay—4

এই রকম আরো কত চিঠি। পাতিয়ালা থেকে দেবরাজ শর্মা বৈদ্য লেখেন হিন্দী চিঠি। একটি চিঠি আসে ব্যাংকক থেকে। পত্রদাতা মহা বেনচরনপা। লা ডাগোলিভ মরিসাস থেকে চিঠি লেখেন রূপনারায়ণ ছতরু। আর একটি চিঠির তলায় লেখা 'ইতি লক্ষ্মীছাড়া কুলাঙ্গার সাধুবাবা। সিন্ধু প্রদেশ থেকে মূলচাঁদ পারওয়ানি জানতে চান—

'What is love, what is the rolling pattern of life'

জনৈক নর্মদানন্দ পরিব্রাজক দশ হাজার টাকা দিয়ে স্কুল খুলতে চান এবং 'রবিবাবুর আশীর্বাদ চান।'

সব শেষে নিবেদন করি একটি বাংলা কবিতা। লেখক ছাত্র রবীন্দ্রভক্ত এবং স্বীকার করতেই হবে কবিতা লেখার ক্ষমতা, তাঁর আছে। লেখকের নাম সুকুমার মহলানবিশ, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ঠিকানা ৩।২ নীলমণি মিত্র রোড, পোঃ কাশীপুর, টালা, কলকাতা। কবিতাটি এসেছে ১৩৪১ বাংলার ২৪ কার্তিক। অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর উন্মাদনা আছে, তবে উন্মাদ নন। অন্যরা বোধ হয় তা মানেন না।

কবিবর, শফরি স্বেচ্ছায় আজি
ধরিয়ে হাঙ্গরে

বামনেও চন্দ্র সুধা লভিবারে চাহে,—
নাহি জানি হৃদয়ের কোন তীব্রোচ্ছ্বাসে
অনুজ্জ্বল হৃদাবেগে উন্মাদনা বলে,
নাহিক উন্মাদ——লোকে বলিবে উন্মাদ
তবু
উন্মাদের মত আহরিব শেষে
কবীন্দ্র! রবীন্দ্রসম আচ্ছাদি গগন

মহাতেজে যে প্রতিভাতেজঃ বিস্তারিছে
সর্বভূমে কাব্য প্রভাসহ অগৌরবে
তাহারি কণিকা আশে উপস্থিত দেব
আমি তব পদরজে, দেহ বর, পারি
যেন কাব্যরূপজালে আপনি বাঁধিতে।
কণক অঞ্জলি পদে প্রদিব আজিকে
শিশুর নাটক এক কৌন্তেয় নামেতে।
গাহিবে কি ? দেব।

ইতি—সুকুমার মহলানবিশ।

তামাম শুদ। পত্র সংকলনের সমাপ্তি এইখানেই। খ্যাতির বিড়ম্বনা যে কত সংখ্যাতীত কত ভয়ংকর, তার পরিচয় এই পাগলা ফাইলের চিঠিতে। প্রাপকের মনোভাব ঠিক জানি না, তবে চিঠিগুলি নকল করে করে আমার মনের অবস্থা অনেকটা সুকুমার মহলানবিশের মতো—'নহিক উন্মাদ, লোকে বলিবে উন্মাদ, তবু, উন্মাদের মতো আহরিব শেষে কবীন্দ্র।'

যাঁরা পাঠক, তাঁদের মনের অবস্থাও কল্পনা করতে পারি। প্রলাপের এমন আন্তর্জাতিক রত্নভাণ্ডার আর কোথাও সম্ভবত এক সঙ্গে নেই। পত্রদাতাদের কেউ কেউ জীবিত থাকতে পারেন। তাঁদের প্রতি যদি কোন অন্যায় মন্তব্য করে থাকি, তবে তাঁদের এবং সকলের আত্মীয়স্বজনের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

যখন এ মর্ত্যকায়ায় থাকবেন না, তখন তাঁকে চৈত্রের শালবনের নিভৃত ছায়ায় স্মরণ করতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে তো ভাবের জগতের দিক। তাছাড়াও কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল কি রবীন্দ্রনাথের? নিশ্চয়ই ছিল। অনেক কিছুই ছিল। ভাবের জগতের বাইরে রবীন্দ্রনাথের বড় দুটি সম্পত্তি শান্তি-নিকেতন এবং শিলাইদা ও পতিসর। আর আছে বইপত্র থেকে আয়। বাস্তবে সেগুলি সম্পর্কে তাঁর মনোবাঞ্ছা কী ছিল বহু জায়গায় বহুভাবে তা' বলে গেলেও এযাবৎ অপ্রকাশিত আর একটি দলিল আমি পেয়েছি। পেয়েছি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে। ৬৭৬ সংখ্যক নথির বিষয়বস্তু 'রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত উইল।' তারিখ ২ পৌষ ১৩১৮। অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর, ১৯১১। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫০ বছর ৭ মাস ১৩ দিন। সেই সময় তিনি দীর্ঘ দুই পৃষ্ঠার একটি উইল করে যান। তাতে লেখা আছে 'আমার উইল পত্র, আমার মনোবাঞ্ছা নিবেদন।' পুরানো কাগজের মধ্যে এই মূল্যবান দলিলটি হঠাৎ পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ এটিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উইল নয়। তার আগেও যে করেছিলেন, তারও প্রমাণ আছে। যতদূর জানি নিজের লেখা বই সম্পর্কে আর একটি উইল তিনি করেছিলেন বিশ দশকের গোড়ায়। তবে এই উইলটি বহুদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে এত দিন কেউ কোন আলোকপাত করেন নি কেন, অবাক লাগে।

এই সময়ই 'ডাকঘর' নাটক লেখা হয়েছিল। 'ডাকঘর' লেখা শেষ হয় ১৯১১ সালের পুজার ছুটির আগটায়। নাটক ছাপা হয় ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে। উইলপত্র রচনার সময় ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস—সাতুই পৌষ উৎসবের অল্প কয়েকদিন আগে।

'ডাকঘর' নাটকের প্রধান চরিত্র অমল। অমল চরিত্রের সঙ্গে মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের সত্তাও। নিঃসঙ্গ অমলের মৃত্যু নাটকটির মূল বিষয়। সেই মৃত্যুটির সঙ্গে নাট্যকারের মৃত্যুর চিন্তা মিশে থাকা সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি নাকি ডাকঘর নাটকে অমলের মৃত্যুর পর গাওয়ানোর কথা ছিল। রিহার্সেল হতে হতে রবীন্দ্রনাথ গানটি তুলে নেন এবং এই ইচ্ছা নাকি প্রকাশ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন

'সমুখে শান্তি পারাবার' গাওয়া হয়। তাই হয়েছিল। ১৯৪১ সালে কবির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হয়।

এই উইলপত্রের দুটি। ভাগ একটি টাকাকাড়ি বিলির বিষয়ে। অন্যটি বিশ্ব ভারতী ও জমিদারি নিয়ে। নিচে উইলপত্র ও মনোবাঞ্ছা হুবহু তুলে দিলাম। অবাক লাগে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ এই উইলই বা কেন করতে হয়েছিল?

আমার উইলপত্র

আমার মৃত্যুর পরে আমার সমুদয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে আমি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিবাস ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা—সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে এই উইলপত্র লিখিয়া দিতেছি—

(১) বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার শ্রাদ্ধক্রিয়া অনধিক এক হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে।

(২) যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবীর অভাব অল্প ও তাঁহার সঙ্গতি যথেষ্ট এই কারণে কেবলমাত্র আমার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার জন্য যাবজ্জীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকা এবং আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অতসীলতা দেবীর জন্য যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা মাসহারা বরাদ্দ করিলাম।

(৩) যদি আমার কনিষ্ঠ জামাতা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির জীবিত কালেই আমার কন্যা শ্রীমতী অতসীলতা দেবীর মৃত্যু ঘটে, তবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি যাবজ্জীবন পঞ্চাশ টাকা মাসহারা পাইবেন।

(৪) যদি শ্রীমতী মাধুরীলতা বা অতসীলতা দেবীর বৈধব্য ঘটে তবে তাঁহাদের বরাদ্দ মাসহারার অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ টাকা করিয়া তাঁহারাই মাসিক পাইবেন।

উপরিলিখিত ১, ২, ৩ ও ৪ দফায় বর্ণিত দেয় বাদে অবশিষ্ট আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আমি আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দান করিলাম।

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার উইলের একজিক্যুটর নিযুক্ত করিলাম।

অদ্য বাংলা ২রা পৌষ ১৩১৮ সালের ইংরেজী ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সোমবারে আমি এই উইলপত্র লিখিলাম। ইহার পূর্বে আমা কর্তৃক যে কিছু উইল লেখা হইয়াছে তাহা বাতিল হইয়া এই বর্তমান লিপিই আমার চরম পত্ররূপে গণ্য হইয়া গ্রাহ্য হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পুনশ্চ ॥ অপর পত্রে রথীন্দ্রনাথের প্রতি আমার যে উপদেশ ও ইচ্ছা নিবেদন করিলাম তাহা আমার এই উইলের অঙ্গ নহে, সে সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন।

২রা পৌষ ১৩১৮ সোমবার। ইতি,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাক্ষীঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯নং শ্রীনাথ রায়ের গলি, চোরবাগান, কলিকাতা।

আমার মনোবাঞ্ছা নিবেদন

বোলপুর বিদ্যালয়কে রক্ষা করা সম্বন্ধে আমার যে অভিপ্রায় তাহা রথীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে আমি তাহাকে কোনোরূপে আবদ্ধ করিতে চাহি না। কারণ বিদ্যালয়ের কখন কিরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা আগে থেকে চিন্তা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে যখন যাহা করা কর্তব্য তাহা তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক করিবেন।

জমিদারী সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীন্দ্রকে সে সম্বন্ধে বার বার উপদেশ দিয়াছি। তদনুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি যদি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রসন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতে পারেন, তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ইতি, ২রা পৌষ ১৩৮৩, সোমবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাক্ষীঃ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯নং শ্রীনা: রায়ের গলি, চোরবাগান, কলিকাতা।

উইলপত্র রচনার সময় স্ত্রী মৃণালিনীদেবী, মধ্যমা কন্যা রেণুকা এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মৃত। তাই উত্তরাধিকারী হিসাবে বেঁচেছিলেন মাত্র তিনজন—পুত্র রথীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলা এবং কনিষ্ঠা কন্যা অতসীলতা বা মীরা। এই তিন জনেরই উল্লেখ আছে উইলে। সাক্ষী দু'জনের একজন ভাগ্নে, অন্যজন বাড়ির সদর খাজাঞ্চি।

এই উইলটির 'মনোবাঞ্ছা নিবেদন' অংশটিই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ব ভারতী বাঁধাধরা কানুনে যাতে অচলায়তন না হয়ে ওঠে সেকথা আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলে গিয়েছেন পুত্রকে। জমিদার র.ীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মনোবাঞ্ছাটি আরো উল্লেখযোগ্য। জমিদারী আয়ের উপর জীবনধারণ করা যে রবীন্দ্রনাথ কত ঘৃণ্য মনে করতেন এই দলিল তার আর একটি প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৯৩০ সালের ৩১ অক্টোবর রথীন্দ্রনাথকে লেখা, একখানা

চিঠি। ফিলাডেলফিয়া থেকে তিনি লিখছেন 'জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নিচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।'

নিজে জমিদার হয়েও প্রজার স্বার্থ যে রবীন্দ্রনাথ বেশি দেখতেন তার আরো অজস্র প্রমাণ আছে। প্রজাদের হাতে জমিদারী তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর অনেক দিনের। এই উইলপত্রে সেই ইচ্ছাটা আরো স্পষ্ট। তবে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এতই যদি ইচ্ছে তাহলে পুত্রকে নির্দেশ না দিয়ে নিজেই তো সব প্রজাদের দিতে পারতেন। প্রশ্নটি সঙ্গত, তবে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। জমিদারী রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জিত নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করার নৈতিক অধিকার তাঁর নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেয়ে পুত্র যদি তা দান করেন, তাহলেই পিতা তৃপ্ত হন, কারো কিছু বলার থাকে না। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সম্পত্তি বিপুল আয়ের বই। তা তিনি পরে বিশ্বভারতীকে দান করে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুত্র বঞ্চিত হলেও কিছু বলার থাকে না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ জবরদস্তি কিছু চাপানো পছন্দ করতেন না। সেই সব কারণেই জমিদারীটা প্রজাদের হিতার্থে উৎসর্গ করার কোন আইনগত নির্দেশ না দিয়ে তিনি নৈতিক অনুরোধ করেছেন পুত্রকে। তবে যেভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাতে প্রজাদের হাতে সম্পত্তি তুলে দেওয়ার কথাটা আইনগত নির্দেশের চেয়েও বড়। এইদিক থেকে বিচার করলে এই উইলপত্রটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

আর একটি কথা মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথদের জমিদারী ছিল এজমালি। পরিবারের অন্য মালিকদের সায়ও এই সম্পত্তি উৎসর্গে প্রয়োজন ছিল।

বড় বিস্ময় লাগে

দেশবিদেশের কত গুণীজ্ঞানী রবীন্দ্রসান্নিধ্যে এসেছেন। আসারই কথা। রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ', ইয়েটস, রটেনস্টাইন, আইনস্টাইন, এইচ. জি. ওয়েলস, আঁদ্রে জিঁদ, বার্ট্রান্ড রাসেল, মেন্ডেল সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিজ, এজরা পাউন্ড, নোগুচি—কত নাম বলব। নানা সময়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অনেকের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছে। তা ছাড়াও আরো এমন অনেক বিদেশী বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল, যাঁদের কথা আমরা ভালভাবে জানি না।

যেমন লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। তাঁর বহু দিনের শখ ছিল রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২০ সালের ২৭ জুন লন্ডনে দু'জনে লাঞ্চ খান লরেন্সেরই আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথ ওঁকে আরব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পশ্চিমের লোকের অন্তরে একটা পাশবপ্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে। লরেন্স জবাবে বলেন, ইংরেজদের জব্দ করার একমাত্র উপায়, তারা যতখানি শক্তিতে আঘাত করে তার দ্বিগুণ শক্তিতে সে আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া।

মূকবধির ও অন্ধমনস্বিনী হেলেন কেলার ছিলেন রবীন্দ্রভক্তদের একজন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবিও অনেকে দেখে থাকবেন। আমেরিকা প্রবাসের সময় কবি কেলারের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২০ সালের ৭ ডিসেম্বরে একসঙ্গে দু'জনকে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। হেলেন কেলারের আত্মজীবনীর নাম 'দি ওয়ার্ল্ড আই লিভ ইন'। ১৯২১ সালে বইটি যখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন, তাতে লিখে দেন, কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি—

I forget, I ever forget that the gates are shut everywhere in the house where I dwell alone.

ঠিক এমনই উইল ডুরান্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় ১৯৩০ সালে। তাঁর লেখা বই 'দি কেস ফর ইন্ডিয়া'। বইখানি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়ে ডুরান্ট লেখেন—

'You alone are sufficient reason why India should be free.'

জার্মান মনীষী কাউন্ট কাইজারলিং রবীন্দ্রনাথকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার

জন্য একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। দি গোল্ডেন বুক অব টেগোর গ্রন্থে তিনি লেখেন—

Rabindranath Tagore is the greatest man I have had the privilege to know. He is much greater than his world reputation and above all his poosition in India imply. There has been no one like him anywhere on our globe for many centuries

নাম করা ইংরেজ অভিনেত্রী ডেম সিরিল থর্নডাইক। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে, তিনি তাঁর হোটেলে দেখা করতে যান, শিষ্যার মতো কবির কথা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। তারপর এই স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ দিয়ে থর্নডাইক লেখেন—

'It was an hour I shall never forget as long as I live for he gave me a glimpse of the very things I had been striving to find and understand as a Christian through the eyes of a great mind of another race.

পৃথিবীবিখ্যাত বেহালাবাদক পাদেরিয়েস্কি। তিনি পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনসার্ট শুনে মুগ্ধ হন। কনসার্টের পর দু'জনে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন, দু'জনের বন্ধুত্ব এত নিবিড় হয় যে, পাদেরিয়েস্কি পরে তাঁর সম্পূর্ণ একটি কনসার্ট রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

জার্মান নাট্যকার বারটোল্ডে ব্রেখট ছিলেন আর একজন রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছিল। রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'বড় বিস্ময় লাগে, বড় অবাক লাগে আমাদের, কেমন করে আমাদের বুকের তন্ত্রীগুলোতে মোচড় দেয়, আমাদের করে দেয় বড় বেদনার্ত, বড় আনন্দনিবিড়, আমাদের সময়ের পাষাণভারী অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেন। ভুলিয়ে দেন আমাদের সংগ্রাম আর পরিশ্রম। আমরা কবির বাড়িয়ে দেওয়া হস্ত ধরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল শান্তির এক বিশ্বে ভ্রমণ করে আসি।'

ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয় দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে। ক্রোচে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরে এক চিঠিতে লেখেন—'প্রখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে সেদিন আমার এক পলক দেখা হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলতে অবশ্য একটু বেগ পেতে হয়েছিল। স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা বীর, যাঁরা অকুতোভয়, তাঁদের সঙ্গে চিন্তা বিনিময়ে আমার অশেষ আনন্দ।'

পর্যটক স্বেন হেডিনও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতিতে লিখেছেন—

পর্যটক স্বেন হেডিনের সঙ্গে আমাদের আগের থেকেই আলাপ ছিল।

আচমকা যত্রতত্র তাঁর আবির্ভাব হত। সকল দেশই ছিল তাঁর আপন দেশ। তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। বাবা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে খুব ভালবাসতেন। এখন সাক্ষাৎ-পরিচয়ের ফলে মানুষটিকেও তাঁর খুব ভালো লাগল। খুব সহজে এঁর সঙ্গে বন্ধুতা জন্মে।'

গিলবার্ট মারে, ইকনমিস্ট কেইনস মুরহেড বোন, লোজ ডিকিনসন, জ্যোতির্বিদ স্যার ফ্রাঙ্ক ডাইসন, মে সিনিকিয়ার প্রমুখ আরো অনেক গুণী-জ্ঞানীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল হৃদ্যতা। তাঁদের সকলেই নানাদিকে কৃতী।

যেমন বিদেশে, তেমনি স্বদেশেও নানা রকমের গুণী কবির সংস্পর্শে আসেন। সুভাষবাবুকে যেমন তিনি ভালোবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন নেহরুকে। একজনকে বলেন দেশনায়ক, আর একজনকে ঋতুরাজ। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব জগদীশ বসু, ব্রজেন শীলের সঙ্গে, কেশরবাঈ কেরকারের হিন্দী গান শোনেন মন দিয়ে, শান্তিনিকেতনে ডেকে এনে দেখেন মালয়ালম কবি ভাল্লোথালের কথাকলি নাচ, আলাউদ্দীন খাঁর তিনি বড় সমঝদার, উদয়শংকরকে জানান সম্বর্ধনা, আনন্দকুমার স্বামীর তিনি গুণমুগ্ধ। মদনমোহন মালবীয়, লোকমান্য তিলক, চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যেমন তিনি ছিলেন, তেমনি ছিলেন ফজলুল হক, নলিনী সরকার, শিশির ভাদুড়ি, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহাদের সঙ্গে। নিবেদিতা তাঁকে নিয়ে যান বুদ্ধগয়া, লোকমান্য তিলক তাঁকে ইউরোপ পাঠাতে চান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবির প্রচারে। কবি হয়েও তাঁর গতিবিধি ছিল সর্বত্র, তাই অসংখ্য অ-কবি গুণীজ্ঞানী তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রেখটের মতো সকলেরই যেন এক কথা—'বড় বিস্ময় লাগে।'

জোড়াসাঁকো — শান্তিনিকেতন

উনবিংশ আর বিংশ—এই দুই শতাব্দীকে নিজের জীবনে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন মণীষীদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। আশী বছর তাঁর পরমায়ু, চল্লিশ দিয়ে দুটি শতাব্দী বিভক্ত। এই বিভাগ শুধু কালের নয়, স্থানের বিচারেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ—১৮৬১ থেকে ১৯০১ কাটিয়েছেন প্রধানত জোড়াসাঁকোয় এবং শেষার্ধ—১৯০১ থেকে ১৯৪১ প্রধানত শান্তি-নিকেতনে। জোড়াসাঁকো তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর ঠিকানা হলেও রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন শান্তিনিকেতনেই। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে আত্মীয় পরিজনদের মাঝখানে জীবনের প্রথমার্ধ কাটিয়ে তাঁর বাকি জীবন কাটে মুখ্যত অনাত্মীয় প্রিয়জনদের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির 'কাঁচাপাকা আম' তখনই হন বিশ্বকবি।

শান্তিনিকেতনে ঠিকানা বদলের পর রবীন্দ্রনাথ প্রায় জোড়াসাঁকোয় আসতেন বটে, কিন্তু মন আর সেখানে নেই। ততদিন অবশ্য ঠাকুরবাড়িও ভাঙা হাট, সেই জমজমাট চেহারা আর তার নেই। তিনি ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে, দাদা দিদি বৌদিদের স্নেহে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণও সেই ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু প্রতিভার যখন পূর্ণ বিকাশ হল দ্বিজেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বাদে ঠাকুর বাড়ির অন্যরা সব কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ততদিনে জোড়াসাঁকোয় একজন অতিথিমাত্র।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর সেখানে যান একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ—এই তিন পুরুষ, তাছাড়া ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথ। অজীন্দ্রের ছেলে অভীন্দ্রও শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সত্যেন্দ্রনাথের দিকের কয়েকজনও কিছুদিন পড়েন। ঠাকুরবাড়ির আর বিশেষ কেউ শান্তিনিকেতনকে পাঠযোগ্য স্থান বলে মনে করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ যেতেন কদাচিৎ। ঠাকুর বাড়ির অন্য যে দু'-চারজন শান্তিনিকেতনের ছাত্র হন, তাঁরা সবাই যান রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। জোড়াসাঁকোর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মানসিক দূরত্ব হয়ে যায় সহস্র যোজন।

তার চেয়েও বড় কথা সম্পদে-বিপদে জোড়াসাঁকো তখন রবীন্দ্রনাথের পাশে নেই। শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হবার পরে পরেই রবীন্দ্রনাথ পড়েন ভীষণ সংকটে। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিরবিদায় নেন। রবীন্দ্রনাথ বিপন্ন হন শিশু পুত্রকন্যাদের নিয়ে। তাদের কে দেবে আহার, কে করবে পরিচর্যা। রবীন্দ্রনাথ এত বড় বাড়ির ছেলে, এত খ্যাতিমান পুরুষ, কিন্তু তাঁর বিপদের সময় ঠাকুরবাড়ি থেকে কেউ এগিয়ে আসেন নি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ অত্যধিক পরিশ্রম। বিবাহের পর থেকেই তিনি বৃহৎ পরিবারের সংসারজালে বাঁধা পড়ে যান। দম ফেলবার জন্যে একবার আলাদা স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিলেন শিলাইদা, কিন্তু সেখানেও জীবন সুখের হয় নি। আবার ফিরে আসেন জোড়াসাঁকোয়। শান্তিনিকেতনে যখন স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে নতুন সংসার পাতলেন, সুখ সহ্য হল না, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি অকালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে প্রাণ হারালেন এবং স্বামীকে রেখে গেলেন নিঃসঙ্গ নিরালম্ব করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চোখে অন্ধকার দেখলেন। সন্তানদের মানুষ করবে কে? এই সময় শেষ পর্যন্ত সন্তান পরিচর্যার জন্য জমিদার রবীন্দ্রনাথকে খুলনার এক গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে হল রাজলক্ষ্মী দেবী নামে মৃণালিনী দেবীর এক দূর সম্পর্কের পিসিমাকে। শুধু তাই নয়, শতকর্মের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকেও স্নান করাতে ঘুম পাড়াতে হয়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের।

দুঃখের জীবন রবীন্দ্রনাথের। স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই বিদায় নিলেন মেজ মেয়ে রেণুকা, ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ। রেণুকা যখন ক্ষয় রোগে অসুস্থ, পাহাড়ী এলাকায় পাইন গাছের হাওয়া যখন তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে দরকার, তখনও রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে কেউ দাঁড়ান নি। অসুস্থ এত বড় মেয়েকে নিজে কোলে করে নিয়ে চড়াইয়ের পর চড়াই ভেঙেছেন পাহাড়ে। এমনই কপাল, আর কোন বাহকও জোটে নি কবির এই দুর্দিনে। শমীন্দ্রনাথ যখন মুঙ্গেরে হঠাৎ মারা যান, তখন শোকার্ত পিতার সঙ্গে তাঁর পরিবারের কেউ ছিলেন না। ছিলেন শান্তিনিকেতনেরই একজন অধ্যাপক—ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। মৃণালিনী দেবী যখন জোড়াসাঁকোয় মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর সন্তানদের বোলপুরে আনা-নেওয়া করতেন আর কেউ নন, শান্তিনিকেতনের এক অধ্যাপক—শিবধন বিদ্যার্ণব। মৃণালিনীদেবী তাঁর শেষ শয্যা পেতেছিলেন বিচিত্রা বাড়িতে। যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেখানে আলো হাওয়া ঢোকার রাস্তা ছিল না। কনিষ্ঠা কন্যা মীরা-দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় তার জন্যে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যদি বন্ধ ঘর না হত তাহলে মা মৃত্যুর আগে একটু স্বস্তি পেতেন।' স্ত্রীকে একটু শান্তি দিতে রবীন্দ্রনাথই অনবরত চালিয়েছেন হাতপাখা। এত বড় বাড়ির অন্য কোন খোলামেলা ঘরে রোগিনীর স্থান হয় নি।

দুঃখের তালিকা দীর্ঘ করার দরকার নেই, শুধু এইটুকুই বলব যে—

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এত গর্ব, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কতটুকু করেছেন রবীন্দ্রনাথের জন্যে। একমাত্র প্রতিমাদেবী রবীন্দ্রনাথের সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি দান করে গেছেন রবীন্দ্রচর্চায়। আর কাগজপত্র সব দিয়েছেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। আবার এও দেখতে পাই, দেশের সাধারণ মানুষ যখন সাধ্যমত অকাতরে দান করেছেন রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষায় তখন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একজন ধনাঢ্য মহিলা রবীন্দ্র-গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে দান করার মতো ঔদার্য না দেখিয়ে পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন লক্ষাধিক টাকা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতই তাঁর মমতা!

কবিতায় তিনি অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'একী কৌতুক নিত্যনূতন, ওগো কৌতুকময়ী।' অন্তরালের এই 'কৌতুকময়ী' কে, আমরা ঠিক জানি না, তবে এইটুকু জানি রবীন্দ্রনাথ নিজে আজীবন কৌতুকময়। এবং সেই কারণেই বোধ হয় শান্তিনিকেতনে কৌতুকের এত চর্চা। রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র কৌতুকের ছড়াছড়ি তো আছেই, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও সাক্ষ্য দেবেন, কবির প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে থাকত কৌতুকরসের ফুলঝুরি। মৈত্রেয়ী দেবীর মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, রানীচন্দের আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও গুরুদেব, রাণী মহলানবিশের বাইশে শ্রাবণ বা কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, কিংবা প্রমথনাথ বিশী, নন্দিতা কৃপালনি, অমিতা ঠাকুর প্রমুখের জবানবন্দীতে কবির কৌতুক বাক্যের ছড়াছড়ি।

তখন রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ ছাপা হচ্ছে, কবি কিঞ্চিৎ অসুস্থ, সকালবেলা শান্তিনিকেতনে রাণীচন্দকে হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'রবীন্দ্রনাথের মুখ্য সংস্করণের খবর কী? 'রাণীচন্দ প্রথমে অবাক, পরে বুঝতে পারেন, নিজের মুখের চেহারা আজ সকালে কেমন, তাই জানতে চেয়েছেন কবি। ঠিক তেমনি মৈত্রেয়ী দেবীকে একদিন মংপুতে 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন' গানটি শুনতে চেয়ে হাসতে হাসতে বলেন, "কী বোকাই না ছিলাম তখন, কনকব গসে জলভরে চলে যাওয়া মেয়েটির জন্য কী হা হুতাশ, এখন হলে বলতুম, যাবে তো চলে যাও, কে আটকাচ্ছে তোমাকে, বরং তোমার কনককলসটি রেখে যাও, বিশ্বভারতীর অর্থাভাবে কাজে লাগবে, সোনার এখন অনেক দাম।"

উদাহরণ অজস্র। আগ্রহীরা ওইসব স্মৃতিকথায় ঢের মালমশলা পাবেন, দেখতে পাবেন সাধারণ কথা নিয়ে অসাধারণ রসিকতা করার ক্ষমতা কতটা ছিল রবীন্দ্রনাথের। এবং সেই কারণেই বোধ হয়, আগেই বলেছি, গোটা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সংস্পর্শে রসস্নিগ্ধ হয়েছিল। এই ব্যাপারে ক্ষিতিমোহন সেন অগ্রগণ্য। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি 'পান' অদ্বিতীয়। একটা উদাহরণ দিই। ক্ষিতিমোহনবাবুদের পৈত্রিক পেশা কবিরাজী। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হয়ে আসার পর একজন জিগ্গেস করেন, তিনি কবিরাজী আর করছেন না কেন। তৎক্ষণাৎ জবাব, "কি করব, কবি রাজী হলেন না যে!" পরবর্তীকালে

প্রবোধচন্দ্র সেনও 'পান'-এ সিদ্ধবাক্। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখবেন, শান্তিনিকেতন থেকে যে-দু'জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক নাম কিনেছেন, আমি প্রমথনাথ বিশী আর সৈয়দ মুজতবা আলির কথা বলছি, সেই দুজনেরই রচনা কৌতুকরসে ভরা।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'হালকা হাসি দেবতার দান।' তাই বৃদ্ধবয়সেও তিনি বলতে পারেন, "ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায় দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়।" তাঁর বক্তব্য—"এত বুড়ো কোনকালে হব নাকো আমি, হাসি তামাসারে যবে কব ছ্যাবলামি।" সে, গল্পসল্প, খাপছাড়া, প্রহাসিনী—কত বই তিনি লিখেছেন কৌতুকরস নিয়ে। প্রত্যেকটি অনন্য, প্রত্যেকটি অসাধারণ। তাই তিনি আদর করে মেয়ের নাম রাখেন ক্যালিফোর্নিয়া, চার মিথ্যের বর্ণনায় বলতে পারেন, 'মিথ্যে ভেলকি ভূতের হাঁচি মিথ্যে কাচের পান্না, তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।' বাংলার সঙ্গে হিন্দী মিলিয়ে ভাইপোকে চিঠি লেখেন "তুম্ ছাড়া কোন সমঝে না তো হম্‌রা, দুরাবস্থা, বহিন তেরি বহুৎ মেরী খিলখিল কর্কে হাস্‌তা' এবং অবশেষে স্বীকার করেন 'খোলসটা খসিয়াছে বৃদ্ধের, ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে সিদ্ধের।'

শুধু তাই নয়, যখন গুরুগম্ভীর গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ লেখেন তখনও তলায় তলায় কৌতুক উঁকি মারে অনিবার্যভাবে। গল্পগুচ্ছের রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা গল্পটাই ধরুন না। শুরুতেই লিখেছেন—"যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপীকৃত চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব তারো সময় পাওয়া যায় না।'

ঠিক এই ভাবেই তাসের দেশ, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, গোড়ায় গলদ বইয়ে হাসির ছর্‌রা ছড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক—এই বইয়ের নামও আলাদাভাবে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে সব কিছুকে টেক্কা দিয়েছে 'সে' এবং 'গল্পসল্প'। 'সে' বইয়ের "স্মৃতিরত্নমশাই মোহনবাগানের গোলকীপারী করে ক্যালকাটার কাছে একে একে পাঁচগোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অকটারলনি মনুমেন্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে।" গল্পসল্পের বাচস্পতিমশাই আর এক কাঠি বাড়া। তিনি শুরু করলেন এইভাবে—

সম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাক্রান্ত তরিৎব্রামন্ত পর্যুগাসন উথ্যুংসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতিমশায় উখ্‌শ্রংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজী বললেন, ওর মানে উখ্‌শ্রংসিত।

তার মানে?

তার মানে উখ্‌শ্রংসিত।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ তার মানে হতেই পারে না। মেরেকেটে একটা মানে দিতে পারি।

কী রকম?

ভিরভ্রিংগাট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, বলে যান।

পাঠকদেরও আর বলতে হবে না, উদ্ভটত্বের সঙ্গে মিশে কৌতুকরস কত দূরে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি "কৌতুকের বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।" এই জন্যেই তিনি অন্যত্র ছন্দে বলেন, "ভূগোল হত উলটো পালটা কাহিনী আজগুবি, মজা লাগত খুবই।" এই মজার জগতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে তিনি সৃষ্টিও করেছেন অজস্র। এমন কি গান লিখতে বসেও বড় দুঃখের সঙ্গে তিনি আমাদের হাসান, অনায়াসে বলেন, "বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে, হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিসকে।" বাল্মীকি প্রতিভায় দস্যুদলের সংলাপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথ সংগীতজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী, কিন্তু প্রকৃতি আর মানুষের মতো কৌতুকও তাঁর কাছে প্রিয় এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বীকারোক্তি দেন—

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝেমাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু।
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি।

জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রায় সমসাময়িক দুই দিকপাল সাহিত্যিক। বিবাহসূত্রে যেমন এই দুই খ্যাতিমান কাছাকাছি এসেছিলেন, তেমনি আরো কাছে এসেছিলেন সবুজপত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকাটি সেকালে আলোড়ন তুলেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। এ কাহিনী অবশ্য সকলেরই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, আর একটি ক্ষেত্রে এই দুই মনীষী একত্র হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পুবাদস্তুর জমিদাব, তখন কিছুকালের জন্য তাঁর এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রজামঙ্গলে দু'জনে হাত মিলিযেছেন। প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথা বইয়ের ভূমিকাও লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথেব জমিদারী কাজকর্ম নিয়ে আমি একখানি বই লিখেছিলাম। জমিদার রবীন্দ্রনাথ। বইটিতে সবই দিয়েছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জমিদারী হুকুমনামার কোন লিখিত নজির বিশেষ দিতে পারিনি। তার কারণ তখনও এমন নজির পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী হুকুমনামার কয়েকটি লিখিত নজির পেয়ে গেছি। তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, আছে ঐতিহাসিক মূল্য। এই হুকুমনামার সঙ্গে আর এক প্রতিভাধর সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর নামও যুক্ত। নিচে দেওয়া দুটি নজিরই এযাবৎ অপ্রকাশিত।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনৈক অক্ষয়কুমার সেন একখানা আবেদনে জমিদারবাবু রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

নিবেদন এই, অধীনের পরিবারে স্ত্রীলোক এবং ছেলেপেলে লইয়া ৭।৮ জন লোক আছে এবং তাহাদের পুরুষ অভিভাবক একমাত্র আমি। উহাদিগকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দূরে পল্লীগ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া বিদেশে সর্বদা চাকরি করা আমার পক্ষে ক্রমেই অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া উঠিতেছে অথচ এরূপভাবে চাকরি করা ভিন্ন উপায় নাই। হুজুরদের সেরেস্তায় পুনরায় চাকরি গ্রহণ করিয়াছি এবং বিশেষ অসুবিধা না হইলে জীবনের অবশিষ্টাংশ এই কার্যেই অতিবাহিত করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। এ কারণ দেশের বাস তুলিয়া দিয়া হুজুরদের এলাকায় বাড়ী করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার দুটি ভাইপোকে পড়াইবার

জন্য সদরের ধারে বাড়ি করার দরকার এবং আমার মত একা প্রাণীর সংসারে কিছু খামার জমি থাকাও একান্ত দরকার। লাহিনী মৌজার যেখানে বাগান হইয়াছিল, সেখানে ২০ বিঘা আন্দাজ সরকারী খাস জমি আছে। উহা বন্দোবস্ত লইলে আমার উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে। বলিয়া মনে করি।

দেশের বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইব। তাহা হইতে সরকারের কিছু নজরও দিতে পারিব। অনুগ্রহ করিয়া ঐ জমিটা আমাকে বন্দোবস্ত দিতে আদেশ হইবে। দিনু ঘোষের যে-জমি সরকারের পক্ষ হইতে খরিদ করা হইয়াছে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যতে সরকারের কিছু আয় হইতে পারে সে জমি আমি চাহিতেছি না। যে জমি চাহিতেছি তাহা এ জমির পশ্চাতে এবং কতটা রেল লাইনের অপর পার্শ্বে। বিদিতার্থে নিবেদন। ইতি সন ১৩২১, ২২শে মাঘ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

এই দরখাস্তের উপর বাঁ কোণে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে নোট দেন :—রথী এ সম্বন্ধে প্রমথর সঙ্গে আলোচনা করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই নোটের উপর ১৯১৫ সালের ২৪ জুলাই প্রমথ চৌধুরী নিজে ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন : 'ম্যানেজারবাবু, অক্ষয়বাবু, ভূপেশ, অনঙ্গ এবং অক্ষয়বাবুর তিনঘর আত্মীয় এবং একঘর ডাক্তারের বাড়ি তৈরী করিবার জন্য ২ নং প্লট দেওয়া যাইতে পারে—পি. সি.

এই নোট ও নির্দেশ অনুযায়ী জমি পেয়ে যান দরখাস্তকারী।

আর একখানা দরখাস্ত জনৈক প্রজা তোরাপ আলি মণ্ডলের। সাকিন চর রাধাকান্তপুর।

তিনি লিখছেন—

ধর্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু। দরখাস্ত শ্রীতোরাপালি মণ্ডল সাং চর রাধাকান্তপুর। অধীনের নিবেদন এই যে, সন ১৩২০ সালে চর সদীরাজপুরে ২৬ বিঘা জমি প্রতি বিঘা ২৫ টাকা নজরে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া ১০০ টাকা দিয়াছিলাম। ঐ জমিতে কিছুই না জন্মায় আমি হুজুরের নিকট একখণ্ড দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে হুজুর আমাকে ঐ টাকায় জমি দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। এহিক্ষণে হুজুরে প্রার্থনা এই যে, কোন ফাকি চর রাধাকান্তপুর মধ্যে উক্ত ১০০ টাকায় জমি কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়। আমি হুজুরের নিতান্ত দুঃখী প্রজা। আমার প্রতি সুলক্ষ্য করিয়া আমাকে ভিটায় বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। ধর্মাবতার কর্তা নিবেদন ইতি। সন ১৩২২ সাল ২৮ মাঘ।

দরখাস্তের কোণে সদর খাজাঞ্চি এস. সি. ঘোষ নোট দেন : এ ব্যক্তি গত ১৩২০ সালে সদীরাজপুরের চরে ২৬ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া তদ্দ্বারা ১০০ টাকা নজর দিয়াছিল। ১৩২০।১৩২১ সালে জমিও আবাদ করিয়াছিল। ফসলাদি

ভালরূপ না হওয়ায় তাহার পরিবর্তে জমি পাওয়ার প্রার্থনা করে। তৎসম্বন্ধে পূজনীয় চৌধুরীসাহেব মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন ঐ চরে অন্য স্থান হইতে কিছু জমি দিয়া তাহার নজর মধ্যে পূর্বেকার লওয়া ১০০ টাকা বাদ দিয়া লওয়া হইবে। দরখাস্তকারী সদীরাজপুরের জমি লইতে ইচ্ছা না করায় তথায় জমি দেওয়া হয় নাই। রাধাকান্তপুরের হালপয়স্তি চর হইতে জালি সেচকর হিসাবে ১০ বিঘা জমি দেওয়া হইয়াছে।

এই নোট পাওয়ার পর দরখাস্তের উপরে বাঁ কোণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: জালির জমি যাহা ভোগ করিতেছে, তাহা কায়েমী স্বরূপে দেওয়া যায়।—আর. টি.

এই দুটি দরখাস্ত থেকে জমিদার হিসাবে প্রজাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝা যায়। তাছাড়া তিনি যে নামমাত্র জমিদার ছিলেন না, প্রত্যেকটি কাগজ নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন তার প্রমাণও এই দলিল দু'টি। সেকালে জমিদারী কাজকর্মে ব্যবহৃত সাধারণ লোকের ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নোটের ভাষাও লক্ষ্যণীয়। দুই সাহিত্যিক এইভাবে এক অসাহিত্যিক ক্ষেত্রে আর কোথাও এইভাবে মিলিত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সেই কারণেই তার গুরুত্ব এড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ যে-উইল করেন তাতে তাঁর মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বলেন—জমিদারী সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীন্দ্রকে সে সম্বন্ধে বারবার উপদেশ দিয়াছি। তদানুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি যদি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রসন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতে পারেন, তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তারপরও বলব রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী জমিদার ছিলেন? দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

রবীন্দ্রনাথ ও নাসবন্দী

কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাবনার পরিধি আরো বিরাট, আরো বিচিত্র। তাই তাঁকে বলা হয় বিচিত্রের দূত। সাহিত্য শিল্প সংগীত দর্শনের কথা বাদ থাক, চাষের কাজে ট্রাকটর, রাজনীতির সঙ্গে যোজনার সংযোজন, গোলাপের চাষ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ইত্যাদি কত না বিষয় তাঁর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ঋষিবাক্যের মতো কত শত বিষয়েই না তিনি দীর্ঘদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ। চলতি কথায় এখন যার নাম নাসবন্দী। এই নাসবন্দী নিয়ে কত তুলকালাম কান্ড হয়ে গেছে গত সাতাত্তরের লোকসভা নির্বাচনে। জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবনা চিন্তা করেছেন নানা সময়ে। তিনি যে কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে তা স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন আমাদের। রাজনারায়ণমার্কা ব্রহ্মচর্য আর দৈহিক সংযম যে ছেঁদোকথা তা ঘোষণা করতে তাঁর কোথাও আটকায়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধীর অবৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরোধিতা করতেও দ্বিধা করেন নি।

আজ থেকে ঠিক চুয়ান্ন বছর আগে ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষে আসেন আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গার। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নেত্রী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্ব যখন বেকার সমস্যায় পীড়িত, তখন এই মিসেস স্যাঙ্গার, ইংল্যান্ডের মেরি স্টোপস এবং সুইডেনের এলেন কে, জন্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই আলোচনাই ক্রমে আন্দোলনের রূপ নেয়। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার বিপদ এবং ক্রমক্ষীয়মাণ খাদ্যের বিপদ এঁরা তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর কাছে।

মিসেস স্যাঙ্গার প্রথম ভারতে আসেন নিখিল ভারত মহিলাসম্মেলনের আমন্ত্রণে। সে সময়ই তিনি ওয়ার্ধায় গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের আলোচনার বিষয়, বলা বাহুল্য, ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ। গান্ধীজি ছিলেন বৈজ্ঞানিক রীতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। তাঁর দাওয়াই ব্রহ্মচর্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপরীত। তিনি ছিলেন রক্ত মাংসের মানুষের দৈহিক প্রয়োজন ও মানবিক

দুর্বলতা দৈহিক সংযম দিয়ে আটকে দেওয়ার বিরোধী। এ ব্যাপারে গান্ধীজি মানতেন ধর্মনীতি আর রবীন্দ্রনাথের ছিল বাস্তবনীতি।

১৯২৫ সালেই স্যাঙ্গার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের সঙ্গে একমত হন। সেই সময় গান্ধীজি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ জানালে স্যাঙ্গার বিচলিত হন। তিনি গান্ধীজির বিবৃতি পড়েই রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লেখেন তাঁর অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসুন।

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে থাকেন নি। তিনি নিজের মত ব্যক্ত করে স্যাঙ্গারকে একখন্ড চিঠি লেখেন এবং তা ছাপা হয় ১৯২৫ সালের Birth Control Review পত্রিকায়।

মিসেস স্যাঙ্গার ১৯২৫ সালের ১২ আগস্ট রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—"The Indian papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Santiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to birth control. You have travelled all over the earth and you have observed the joys and sorrows and miseries of the world, and we take it for granted that with your international outlook on life and human society you cannot but feel friendly towards birth control."

তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন কেন তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সার্থক। তাঁর বক্তব্য "I am of opinion that birth control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its original limits. In a hunger stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of overpopulation. It proves that in this case nature's urging gets better of the severe warning that comes from the providence of civilized social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generation of children to

suffer prevations and untimely death for no fault of their is a lot great social injustice which should not be ownerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered."

দীর্ঘ চিঠি। উপরের এই অংশটুকুতেই পরিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের ধারণা কত স্বচ্ছ। শুধু তাই নয়, এই চিঠির চুয়ান্ন বছর পরও এই ভারতবর্ষে তার মর্মার্থ কত সত্য।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালে মিসেস স্যাঙ্গার আবার ভারতবর্ষে আসেন। শান্তিনিকেতনে এ বিষয়ে দু'জনে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সে আলোচনার বিবরণ কোথাও প্রকাশ হয়নি, কিন্তু অনুমান করতে পারি দশ বছর আগেকার সেই চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে তার অমিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন কিনা এই প্রশ্নও একদা এই বঙ্গভূমিকে আন্দোলিত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বিবৃতি দিয়ে জানাতে হয়েছিল তিনি হিন্দু। প্রশ্নে স্পষ্ট উত্তর মিললেও আজও অনেকে রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে অহিন্দু ছাপ মেরে আনন্দ পেয়ে থাকেন। তার কারণ ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সংযোগ। কিন্তু কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও নিজের পরিচয় হিন্দু বলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজ যে বৃহত্তর হিন্দু ধর্মেরই অংশ সে কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদ মানতেন, ছেলেদের উপনয়ন করিয়েছেন, (রবীন্দ্রনাথও তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন কর্ম করিয়েছেন) বিবাহে শ্রাদ্ধে সব হিন্দু আচার পালন করতেন। তফাৎ শালগ্রাম শিলার ব্যবহারে। এই অপৌত্তলিক হিন্দুত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। তিনি একবার নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আমি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি ব্রাহ্মসম্প্রদায়-ভুক্ত, আমার ধর্ম বিশ্বজনীনতা—সেটাই হিন্দুধর্ম।"

তবে অপৌত্তলিক হলেও, বেদ উপনিষদে নিমগ্ন থাকলেও পৌরাণিক দেবদেবীর কল্পনা রবীন্দ্রভাবনায় বার বার এসেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র গণেশ কার্তিক বিশ্বকর্মা দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীরা বার বার মূর্তিমান। হরপার্বতীর যুগলমূর্তি তাঁকে অনবরত প্রেরণা দিয়েছে। এমনকি দেবী কালীও রবীন্দ্রসাহিত্যে অবহেলিতা নন। দেশজননীকেও তিনি কালী মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করেছেন, বলেছেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুনবরণ।

কালী ও দেবীদুর্গা বা অন্নপূর্ণার স্বরূপের পার্থক্যও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন! বলেছেন, "শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই, এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিস্ফুট করে তোলে। আর এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়, আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না, না টাকায়, না খ্যাতিতে; না অন্য কোন বাসনার বিষয়ে (শান্তিনিকেতন ১ পৌষ ১৩২৪)।

দেবী পার্বতীই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মনকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। এই পার্বতীই কখনো অন্নপূর্ণা, কখনো শারদা, কখনো দুর্গা। ছিন্নপত্রে তিনি লিখছেন—"আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে।" আবার শরৎ ঋতুর বর্ণনায় গৌরী শারদার মনোহরণ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে সব সময় ভেসেছে। তিনি যখন বলেন, 'আমার নয়ন ভোলানো এলে, আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে', তখন দেবী শারদা সোনার নূপুর বাজিয়ে হাতে কাশফুল আর গলায় শেফালীর মালা নিয়ে উপস্থিত হন। বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি বলেছেন—"মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা জননীর কোলে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরী নাই, শ্মশানবাসী পাগলাটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।"

শারদগৌরীর বর্ণনা রবীন্দ্রসাহিত্যে ছড়ানো। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুর্গোৎসব—বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ পার্বণ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঠাকুর-দালানে এককালে ঘটা করে দুর্গোৎসব হত। রবীন্দ্রনাথ তা দেখেননি। ঘরের পুজো নাইবা দেখলেন, বাইরের পুজো দেখেছেন অজস্র, দেখেছেন শরৎকালের এই অকালবোধন বাঙালীর মনকে কীভাবে নাড়া দেয়। 'আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হলে' বাঙালীর ঘরে ঘরে কেমন সাড়া পড়ে, তার বর্ণনা আছে কবিতায় গানে গল্পে। গান তিনি বেঁধেছেন বিজয়াদশমী নিয়েও। দুর্গাপুজোর তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের এক চিঠিতে বলেছেন—

"কাল দুর্গাপুজো আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে সুরেশ সমাজপতির বাড়ি যাবার সময় দেখেছিলুম রাস্তায় দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশহাত তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে —এবং আশেপাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হ'ল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিন কতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে বড়ো গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই— বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটা কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের

মধ্যে কত লোক আছে, যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে হিউম্যানাইজ করে দেয়। কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে—আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটা আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়···যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক অরসিক সকল লোকেই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তারপরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে, তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালবাসি, অন্যলোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষমাত্র, কিন্তু আমার কাছে সে একটা অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কাজ নেই, তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে মৃৎপিণ্ড জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।"

দুর্গাপুজো ও দুর্গাপ্রতিমার এমন অসাধারণ বিশ্লেষণ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। তবে একথা অবশ্য উল্লেখ্য, দেবীপ্রতিমার রূপ রূপক হিসাবেই তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয়, ব্যক্তিগত ধর্মচিন্তায় তিনি পৌত্তলিকতাকে স্থান দেননি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে-উৎসব চলে, তার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল্যবান, সেই উৎসবে তিনি সর্বতোভাবে যোগ দিয়েছেন, পৌত্তলিকতা তার সৃষ্টিকর্মে অপরূপ মূর্তি ধরে উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তাকে তাঁর উপাসনার আসনে বসাননি। তাই বিপিন পাল প্রমুখ যখন দুর্গাপ্রতিমা ও দুর্গাপুজো নিয়ে তাঁকে একটি সর্বজনীন সংগীত লিখতে অনুরোধ করেন, তিনি রাজি হননি। শুধু তাই নয়, বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীত হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য করতে গেলে যে ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীম্ অংশটুকু বাদ দেওয়া দরকার তা তিনি প্রকাশ্যে বারবার ঘোষণা করেছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি স্মরণীয়। 'আমার জীবন' গ্রন্থে নবীনচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উল্লেখ করেছেন। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন মত জিজ্ঞাসা করলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি অনেক সময় ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র।" এই স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের দেবীমূর্তিচিন্তায়ও।

হাজারো ভুলের আর একটি। অনেকেরই ধারণা, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন 'উপনিষদ-উপনিষদ' করে জীবনপাত করেছেন, কিন্তু গীতা সম্পর্কে নীরব। এই তথাকথিত নীরবতার কারণ আবিষ্কার করে কেউ কেউ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাঁদের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ তো আর হিন্দু নন যে গীতা নিয়ে মাতামাতি করবেন। ষোলআনা ব্রাহ্ম তাই তাঁর উপনিষদই সর্বস্ব।

ঠিক কথা, উপনিষদই রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথই বিভিন্ন উপনিষদ থেকে শ্লোক চয়ন করে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাই বলে গীতা পরিত্যক্ত হয়নি কখনো। রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানাভাবে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, গীতার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং গীতার বাণী প্রচার করেছেন।

গীতা সম্পর্কে এই আগ্রহের প্রধান উৎস জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার। গীতা নিয়ে আলোচনা ও গ্রন্থ রচনা ঠাকুর পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভগবদ্গীতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সকলেরই প্রধান আলোচ্য ও আদর্শ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন গীতাপাঠ, সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা করেন ভগবদ্গীতা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেন টিলকের গীতারহস্য। এই তিন ভ্রাতার প্রভাব পড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তাছাড়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ পুত্রকে গীতাপাঠ আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে নিজেই লিখেছেন—ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করতে দিয়েছিলেন।

গীতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য নানা চিঠিতে ছড়িয়ে আছে। ১৩২৫ বাংলার ১৮ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন : গীতা সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, সেটা চিন্তা করে দেখবার বিষয়। গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোন একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোন একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে

যেরকমটি হয়, গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশ ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল—যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র নেগেটিভ লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন কোন একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটা সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চ ভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতার সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।

১৩১৭ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ আর একখানা চিঠিতে ওই অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখছেন: ভগবদ্গীতা আমার খুব কাজে লাগছে। এতকাল এত হুজুকের মধ্যেও আমি গীতা পড়িনি। কারণ তখন আমার পড়ার সময় হয়নি। এখন সময় বুঝেই সময়ের কর্তা আমার হাতে এই বইখানি তুলে দিয়েছেন। এর সঙ্গে যোগযুক্ত হবার জন্যে মনকে যে একটি অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে তার সত্যতা বুঝতে পেরেছি।...চলতে চেষ্টা করছি। কেঁদে কোন লাভ নেই। গীতায় এই চলার কথাটা বারবার খুব করে লিখেছে। নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত বাধাকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিয়ে সেই অনন্তের সঙ্গে মিলনের পূর্ণতার পথটাকে দেখিয়েছে। দুর্গম হোক কিন্তু এই তো পথ। ফলের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কর্মের সঙ্গে বাঁধে, প্রবৃত্তি আমাদের বিষয়ের মধ্যে বন্দী করে। মুক্ত না হলে সেই মুক্তের সঙ্গে মিলবে কেমন করে। হাতজোড় করে কেবল জিজ্ঞাসা করছি, কবে বাঁধন কাটবে।

১৩১৭ সালের ১২ অগ্রহায়ণ গীতা বিষয়ে আর একখানা চিঠি: আধুনিক ভারতবর্ষ উপনিষদ ও গীতার উপদেশ ভুলে গিয়েছে, সেই জন্যেই দেখতে পাই উত্তেজিত হৃদয়াবেগকেই আমাদের দেশের লোক সিদ্ধি বলে মনে করে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় গীতার দৃষ্টান্ত অজস্র। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি গীতার উপদেশ মানতেন। স্ত্রীকে লেখা পত্রে সাংসারিক ব্যাপারে স্থৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন গীতার 'যস্মান্নোদ্বিজতে'—শ্লোক উদ্ধৃত করে। গীতাকে তিনি একটি দর্শন বা ধর্মগ্রন্থরূপেই দেখেন নি, তার উপদেশগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গীতার সমন্বয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথার সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।" একই রচনায় তিনি আরো বলেছেন, "মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার

মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য।'

গীতার নিষ্কাম বাণীও রবীন্দ্রচিন্তাকে উজ্জ্বল করেছে। তিনি বলেছেন— 'ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়।' জাভা-যাত্রীর পত্রেও তিনি লিখেছেন—'গীতা বলেছেন, কর্ম করো, ফল চেয়ো না। এই চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত চেলে নেবার জন্য লালায়িত।'

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, "ভগবদ্গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়ত কোনকালেই পুরাতন হবে না।" এটাই রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা। গীতার বাণী আরো কত রচনায় কত ভাবে তিনি স্মরণ করেছেন, তার উদাহরণ অজস্র। সেই উদাহরণে রচনাটি ভারাক্রান্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ভুল ভাঙা। আমি বলতে চাই শুধু উপনিষদ নয়, গীতাও ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও মননের সহচর।

অপ্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে ওই একমাত্র পরিচয়ের তলায় তাঁর অন্যসব গুণপনা ঢাকা পড়ে গেছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির আরো অনেকের মতই সাহিত্য আর সংগীতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যধিক স্বাধীনচেতা। পিতা দেবেন্দ্রনাথ পারিবারিক ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং আপন সিদ্ধান্তে অটল। পিতার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস রবীন্দ্রনাথের পর্যন্ত ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও অতিবৃদ্ধ পিতার সম্মুখে যেতে সাহস পেতেন না। ১৯০৫ সাল অবধি আমৃত্যু দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইচ্ছা। কিন্তু তারই মধ্যে দু'একবার প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেই।

অশেষ গুণের আধার সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪২ সালে—রবীন্দ্রনাথের থেকে তিনি উনিশ বছরের বড়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ পিঠাপিঠি ভাই। মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিলেত যান এবং আই. সি. এস. হন চার বছর পর ১৮৬৪ সালে। চাকরি করেন বোম্বাই প্রদেশে। তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন রূপবতী ও গুণবতী রমণী। বাংলাদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে এই দম্পতির দান সর্বাধিক। সত্যেন্দ্রনাথ ভাল গান লিখতে পারতেন। "মিলে সব ভারত সন্তান" তাঁরই রচনা। মারাঠী সাধকদের কথা তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের গোচরে আনেন। তিনি পদ্যানুবাদ করেন গীতা ও মেঘদূত। বৌদ্ধ-ধর্মের উপর তাঁর বই আছে। 'আমার বাল্যকথা' ও 'আমার বোম্বাই প্রবাস'—আত্মজীবনী। 'সুশীলা' উপন্যাস।

ঠাকুর-ভাইদের মধ্যে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথই জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে আবাসিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কখনও থেকেছেন লোয়ার সার্কুলার রোড বিরজি তলাওয়ে, কখনও স্টোর রোডের সেই বিশাল প্রাসাদে—এখন যেখানে বিড়লা টেকনিকেল মিউজিয়াম। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মতের সঙ্গে সব সময় এক হতে পারেন নি বলেই নিজের পুত্র কন্যা—সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে স্বাধীনভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব প্রচুর। কৈশোরে

বিলেত-প্রবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন মেজদাদা ও মেজ বৌ-ঠাকরুনের সঙ্গে, একই সঙ্গে থেকেছেন আমেদাবাদে, বোম্বাইয়ে,সোলাপুরে ও কারোয়ারে। তবে সত্যেন্দ্রনাথ সব চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের গড়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের হাতেগড়া। বোম্বাইয়ে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সংস্কৃত ইংরেজী শিখিয়েছেন, সেতারের জন্যে ভাল শিক্ষক রেখেছেন এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানী করার জন্য সব-রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে আসেন প্রগতির হাওয়া, পাশ্চাত্যের অনেক আদব-কায়দা।

এই রচনায় আমার আলোচ্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন বা প্রতিভা নয়, মূল বিষয়ের ভূমিকা হিসাবেই তার সামান্য আলোচনা। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত প্রবাস কালের কিছু কিছু অজানা তথ্য সম্প্রতি আমার কাছে এসেছে, যা বাংলার গুণীজ্ঞানীদের কাজে লাগতে পারে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সদনে টেগোর ফ্যামিলি করেসপণ্ডেন্স নামে বিরাট রত্নভাণ্ডার আছে, তাতে ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত মূল্যবান সব চিঠি এক সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এই ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথ। তিনিই সব চিঠি সাজিয়ে রেখে যান এবং পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ নতুন অনেক চিঠি সংযোজন করেন। মাত্র কিছুদিন আগে উদয়ন বাড়ির একটি ঘর থেকে এই সব চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বহু চিঠি একের পর এক সাজানো রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা ঘটনার পরিপূরক তথ্য পাওয়া যাবে চিঠিগুলিতে।

সত্যেন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলি পড়েই জানা যায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন তাঁর খুড়তুতো দাদা ঘোর স্বদেশী গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাকে তিনি ডাকতেন মেজদা বলে। শুধু মেজদা নয়, বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের মধ্যে। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, সত্যেন্দ্রনাথ সেই সময়ই তার মেজদাকে বাংলাতে অনেক চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া ইংরেজীতেও কিছু চিঠি আছে। প্রথম ভারতীয় কী ভাবে তাঁর আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন, তাঁর ফল কী রকম হয়েছিল ইত্যাদি বহু অজানা তথ্য পাওয়া যাবে গণেন্দ্রনাথকে লেখা এযাবৎ অপ্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি থেকে।

সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই জানা যায় দু'জন ভারতীয়—দু'জনই বাঙালী—প্রথম আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসেছিলেন। দ্বিতীয় জন সত্যেন্দ্রনাথেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনমোহন ঘোষ। তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। তাই পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। মনমোহন ঘোষ একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে না পারায় বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ মনে বড় কষ্ট পান।

সত্যেন্দ্রনাথেরও ভয় ছিল, তিনিও হয়ত সিভিল সার্ভিস পাশ করতে পারবেন না। তাই আগেভাগেই পিতা দেবেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে অনুমতি নেন আই. সি. এস. হতে না পারলে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় বসবেন।

১৮৬২ সালের ২৬ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে গণেন্দ্রনাথকে তিনি বাংলাতে লিখছেন: 'সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাতে নিরাশ হইলেও শূন্য হস্তে না ফিরিয়া গিয়া বার-এর মধ্যে একজন হইয়া যাইতে পারি। এ বিষয়ে মনে করিতেছি বাবা মহাশয়কে লিখিয়া দেখিব, দেখি তিনি কী বলেন।'

তারপরই ১৮৬৩ সালের ১৮ আগস্ট প্যারিস থেকে মেজদাদাকে আর একখানা চিঠি। দীর্ঘ চিঠি। তাতে লেখেন, তিনি পাশ করেছেন আই. সি. এস. পরীক্ষায় এবং ৬০ জনের মধ্যে তাঁর স্থান ৪৩। তিনি লিখেছেন—

মেজদা, আমাদের পরীক্ষা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কখনো আশা করি নাই, আমি তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছি। ষাটজন এ বৎসর পরীক্ষায় পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে আমার সংখ্যা ৪৩—নিতান্ত নীচে নয়। প্রথম ৩৫ জনের বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। দেখি আমার ভাগ্যে কোন প্রেসিডেন্সি পড়ে। হয়ত আমাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া বোম্বাই কি মাদ্রাজের কোথাও পাঠাইয়া দিবে, তোমাদের সঙ্গে একবার ভাল করিয়া দেখাও হইবে না। আগামী বৎসর আমার এখানে আর এক পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বড় ভাবিতে হইবে না। যাহা হউক, আমার স্কন্ধ হইতে এক মহদ্ভার অপনীত হইয়াছে। এখন আপনাকে লঘু বোধ করিতেছি এবং আনন্দ হইতেছে যে, আমাদের পরিবারের নিশানে যে তিনটি মহার্ঘসূচক শব্দ আছে—ওয়ার্কস উইল উইন—তাহা অনেক যত্নে সফল করিতে সক্ষম হইয়াছি। মনমোহন এবারে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আমরা দু'জনে একসঙ্গে জয়ী হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিলে কী সুখের বিষয়ই হইত। তিনি কেবল সংস্কৃত আরবী আর ইংরেজি—এই তিন বিদ্যা লইয়া সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাহাকে পরাঙ্মুখ হইতে হইল। কী করা যায়। আমাকে এই ঘোর পরীক্ষার পর কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। এখন আমরা সুন্দরী পুরী প্যারিসে অবস্থিতি করিতেছি। এমন পুরী আর কোথাও নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ তারপর প্যারিসের বর্ণনা দেন এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা করেন। সুইজারল্যান্ড ও ইতালি যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথের বন্ধু মাক্সমূলারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। চিঠি শেষ হওয়ার পর ইংরাজীতে একটি পুনশ্চ তিনি সংযোগ করেন। তাতে লেখেন—সিন্স রাইট দি এবাভ, আই হ্যাড হার্ড ফ্রম ইংল্যান্ড দ্যাট আই অ্যাম এপয়েন্টেড টু বম্বে।

এই পরীক্ষা নিয়ে মনমোহন ঘোষও ইংরাজীতে চিঠি লেখেন গণেন্দ্রনাথকে।

১৮৬৩ সালের ২৬ শে নভেম্বর লন্ডন থেকে জানান : আগামী বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আরো কঠিন হবে। তার কারণ প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ বা তারও কম করা হচ্ছে। যত দিন যাবে, পরীক্ষা ততই কঠিন হবে। কারণ সরকার চান না বেশি সংখ্যায় সিবিলিয়ান হোক।···বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রের নিয়োগ নিয়ে ভারতীয় কাগজগুলি সরকার বাহাদুর ও স্যার সি. উডকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। ওরা বলছে বাঙালী বলেই সত্যেন্দ্রকে বোম্বাইয়ে পাঠানো হয়েছে। তাদের কে এই তথ্য দিল? নিশ্চয়ই এসব গল্পো। বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে সত্যেন্দ্র এতে মুশকিলে পড়ে গেছেন। অথচ আমরা সবাই কি একথা জানিনা যে সত্যেন্দ্র ভাল উচ্চস্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি বলেই বাংলার তালিকায় না থেকে বোম্বাইয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। বেচারা স্যার সি. উডের এতে কিছু করার ছিল না এবং যেহেতু প্রথম ৩৫ জনকে বাংলাতে রাখতে হয়েছে, সেহেতু কোন বাঙালী সিবিলিয়ানের বাংলা থেকে চলে যাওয়ার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না! যারা সত্যেন্দ্রের চেয়ে উপরের দিকে আছেন, তারাই বাংলাতে নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে যে কোন একটি সত্যেন্দ্রকে বেছে নিতে হবে। আশ্চর্য, ইন্ডিয়ান মিরর পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে লেখালিখি করছে। অকারণ সরকারকে আক্রমণ করা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও নিয়োগ নিয়ে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য দুই বন্ধুর মনোভাব দুই চিঠিতে স্পষ্ট।

সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে চাকরির জন্যে প্রথমে যান বোম্বাইয়ের বাইকুল্লা। ১৮৬৫ সালের ৩রা এপ্রিল সেখান থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখেন, তিনি হিন্দুস্থানী আর গুজরাটী—এই দুই ভাষাতেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন এবং আশা করছেন শীগ্‌গীরই নিয়োগপত্র পাবেন, সম্ভবত গুজরাটে। চিঠিতে কিছু গুজরাটী কথার উল্লেখ করে বলছেন, বোম্বাই তাঁর ভাল লাগছে না—আই অ্যাম গেটিং রাদার টায়ার্ড অব বম্বে।

প্রথম কর্মস্থল আমেদাবাদ। এইখানেই প্রথম বিলেত যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ যান, থাকেন শাহীবাগ প্রাসাদে। এই শাহীবাগই একালের গুজরাটের রাজভবন। সবরমতী নদীর পারে শাহজাহানের তৈরি এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প। ১৮৬৫ সালের পয়লা মে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় লিখছেন—

আমি কর্মস্থলে আসিয়া আমার কর্মের ভার লইয়াছি। এ স্থান আমার মনোনীত হয়েছে। কেবল গ্রীষ্মের উত্তাপ এক্ষণে অত্যন্ত প্রবল, নতুবা আর সকল বিষয়ে ইহা রমণীয়। আমার এ প্রদেশে কতদিন থাকা হয় বলিতে পারি না। পরীক্ষা দিবার এখনো অবশিষ্ট আছে এবং আগামী মাসে যে পরীক্ষা আসিতেছে তাহার নাম ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা। ইহাতে কীরূপ হয় স্থির জানি না।

১৮৬৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ থেকে আর একখানা চিঠিতে স্বর্ণলতা উপন্যাস ছাপানোর বিষয়, নিজের ও ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্যের উল্লেখ করেন এবং জানান তিনি বদলির আবেদন করেছেন। আরো জানান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেতার, ফরাসী ভাষা ও ছবি আঁকা শিখছেন, তবে "জ্যোতি ইজ ভেরি শাই ইন সোসাইটি অ্যান্ড আই অ্যাম এফ্রেড হি ইজ রাদার লংগিং টু গো হোম।"

তার আগে ১৫।৭।১৮৬৬ তারিখে মেজদাদাকে লেখেন 'আমি এখন থার্ড এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর।' তার আগে ১৪।৪।১৮৬৬ সালের একখানা চিঠিতে ভীষণ অভিমান করেন। অভিমান তাঁর নিজের বাড়ির উপর। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভাই বোনেরা একখানা চিঠি দিয়েও তাঁর খোঁজ খবর নেন না। তিনি বলছেন—

Is there anything new going on in Calcutta? It is useless asking বড়দাদা or any of my brothers about anything when not a single line has yet received by me from that quarter regarding such an important affair in the family as Birendra's marriage. None of them has to say a single word about it and it is only from newspapers that I came to learn that one of my brothers got married.

সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার, সহোদর চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ সংবাদ পর্যন্ত জানানো হয়নি সত্যেন্দ্রনাথকে। অভিমান হওয়ারই কথা।

সত্যেন্দ্রনাথ যে পিতা মহর্ষিদেবের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রায়ই যেতেন, তার কথা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। ওই বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বলেন্দ্রনাথ মারা গেলে তাঁর বিধবা কিশোরী বধূ সাহানা দেবীকে আবার বিবাহ দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ তাতে বাধা দেন এবং বিস্তর মনোমালিন্যের পর সেই বিধবা-বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ প্রসঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথ যে পিতার মতের বিরুদ্ধে ছিলেন তার একটি প্রমাণ পেয়েছি ওই চিঠির খাতায়। তিনি ভিলা বাইকুল্লা বোম্বাই থেকে ১৮৬৭ সালের ৩১ মার্চ গণেন্দ্রনাথকে লিখছেন—তুমিই বল দেখি ভাই, যে কেশববাবু নিতান্ত অপমানিত হইয়া পদভ্রষ্ট হইয়াছেন কিনা। আমি যদি তাহার জায়গায় থাকিতাম তবে আমার প্রতি এরূপ আচরণ আচরিত হইলে আমি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতাম।

সত্যেন্দ্রনাথ পুরো চাকরি জীবন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন, কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়িতে আর থাকেন নি। তার স্টোর রোডের বাড়ি হয়ে ওঠে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রধান আড্ডার স্থল। সেখানেই অভিনয়ের মহড়া, গানের সুর, খাওয়া দাওয়া। সেই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন

সত্যেন্দ্রজায়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে রাঁচি এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে গেলে সেই আসর ভেঙে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচি ও শান্তিনিকেতনে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁর মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে—১৯২৩ সালে। বয়স তখন একাশি।

অপ্রকাশিত দ্বারকানাথ

নীলমণি ঠাকুরের নাতি, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা দ্বারকানাথ এক বিস্ময়কর পুরুষ। খ্যাতিমান পুত্রে ও তদধিক খ্যাতিমান পৌত্রের প্রতিভার আড়ালে তিনি অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছেন। দ্বারকানাথ মানেই যেন বড়লোকী চাল আর বিলাসিতা, দ্বারকানাথ মানেই যেন সাহেবসুবোদের সঙ্গে ডিনার লাঞ্চ। অথচ এই কীর্তিমান বাঙালী যে কত প্রতিভাধর, কত দিকে তাঁর সংগঠনশক্তি, তা আমরা আজও ভালভাবে বিচার করিনি। অন্যের কথা বাদ দিই, তাঁর পৌত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পিতামহ সম্পর্কে দু'চারটে রসিকতা ছাড়া বিশেষ কিছু বলেননি বা লেখেননি। তিনি সারাজীবন শুধু পিতার গুণপনার কথা লিখে গেছেন। নিশ্চয়ই লিখবেন, কারণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যিই এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং পিতার প্রভাব কবির জীবনে সর্বাধিক। কিন্তু পিতামহ দ্বারকানাথের যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুও তিনি পাননি। না পরিবার, না স্বজাতি ; না স্বদেশবাসীর কাছে।

নীলমণির দ্বিতীয় পুত্র রামমণির প্রথমা স্ত্রী মেনকাদেবীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ সন্তান দ্বারকানাথ। জ্যেষ্ঠভ্রাত রামলোচন অপুত্রক থাকায় দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক নেন। তাই যশোর থেকে কলকাতায় প্রথম আসা। পঞ্চানন ঠাকুরের নাতি নীলমণি, নীলমণির ছেলে রামলোচন এবং অবশেষে দ্বারকানাথের উপর বিরাট ঠাকুরবাড়ির পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। নীলমণি আর তাঁর ভাই দর্পনারায়ণ একসঙ্গে আদিবাড়ি পাথুরেঘাটাতেই থাকতেন। নীলমণি পৃথগন্ন হয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন।

১৮০৭ সালে সেকালের সবচেয়ে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত রামলোচনের যখন মৃত্যু হয়, তখন দ্বারকানাথের বয়স তেরো। দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪ সালে। রাজা রামমোহনের চেয়ে তিনি আঠার বছরের কনিষ্ঠ। তবু দুইজনে ছিল বন্ধুত্ব। দ্বারকানাথ ইংরেজি আর ফার্সী ভালভাবেই শিখেছিলেন। সংস্কৃতও ভাল জানতেন। যৌবনে পা দিতে-না-দিতেই তিনি সংসারের হাল ধরলেন। একদিকে দেখতেন বিশাল পৈতৃক জমিদারি, অন্যদিকে সাহেবকোম্পানির সঙ্গে নামলেন ব্যবসায়ে। ব্যাঙ্কিং, কয়লাখনি, নীল ও রেশমকুঠি, লবণ—সর্বদিকেই তিনি ব্যবসার জাল ছড়ালেন। প্রথমে ছিলেন ম্যাকিনটস কোম্পানির গোমস্তা, তারপর

নিজেই নিতে শুরু করলেন বিলিতি অর্ডার। আজকের ইস্টার্ন কোলফিল্ডের আদি কারটেগোর অ্যান্ড কোং দ্বারকানাথেরই সৃষ্টি। একালের স্টেট ব্যাঙ্কের আদিরূপ দ্বারকানাথের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। তাছাড়া তিনি বাড়াতে লাগলেন জমিদারির আয়তন এবং কিনতে লাগলেন চৌরঙ্গী পাড়ায় একের পর এক বাড়ি। তিরিশ বছর বয়স হওয়ার আগে তিনি হয়ে গেলেন পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ধনী। তাছাড়া আইন ও রাজস্ব সম্পর্কে তিনি এমন জ্ঞান অর্জন করলেন যে মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে হয়ে গেলেন ২৪ পরগণার কালেক্টার ও নিমকি-দেওয়ান। তারপর হন শুল্ক ও আবগারি বিভাগের দেওয়ান। শিলাইদহে নীলকুঠি, ম্যাকিনটস কোম্পানির ডিরেক্টার, ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, রাণীগঞ্জের কয়লাখনির ইজারাদার, বিরাহিমপুর সাজাদপুর কালীগ্রামের জমিদার, রামনগরের চিনির কারখানার মালিক, মুর্শিদাবাদে রেশমের কুঠিয়াল দ্বারকানাথ তাঁর জীবিতকালেই কিংবদন্তী। বিলাসব্যসনে তিনি যেমন পয়লা নম্বর, জনহিতকর কার্যেও প্রথম সারিতে। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ নিবারণ, ভারত-ইংল্যান্ড ডাক-চলাচল ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি কাজেও দ্বারকানাথ অগ্রণী। বিশেষ ক'রে তাঁর আগ্রহ ছিল ভারতীয়দের ডাক্তারীশাস্ত্র অধ্যয়নে। নিজের খরচে তিনি গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজনকে প্রথম বিলেত পাঠান ডাক্তারী পড়তে।

দ্বারকানাথ প্রথম বিলেত যান ১৮৪২ সালের ১১ জানুয়ারি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর নিজের সাহেব ডাক্তার ডঃ ম্যাকগাওয়ান, ভাগনে চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি, আমলা পূর্ণানন্দ মৈত্র এবং চার ভৃত্য। কায়রো আলেকজাণ্ড্রিয়া মাল্টা নেপলস হয়ে আসেন রোম। সেখানে পোপ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং প্রুশিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক আর গণিতবিদ মিসেস সমারভিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোম থেকে ভেনিস ফ্লোরেন্স স্টুটগার্ট হাইডেলবার্গ ফ্রাংকফুর্ট কলোন ব্রাসেলস হয়ে ক্যালে। ক্যালে থেকে ডোভার।

লন্ডনে ১০ জুন পৌঁছে প্রথমে ওঠেন এলবেমার্লে স্ট্রীটে সেণ্টজর্জেস হোটেলে, তারপর গ্রেট কাম্বারল্যান্ড স্ট্রীটে উইলিয়াম প্রিন্সেপের মায়ের বাড়িতে। বাকিংহাম প্যালেসের ড্রয়িংরুমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ১৬ জুন। সাক্ষাৎ হয় আরো অনেক লর্ড ডিউক ডাচেস প্রিন্স প্রিন্সেসের সঙ্গে। মহারাণী তাঁকে নিয়ে যান রয়েল নার্সারিতে। সেখানে প্রিন্স অব ওয়েলসকে নিয়ে আসা হয় তাঁকে দেখাতে। মহারাণী আবার তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণে নিয়ে যান প্রাসাদে এবং লর্ড মেয়র তাঁর সম্মানে দেন বিরাট ডিনার।

দ্বারকানাথ শেফিল্ড ইয়র্ক নিউক্যাসল এডিনবরা গ্লাসগো লিভারপুল বার্মিংহাম উরচেস্টার ব্রিস্টল ঘুরে যখন লন্ডন ফিরলেন, মহারাণী তাঁকে উইন্ডসর প্রাসাদে মধ্যাহ্নভোজে ডাকেন। দু'জনে নিবিড় সখ্য হয়।

১৬ অক্টোবর দ্বারকানাথ প্যারিস রওনা হন। সেখানে লুই ফিলিপ ও তাঁর

রাণী এবং বেলজিয়ামের রাজারাণী তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। ১৮৪২ সালের শেষদিকে তিনি ফিরে আসেন কলকাতা। এই যাত্রার একটা রোজনামচা রেখেছিলেন দ্বারকানাথ।

১৮৪৫ সালের ৮ মার্চ তাঁর দ্বিতীয় বিলাতযাত্রা। এবার সঙ্গে ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথ, ভাগনে নবীনচন্দ্র মুখার্জি, সাহেব ডাক্তার ডাঃ র‍্যালে ও ব্যক্তিগত সচিব মিস্টার সেফ। কায়রোতে মহম্মদ আলি পাশা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। মাল্টাতে পনের দিন কোয়ারেনটাইন হয়ে থাকতে হয়। খবর পেয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর জাহাজ 'আইগল' তাঁকে নিয়ে ইতালির নেপলসে পৌঁছে দেয়। এবার গেলেন নেপলসে ভিসুবিয়াস দেখতে। তারপর পিসা জেনোয়া মার্সাই বর্দো হয়ে প্যারিস। দিন পনেরো কাটিয়ে ২৪ জুন লণ্ডনে। আসার পরেই ডাক পড়ে বাকিংহাম প্যালেসে—মহারাণীর দরবারে। ব্যস্ত কর্মসূচী। এবার ঘুরে এলেন আয়ারল্যাণ্ড, এবং পরিচিত হলেন ড্যানিয়েল, কর্নেল ও ফাদার ম্যাথুর সঙ্গে।

লণ্ডনে ফিরে সামান্য অসুস্থ হন ৩০ জুন। ডাচেস অব ইনভারনেসের বাড়িতে ডিনার খাওয়ার সময়। হাওয়া বদলাতে চলে যান ওয়ার্দিং। তাঁর নাকি ম্যালেরিয়া হয়েছিল। মৃত্যু লণ্ডনে ফিরে ১৮৪৬ সালের পয়লা আগস্ট।

ধনী বিলাসী ও সৌন্দর্যপ্রিয় দ্বারকানাথের উপস্থিতি ইংলণ্ডে সোরগোল তোলে। তাঁর পার্টিতে উপস্থিত থাকার জন্যে লর্ড ও ডিউক পরিবারাদিতে প্রতিযোগিতা চলত। শোনা যায় তিনি প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকে হাজার হাজার টাকা দামের কাশ্মীরী শাল উপহার দিতেন। এইসব কারণেই তাঁকে সবাই ডাকতে থাকেন 'প্রিন্স'। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গেও আগের সফরেই হয় তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তিনি বলতেন 'মাই প্রিন্স'। সেই থেকেই প্রিন্স দ্বারকানাথ। বাকিংহাম প্যালেস বা উইণ্ডসর ক্যাসেলে প্রিন্সের অনবরত ডাক পড়ত। মহারাণী তাঁর কেশদাম কেটে একটি সোনার ঘড়িতে চেন হিসাবে লাগিয়ে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ দ্বারকানাথকে দেন উপহার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দেন নিজের একটি মিনিয়েচার। তাছাড়া দ্বারকানাথ সম্পর্কে আরো কত কাহিনী, কত উপাখ্যান। তিনি ইংল্যাণ্ড ছাড়া আয়ারল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে যান। প্যারিসে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন সাহিত্যরসিক ও সংগীতপ্রিয়। ম্যাক্সমুলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনিয়েছেন, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। দ্বারকানাথের পৌত্রের পৌত্র অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমি দেখেছি ম্যাক্সমুলার তাঁর লেখা একখানা বই দ্বারকানাথকে উপহার দিয়ে বাংলায় লিখেছেন—বন্ধুবর দ্বারকানাথকে দিলাম। ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা আমরা জানি, কিন্তু অনেকেই জানেন না, খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডিকেন্স দ্বারকানাথের লণ্ডনের বাড়িতে এসে তাঁর লেখা শুনিয়ে গেছেন এবং সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা লিখলাম, তা মোটামুটি জানা। সম্প্রতি আমার হাতে দ্বারকানাথের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্য এসেছে। তারই কিছু কিছু দিয়ে এই লেখাটা সাজালাম। তথ্যের উৎস কতকগুলি চিঠি। তবে আগেই বলে রাখি, প্রবন্ধে উল্লেখিত দু' একখানি চিঠি আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আমি এইসব চিঠি পেয়েছি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন থেকে, সেখানে যত্নে রাখা আছে ১৮৩৫ থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত দ্বারকানাথ সম্পর্কিত সব চিঠিপত্র। টেগোর ফ্যামিলি করেসপণ্ডেন্স নামে ৩৭৪ সংখ্যক এই দলিলগ্রন্থটি ছাড়াও নানা জনের অসংখ্য চিঠি রয়েছে অন্যান্য খণ্ডে। তাতে দ্বারকানাথ ছাড়াও রামলোচন রামমণি, রমানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের অজস্র চিঠি রয়েছে। তার মধ্যে আবার ফ্যানি স্মিথ নাম্নী জনৈক ইংরেজ ললনার রবীন্দ্রনাথের ছোট কাকা নগেন্দ্রনাথকে লেখা প্রচুর প্রেম-পত্র রয়েছে। আমি সেই বিরাট তথ্যভাণ্ডার থেকে দ্বারকানাথের নিজের, বিলাতে দ্বারকানাথের সহযাত্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের, উইলিয়াম বেণ্টিংকের এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত সচিবের চিঠি ব্যবহার করেছি। তাছাড়া দ্বারকানাথ সম্পর্কে প্যারিসের জনৈক চিত্রকরের দেবেন্দ্রনাথকে লেখা পরবর্তী-কালের একখানা চিঠির উল্লেখ করেছি। কোন গবেষক ওই পত্রাবলী সম্পূর্ণ উদ্ধার করলে শুধু দ্বারকানাথ নয় তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও ইংলণ্ডের সমাজ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাবেন।

এই পত্রাবলী একত্রে সংগ্রহ করে রাখেন দ্বারকানাথের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের নিজের ও তাঁর সম্পর্কিত সব চিঠিই ইংরেজিতে। বিলেত থেকে দ্বারকানাথের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় সব চিঠি লেখেন গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রদের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তার মধ্যে একটি চিঠিতেই লেখেন, 'বাবু চেঞ্জেস হিজ অপিনিয়ন ইন এভরি মোমেণ্ট।' এই বাক্যটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলতেন, আমি তো দ্বারকানাথের নাতি, তাই 'বাবু চেঞ্জেস হিজ মাইণ্ড'। চিঠির কথাটা আদতে অপিনিয়ন—মাইণ্ড নয়। ১৮৪৫ সালের ২ অক্টোবর ১৫ ওল্ড জুইয়ারি চেম্বার লণ্ডন থেকে নবীনচন্দ্র তাঁর মামা সম্পর্কে লেখেন—

Baboo speaks of going back to India in 1846 and thereby we shall be able to reach Calcutta in the begining of March 1847. I am not quite certain of it, for you know Baboo changes his opinion in every moment.

কিন্তু কলকাতায় ফেরা আর হল না, ১৮৪৬ সালের আগস্টেই প্রবাসে জীবনাবসান ঘটল দ্বারকানাথের।

দ্বারকানাথের যাত্রাসঙ্গী তাঁদের বিলাত যাত্রার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন

চিঠিগুলিতে। কলম্বো এডেন পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি বন্দরের বর্ণনা। তারপর লন্ডনে গিয়ে নগেন্দ্রনাথের কার্যকলাপেরও কিছু তথ্য উপহার দিয়েছেন। হাইড পার্কে রোজ ভোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে নগেন্দ্রনাথের অসুস্থ হওয়ার কথা, চার্লস ডিকেন্সের কথা, ডাবলিনে দ্বারকানাথের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (আয়ারল্যান্ডের শিক্ষা বিস্তারে দ্বারকানাথের মুক্ত হস্তে অর্থদানের সাক্ষ্য আছে এক চিঠিতে), রোজ মাঝ রাতে ফিরে আবার ভোরে সারাদিনের জন্য ফিটফাট হয়ে দ্বারকানাথের বেরিয়ে যাওয়ার কথা, সাহেব মেমদের মধ্যে দ্বারকানাথের কথা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রেছেন নানা চিঠিতে।

পত্রাবলীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বেণ্টিঙ্কের চিঠি। গবর্ণর জেনারেল পদে অবসর গ্রহণের পর লন্ডনে ফিরে ১৮৪২ সালের ৯ অক্টোবর তিনি দ্বারকানাথকে এক চিঠিতে লিখেছেন, সমাজ-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথের কাছে তিনি কতটা ঋণী।

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের গত কথাবার্তার কথা মনে পড়ছে, সেই কথাবার্তায় আপনি আপনাদের প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেলের হৃদয় এবং মন একটি বিশেষ বিষয়ে কতখানি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এ-ব্যাপারে একটি প্রমাণ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি, কলকাতার নেটিভ সমাজের মধ্যে স্বর্গত রামমোহন রায় ও আপনিই এ-ব্যাপারে সবচেয়ে হার্দ্য উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য সর্বাধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে জানিয়েছিলেন যে, যদিও এই বীভৎস প্রথা আইনের সুবিধা অর্জন করেছিল, তবু হিন্দুদের কোনোরকম শাস্ত্রীয় সমর্থনই আদৌ ছিল না এর পিছনে; সোজা কথায় বলতে গেলে, আপনি এবং আরো কয়েকজনই স্বদেশবাসীর পূর্বসংস্কারে ঘা দিয়ে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাদের মন উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুপম সত্যগুলোর দিকে, যে-সব সত্য উল্লেখযোগ্য ফলের দিকে সবাইকে ক্রমশ এগিয়ে দিচ্ছে।

আপনার প্রতি আন্তরিক সম্ভাষণ রইল আমার, আশা করি আপনার জীবন, যা আপনার স্বদেশবাসীর কাছে এতখানি মূল্যবান বলে পরিগণিত হয়েছে, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আপনার স্থাপিত দৃষ্টান্তের আরো বেশি সুবিধা ও উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলবে, এবং আমি এই প্রত্যাশা পোষণ করি যে, ইংল্যান্ডে আপনার সংক্ষিপ্ত প্রবাসজীবনে যা আপনি দেখেছেন ও শুনেছেন, তাতে ক'রে আমাদের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের শুভ ফলাফল সম্বন্ধে আপনার দেশবাসীকে তৃপ্ত করতে আপনি সক্ষম হবেন। কেননা সে-যোগাযোগে দুদেশের বর্তমান দ্রুত সংযোজক। আরো বেশি নিবিড় ও স্থায়ী করে তুলছে।

আপনার আন্তরিক বন্ধুত্বের প্রত্যাশী,

এম ডব্লু এম বেণ্টিঙ্ক

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দ্বারকানাথের হার্দ্য সম্পর্কের পরিচয় আছে একটি চিঠিতে। মহারাণীর প্রতিকৃতি দ্বারকানাথ তাঁর কাছে চান কলকাতাবাসীর জন্যে। মহারাণী সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে দ্বারকানাথকে আর একটি ছবি দিতে চান। মহারাণীর সচিব লিখেছেন :

লণ্ডন, অক্টোবর ৯, ১৮৪২, উইণ্ডসর ক্যাসল

প্রিয় মহাশয়,

কিছুকাল আগে আপনাকে সরকারীভাবে জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম যে, কলকাতা মহানগরীর জন্য আপনার অনুরোধক্রমে মুদ্রিত দু'টি রাণীপ্রতিকৃতি ভারতবর্ষের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে, সেইসঙ্গে এখন আরও জানাচ্ছি—মহারাণী তাঁর একটি মিনিয়েচার যত দ্রুত সম্ভব তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন, এটি আপনাকে পাঠানো হবে আপনার নিজস্ব সংগ্রহে রাখবার জন্য, এবং এটি আপনার প্রতি মহারাণীর বিশেষ আনুকূল্যের স্মারক।

সম্ভবত আপনি জানেন, রাজপ্রতিকৃতি অংকনে যে-সব শিল্পীরা নিযুক্ত থাকেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কাজে সময় লাগে বেশি, ফলে যত দ্রুত আশা করেছিলাম ততটা তাড়াতাড়ি হয়ত শেষ ক'রে দিতে পারব না আপনারটা ; তবে আমি দেখব যাতে ব্যাপারটা বিস্মৃতির আড়ালে চলে না যায় এবং নিরাপদে এটি ভারতবর্ষে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এই সংবাদ আমার পক্ষে উদ্বেগজনক যে, আপনার দেশের সবচেয়ে ওয়াকিবহাল এবং সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিরাও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রতিক বিস্ময়কর পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে বলাবলি করছেন ; তবে খুব সম্ভব আমায় এইরকম একজন ব্যক্তির ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের মতো বিরল ঘটনার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে, কেননা লিখিতভাবে কারো মন্তব্য করার পক্ষে এটি একটি জটিল বিষয় ; সমগ্র পৃথিবী আজ সক্রিয় হয়ে উঠেছে, আর তার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে সতর্কভাবে—লেফাফার আঠা ও ঘনীভূত গালা বিগলিত হওয়ার মতো ভীতিজনক ঘটনার জন্য।

আপনার যথার্থ প্রীতিভাজন

সি. মারী

উপরের এই ভিক্টোরীয় ইংরেজীর জবরজং বাংলা অনুবাদ ছাড়াও এই সম্পর্কে নবীন মুখুজ্জে গিরিন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন মহারাণীর সঙ্গে দ্বারকানাথের সাক্ষাতের কথা।

লণ্ডন, ৭ জুলাই, ১৮৪৫, বেলা দু'টো

প্রিয় ভাই,

কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে রাণীকে তাঁর প্রতিকৃতি প্রদানের জন্য শিষ্ট সম্ভাষণ জানিয়ে বাবু এইমাত্র ফিরলেন, যে-ছবি এখন থেকে তুমি কলকাতা টাউন হলে দেখতে পাবে।

মহারাণী তাঁর ও প্রিন্স অ্যালবার্টের আরও একটি যুগ্ম মিনিয়েচার উপহার দিয়েছেন বাবুর নিজের ব্যক্তিগত (টাউন হলের জন্য নয়) ব্যবহারের জন্যে।

উনি একটি সান্ধ্য পার্টিতেও যাচ্ছেন আজ রাত সাড়ে ন'টায়।

তোমার স্নেহভাজন
নবীনচন্দ্র মুখার্জী

নবীন মুখুজ্জের আর একখানা চিঠি। এই চিঠিও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে।

সেণ্ট জর্জেস হোটেল, অ্যালবারমার্বেল স্ট্রীট, লণ্ডন, ২০ অক্টোবর, ১৮৪৫

এই সঙ্গে আমি আমাদের যে ভৃত্য কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে তার মারফৎ তোমাকে রাণী ভিক্টোরিয়ার দুখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি পাঠালাম। দয়া ক'রে এর একটি বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে দিও। এই ডাকে ইতিমধ্যেই তোমায় লিখেছি। তাই আর বেশি কিছু লিখছি না, শুধু তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে পুনঃ শুভেচ্ছা রইল।

এই চিঠিগুলির পাশেই উল্লিখিত ভিক্টোরিয়ার দেওয়া মেডালিয়ানে কী লেখা আছে: Inscription at the back of the Medallian—Presented by Her most gracious Majesty Queen Victoria to Dwarakanath Tagore at Buckingham palace on the 7th day of July 1845.

দ্বারকানাথের নিজের লেখা অনেক চিঠিও দেখেছি। অধিকাংশই জমিদারি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত। কিছু কিছু বন্ধু সাহেবদের কাছে লেখা। শেষোক্ত চিঠিগুলিতে ইংরেজ ললনাদের রূপ ও গুণ বর্ণনা বিস্তর। কোন পার্টিতে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কে কী ভাবে তাকিয়েছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আছে। এই ধরনের একটা চিঠি ১৮৫৩ সালের ২০ নবেম্বর কলকাতা থেকে গাজীপুর, মীরাটের লেঃ আই ক্যানারকে, এবং সাহারানপুরে জে. এইচ. বাল্টেনকে (১।১।১৮৩৬) লেখা। নিজে যে ভাল গান গাইতেন এবং পার্টিতে গেয়েও শোনাতেন, তার সাক্ষ্য আছে চিঠিতে। যশোরে দ্বারকানাথের প্রচুর জমিজমা ছিল। ১৮৩৫ সালের ২১ নবেম্বর যশোরের জে. এফ. ডনেলিকে লিখেছেন; যশোর শহর সংস্কারে কিছু টাকার প্রয়োজন হলে তিনি দেবেন। তাঁর মতে—Jessore was one of the healthiest station throughout the whole of the lower provinces.

চৌরঙ্গির থিয়েটার হলের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ। সেটি পরে পুড়ে যায়। ১৮৩৫ সালের ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ডব্লু ড্যাম্পিয়ারকে এক চিঠিতে ওই থিয়েটার সম্পর্কে লিখেছেন—

I wish you were in Calcutta to favour us with your pre in our Theatre. It is almost my sole property now, so that

there is no old humbug of one hundred share holders and that of losing 200 free admission tickets in each play. Parkar Palmer and few others have determined to go on regularly every fortnight and in March next to be commenced the necessary repairs in grand style.

টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারেও অনেক চিঠি আছে। তার মধ্যে প্রধান বহরমপুরের বাবু গঙ্গাচরণ সেনকে ৪।১২।১৮৩৫ সালে লেখা চিঠি। আবার সাজাদপুর জমিদারিতে মাসমাহিনা ১৫০ টাকা এবং মুনাফার ১০ শতাংশ কমিশনে জে. সি. মিলার নামক ইংরেজকে ম্যানেজার নিযুক্ত করার নির্দেশও আছে। চিঠির তারিখ ১৮।১।১৮৩৬।

১৮৩৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জনৈক ডি ম্যাকয়ারলেনকে স্টেট লটারি নিয়ে এক চিঠিতে দ্বারকানাথ বলেছেন—

যদিও অন্যান্য যে কোনো লটারির মতন রাজ্য লটারিও হয়তো একটি বিরাট জুয়া, তবু এর একটি বিপুল উপকারিতাময় উৎপাদনের দিক আছে; আর, লোকে যাতে জনসাধারণের সমৃদ্ধির জন্য তাদের কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়, সে-বিষয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করবার পক্ষেও বেশ ভালো পরিকল্পনা এই রাজ্য লটারি, কেননা অন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনাতেই তারা এমনভাবে উদ্যোগী হতো কিনা সন্দেহ। আরও কর বসানোর মানেই হলো ধনীদের উপর অভিশাপ এবং দরিদ্রের আরও এক দফা মর্মান্তিক ক্লেশ; সেজন্য হয় উন্নয়নের যাবতীয় পরিকল্পনা আমাদের বর্জন করতে হবে, সেসব উন্নয়নের কাজ শেষ করার জন্য লটারিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন খুবই জোরালো; কিন্তু এই দুই প্রত্যন্তের মধ্যে শেষটিই আমাদের অধিক পছন্দের, কারণ এর লভ্যাংশ গিয়ে পৌঁছবে শেষ অবধি জনসাধারণের কাছেই।

সর্বশেষে উল্লেখ করি একখানা চিঠি। প্যারিসের এক বিখ্যাত চিত্রকরের লেখা এই চিঠি দেবেন্দ্রনাথকে। বিষয় দ্বারকানাথের প্রতিকৃতি।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বোলপুর, বর্ধমানের সন্নিকটবর্তী, কলকাতা
মহাশয়,

কয়েক বছর আগে ফরাসী কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে আপনার স্বর্গত পিতার একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি সম্পর্কে আমার একবার যোগাযোগ হয়েছিল; প্রতিকৃতি আমি এঁকেছিলাম ১৮৪৬ সালে।

এই ছবিটি প্যারিস ও লণ্ডন (রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে) দু' জায়গাতেই প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এখন তা রয়েছে আমার দখলে না বলে বরং বলা যাক, আমার হেফাজতে, কারণ 'প্রয়াত' বাবু আমায় এর একটা কপি তৈরী করার জন্যও অর্ডার দিয়েছিলেন, এবং সেটিও তৈরী হয়ে রয়েছে এ-তাবৎ।

এই ছবি আপনারই সম্পত্তি, এর দামও, অর্থাৎ ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড আমায় মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনার জন্য আমি এটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি আজও ; কীভাবে ছবিটা আপনাকে পেঁছে দেওয়া যায় সে সম্পর্কে যদি জানান, বাধিত থাকব।

আর ঐ কপিটি, যা মূল ছবিরই অবিকল প্রতিলিপি, সেটিও কোনো অতিরিক্ত দক্ষিণা ছাড়াই আপনাকে আমি নিঃশর্তে দিয়ে দিতে চাই, কিংবা আপনি যা ভাল বোঝেন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই ছবিটি একটি শিল্পকর্ম এবং এটি আমার নিজের সম্পত্তি নয় ; সুতরাং এতকাল ধ'রে একে নিজের কাছে রাখতে হওয়ায় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, কিন্তু পক্ষান্তরে আপনার কাছে এই ছবি নিশ্চয়ই অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
ব্যারনদ্য সোভতার
১০ রয়েল আ প্যারী

অলমতি বিস্তরেণ। আরো অনেক মণিমুক্তা আছে ওই পত্রগুচ্ছে। যাঁরা ইতিহাসের গবেষক, যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর চর্চা করেন, তাঁদের অনুরোধ করি চিঠিগুলো ভালভাবে দেখে নিতে। আমার এ রচনা তার ভূমিকা মাত্র।

সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসনৎ লাহিড়ী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আর মসূয়ায় রায়পরিবার। বিধাতার আশীর্বাদে সৃজনশীল এই দুটি পরিবার বাংলার সংস্কৃতিচর্চার দুই প্রধান কেন্দ্র। ঠাকুর-বাড়ির কথা আমরা জানি, জানি যশোর-খুলনা থেকে আদি কলকাতায় আসা পঞ্চানন কুশারীর বংশধরেরা ধনে-মানে-যশে কীভাবে দেশবিখ্যাত হলেন, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের আলোয় দশ দিক আলোকিত হল। রায়পরিবারের কথাও আমরা জানি, কিন্তু কম লোকেই জানেন এই দুই পরিবার নানা সময়ে নানা সূত্রে গত একশ বছর ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, একাদিক্রমে বিখ্যাত তিনটি পুরুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট-সম্পর্ক শুধু এই রায়পরিবারের সঙ্গেই ঘটেছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নীলরতন সরকার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অমল হোম প্রমুখের সঙ্গে পারিবারিক পুরুষানুক্রমিক সম্পর্ক ছিল ঠিকই, তবে রায় পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ—যে তিন পুরুষের কথা বলছি, তাঁদের মত ক্রমান্বয়ে খ্যাতমান ও বিশিষ্ট ওই সব পরিবারে নেই। এই ধরনের ধারাবাহিক খ্যাতির প্রকাশ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ও মসূয়ার রায়পরিবার ছাড়া অন্য কোন বাঙালী পরিবারেও তেমন নেই। আর এই দুটি পরিবারকে সম্পর্কের সূত্রে গেঁথেছেন রবীন্দ্রনাথ।

মসূয়া ময়মনসিংহের একটি গ্রাম। আজ থেকে প্রায় চার শ বছর আগে নদীয়া জেলার চাকদহ থেকে (তার আগে বিহার) রামসুন্দর দেও নামে এক সুদর্শন যুবক ঘুরতে ঘুরতে যান ময়মনসিংহের শেরপুর। সংলগ্ন যশোদলের রাজা রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওই যুবকের বিয়ে দেন, দেন ঘরবাড়ি জমিজমা। তারপর তাঁদের পদবী হয় 'রায়' এবং বহুদিন যশোদলে কাটিয়ে স্থায়ী বসবাস করতে চলে আসেন মসূয়া গ্রামে। পরবর্তীকালে এই সম্পন্ন জমিদারবাড়িরই ছেলে কালীনাথ রায়। তিনি যেমন জানতেন ভাল সংস্কৃত, তেমনি জানতেন আরবি ফারসি এবং বেশি পরিচিত হন মুনসি শ্যামসুন্দর নামে। এই কালীনাথ রায়ের পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে। ছেলেরা সারদারঞ্জন কামদারঞ্জন মুক্তিদারঞ্জন কুলদারঞ্জন প্রমদারঞ্জন। প্রত্যেকেই বিদ্যায় বুদ্ধিতে লেখাপড়ায় খেলাধুলায় অগ্রণী। কামদারঞ্জনের পাঁচ বছর বয়সে অপুত্রক জ্ঞাতি জ্যেঠামশাই হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে পোষ্যপুত্র নেন। তাই পাঁচ দারঞ্জনের মধ্যে তিনিই একমাত্র উপেন্দ্রকিশোর। পোষ্যপুত্র নেওয়ার পর

অবশ্য ওই জ্যেঠামশায়ের এক ছেলে হয়—নরেন্দ্রকিশোর। কালীনাথের এক মেয়ের বিয়ে হয় ময়মনসিংহেই, অন্য মেয়ে হন কুন্তলীনখ্যাত হেমেন বোসের গৃহিণী। তাঁরই সন্তান মালতী ঘোষাল, নীতিন বসু, মুকুল বসু, কার্তিক বসু ও গণেশ বসু।

কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন শিশুসাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রমদারঞ্জনের কন্যা লীলা মজুমদারের বই কোন্ বাঙালী পড়েনি? সারদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন গণিতের অধ্যাপক ও এদেশে ক্রিকেট খেলার পথিকৃৎ। বিশেষ করে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন—ক্রিকেট ও দাড়ির জন্যে যাঁকে বলা হত বাংলার ডব্লু জি গ্রেস। সবচেয়ে খ্যাতিমান অবশ্য উপেন্দ্রকিশোর—সুকুমার রায়ের পিতা, সত্যজিতের পিতামহ। তিনি বহু বিষয়ে অসাধারণ। ছোটদের জন্যে দারুণ লিখেছেন। ভালো বাজনা বাজাতেন। সেতার পাখোয়াজ হারমোনিয়াম বাঁশি বেহালা। ছবি আঁকতেন গান লিখতেন গান গাইতেন এবং ছাপাই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতেন। ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লক করার মূলে তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সনস সেকালে ছিল পয়লা নম্বর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। রায়-ভ্রাতারা পড়াশোনার আদিপর্ব সেরে একে একে চলে আসেন কলকাতায় এবং প্রত্যেকেই ক্রমে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তবে সকলেরই মসুয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমৃত্যু।

উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম ১৮৬৩ সালে, মৃত্যু ১৯১৫ সালে। তিনি বিয়ে করেন সেকালের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে। তাঁর সংশাশুড়ি ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও প্রথম বিলেতফেরৎ মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। উপেন্দ্রকিশোরের তিন ছেলে তিন মেয়ে—সুখলতা সুকুমার সুবিমল। সুখলতা রাও পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও সুবিনয় রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত। নলিনী দাস ও কল্যাণী কার্লেকার পুণ্যলতারই দুই কন্যা।

বলছিলাম উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা। উপেন্দ্র-কিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ—এই তিন পুরুষের ধারা বাংলা সাহিত্য সংগীত ও সংস্কৃতি জীবনে প্রবল প্রভাবশালী প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত উপেন্দ্রকিশোরকে দিয়ে। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ করার পর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেই সূত্রে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারের নিকটে আসেন।

বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সম-সাময়িক উপেন্দ্রকিশোরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সেখানেই তিনি পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তাঁর বেহালা বাজানোর ঘটনাও প্রচুর। সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ক আলোচনাতেও উপেন্দ্রকিশোর যোগ দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে যখন ডোয়ার্কিন নামক বাদ্যযন্ত্র

কোম্পানি খোলা হয়, তখন তিনিই আগ্রহ সহকারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গীতিমালা ডোয়ার্কিন থেকে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন এবং নতুন তৈরি হারমোনিয়াম সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের।

উপেন্দ্রকিশোরের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন। তাঁর লেখা বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে যে নিয়মিত যেতেন, তার পরিচয় আছে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর লেখা 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইয়ে। তিনি লিখছেন—

কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। বাবার বেহালা বাজনার প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন। প্রতি বৎসর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে উৎসবের সময় বাবাকে রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতে হ'ত। ছোটদের জন্য বাবা যে বই লিখতেন, তাতেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। বাবার নতুন বই বেরোলেই আনন্দ প্রকাশ করে আরো লিখবার উৎসাহ দিয়ে তিনি চিঠি লিখতেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি দেশী গল্প শেষ হলে বেদেশী গল্পের ভাণ্ডারেও হাত দিতে তিনি বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন, কতকগুলি বিদেশী বইয়ের নামও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে দেখতাম। এখন তাঁর সাদা চুলদাড়ি ঋষির মত চেহারার ছবিই তোমরা বেশি দেখতে পাও, তখন আমরা দেখতাম তাঁর কালো কোঁকড়ানো চুল, জোয়ান বয়সের চেহারা। সে চেহারাও অবশ্য খুব সুন্দর ছিল। একদিন রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে দেখা সেরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ি যাবার জন্য রওনা হলেন। বাড়িটা কাছেই ছিল, তাই হেঁটেই যাচ্ছিলেন, একটু পরেই আবার ফিবে এলেন। পথে যেতে যেতে দেখেছেন, একটা মরা ইঁদুর ফুটপাতে পড়ে আছে, দেখে মনে হয় প্লেগেই মরেছে। পাশেই ছেলেপিলেরা খেলা করছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে, ইঁদুর থেকে যে প্লেগের ছোঁয়াচ লাগতে পারে, সে খেয়াল কারো নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তিনি বাবাকে বললেন। বাবা লোক নিয়ে গিয়ে ইঁদুরটাকে কেরোসিন ঢেলে জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন, তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারলেন। কাকারা খুশি হয়ে বললেন, 'দেখ, কবি শুধু ভাবেই ভুলে থাকেন না, সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে।'

উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কত নিকট ছিল এই চিঠিই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কাব্যগ্রন্থখানি চিত্রিত করেন অবনীন্দ্রনাথ। স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্রগুলি ছিল উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা। ইংলণ্ডের সংগীত বিশারদ ফক্স-স্ট্রাঙ্গওয়েজ যখন 'দি মিউজিক অব হিন্দুস্থান' নামে তাঁর বিখ্যাত বইটি প্রকাশ করেন, তখন সেই বইয়ে উপেন্দ্রকিশোরের স্টাফ নোটেশন করা কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের সেই প্রথম স্টাফ নোটেশন।

উপেন্দ্রকিশোর জীবিত থাকাকালে রবীন্দ্রসম্পর্কের ধারা অটুট রাখেন পুত্র

সুকুমার। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় এই প্রতিভাধর মানুষটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একজন। সেকালে প্রচন্ড রবীন্দ্রবিরোধিতার মাঝখানে মুষ্টিমেয় যে কয়জন যুবক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সৌরজগতের সৃষ্টি করেছিলেন, সুকুমার ছিলেন তার অন্যতম উজ্জ্বল গ্রহ। প্রশান্ত মহলানবিশ অজিতকুমার চক্রবর্তী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অমল হোম কালিদাস নাগ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ ছিলেন রবিকেন্দ্রিক সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ। এঁরা একাধারে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শিষ্য ভক্ত। সুকুমার রায় আরও বিশিষ্ট এই কারণে যে তিনি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র ঘরানার লোক হয়েও তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিন্দুমাত্র নেই। অবনীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জীবনে ও মননে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁদের তিনজনের রচনায় রবীন্দ্রনাথের ছাপ নেই। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বমুখী হলেও সম্ভবত এই তিনজনকে তিনি তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

পিতা উপেন্দ্রকিশোরের সূত্রে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমারের পরিচয়। একটু বড় হওয়ার পরই তিনি রবীন্দ্রগোষ্ঠীর একজন হলেন এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহের ভাগিদার হলেন। রবীন্দ্রসান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন দীর্ঘদিন। শান্তিনিকেতনে তাঁর যাতায়াত কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে থেকেই। সুকুমার রায় ছিলেন সব উৎসবের নিয়মিত অতিথি। কলকাতায় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতেও সুকুমার প্রমুখ রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই মিলিত হতেন। সেকালের শান্তিনিকেতনের স্মৃতিতে সুকুমার রায়কে জড়িয়ে অনেক কাহিনীই রয়েছে নানা জনের রচনায়। কালিদাস নাগ আমাদের জানান, সেকালের শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে প্রতিদিন আলু খেয়ে খেয়ে বিরক্ত সুকুমার পরিহাসের ভঙ্গীতে গান বাঁধেন এবং নিজেই গেয়ে ওঠেন— এইতো ভালো লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়।

প্যারডি রচনায় সুকুমার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানের। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের কথা ও সুরের আদলে লেখেন মানডে ক্লাব বা মন্ডা ক্লাবের জাতীয় সংগীত—'আমাদের মন্ডা সম্মিলন।' বিশ্ববীণা রবে-র অনুকরণে তিনি লেখেন—

বৃষ্টি বেগভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে নোংরা
ঘোলা কালো,
হাঁটু জল ঠেলি চলে যত লোক।
রাস্তাতে চলা দুষ্কর মুস্কিল বড়
অতি পিচ্ছিল অতি পিচ্ছিল

আঁতিপাঁতিপাঁতিপাঁতিপাঁতিপাঁছল
বিচ্ছিরি রাস্তা।
ধরণী মহাদুর্দম কর্দমগ্রস্তা
যাওয়া দুষ্কর মুস্কিল রে ইস্কুলে
সর্দি জ্বরবৃদ্ধি বড় নিত্যি লোকে বদ্যি ডাকে
তিক্ত বড়ি খায়। ইত্যাদি।

সুকুমার অবশ্য ভাল গানও লিখতেন। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা 'জাগো পুরবাসি' গানটি দিয়ে যেমন প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের উপাসনা শুরু হয়, তেমনি সুকুমারের লেখা গান এখনও ব্রাহ্মবিবাহে গাওয়া হয়। গান দুটি হল 'প্রেমের মন্দিরে' তাঁর আরতি বাজে' এবং 'নিখিলের আনন্দধারা'। প্যারডির বিকৃতি ছাড়াই এই দু'টি গানের সুর হুবহু রবীন্দ্রনাথের "ছিল যে পরানের অন্ধকারে" এবং "শ্রাবণের ধারার মত" থেকে নেওয়া।

১৯১৭ সালে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেন উদ্দীপক একটি দেশাত্মবোধক গান লিখতে। রবীন্দ্রনাথ তখনই লেখেন 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।' এই গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজে শেখান জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে। গানের দলে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন সুকুমার রায়।

পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে সীতাদেবী সুকুমার রায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দরভাবে। ১৯১১ সালের পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে তাঁরা দল বেঁধে যান। সেবারই প্রথম রাজা নাটক অভিনীত হয়। সুকুমার রায় ওই সময় তাঁর অদ্ভুত রামায়ণ পড়ে শোনান। সীতা দেবী লিখছেন—

'এই রামায়ণ গান সকলেই খুব উপভোগ করেছিলেন। অদ্ভুত রামায়ণে একটি গান আছে, ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কইরে। ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে। আশ্রমের ছোট ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল—'ঐ আসে।' একটি ছোট ছেলে মাঠের ভিতর গর্তে পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমারবাবুকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'ও ঐ-আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও তো।'

সীতাদেবীর পুণ্যস্মৃতি থেকে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যাকঃ 'সেবার (১৯১৭) সুকুমারবাবুরা দিন চার ছিলেন বোধহয়। এ চারদিনই গান গল্প কবিতা পাঠ প্রভৃতি একটানা চলিত। দিন দুই শ্যারাড পেলাও হইল। যাত্রার দিন বার তিন চার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্বক ট্রেন ফেল করিয়া শেষে সত্য সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন।'

১৯১৭ সালের আর একদিন। সীতাদেবী লিখছেনঃ সকলে মিলিয়া আবার বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর

দিল যে 'বাঙাল সভা হইবে', আমাদের সেখানে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সকলেই উৎসুক হইয়া চলিলাম। 'বাঙাল সভার' নাম ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে কোন অধিবেশনে কখনও উপস্থিত থাকি নাই। শুনিলাম অন্যান্য অতিথিরাও আসিতেছেন এবং স্বয়ং, কবিও উপস্থিত থাকবেন। পথেই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল।

রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে খোঁজ করিলেন যে আমার মাথাধরা কেমন আছে, তাহার পর বলিলেন, 'আচ্ছা চলো বাঙাল সভায়, তাদের কথা শুনলে বোধহয় তোমার মাথা ছেড়ে যেতে পারে।' খোলা মাঠেই সভা হইতেছিল। মেয়েরা ও মান্যগণ্য অতিথিবর্গ তক্তপোষে বসিলেন, ছেলের দল বসিল মাটিতে শতরঞ্চি বিছাইয়া। সর্বসম্মতিক্রমে সুকুমারবাবু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে, সুকুমারবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী সুপ্রভাকেই সভানেত্রী করা হোক, কারণ আজন্ম কলিকাতায় বাস করিয়া সুকুমারবাবুর বাঙালত্ব খানিকটা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা রাজি না হওয়াতে সুকুমারবাবুই সভাপতির পদে বহাল রইলেন। সভার কার্যতালিকা বেশি বড় ছিল না। একটি গল্প একটি বিজ্ঞাপন। একটি বাঙাল ভাষায় অন্যটি সাধারণ বাংলা ভাষায়। সভার কার্য যথাসম্ভব বাঙাল ভাষাতেই হইতেছিল। অনেকে উঠিয়া ছোট ছোট বক্তৃতা দিলেন। বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক, 'তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।' বক্তাদের ভিতর নাম মনে পড়ে দুই জনের। শ্রীযুক্তা সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকেও তাঁহার মামার বাড়ির (মালদহ) ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথকেও সভাপতি অনুরোধ করিলেন তাঁহার মামার বাড়ির ভাষায় কিছু বলিতে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, খুলনার ভাষায় মাত্র দুইটি কথা তিনি জানেন, তাহাতে বক্তৃতা দেওয়া চলে না। সে কথা দুটি হইতেছে, 'কুলির অম্বল ও মুগির ডাল।' অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দিলেন অতি কষ্টে। বেশ পুরাপুরি বাঙাল ভাষা হইল না।

বাঙাল সভার মতই শান্তিনিকেতনে আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল—হৈ হৈ সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের বৈঠকে গাওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ আবোল-তাবোলের সেই বিখ্যাত কবিতা—'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে'-তে সুর দেন।

বিমলাংশুপ্রকাশ রায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, একবার শান্তিনিকেতনে সুকুমার রায়কে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, সুকুমার, তুমি যে লিখেছ, 'ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া তিন ভাবে ডিসপেপসিয়া ঢেঁকুর উঠবে চোঁয়া'—আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছ কি? বিমলাংশুপ্রকাশ আরও জানান, ব্রাহ্মযুব-সমিতির পক্ষ থেকে সুকুমার রায় তাঁদের নিয়ে মাসে একবার করে কলকাতার নানা জায়গায় যেতেন। একবার তাঁদের নিয়ে যান স্টেরা রোডে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়িতে। তাঁর ধারণা রবীন্দ্রনাথের 'আলোয় আলোকময় করে এস

হে' গানটি সুকুমার রায়ের অনুরোধে "আলোক" পত্রিকার জন্যে লেখা। প্রথম সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠতা ছিল সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীদের। ১৯৪০ সালের একটা চিঠিতে (অপ্রকাশিত) দেখছি, তিনি সুপ্রভা রায়কে নেমন্তন্ন করেছেন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভজন গান শোনানোর এবং হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের গান শোনার জন্যে।

হিরণকুমার সান্যাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সুকুমার রায়ের পাল্লায় পড়ে ১৯১৫ সালে বাক্স পেঁটরা সব কাঁধে করে ডবল মার্চ করতে করতে তাঁরা শান্তিনিকেতন থেকে একবার বোলপুর যান ট্রেন ধরতে।

সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভাও রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর, সুকুমার রায়ের সঙ্গে তো বটেই, অকালে স্বামীহীনা হওয়ার পরেও তিনি শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছেন বার বার। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ওঁরা একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান। যখনই গিয়েছেন, সুকুমার তাঁর কিছু রচনা শান্তিনিকেতনেব ছেলেমেয়েদের গেয়ে বা অভিনয় করে শুনিয়েছেন। সেবারও শোনান। সুপ্রভা রায়ের একটি খাতায় দেখা যায় ১৯২১ সালে পুজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো পাতায় একটি করে গান নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। দিন অবসান হল, আমার দোসর যে জন, আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে ওই খাতায় লেখা শেষ রবীন্দ্রসংগীত—সকাল বেলার বাদল আধারে। তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। প্রথম লেখা সুপ্রভা রায়কে রবীন্দ্রনাথ অনেক চিঠিও লিখেছেন। ১৯১৭ সালে শিলঙে তাঁর "স্নেহের টুলুকে" লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভিনীত মায়ার খেলার কথা উল্লেখ করেন এবং সুকুমারের কাজকর্ম সম্পর্কেও খোঁজ করেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন,"সুকুমার ওদিকে আসর জমিয়েছে কেমন? নতুন পালার সৃষ্টি হচেছ কি? ইতি ৬ কার্তিক ১৩২৪।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুকুমার-সুপ্রভার পুত্রবধূ বিজয়া রায়ও ওই মায়ার খেলা অভিনয়ের সূত্রে ত্রিশ দশকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। সুপ্রভা রায়ের মত তিনিও সুগায়িকা।

সুকুমার রায়ের সঙ্গে সুপ্রভা দাসের বিয়ে হয় ১৯১৩ সালে, বিলেত থেকে ফেরার পর। সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্যে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার দুজনেই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুরোধ করেন। সেই সময় শিলাইদহে জমিদারীর কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় উপেন্দ্রকিশোরকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান, তাঁর পক্ষে বিবাহোৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু স্নেহের টান এমনই, সব কাজ ফেলে শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ বিয়ের আসরে এসে উপস্থিত হন। সুকুমার সুপ্রভা উপেন্দ্রকিশোর সবাই খুশি। বিবাহবাসরে উপস্থিতদের মধ্যে একজন, সীতাদেবী, এই সম্পর্কে লিখেছেন—

এই বৎসর অর্থাৎ ১৯১৩-র ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোধহয় সুকুমার রায়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে, এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

স্নেহের পাত্র হবার যোগ্যও ছিলেন তিনি। দীর্ঘকায়, সুদর্শন, ভাল ছবি আঁকেন, কবিতা লেখেন, গান জানেন, হাসি তামাসায় মাতিয়ে রাখেন। উপেন্দ্রকিশোরের যোগ্য পুত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে অন্য অনেক রকম সাহায্যও চেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রেসের একজন লোককে সুকুমার রায়ের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠান ওদের প্রেসে কাজ শিখিয়ে দেবার জন্যে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ঠিক আগে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেতে ছিলেন, তখন তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে বিদেশের বিদ্বজ্জনের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছিলেন সুকুমার রায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে পৌঁছান, সুকুমার রায় তার আগে থেকেই ওখানে ছিলেন। তিনি বিলেত গিয়েছিলেন মুদ্রণ সম্পর্কে নতুন বিদ্যা অর্জন করতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। তা ছাড়া ঠিক সেই সময়টাতে সুকুমার রায় ছাড়া আরও কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী বাঙালী ছিলেন লণ্ডনে। কালীমোহন ঘোষ অরবিন্দমোহন বসু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রও এসেছিলেন কিছু দিন আগে। সুরেন ঠাকুর আসেন কয়েক মাস পর। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমথলাল সেনও ওখানে ছিলেন নানা কাজে।

লণ্ডনবাসী, বিশেষ করে সেকালের বুদ্ধিজীবী মহলে রবীন্দ্রসাহিত্যকে পরিচিত করার ব্যাপারে সর্বাধিক উৎসাহ ছিল সুকুমার রায়ের। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক উইলিয়াম পিয়ার্সনের লণ্ডনের বাড়িতেও এক ঘরোয়া বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, তাতে রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষ-ভাবে ছিল। রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে পৌঁছনোর পাঁচ দিন পরে ১৯১২ সালের ২১ জুন সুকুমার রায় কলকাতায় তাঁর ছোট বোন পুণ্যলতাকে এক চিঠিতে লিখছেন : পরশু দিন মিঃ পিয়ার্সন তাঁর বাড়িতে আমাকে বেঙ্গলী লিটারেচার সম্বন্ধে একটি পেপার পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস আরনল্ড, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস রটেনস্টাইন, ডঃ পি. সি রায় প্রভৃতি অনেকে। তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম উপস্থিত। শুধু

তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে আছেন। বুঝতেই পারছিস আমার অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুঁজে পড়েছিলাম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে বইটই এনে ম্যাটেরিয়াল জোগাড় করতে হয়েছিল। তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা—সুদূর, পরশপাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ ইত্যাদি অনুবাদ করেছিলাম। মিঃ ক্র্যানমার বীং, নর্থব্রুক সোসাইটির সেক্রেটারি, আর উইজডম অব দি ইস্ট সিরিজের এডিটর খুব খুশি। আমাদের ধরেছেন অনুবাদ করতে, তিনি পাবলিশ করবেন।

ইতিমধ্যে রটেনস্টাইন ইংরেজি গীতাঞ্জলির টাইপ-করা কপি য়েটস প্রমুখ কয়েকজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন বার্ট্রান্ড রাসেল এইচ জি ওয়েলস হ্যাভেল লোয়েজ ডিকিনসন এন্ডরুজ স্টপফোর্ড ব্রুক ব্রাডলে এজরা পাউন্ড স্টার্জ মুরের সঙ্গে। কেদারনাথ দাসগুপ্তের উদ্যোগে ইউনিয়ন অব ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের প্রথম সম্বর্ধনা সভা এবং দু দিন পর ইন্ডিয়া সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায় সুকুমার রায় শুধু উপস্থিত নয়, আয়োজনে সাহায্যও করেছিলেন।

অর্শ রোগের চিকিৎসার জন্য, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছয় মাস কাটিয়ে লন্ডনে ফিরে এক নার্সিং হোমে ভর্তি হন। সুকুমার তাঁকে দেখতে প্রায়ই যেতেন। কবি যখন নার্সিং হোমে তখন ১৯১৩ সালের ২১ জুলাই ইস্ট অ্যান্ড সোসাইটিতে সুকুমার রায় 'দি স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে "ইহাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম পাবলিক ভাষণ।"

ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধিমন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায় একসঙ্গে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপাসনা করেন। সঙ্গে গান হয়।

সুকুমার রায় তার চার দিন পর ২৫ জুলাই পুণ্যলতাকে এই প্রবন্ধপাঠ সম্পর্কে লেখেন—লোক মন্দ হয় নি। কোয়েস্ট কাগজের এডিটর মিঃ মীট, (যিনি এখানে রবিবাবুর লেকচার সব অ্যারেঞ্জ করেছিলেন) তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে, তিনি সেটা কোয়েস্ট কাগজে ছাপাচ্ছেন।...রবিবাবু দু সপ্তাহ নার্সিং-হোমে ছিলেন। কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দেখতে গিয়েছিলাম। দি স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ নামে প্রবন্ধটি কোয়েস্ট কাগজে ছাপা হয়েছিল। তাঁর বর্ণমালাতত্ত্ব বইয়েও আছে।

তখন রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো নাটক ইংরেজিতে তর্জমা হয়ে অভিনীত হচ্ছিল একের পর এক। ওই চিঠিতে সুকুমার আরও লিখছেন : সেদিন রয়েল কোর্ট থিয়েটারে তাঁর ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল। মালিনী আর চিত্রাঙ্গদাও শীগগিরই কোথাও হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুব নাম হয়েছে। এখানকার পোয়েট লরিয়েট আর ব্রিজেস তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

১৯১৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ দেশে রওনা হন। সিটি অব লাহোর নামক জাহাজে। এই জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ এবং সুকুমার রায়। কুড়ি দিনের এই দীর্ঘ পথে কবির সঙ্গে সুকুমারের কী কী বিষয়ে আলাপ হয়েছিল, কেমন কেটেছিল কবিসঙ্গ, তার কোন লিপিবন্ধ বিবরণ মেলে নি। সত্যজিৎ রায়কে এই প্রসঙ্গে পরে যখন জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন "আপশোসের কথা, শৈশবে বাড়ি বদলের সময় বাবা ও ঠাকুরদার অনেক কাগজপত্র হারিয়ে যায়।" হারিয়ে যাওয়াটা আমাদের সকলের পক্ষেই দুর্ভাগ্য। থাকলে হয়ত আরও অনেক কিছুই জানা যেত।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকুমার রায়ের শ্রদ্ধা এবং সুকুমারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ কেমন ছিল তার পরিচয় মেলে দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত পুত্রপ্রতিম শিষ্যের অন্তিম সময়ে।

১৯২৩ সালে সুকুমার রায় শেষ শয্যা নিলেন। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। বাঁচার আশা নেই। শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথ এলেন। তার আগে যখন অসুস্থ হন তখনও দেখতে এসেছিলেন। এবার রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতেই অনুরোধ করলেন, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। সুকুমার আবার ফরমাস করলেন, 'দুঃখ এ নয় সুখ নয়গো, গভীর শান্তি এ যে' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। একবার নয়, দুবার। সারা ঘরে ধ্বনিত হল—এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে, ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে। সুকুমার রায়ের হৃদয়ও ভরে উঠল। তাঁর আকাঙ্ক্ষার অবসান এবং কিছুদিন পরেই জীবনাবসান।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে একটি উপাসনার আয়োজন করেন। আচার্যের ভাষণে তিনি বলেন, 'আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি, এই কথাই বার বার মনে হয়েছে, জীব-লোকের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মলোক আছে। যে-কোন মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে স্পষ্ট করে তোলেন, অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ু নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁরা রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

ওই ভাষণের মূল পাণ্ডুলিপির সূচনায় আর একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত ছিল। তাতে সুকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন "আমার যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। তাঁকে আপনার আত্মীয়স্বজনের মত স্নেহ করতুম। তিনি দুই বছরের দীর্ঘকাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতুম।"

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে সুকুমার রায় যখন বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে ব্রাহ্ম যুব সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক, তখন তাঁরা দুজনেই উদ্যোগী হ'ন রবীন্দ্র-নাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে। এই প্রস্তাবে বাধা দেন কৃষ্ণকুমার মিত্র নবদ্বীপচন্দ্র দাস হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রমুখ গোঁড়া ব্রাহ্ম। তাঁদের বক্তব্য, আদি ব্রাহ্মসমাজের রবীন্দ্রনাথ কার্যত হিন্দু, তাঁকে গ্রহণ করার অর্থ ব্রাহ্মত্ব বিসর্জন দেওয়া। সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা তাতে ক্ষেপে যান এবং হুমকি দেন, তাঁদের প্রস্তাব না মানলে তাঁরা সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবেন। বিরোধ তীব্র হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ তৃতীয়বার ভাঙনের সম্মুখীন হয়। তবে হুমকিতে শেষে কাজ হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সদস্যরূপে গৃহীত হন। এই বিতর্কের সময় সুকুমার রায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। যার শিরোনাম—কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর ছ'বছর পর, ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য পরলোকচর্চায় মেতে ওঠেন। তিনি মিডিয়াম উমা সেনের (বুলা) মাধ্যমে ডেকে আনেন তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় বন্ধুদের। শমী বেলা নতুন বৌঠান জ্যোতিদাদা অজিত চক্রবর্তী সতীশ রায় মণিলাল গাঙ্গুলি সত্যেন দত্ত প্রভৃতি এবং সুকুমার রায়কে। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে সুকুমার রায় যেসব উত্তর দিয়েছিলেন নিচে তুলে দিলাম আমার 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' বই থেকে। এ থেকে দুজনের মধুর সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।

—এসেছি।

সুকুমার! কেমন আছ তুমি?

অন্য কথা বলুন।

তোমার পৃথিবীর সঙ্গে এখন যোগ আছে?

—আছে খুব।

আমাদের এখানকার রচনার কাজ, অন্য কাজ—তাতে তোমার মন আছে?

—আছে বৈ কি, এখনও তো তাই নিয়েই আছি।

তোমার এখানকার রচনার প্রতি অনুরক্তি আছে?

—রচনা তো কাগজে হয় না, মনের মধ্যে আছে।

আমাদের কাউকে অবলম্বন করে করতে পার রচনা?

—শক্ত। কার হাতে?

বুলার হাত দিয়ে ছবি আঁকো কিংবা লেখ।

—বড় শক্তির প্রয়োজন। আমার ভাব যেন এক সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্য দিয়ে চলেছে।

আমাদের কাছে কিছু বলবার আছে?

—আছে। বলুন আপনি কতদিন কতদিন আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে?

—শুনুন, আমি যেন কী মহান আলোকের মধ্যে রয়েছি। আমার চোখ সেই আলোয় ডুবতে চায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কী অন্ধকার—।

আলো কি মনকে আশ্রয় করে না দেহকে ?

—আমার মন এখানে সর্বস্ব। আমার মন—।

ওটা আর একবার বল।

—আমাদের মনকে পূর্ণ করতে পারলে অর্থাৎ দেবতাকে · কিন্তু আমার ধর্মবিশ্বাস আলাদা।

আমার নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটা লেকচার (হিবার্ট লেকচারে মানুষের ধর্ম) লিখেছি, জান ?

—সে ঠিকই করেছেন। আমার মনও ওই চায়।

আমাদের সাধনায় সাহায্য করতে পার ?

—সাধনায় ?

আমরা যেটা ইচ্ছা করি কামনা করি 'এস্পায়ার' করি, তাতে সহায়তা করতে পার ?

—আপনাকে আমার দরকার। আমার নিজের সাধনা আজও শেষ হল না।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলবে ?

—কিছু না !

ব্রাহ্মসমাজের উপর শ্রদ্ধা আছে ?

—না, ও পথ ঠিক নয়।

ব্যক্তিগত সাধনা, এই তোমার বলবার কথা ?

—হাঁ, কতকটা তাই।

প্রশান্ত (সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) এখন যে কাজে নিযুক্ত, তাকে তুমি অনুসরণ করছ ?

—সমস্তই।

এই পথে সে সার্থকতালাভ করবে ?

—জানেন, যখন এলাম মনে হল পৃথিবীতে আমার মনের ধারা পূর্ণ বিকাশের পথে চলেছে।

বাণীর আরোগ্য ?

—বলতে পারি না।

আমি যে ছবি আঁকি সে কি ভালো ?

—হাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, অপূর্ব।

ইউরোপে তার সমাদর হবে ?

—হবে।

আমি মনে করছি পশ্চিমে যাব। কোথায় যেতে পরামর্শ দাও।

—ইউরোপে প্রায় সব জায়গায় আপনার যশের স্তম্ভ প্রস্তুত।

তুমি যে বললে, আমাকে দরকার আছে। আমি কী ভাবে সহায়তা করতে পারি ?

—আমি আজও পৃথিবীর সেই দুঃখ সুখের অজানা দেবতাকে খুঁজে মরছি। আজও তো তাঁকে পেলাম না।

আমার কোন রচনা দ্বারা তোমার সহায়তা হবে ?

—তা আমাকে প্রবুদ্ধ করবে।

আমার একান্ত ইচ্ছা আমার সাধনার ফল লাভ করি বল লাভ করি।

—আপনি মোক্ষপথে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন।

দেহান্তর ধারণ করবার ইচ্ছা আছে ?

—ভারি ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঠিক জায়গা তো পাব না।

দেহান্তর ধারণ কি করতেই হবে ?

—সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসা করবার মত শক্তি তিনি এখনও আমাকে দেননি।

পরোলোকগত আত্মা—যাঁরা তোমার চেয়ে অগ্রসর, তাঁরা তোমায় সাহায্য করেন ?

—এখানে কেউ কারো নয়, অথচ কী নিবিড় যোগ।

ভালবাসা সম্বন্ধে পরিণাম ওখানে কী রকম ?

—আমার পৃথিবীর নেশা আজও কাটে নি। তাই এখনকার কোন সুর আজও মনে লাগে না।

এখানকার সৌন্দর্য তোমার উপলব্ধির মধ্যে আছে ?

—আছে বৈকি ? কিন্তু ঠিক তেমনি করে যদি আপনার পায়ে বসতে পারতুম।

এখানে আমি গান রচনা করি। সেটাতে তোমাদের উপভোগ আছে ?

—করি। অন্তরের একান্তে তাকে পাই।

ইহলোক পরলোক—দুইকে একত্র করে কি মানবলোক ?

—আবার বলুন।

দুইকে সম্মিলিত করে কি কোন জগৎ আছে, না উভয়ের বিচ্ছেদ আছে ?

—বিচ্ছেদ নেই। ওখানকার কাজ এখানে শেষ করতে হয়। যারা কাজ শেষ করে এসেছে তাদেরই মুক্তি।

এখানে যারা ইন্দ্রিয়সেবা, বিষয়কর্মে নিযুক্ত, তাদের কী ?

—তাদের পরীক্ষা প্রবল।

যাঁরা সৌন্দর্যসৃষ্টি করবেন, তাঁদের সফলতা পরলোকে আছে ?

—ঐ পথেই মুক্তির সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎ হয় না কি ?

তুমি চলে গেলে। তোমাদের অভাব অনুভব করছি। সত্যেন্দ্র (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), তুমি চলে গেছো, অভাব অনুভব করি। তুমি বোধহয় তা জান।

—জানি। আমার ছেলেকে (সত্যজিৎ রায়) আপনার আশ্রমে নিতে পারেন।

তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।

—তাকেও বলুন না।

তাঁকে পেলে আমিও খুব খুশি হব। ও কিছুকাল ধরে শান্তি খুঁজছিল।

—জানি, কর্মহীন মন বড় অশান্ত হয়। কাজ তো কতই করবার আছে।

আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।

—আচ্ছা।

প্রশান্তকে কিছু বলবার আছে? আমি বলতে পারি।

—না, বলে কী হবে? না, সে আমার ভাল লাগে না।

তোমার আত্মীয়ের সঙ্গে মিলন হয়?

—হয়। কবিতা পড়ুন, নয় গান করুন, নয় ঘরের সকলে সোরগোল (হাস্য ইত্যাদি) করে উঠুন।

কী গান করব বল?

—তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

(রবীন্দ্রনাথ খানিক গুণ গুণ করে সুর ভাঁজলেন এবং গলাটা ঠিক করে নিয়ে ফরমাশ মত গাইতে শুরু করলেন—তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়, কোন খানেরে কোন পাষাণের ঘায়। কিন্তু 'ভেসেছিল স্রোতের ভরে' বলে থেমে গেলেন।)

সুকুমার, তুমি আমায় বড় শক্ত ফরমাশ করেছ, সব কথা মনে থাকে না।

—জানি সে কথা।

'অন্ধজনে দেহ আলো' শুনবে?

—করুন। ওটা একদিন আমায় শুনিয়েছিলেন, মনে পড়ে?

(রবীন্দ্রনাথ একটু সুর ভেঁজেই পুরো একটানা গেয়ে গেলেন গানটি। গান শেষ হলে সুকুমার রায় আবার কথা শুরু করলেন।)

—বড় ভাল লাগল।

এখান থেকে ছোট ছেলেরা যারা চলে গিয়েছে, তাদের কী রকম বিকাশ? তারা কি আত্মা নিয়ে যেতে পেরেছে, না পরিপূর্ণ হতে পারে নি বলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে?

—সে যেন পথ চলতে যেমন ফুল পায়ে ঠেকে, তুলে নিয়ে মনটা ভরে ওঠে, তেমনি করে হঠাৎ শিশুদের পথের মাঝখানে পাই। এখানে শিশুর একটা জগৎ আছে। যারা বড় হয়েছে, সংসারের তাপে যারা মলিন, তারা কি পারে সেখানে যেতে?

আমরা তো দেখতে পাই নে। সেটা কি তোমার গোচরে আছে?

—সব কথা বলতে পারি না। চেষ্টা করতে পারি।

(পাশে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি হঠাৎ সুকুমার রায়ের আত্মাকে বৈষয়িক একটি প্রশ্ন করেন। সেবার প্রতিমা দেবীরা রাজগীরে বেড়াতে যান। সেখানে তার একটি দামি ঘড়ি হারিয়ে যায়। আলোকেন্দ্রনাথের প্রশ্ন সেই ঘড়ি নিয়ে।)

প্রতিমার একটি ঘড়ি হারিয়ে গেছে রাজগীরে। কোথায় আছে ?

—সে কুড়িয়ে নিয়েছে একজন।

কিন্তু শুধু তাই কি হারিয়েছে ?

—আরো কি হারিয়েছে ?

খুব সামান্য, অথচ ভারি দরকারি।

—কী জিনিস বলে দাও।

কাপড়চোপড় সংক্রান্ত।

—ঘড়িটা কোথায় রেখেছিলেন ?

আয়নার কাছে।

—সেখান থেকে পড়ে যায়। কিন্তু আমার ভুল হতে পারে।

কোন সময় ?

—স্নানের পূর্বে।

সে কি পাবার উপায় আছে ?

—আমি কি দেবতা ?

(অলোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ শেষ। আবার প্রশ্নকর্তা রবীন্দ্রনাথ।)

অপূর্ব-র স্ত্রীকে (অপূর্বকুমার চন্দ্রের স্ত্রী লোপামুদ্রা) জান ? তাঁকে ডেকে দিতে পার ?

—দূরে আছেন। তিনি এখনও খুব আকর্ষণের মধ্যে আছেন। আমার ভাগ্য ভাল, আমি একটু দূরে যেতে পেরেছি।

তোমাদের থাকবার ভিন্ন ভিন্ন স্থান আছে ?

—সীমাহীন আকাশ বন্ধনবিহীন ।

তোমার চেয়ে যাঁরা মুক্তিপথে অগ্রসর, তাঁরা কি অন্য কোন সীমাবদ্ধ আকাশে আছেন ?

—সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সেও অসীম। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে দূরে আছেন, কিন্তু সে একই আকাশে।

তাদের সঙ্গে যোগের কোন বাধা আছে ?

—নয়, বেশির ভাগ মায়ের আকর্ষণই বেশি—স্ত্রীর চেয়েও।

যাঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, তাঁরা কি তেমনি থাকেন একত্র হয়ে ?

—সব জায়গায় সমান নয়। ইচ্ছা করলেই পাওয়া যেতে পারে। আমি এখান থেকে আমার প্রপিতামহকে দেখতে পাচ্ছি।

(রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রশ্ন হাতের লেখায় অস্পষ্ট। সুকুমার রায়ের

উত্তর হল—)

—বড় মধুর সে সম্বন্ধে। কিন্তু আমি কি আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝেছি? যারা দেহে আসক্ত, তারা কি সেখানে ভোগ ইচ্ছা করে?

—কোন প্রয়োজন হয় না। হাওয়ায় যেমন ফুল উড়ে, শুধু গন্ধটুকু থাকে। মধুরতা আছে, কিন্তু মাদকতা নেই।

(পরবর্তী প্রশ্নকর্তা অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর দুটো প্রশ্নই হাতের লেখায় অস্পষ্ট। কিন্তু সুকুমার রায়ের উত্তর (১) মন পিছিয়ে পড়ে থাকে (২) আধ্যাত্মিক ভাবে। উত্তরের পরই রবীন্দ্রনাথ নিজে আত্মার সঙ্গে আবার আলাপ শুরু করেন।)

তুমি তো জান, কোনান ডয়েল পরলোক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন, সে কি সত্য?

—সত্য আছে., কিন্তু কল্পনা-মিশ্রিত সত্য।

পরলোক থেকে কেউ কি মিথ্যা বলে ভোলায়?

—আছে বৈ কি! এখনও অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা পৃথিবীতে কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে এলেন, তাঁরা এখানে এসে অনেক মন্দ কাজে···দুষ্ট লোকের তাদের আর একটা পৃথিবী···।

তারা কি পৃথিবীতে জন্ম নেবে?

—তারা তাই ইচ্ছে করে। এত উন্মত্ত আনন্দ আর কোথাও নেই।

জন্তুরূপে, না মানবরূপে?

—যা ইচ্ছে। কিন্তু কী ভুলই যে হয়। আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন, আমার মনে এত কথা এল কেমন করে—

তোমার এখানকার পার্সোনেলিটি সীমায় এখনও তুমি আছ। এখনও কি তারই অনুসরণ করে চিন্তা কর, সুখ দুঃখ অনুভব কর?

—না, ব্যক্তিত্বে তেমন প্রয়োজনবোধ করি না। এখানে যে হাওয়ায় ভাসি।

অন্যলোক মানুষ আছে?

—না, মানুষ নয়।

প্রাণী?

—জল আছে পাথর আছে কোন স্থানে সবুজও দেখা যায়।

অন্যলোকের সঙ্গে তোমাদের কোন কম্যুনিকেশন নেই?

—যদি ইচ্ছা করি পারি। কিন্তু যে-লোকের আকর্ষণ কাটাতে এখানে আসা, আবার একটা অন্যলোকের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক?

'রেসিয়াল' পার্থক্য।

—না খুব কাছাকাছি আছি। অন্তরে অন্তরে আত্মায় আত্মায় কী· প্রবল যোগ।

পিয়ারসনকে (ডবলু ডবলু পিয়ারসন) জান? আনতে পার।

চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আরো একজন তো সম্মুখেই রয়েছেন।

কে আছেন ?

—তার নাম শমী।

পরলোকের সঙ্গে আলাপ এইখানেই শেষ। এই আলাপ কতটা বিজ্ঞানসম্মত, কতটা বাস্তব এই তর্কে না গিয়ে একটি কথা বলা যায় যে উত্তরে যদি বা সংশয় থাকে, প্রশ্নগুলি নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য এবং তা রবীন্দ্রনাথের মন ও চিন্তাধারা ভাল বোঝা যায়। সুকুমার রায়কে যে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন, মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করতেন, তার প্রমাণ প্রশ্নগুলি। তাঁর পরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাস, ছবি আঁকা, পরলোক, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে, সুকুমারের মতামত তিনি জানতে চান এবং সখেদে বলেন, 'তুমি চলে গেলে' তোমাদের অভাব অনুভব করি।' শুধু তাই নয়, সুকুমার রায়ের আত্মা মিডিয়াম মারফৎ পুত্র সত্যজিৎকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রয় দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরোধের সূত্র ধরেই সুপ্রভা রায়কে অনুরোধ করেন পুত্রকে শান্তিনিকেতনে দিতে এবং এই সুবাদেই সত্যজিৎ পরে, ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। রায় পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক তৃতীয় পুরুষে গিয়ে বর্তায়।

তবে একটা ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে, সুকুমার রায়ের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মুখে অনেকের কাছে প্রশংসা করলেও কোন প্রবন্ধ আকারে বা বড় চিঠিতে তার মূল্য নিরূপণ করেন নি। মৃত্যুর বছর খানেক আগে ১৯৪০ সালের জুন মাসে পাগলা দাশু প্রকাশের ভূমিকারূপে একটা ছোট লেখামাত্র পাঠান। তা'ও সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে। এই লেখাতে সুকুমার-সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর মন্তব্য আছে। তিনি লিখেছেন—

"সুকুমারের লেখনি থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যেই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়াছে, কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্যে জড়িত হয়ে রইল।"

সুকুমার অকালে চলে গেলেন, রইলেন শিশুপুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে সুপ্রভা রায়। শোকে সান্ত্বনা পেতে মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের কাছে। সঙ্গে সত্যজিৎ। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র এবং স্নেহভাজন বন্ধু সুকুমারের পুত্র, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও দেখেন স্নেহের দৃষ্টিতেই।

অন্যান্য আরও অনেক কিছুর সঙ্গে পূর্বতন দুই পুরুষের রবীন্দ্রঘরানা নিয়ে বড় হতে থাকেন সত্যজিৎ। শিশু সত্যজিৎ মা ও বাবার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে যান ১৯২১ সালে। তখন সত্যজিতের বয়স মাস চারেক। সেই সময়ই সুপ্রভা রায় রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেকগুলো গান শেখেন। ওঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতিথি।

শান্তিনিকেতনে সত্যজিতের প্রথম সজীব স্মৃতি অবশ্য ১৯২৫ সালের। বয়স তখন চার। 'যখন ছোট ছিলাম' রচনাটিতে তিনি লিখেছেন ঃ এর কিছু পরেই মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। সেবার গিয়ে মাস তিনেক ছিলাম। তখন আমার খেলার সাথী ছিল রথীন্দ্রনাথের পালিতা মেয়ে পুপে। দুজনের বয়স কাছাকাছি, রোজ সকালে পুপে চলে আসত আমাদের ছোট কুটিরে, ঘণ্টাখানেক খেলা করে চলে যেত। তখন শান্তিনিকেতনে চারিদিক খোলা। আশ্রম থেকে দক্ষিণে বেরোলেই সামনে দিগন্ত অবধি ছড়ানো খোয়াই। পূর্ণিমার রাতে খোয়াইতে যেতাম আর মা গলা ছেড়ে গান গাইতেন।

এই স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। তারও বছর তিন চার পর মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার স্মৃতি তিনি বর্ণনা করেছেন অন্য একটা লেখায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অটোগ্রাফ খাতা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পরদিন আসতে বলেন। পরদিন আবার যেতেই অটোগ্রাফ খাতা এগিয়ে দিয়ে বলেন, কবিতা লিখে দিলাম, বড় হলে বুঝবে। অসাধারণ সেই কবিতা, অটোগ্রাফের যৎকিঞ্চিৎ নয়, আজকাল প্রায় সকলেরই মুখে মুখে ফেরে। কবিতাটি হল—বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু—।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিতের আরও দেখা হয়েছে কলকাতায় ও শান্তি-নিকেতনে। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উৎসবের সময় মায়ের সঙ্গে শান্তি-নিকেতন যাওয়ার ধারা বজায় ছিল অনেক দিন। কলকাতায় একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভর্তি হবার কথা বলেন। ভর্তি হলেনও পরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ, আশ্রমের কাজে বিশেষ যুক্ত থাকেতেন না, বেরোতেনও কম। তবে সুকুমার-তনয়ের খোঁজ প্রায়ই নিতেন বলে শুনেছি। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন, সত্যজিতও সেই বছরের শেষ দিকে শান্তিনিকেতন ছাড়লেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতা ও পিতামহের খ্যাতি ছাড়িয়ে আজ বিশ্ববন্দিত। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বাঙালীর সবচেয়ে বড় গর্ব। দেশে এবং বিদেশে এত সম্মান রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ পান নি। রবীন্দ্রনাথের মতই বিদেশে বেশি সম্মান পাওয়াতেই যেন স্বদেশে তাঁর খ্যাতি বাড়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে একবার ডেকেছিল রবীন্দ্রনাথকে, আর বার ডাকে একমাত্র সত্যজিৎ রায়কে। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের কীর্তির পর তৃতীয় পুরুষ

রবীন্দ্রনাথে এসে যেমন জোড়াসাঁকো বাড়ির জয়জয়কার ; ঠিক তেমনি উপেন্দ্র-কিশোর ও সুকুমারের প্রতিভার ধারায় সম্পদশালী তৃতীয় পুরুষ সত্যজিতে বৃহত্তর গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, মসুয়ার রায় পরিবারের পতাকা আরও উঁচে উঠেছে।

তিনি আজ আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর গল্প ও গোয়েন্দা-কাহিনী তুলনাহীন। ছড়ার হাত দুর্দান্ত। ছবি আঁকায় ওস্তাদ। ইংরেজি বাংলা দুটি ভাষাতেই আশ্চর্য দখল। গান গাইতে পারেন, লিখতে পারেন, সুর দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পর এত বড় কম্পোজার বাংলাদেশে আর জন্মাননি। এই সব সৃষ্টির পিছনেও কাজ করেছে রবীন্দ্রঘরানা। এই ঘরানার অর্থ রুচি সূক্ষ্ম রসবোধ নিষ্ঠা পরিশ্রম শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা। সংগীত সাহিত্য মুদ্রণ অঙ্কন আলোকচিত্রগ্রহণ ইত্যাদি বিদ্যা পরিবারের মধ্যে ছিল বলেই সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে যুগান্তর আনতে পেরেছেন। এই সকল পারিবারিক বিদ্যার বিকাশে এবং নবনবোন্মেশালিনী নিজ প্রতিভায় শিল্পের এই বাহনটিকে তিনি কলালক্ষ্মীর মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চলচ্চিত্রে তিনি রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গল্প—চারুলতা সমাপ্তি মণিহার পোস্ট মাস্টার। ঘরে বাইরে তাঁর মাথায় ঘুরছে দীর্ঘকাল। রবীন্দ্র-জন্ম-বার্ষিকীর সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের ভারও পড়েছিল তাঁর উপর। রবীন্দ্রনাথের নামে ডাকটিকিট যখন বেরোয়, তার ডিজাইনও করে দেন সত্যজিৎ রায়। বিশ্বভারতীর আরও অনেক কাজে আছে তাঁর হাত। এ দায় নিজের, এ দায় তিন পুরুষের। বিশ্বভারতীও তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে নিজেই সম্মানিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রপ্রতিম প্রিয় শিষ্য সুকুমার রায়ের পুত্রের কীর্তি দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তারাকুমার ঘোষদুড়িকে লেখা এক চিঠিতে তিনি শিল্পের বাহন হিসেবে চলচ্চিত্রের আলোচনা করেছিলেন। তাতে চলচ্চিত্র সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে বলে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি একজন প্রতিভাধর সৃষ্টিকর্তার জন্যে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই ইঙ্গিত যে সত্যজিতের শিল্পকীর্তির সঙ্গে মিলে যাবে, সে কথা তখন কেউ ভাবেন নি। মনে হয় যেন ভবিষ্যতের সত্যজিৎ রায়ের কথা ভেবেই সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে লিখেছেন—

উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনও তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা কলাতন্ত্রেও চাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা কলাবিদ্যার লক্ষ্য—নইলে তার আত্মমর্যাদার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে, তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব

থেকে উদ্ধার করতে পারে নি। করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সংগীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়। ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত, যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষায় মাথার ওপরে আর একটা ভাষা কেবল চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয়, তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনাবাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে, তেমনি রূপের চলৎ প্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মোচিত হবে না। হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়। তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।'

চিঠিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে 'রূপকারের' কথা তিনি বলেছেন—যিনি "আপন প্রতিভার" বলে চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেন সেই প্রতিভাধর রূপকার সত্যজিতের শিল্পকর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হ'ত আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে; তিনি দেখতে পেতেন 'রূপের চলৎপ্রবাহ' কী সুন্দর একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হয়েছে প্রকৃত একজন 'সৃষ্টিকর্তার' শিল্পনৈপুণ্যে।

রায় পরিবারের সত্যজিৎ আজ ষাটোত্তীর্ণ, খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে। ময়মনসিংহের মসুয়া থেকে বিশপ লেফ্রয় রোড আজ অনেক দূর। গড়পার থেকেও। কিন্তু যোগসূত্র হিসাবে আছে পিতৃপিতামহ-পিতৃব্য-পিতৃষ্বসাদের প্রতিভার ধারাবাহিকতা, আজ পারিবারিক নানা বিদ্যার চর্চা এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রভাবনা। চতুর্থ পুরুষ সন্দীপও পিতার পথ ধরে নেমেছেন চলচ্চিত্র-নির্মাণে। পারিবারিক বিদ্যাচর্চায় তিনিও উৎসাহী। তবে তাঁর সত্তার গভীরে রবীন্দ্রনাথ আছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর নামের মধ্যে জড়িয়ে আছে পিতার প্রিয় রবীন্দ্রউপন্যাস ঘরে বাইরের নায়কের সেই বিখ্যাত নাম—যেমন তাঁর পিতামহ সুকুমার রায় ও পিতামহের দিদি সুখলতা রাওয়ের ডাক নাম তাতা ও হাসি-র মধ্যে থেকে গেছে রবীন্দ্রনাথের আদি উপন্যাস রাজর্ষির দুটি চরিত্র।

নদী বহে চলে।

বাতিল খাতায় রবীন্দ্রনাথ

এক

ঘুরে ফিরে কালিম্পং ও মংপু। সতের বার বিদেশঘোরা রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কিছুদিন বারবার গিয়েছেন হিমালয়ের গায়ে এই দুটি জায়গাতে। পুবে। বারো বছর বয়সে কলকাতার বাইরে সর্বপ্রথম গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে সেই হিমালয়েই। পশ্চিমে। ভ্রমণসুখী রবীন্দ্রনাথের জীবন সূচনা ও সমাপ্তিতে হিমালয়ের সূত্রেই বাঁধা।

মংপুতে থাকতেন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। কালিম্পং গৌরীপুর লজে। তাঁর শেষ সফর শুরু ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ২৫ সেপ্টেম্বর হলেন গুরুতর অসুস্থ। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ২৯ সেপ্টেম্বর ফিরে এলেন কলকাতায়। সেই যে শয্যা নিলেন, আর ভালভাবে সুস্থ হলেন না। ১৯ নবেম্বর শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। পরের বছর ২৫ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে চিরবিদায় এবং ৭ আগস্ট কলকাতায় মহানির্বাণ।

এই শেষ সফরের ঠিক আগে ১৯৪০ সালের ২০ এপ্রিল কলকাতা থেকে কালিম্পং যাত্রা করেন। সঙ্গে সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। যাবার আগে রোগশয্যায় শয়ান পুত্রপ্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেষদেখা দেখে যান। গোড়ায় গেলেন মংপু। সেখানে সতের দিন থেকে ৭ মে কালিম্পং। কলকাতায় ফিরে আসেন ২৯ জুন।

সঙ্গী-সচিবরা অন্যান্য কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের হিসেব রাখতেন বরাবর। কার কার কাছে কী চিঠি লেখা হল, সেই বাবদ কত খরচ হল, তার হিসেব থাকত কারেসপণ্ডেন্স একাউণ্ট বুক নামে খাতায়। যে সব চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তার নকলও থাকত ওই খাতায়। রাশিয়ার চিঠির পুরো নকল আছে সেই সময়ের সচিব ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর হাতের লেখায়। আজ সেই খাতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কবির জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ায়। তাছাড়া এমন অনেক চিঠি আছে যা প্রাপকদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে সচিবদের নকল করা চিঠিগুলোর দাম বেড়ে গেছে। সে যত ক্ষুদ্র হোক, যত তুচ্ছ হোক, রবীন্দ্রনাথের চিঠি বলে উপেক্ষা করার নয়।

মংপু এবং কালিম্পং থাকাকালীন ২৩ এপ্রিল ও ১২ জুন অবধি মোট ৫১ দিনের চিঠিপত্রের হিসেব আছে বাতিল হয়ে যাওয়া দুটি খাতায়। সঙ্গী-সচিব

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী অতি যত্নে লিখে রেখেছেন কত তারিখে কার কাছে কোন ঠিকানায় চিঠি বা টেলিগ্রাম রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছেন। কিছু চিঠির নকলও আছে সুধাকান্তবাবুর হাতের লেখায়। এই চিঠির মধ্যে বেশ কয়েকটি পূর্বে প্রকাশিত। যেমন প্রশান্ত মহলানবিশ, রাণী মহলানবিশ, মৈত্রেয়ী দেবী, সুভাষচন্দ্র বসু, সজনীকান্ত দাস, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, অমিয় চক্রবর্তী ও শান্তিদেব ঘোষকে লেখা। বেশ কিছু কবিতাও নকল করা আছে, যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত।

কিন্তু এহো বাহ্য। এই প্রকাশ-অপ্রকাশের মাঝখানে বাতিল খাতার নানা চিঠির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। সে ছবি বড় করুণ, বড় বিষণ্ণ। ১৯৪০ সালটা তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্বৎসরও বটে। পর পর কয়েকজন ঘনিষ্ঠের মৃত্যু তাঁকেও বুঝিবা দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। জীবনের প্রারম্ভে এবং মধ্যভাগে মায়ের পরই গেলেন নতুন বৌঠান। গেলেন রেণুকা মৃণালিনী শমীন্দ্রনাথ মাধুরীলতা—একের পর এক শোকের আঘাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সব শোক সামলে নিয়েছেন আশ্চর্য সংযমে, বলেছেন 'আরো আঘাত সইবে আমার।'

কিন্তু ১৯০২ সাল আর ১৯৪০ সাল এক নয়। আঘাত সহ্য করতে পারল না অপটু শরীর। যাঁদের তিনি ভালবাসেন, যাঁদের সঙ্গে তিনি কর্মসূত্রে বাঁধা, সেই সব আপনজনের মধ্যে সে বছর সর্বপ্রথম বিদায় নেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। ১৯৪০ সালের ৫ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ হারালেন তাঁর বন্ধুকে, তাঁর ভক্তকে। এণ্ডরুজের মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি গান—

> প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে
> তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
> দিই নি তাহারে আসন।
> বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে'
> সে তখন স্বপ্নকায়াবিহীন
> নিশীথতিমিরে বিলীন—
> দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা।

এণ্ডরুজের মৃত্যুশোক কাটতে না কাটতেই এল আরও সাংঘাতিক আঘাত। ৩ মে মারা গেলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। খবরটা গেল মংপুতে। তাঁর জন্মদিন উৎসবের প্রস্তুতি মাঝখানে। রবীন্দ্রনাথ পেলেন পুত্রশোক—যদিও এই সংবাদের জন্যে মনে মনে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সেদিনই তিনি ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লেখেন—তোরা বোধহয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছে করেছি বার বার, বিরুদ্ধভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধহয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে।

এমনভাবে শোকের ভার সামলাতে না পেরে মৃত্যু কামনা রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর কখনও করেননি। এই মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর হেমলতা দেবী সম্পাদিত বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা লেখেন—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস
জীবনের স্বর্গীয় অমৃত।

তারপরই এল আর একটি দুঃসংবাদ। শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কবির স্নেহভাজন কালীমোহন ঘোষ পরলোক গমন করেছেন। খবরটা কালিম্পঙে কবির কাছে এল ১২ মে। শান্তিদেব ঘোষকে সান্ত্বনা দিয়ে তৎক্ষণাৎ এক চিঠিতে লিখলেন—কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

কিন্তু কে কাকে দেবে সান্ত্বনা, রবীন্দ্রনাথ এই সব আত্মীয় বিয়োগে অস্থির হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশনার অন্যতম প্রধান পুরুষ কিশোরীমোহন সাঁতরা। তিনি মারা গেলেন সেই বছর ২০ অক্টোবর। ১৯৪০ সালের ২৪ মে মাসে আর একটি মৃত্যু সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তোলে। খুকু ডাকনামের অমিতা সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গায়িকা। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয় সেই বিখ্যাত গান—'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে'। এই খুকুর অকাল মৃত্যু হল সেই দুর্বৎসরে। অবিনাশচন্দ্র সেনকে ঢাকায় লেখা এক চিঠি আছে বাতিল খাতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'খুকুকে যথেষ্ট স্নেহ করতুম কিন্তু তাকে দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি।'

কারেসপণ্ডেন্স বুক নামধারী যে-দুটি বাতিল খাতার কথা লিখছি, তাতে দেখা যায় এই সব শোক সংবাদ অনবরত ছায়া ফেলেছে কবির শেষ জীবনের এই মংপু-কালিম্পং সফরে। চরম অশান্তির মধ্যে দিন কেটেছে। বিশেষ করে সুরেন ঠাকুরের মৃত্যুতে তাঁর মনের দুরবস্থার কথা সুভাষচন্দ্র বসু, অমল হোম প্রমুখ অন্য অনেককে লেখা চিঠিতে প্রকাশ করেছেন।

এই অশান্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃসংবাদ। একে তো যুদ্ধে লোকক্ষয়ের জন্য তিনি ছিলেন বিরক্ত, তার উপর হিটলারের প্রাথমিক বিজয় সংবাদ তাঁকে অস্থির করে তোলে। অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্য দু-একজনকে লেখা চিঠিতে তার মনের যন্ত্রণার কথা বার বার বলেছেন. কবিতায় লিখেছেন 'রক্তমাখা দন্তপঙক্তি হিংস্র সংগ্রামের।'

এই মানসিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, হয়ত আমেরিকা কিছু শান্তি দিতে পারবে। কারণ তখনও সে ওই যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। কালিম্পং থেকে ১৫ জুন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক টেলিগ্রাম পাঠান—

Today we stand in awe before the fe arfully destructive force that has so suddenly swept the world. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India so utterly indequate to stem, in the least, the tide of evil that has menaced the permanence of civilization. All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not said her mission to stand against the universal disaster that appears so imminent.

রাণী মহলানবিশকে যে চিঠি লেখেন ওই সময়ে তাতেও একই বেদনা ফুটে উঠেছে, বলছেন, 'কিছুকাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে, তার কারণ বোধহয় দূরের দুর্যোগ আমার মনের মধ্যে কুয়াশা জমিয়ে রেখেছে।' এই দুর্যোগ কবিকে মনের দিক থেকে অবসন্ন করে রাখে। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে বাংলাদেশের ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। সারা জীবন স্বদেশ-সাধনায় নিজেকে যুক্ত রাখার পর শেষ জীবনে এসে তিনি হাল ছেড়ে দেন। যিনি শেষ ভাষণেও বলতে পারেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সেই রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বাঙালীর কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রতি যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন এবং সুভাষকে দেশনায়ক আখ্যা দেন। তবে তার খানিক পরে কবির একটি বিবৃতি সুভাষপন্থীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাঁদের অনুমান, কবির আক্রমণের লক্ষ্য তাঁরাই। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে কালিম্পং যাত্রার প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে বলেন—

'এই আমাদের দেশ, এদেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মতো আমরা আবদারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটাই হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ো। নিজেরা করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না। ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভাল আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না। ...এ আমাদের

আলটালপি। নইলে যে সুযোগ বাঙালী পেয়েছিল তেমন সুযোগ জাতির জীবনে ক্বচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোন কাজে লেগেছে। যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এত দিনে অর্জন করা উচিত। ছিল। দুঃখের বিষয় তা হয় নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি বহু বছর আগেকার, কিন্তু তার মূল কথা আজও কত সত্য। তবে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বাতিল খাতায় নকল করা অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতেও। তিনি বলছেন—"সেই পতাকার বাহন কারা তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁতখুঁতে ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালী নয় ; তবু বাঙালীও হয়ত সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিন্তু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালী প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওর মনের মধ্যে উইয়ের বাসা তৈরি জিনিসকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সবচেয়ে যে সুর অকৃত্রিম, সে হচ্ছে দুয়ো দেবার সুর।" কালিম্পং থেকে সুভাষচন্দ্রকেও প্রায় একই সুরে লিখছেন—'স্বদেশীসমাজের ছাঁচে বাংলাকে গড়ে তুলে তার অসম্মান ও ক্ষতবেদনা দূর করার ইচ্ছা আমার মনে ছিল কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, প্রত্যহ অনুভব করছি আমার জীবনীশক্তির খর্বতা।"

জীবনীশক্তির এই খর্বতার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই বার্ধক্য, দেহের অপটুতা ; কিন্তু তাঁর শরীরের যা গড়ন তাতে আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল না। আমার অনুমান আগেই বলেছি। মৃত্যুর আগের বছর মে ও জুন মাসের কিছু ঘটনায় তাঁর শরীর ও মনের উপর এমন চাপ পড়ে যে মৃত্যু নিকটতর হয়। দুঃখ সহার যে তপস্যা যিনি সারাজীবন করেছেন, যিনি ভয় নাই ওরে ভয় নাই বলে আশার বাণী শুনিয়ে এসেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ যেন নৈরাশ্যের ভারে পীড়িত। সেই সময়ে লেখা চিঠি ও কবিতা এক সঙ্গে মেলালে ওই ছবিই ফুটে ওঠে। মে ও জুন মাসের বাতিল খাতা দুটিতে তাই ছড়িয়ে আছে দীর্ঘশ্বাস, জড়িয়ে আছে শোক দুর্যোগ হতাশা।

এই খাতা দুটির পাতায় আরও অনেক রত্ন লুকোনো আছে। ক্যামব্রিজের অধ্যাপককে লেখা এক চিঠিতে বলছেন এলিয়টের কাব্য কী ভাবে তাঁর মনকে আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথ যে চিঠির ভাষাতে কত কঠিন হতে পারেন, তার প্রমাণ হেমলতা দেবীকে লেখা জবাবে। ক্রোধের প্রকাশ ছত্রে ছত্রে। এমন চিঠি তাঁর আর নেই। বিরক্ত হয়ে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের ঘটনায় বিকৃতি ঘটাবেন আত্মীয়রা। সুকুমার রায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র। পাগলা দাশু প্রকাশের সময় সুপ্রভা রায় একটি লেখা চান ভূমিকার জন্যে। কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কাঁপা কাঁপা

হয়তের লেখায় তা পাঠান। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তারিখ বাইশে শ্রাবণের ঠিক আগের বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ পান জীবনের শেষ সম্মান। ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে লেখা একটি চিঠিতে অক্সফোর্ড থেকে ডিলিট দেওয়ার ওই তারিখ ঠিক করেছেন তিনিই। জাপানী কবি নোগুচি মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া ডঃ রঘুবীর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে লেখা চিঠিও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীকে কী টেলিগ্রাম করেছিলেন তা অবশ্য খাতায় লেখা হয় নি।

খাতার হিসাব ও নকল থেকে দেখা যায় একাশি দিনে রবীন্দ্রনাথ অন্তত চারশ চিঠির জবাব দিয়েছেন। তার মধ্যে কেউ পান আশীর্বাদপত্র কেউ কবিতা, কেউ সামান্য একখানা চিঠি, কেউ জন্মদিনের আশীর্বাদ। তাছাড়া বই মধু বা আনারস পাঠানোর প্রাপ্তিসংবাদও দিতে হয়, নানা রকম প্রশ্নের উত্তরে। যাঁদের চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের নামের মোটামুটি একটা তালিকা পাওয়া যায় খাতা দুটি থেকে। সাংহাইয়ের চান্দ-ই লেন, দিনেমার মিশনের রেভারেন্ড এইচ ব্যের রাম, ডঃ মারিয়া মন্তেসরি, স্যার ষণ্মুখম চেট্টি (পরবর্তীকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, কাননবিহারী মুখার্জি, চিত্রপরিচালক মধু বসু, সাগরময় ঘোষ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শান্তিদেব ঘোষ (টেলিগ্রাম), পুলিনবিহারী সেন, সুধীরচন্দ্র কর, মমতা দেবী (জগদানন্দ রায়ের নাতনি), ডঃ ডি এম বোস, মালতী শ্যাম (শিলচর), উদ্বোধনের স্বামী আত্মবোধানন্দ, মিসেস এস এন টেগোর (সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে তাঁর পত্নীকে), সুধীর সেন, সুকুমার চ্যাটার্জি (শ্রীনিকেতন), ডঃ ডি এম সেন, অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, আমিরচাঁদ খান্না, হেমলতা ঠাকুর, বলাইচাঁদ মুখার্জি (বনফুল), সবিতা দেবী (জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি), মহাদেব দেশাই (ওয়ার্ধায় টেলিগ্রাম), অজিত সিংহ মোরারজি খাটাউ (পৌত্রী নন্দিনীর প্রথম স্বামী), অমিতা ঠাকুর (নাতবৌ), মিস ক্রিশ্চনা বসনেক, সুরেন্দনাথ কর, নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কবির শ্যালক), সুধীরচন্দ্র কর, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গৌরগোপাল ঘোষ, পূর্ণিমা রায়চৌধুরী (কবির শ্যালক কন্যা), হৈমন্তী দেবী (অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী), জগদীশ ভট্টাচার্য, নাটোরের মহারাজ কুমার জয়ন্তনাথ রায়, মিস মার্জরি সাইকস, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু), সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, গুরুদয়াল মল্লিক, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, লেনার্ড এলমহার্স্ট, বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী (পতিসর জমিদারির ম্যানেজার), নরেশনাথ মুখার্জি (প্রাক্তন মেয়র); বুলা মহলানবিশ, দেবিকা রাণী (টেলিগ্রাম), প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীনিকেতন), অশোক সেন (আকাশবাণী), নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, পিণাকিন ত্রিবেদী, দেবজ্যোতি বর্মণ, রণজিৎ গুণ, ডঃ আনা সেলিগ (নিউ ইয়র্ক), দিলীপকুমার রায়, হেমচন্দ্র দত্ত (শিলচর), শৈলজারঞ্জন

মজুমদার, বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী (সেতারী), কৃষ্ণ কৃপালনী, বিশু মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, লীলা নাগ, অমূল্যকুমার সেন, প্রতিমা ঠাকুর, অনিল চন্দ, হিরণ সান্যাল, লাবণ্যরেখা চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রফুল্লনলিনী দেবী, তান য়ুন শান, ডাঃ ডি এন মৈত্র, মেয়র এ আর সিদ্দিকি, অন্নদা মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, রামানন্দ চ্যাটার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেক খ্যাত অখ্যাত লোক।

এদের সকলের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা এমন কিছু চিঠি হয়ত আছে, যা আজও অপ্রকাশিত। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন এই সূত্র থেকে পত্র সংগ্রহের চেষ্টাও করতে পারেন। তবে কিছু চিঠির উত্তর কবির সচিবের লেখা।

কয়েকটি নাম-ঠিকানার সঙ্গে কী উত্তর দেওয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসারও লিখে রাখা হয়েছে। যেমন পণ্ডিচেরিতে দিলীপকুমার রায়ের ঠিকানার পাশে লেখা আছে—"পূজনীয় কবির শরীর দুর্বল, মনও ভাল নেই।" হেমন্তবালা দেবীর পুত্র বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে উত্তর—'পূজনীয় কবি ভাল আছেন, তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।" জনৈকা আশারাণী দেবীকে (পি-৪৪৪ সাদার্ন এভিনিউ কলকাতা) কবির সচিব লিখেছেন—"আশীর্বাদিপত্র পাঠানো হইল, অন্য বিষয়ে পত্রোত্তর দেওয়া তাঁহার ক্লান্ত শরীরে সম্ভব নয়।" সমসেরনগরের (সিলেট) যতীন্দ্রনাথ গুণকে ধন্যবাদ পাঠানো হয় আনারসের জন্য।

৮বি দীনবন্ধু লেন থেকে ১৩৪৭ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ বিশু মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথকে : গুরুদেব, বহুদিনের সাধ আপনার কাছ থেকে একটা বড় চিঠি পাই, কিন্তু সে-সাধ আমার আজও পূরণ হয় নি, হয়ত এ জীবনে কোন দিন হবেও না। —এই কটি বাক্যে শুরু করে তিনি তাঁর সম্পাদিত 'সাহানা' মাসিকের জন্যে "কয়েক লাইন কবিতা চাইবার দুঃসাহস" তাঁর নেই বলে "বাংলাদেশে কাগজ চালানো সম্পর্কে কিছু উপদেশ" প্রার্থনা করেন। বিশু মুখোপাধ্যায়ের নামের পাশে লেখা আছে—"গুরুদেবের কবিতা 'অসময় সাহানা'-র জন্য আজ পাঠানো গেল।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন তাঁর বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। অসুস্থ থাকায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। কবির সচিব জানান : আপনার প্রেরিত কর-নীতি ১ম ও ২য় খণ্ড ও টাকার কথা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন, তিনি আপনার বইয়ের প্রশংসা বরাবরই করেন। কাজেই বই দুটি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁর শরীর দুর্বল এবং চক্ষের পীড়া বর্তমান থাকায় তিনি বই দুটি কোনো অবসর সময় সুস্থ হইলে পড়িতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। এখন তাঁহার পক্ষে পড়া দুঃসাধ্য বলিয়া তিনি দুঃখিত। তাঁহার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আলিপুর জজ কোর্টের উকিল দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌহাটি উজানবাজারের বনমালী বর্মণ প্রভৃতি নানা জনের পাঠানো বই সম্পর্কে একই ধরনের উত্তর দেওয়া হয়। বিমল ঘোষ (মৌমাছি), আনন্দ-মেলার জন্যে লেখা চাইলে তাঁকে জানানো হয়—গুরুদেবের শরীর ভাল নেই। এখন তাঁর পক্ষে কোন লেখা দেওয়া অসম্ভব।

১৯৪০ সালের ৬ মে কাঠমাণ্ডু থেকে জনৈক শিবনারায়ণ সেনের রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটা চিঠিও এই বাতিল খাতায় পাওয়া গেল। পত্রলেখকের বক্তব্য —"অমিয়দার (চক্রবর্তী) নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে চিঠি লিখিতেছি। আপনি হয়ত অবগত আছেন যে আমি কবিকে নেপালের মহারাজার জীবনীর ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অমিয়দাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা এই প্রকারে মহারাজকে কবির কাছে তথা বিশ্বভারতীতে সহানুভূতিসম্পন্ন করানো। সম্প্রতি মংপু হইতে চিঠি পাইলাম কবির ভূমিকা লিখিয়া দিতে আপত্তি নাই, তবে আপাতত শরীর দুর্বল।" এই চিঠির উত্তর দেন কবির সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তিনি জানান—ভূমিকা লেখা বিষয়ে পূজনীয় গুরুদেবের আপত্তির কোন কারণ নাই। তবে আপনার সহিত সাক্ষাতে তাঁহার আলাপ প্রয়োজন। আপনার প্রস্তাব মত শান্তিনিকেতনে আপনি আসিয়া দেখা করিবেন আপনার সুযোগসুবিধামত।

রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা বই। সম্ভবত বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ। এই চিঠিতে দেশের 'মেকি কমরেডদের' তিনি কটাক্ষ করেন এবং বলেন, "ব্যক্তিবিশেষের যে মতই থাক, বিশ্বভারতী তো বলশেভিক নীতি বা অন্য কোন অর্থনৈতিক মত অবলম্বন করে সমাজবিপ্লব সমর্থন করতেই পারে না।" রাশিয়ার চিঠির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলির কত তফাৎ। তবে আমরা অনেকেই রাশিয়ার চিঠির একাংশের বক্তব্য নিয়েই মাতামাতি করি, অন্য অংশে যে সমালোচনা আছে তা কদাচিৎ উল্লেখ করি।

তাছাড়া অন্য একটা ফাইলে পাওয়া যায় ১৯৩২ সালের কয়েকটি আকর্ষক চিঠি। বি এম বিড়লার, গিরিজাশঙ্কর বাজপাইয়ের, ভিণ্টারনিৎসের, সি এফ এণ্ডরুজের, জুলিয়াস জার্মানাসের। ১৯০৯ সালের জমিদারি-সংক্রান্ত একটা দলিলও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে তাঁর অংশের পরিচালন দায়িত্ব ওই দলিলে দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রকাশককে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব চিঠি দলিল ইত্যাদি থেকে সেই সময়কার রবীন্দ্রনাথের ছবি স্পষ্ট হয়।

দুই

রবীন্দ্রনাথ সংযমী পুরুষ। তাঁর ক্রোধ তাঁর শোক আড়ালে থাকত। কদাচিৎ তা প্রকাশ পেত আচরণে। চিঠিতে ক্রোধের প্রকাশও নেই বললেই চলে। কিন্তু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবীকে লেখা একটি চিঠি পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বিশেষ একটি কারণে। পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও নামী একজনকে চিঠির ভাষায় আঘাত করার দৃষ্টান্ত আর নেই বললেই চলে।

জোড়াসাঁকো থেকে ৫-৫-৪০ তারিখে হেমলতা ঠাকুর তাঁর পূজনীয় কাকা-মশাইকে লেখেন ঃ আপনার সম্বন্ধে একটা ছোট্ট চিত্র মনে জেগে আছে, লিখতে চাই। 'রবীন্দ্রনাথের অভিমান।' দিদি বলেন, বেলফুলের মত আঁতুড়ঘর আলো-করা খোকা হলি তুই, মা তোকে সরষের তেল মাখিয়ে রোদে দিয়ে দিয়ে কালো করে ফেললেন। মায়ের উপর এই অভিমান বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনে আজও জেগে ওঠে মায়ের গল্প করতে বসে। এইটুকু মূল কথা। আমি একে খুব সুন্দর করে লিখছি। অনুমতি পেলে তা ছাপাব।

চিঠিটা পেয়েই রবীন্দ্রনাথ চটে যান। মংপু থেকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় জবাব দেন—এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! কাগজে নিজের লেখা বের করবার উগ্র উৎসাহে ঠাট্টা বোঝবার ক্ষমতাও তোমার লোপ পেয়েছে। প্রথমত মা আমাকে তেল মাখিয়ে কালো করে দিয়েছেন, একথা আমি যথার্থভাবে বিশ্বাসই করিনে। দ্বিতীয়ত তুমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানবচরিত্রে প্রবেশ করে নিজের বিচারের ছবি তার মধ্যে চালিয়ে দাও যদি, তাহলে তোমার এই সর্দারি যে মারাত্মক হয়ে উঠবে। অল্প কিছুদিন আগেই কোনো আলাপে এই বিপদের কথাই হচ্ছিল। একজন বলছিলেন বাইরের লোকেদের দ্বারা আমার জীবনের বিকৃতি তত বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হবে না, যেমন হবে আত্মীয়দের দ্বারা। এখন দেখছি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া, চিঠিপত্র লেখা আমার পক্ষে আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠল। তেল মাখানো নিয়ে মায়ের উপর অভিমান করে আছি, এত বড় হাস্যকর কথা তাদের পক্ষেই গম্ভীরভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব যাদের মাথায় হাস্যরসের বোধ নেই। আমার বিপদ এই, সকলের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করা আমার স্বভাবসিদ্ধ। ইতি ৬-৪-৪০। কাকামশাই।

ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের সূচনায় রবীন্দ্র-নাথের মতামত ছাপা আছে। এই বাতিল খাতায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটা লিখেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। তাতেই সুকুমার সেন মশাইকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। তবে সে চিঠির শেষাংশে যা ছিল তা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছাপা হয় নি, এবং পত্র প্রাপক সুনীতবাবু ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এযাবৎ অপ্রকাশিত সেই অংশটুকু হল—

'এই উপলক্ষে একটা কথা বলে রাখি। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ আমার রচিত অনেক গানের সুর বসিয়েছেন— কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। এই মিথ্যা জনশ্রুতি ইতিপূর্বে অন্যত্র ছাপার অক্ষরে দেখেছি। মুখে মুখেও অনেকে চালনা করেন।

অমিয় বলেছিলেন, আমার সঙ্গে 'সায়ামে' ভ্রমণকালে তোমার খাতায় যে সকল তন্ন তন্ন বিবরণ জমিয়েছ, তা প্রচুর এবং প্রকাশযোগ্য। এগুলি হাতের অক্ষরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত না থাকাই শ্রেয় মনে করি। ইতি ৪-৫-৪০।'

রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধের পরেই প্রকাশিত হয় সুনীতিবাবুর দ্বীপময় ভারত।

ওই সময়ই রবীন্দ্রনাথের সানাই ছাপা হচ্ছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা দু-একখানা চিঠিতে নিজের বই ছাপা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ 'আষাঢ় মাসের পূর্বে সানাই প্রকাশিত না হওয়াই ভাল। তার প্রথম ফর্মায় বেশ ভালরকম ভুল রয়ে গেছে। যদি প্রতিকার সম্ভব হয় কোরো। সানাইয়ের অনেক কবিতাই বর্ষার গান। এই জন্যে বর্ষামঙ্গলের কাছাকাছি তার প্রকাশ সঙ্গত, চাই কি শ্রাবণ মাসে। ইতি ৬-৫-৪০'। আর একখানা চিঠি: 'তৃতীয় ভাগ রচনাবলী পাওয়া গেল। দেখলুম 'গোড়ায় গলদ' বের হয়েছে প্রথম বারকার পাঠের অনুসরণ করে। শেষরক্ষায় ওটাকে মার্জিত করেছিলুম। আমার মতে তাতে হাস্যরস অনেক বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। তার সম্বন্ধে কী বিচার? যদি কোনো পরিশিষ্টে খাপছাড়াভাবে এখানটা ওখানটা তুলে দাও তাহলে শেষরক্ষাই হবে না, সমগ্রতা থেকে বিচ্যুত হলে ওর রস যাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে। ইতি ৬-৫-৪০।'

শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ আচার্য ব্রজেন শীলের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথের ডাকে সব ছেড়েছুঁড়ে শান্তিনিকেতন চলে আসেন, তারপর ওখানেই বাস। তাঁকে লেখা একখানা চিঠির নকলও বাতিল খাতায় পাওয়া গেল—

'তনয়, জন্মদিনের অভিনন্দনের পত্রবর্ষণের প্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি। চারিদিক অত্যুক্তি-তরঙ্গিত, শুনতে শুনতে হয়তো নিজেকে অসাধারণ বলে ভ্রম হতে পারে। একেই বলা যেতে পারে দশচক্রে অদ্ভুত রবি ঠাকুর। কাল আমার স্থান পরিবর্তন হয়েছে। মংপু থেকে এসেছি কালিম্পঙে। শিশুবিভাগের উপহার তাই বৃদ্ধ-শিশুর হাতে পৌঁছতে দুই একদিন বিলম্ব হতে পারে। পেয়েছি বলেই ধরে নিলুম। আমার আশীর্বাদ তাদের কাছে পৌঁছতে ডাকঘরের মধ্যস্থতার অপেক্ষা করবে না। আর গৌরীর কথা বলবার দরকার নেই। তাতে আমাতে বোঝাপড়া আছে, নীরবেই কাজ চলবে। ইতি ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৭।'

গৌরী নন্দলাল বসুর কন্যা। তনয়েন্দ্রনাথের কন্যা নিবেদিতার সঙ্গে বিবাহ হয় নন্দলালের পুত্র বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে।

এই সময়েই অক্সফোর্ড থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডি লিট উপাধি দেওয়া স্থির হয়। তারিখ ঠিক হয় ১৩৪৭ সালের বাইশে শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট। তাঁর পরের বছর ওই দিনটিতেই তাঁর মহাপ্রয়াণ। অসুস্থ বলে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে যেতে পারেন নি। অক্সফোর্ডই আসে বিশ্বভারতীতে। শান্তিনিকেতন সিংহসদনে অক্সফোর্ডের প্রতিনিধি হয়ে আসেন স্যার মরিস গয়ার। আর আসেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। স্যার মরিস তাঁর স্বাগত ভাষণ দেন লাতিনে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর ভাষণ দেন সংস্কৃতে।

রাধাকৃষ্ণণ তখন দার্জিলিঙে। ২৭ মে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তারিখ ধার্য করে এক চিঠিতে লেখেন—

My dear Radhakrishnan,

I have heard from Sir Maurice and since both of you want me to fix the date, I should like to decide upon August 7th at Santiniketan, I hope that will be quite suitable. I am resting here and doing some writing work—this place is quiet and beautiful. But all this incredible suffering in Europe—there is little that we can do from this distance. With my friendly regards.

ঠিক তখনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের অগ্রগতি হচ্ছে, লোকক্ষয় হচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথ দূরে থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখনকার প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতেই তাঁর মনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে।

এই সময়েই আর একটি পারিবারিক অঘটন রবীন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ করে তোলে। তখনকার অনেক চিঠিতেই সেই বিষণ্ণতার ছাপ আছে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তখনই মারা যান। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি লিখছেন—

'যানবাহনের আকস্মিক অপঘাতে তোমার পথ রোধ করে দিলে। মানুষের শরীর-যন্ত্রেরও এই দশা ঘটে। সুরেনের মৃত্যু কিছুতেই ভুলতে পারি নে। কিছুদিন পূর্বেই তার সৌজন্যমণ্ডিত সৌম্যমূর্তি দেখেছি, সেই তার মধুর চরিত্রের হঠাৎ অবসানে প্রকৃতির নির্মম উপেক্ষা যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়ে দেয়, সাধারণ কোনো মৃত্যুতে করে না। আমি তো এসেছি আয়ুর শেষ ঢালু তটসীমার উপরে, একটা সামান্য ধাক্কায় অতলে অকস্মাৎ পড়ে যাব যেমন একদিন পড়েছিলুম। এ অবস্থায় স্বজন পরিজনের দৃষ্টিগোচরে না থাকলে হঠাৎ কখন এক সময় তাদের পরিতাপের কারণ ঘটতে পারে বলা যায় না। যে-জীবন আশি বছর বয়সের জীর্ণ আশ্রয়কে অবলম্বন করে আছে তার সদ্য-পাতিত্ব তোমার গাড়ির ভঙ্গুরতার মতো অত বেশি অচিন্তিত নয়। আমার খুচরো জিনিসপত্র পাঠাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না। যথা সময়ে তার ব্যবস্থা অনায়াসে হতে পারবে। আপাতত কুমারসম্ভব যদি ডাকে পাঠাও তাহলে একটা দায়িত্ব থেকে রক্ষা পাব।

ও বইটা সমালোচনার জন্য তাগিদ আছে। ইতি ২৮-৫-৪০।' পুনঃ। সেনেদের বাড়িতে শনিবারের চিঠির উৎপতনের কথা সুধাকান্তবাবু কিছুই জানেন না।

এ পি এবং ইউ পি—তখনকার নামকরা দুই নিউজ এজেন্সি। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি ওই এজেন্সির মারফৎ দেশবাসীর কাছে শোকবার্তা পাঠান ৬ মে। ক্ষিতীশ রায়ের হাতের লেখায় সেটি আলাদা ধরা আছে বাতিল খাতায়। রবীন্দ্রনাথের বার্তাটি এইরকম—

Suren's greatness of mind and heart will never be known to many. His death is tragic because a noble life, so pure, so true, endowed with rarest gifts, lies unrevealed. I do not miss him only as a dearly beloved relative, but as a friend and companion whom it has been my privilege in life to know immediately and whose inspiration has helped me all these years in my work and writing.

রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সংজ্ঞা দেবী ও জ্যেষ্ঠপুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও শোকবার্তা পাঠান। আর ইন্দিরা দেবীকে লেখা সেই পরিচিত চিঠি পাঠান মংপু থেকে ৬ মে। 'বিবি, তোরা বোধহয় জানিস আমার নিজের ছেলের চেয়ে সুরেনকে ভালবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষে তাঁকে আমার কাছে আহ্বান করেছি। বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধহয় কাছে আসবে, সেই দিন নিকটে এসেছে।'

১৬ মে অমল হোমকে লেখা চিঠিতেও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর কথা এসেছে। যদিও প্রসঙ্গ ছিল অন্য। তিনি লিখছেন: 'তোমার মুনিসিপ্যাল গেজেটের স্বাস্থ্য সংখ্যা আমার পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। এ সম্বন্ধে তোমার তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনা বিশেষ প্রশংসনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিশক্তি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে চোখকে পীড়িত করতে কুণ্ঠিত হই। আমার বিশ্বাস এই সংখ্যা না পড়তে পারার দরুন আমি নিজেকে বঞ্চিত করেছি। কোনো অনুকূল অবকাশে চেষ্টা করে দেখব। সুরেনের মৃত্যু যে কত শোচনীয় তার সম্পূর্ণ প্রমাণ রইল না। অবস্থা নির্বিচারে সর্বজনের প্রতি এমন অকৃত্রিম সৌজন্য স্বার্থবিস্মৃত এমন উদার মনুষ্যত্ব, দুর্ব্যবহারে এমন অবিচলিত ধৈর্য এমন ক্ষমা আর কারো চরিত্রে দেখিনি। বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ছিল অসামান্য, কিন্তু তার প্রয়োগ ছিল নেপথ্যে। আমার জীবনে এমন ক্ষতি আর কখনো অনুভব করিনি। দীর্ঘায়ুর পথ বিচ্ছেদকণ্টকিত, বিশেষত যাত্রার পশ্চিমপ্রান্তে যখন আলোক ক্ষীণ হয়ে আসে।'

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি বই সম্পর্কে (বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ) রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশ পেয়েছে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে। পত্ররচনার তারিখটি লক্ষণীয়—পয়লা মে। সুরেন্দ্রনাথের বইটির বিষয় সোভিয়েত রাশিয়া। রথীন্দ্রনাথকে কবি লিখছেন: 'রথী, সুরেনের বই সমস্তটা

পড়লুম। ওর প্রথম অংশের যেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা জয় করবারই তিহাস আছে, খুব ভালো লাগল। কিন্তু তার পরে যেখানে হিন্দুজ-এর লেখার লক্ষ্য অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে সমর্থনমূলক প্রচার বলা চলে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের যে মতই থাক বিশ্বভারতী তো বলশেভিক নীতি বা অন্য কোন অর্থনৈতিক মত অবলম্বন করে না। এরকম ভুল বোঝাই যদি কিছুমাত্র উপলক্ষ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের গুরুতর ক্ষতি হবে। আমরা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করি তাতে দোষ হয় না, কিন্তু পক্ষভুক্তভাবে যদি করি, ঘোরতর দুর্বিপাক ঘটবে। এখনি দেশের মেকি কমরেডের দল এই বইটা নিয়ে হৈচৈ বাধিয়ে দেবে। তোর সঙ্গে দেখা হলে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দেখিয়ে দেব। এই বই বিশ্বভারতীর নামে বাজারে চালিয়ে দেওয়া কোন মতেই হতে পারে না। এর বৈজ্ঞানিক বা বর্ণনার অংশে দোষ নেই। কিন্তু বাকি অংশে আমাদের নামের ছাপ দেব কী করে? সুরেনের স্বতন্ত্র নামে বই বের হলে আপত্তির কথা থাকতো না। ইতি ১-৫-৪০। বাবা।'

এই চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এযাবৎ অপ্রকাশিত। এখন প্রশ্ন, বিশ্বভারতী কি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মত বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়েই 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' ছাপিয়েছে? তাহলে বাকি অংশে কী ছিল?

রবীন্দ্রনাথের আপনজন কালীমোহন ঘোষও ওই সময়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে শান্তিদেব ঘোষকে একটি চিঠি লেখেন মংপু থেকে—

'তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে। তাঁর স্মৃতি আমাদের আশ্রমে এবং আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। লোকহিতব্রতে তাঁর যে-জীবন ত্যাগের দ্বারা পুণ্যোজ্জ্বল ছিল, মৃত্যু তার সত্যকে খর্ব করতে পারে না, এই সান্ত্বনা তোমাদের শান্তিদান করুক। ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।'

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লেখেন ৩ জুন। '—দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে সে উদ্বেগ কমল, তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে, নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাই নে। চুপ করে থাক এখন কিছুদিন। এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সব এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুহৃজ্জনের কোনো লেখা ছাপিয়ে বঙ্গসাহিত্য সরোবরের তলায়

পাক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন দুলিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য-লাভ কর এই কামনা করি। ইতি'

সজনীকান্তকে কদিন পর আর একখানা চিঠি।—'সকল বিষয়ে আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপরে কাজ চালিয়ে দিই, সব সময় ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যবসাকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে ব্যোরিখে অ্যান্ড ডিউই-র টৌয়েলেভ টিসু রেমেডিজ আনিয়ে নিয়ো। বলাইয়ের (বনফুল) সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়োকেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিন-চার বার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাবিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা। আমার মনের অবস্থা বর্মবিমুখ। আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাঁজি দেখে ঠিক করে নিয়ো।'

সেকালের খ্যাতনাম্নী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গায়িকা অমিতা সেন (খুকু) মারা যান ১৯৪০ সালের মে মাসে। তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাবক অবিনাশচন্দ্র সেনকে একটা চিঠি লেখেন রমনা; ঢাকায়।—'অনেক দিন থেকেই আশঙ্কা করছিলুম যে খুকুর মৃত্যু আসন্ন। তবু মৃত্যু যখন এসে উপস্থিত হয় তখন তার বেদনা আঘাত করে। খুকুকে যথেষ্ট স্নেহ করতুম। কিন্তু তাকে দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। পরলোকে সে শান্তিলাভ করুক এই কামনা করি। দৃঢ়চিত্তে অনিবার্য বিচ্ছেদের সান্ত্বনা তোমরা বহন কর এই আমার আশীর্বাদ। ইতি ২৭-৫-৪০'

সেকালের আর এক নামী গায়িকা রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন অমলা দত্ত, যিনি 'কুইনি' ডাক নামেই বেশি পরিচিত, তাঁর বাবা আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রমোদচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠি লেখেন।—'কুইনি, তোমার পিতার জীবনের সত্তর বৎসর দেশের কর্ম ও সম্মানে পূর্ণ হয়েছে। সেই গৌরবেই তিনি তাঁর আয়ুর শত বৎসর সম্পূর্ণ ও সমুজ্জ্বল করুন এই কামনা করি। ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭'

উল্লেখযোগ্য চিঠি সুকুমার রায়ের রচনা সম্পর্কে সুকুমার রায়ের স্ত্রী ও সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায়কে ১৯৪০ সালের পয়লা জুন লেখা একখানি চিঠি। কালিম্পং গৌরীপুর ভবন থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ

রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তা ঠিক সমশ্রেণীর রচনায় দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্যে জড়িত হয়ে রইল।

কিছুদিন আগেই সুভাষচন্দ্রের ডাকে কবি মহাজাতি সদনের শিলান্যাস করেন। কিন্তু মন বিক্ষুব্ধ থাকায় আর একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সুভাষচন্দ্রকে কালিম্পং থেকে লেখেন: 'আমার দৃষ্টি ক্ষীণ, আমার শক্তি হ্রাস পেয়েছে। কোন দায়িত্বের কাজ এমন কি চিন্তাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। স্বদেশী সমাজের ছাঁচে বাংলাকে গড়ে তুলে তার অসম্মান ও ক্ষত-বেদনা দূর করবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—প্রত্যহ অনুভব করছি আমার জীবনীশক্তির খর্বতা। তা ছাড়া পলিটিকস আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের অতীত। তোমাদের কোন পক্ষেই আমি যোগ দিতে পারি নে। মতের মিল যখন হয় না তখন বিচার করতে সংকোচ হয়, সে আমার মানসিক অনভিজ্ঞতা এবং শারীরিক জীর্ণতাবশত। আমি এ পর্যন্ত পল্লী সমাজের কাজ চালিয়ে এসেছি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে। তার চেয়ে বড় পরিধির দায়িত্ব নেবার মতো অর্থ সামর্থ্য এবং প্রভাব আমার নেই। কিন্তু পলিটিকসের ধার দিয়েও আমি যেতে পারব না, হস্তক্ষেপ করা অন্যায় হবে। সমস্ত পৃথিবী তার জটিলতায় আক্রান্ত ও অভিভূত এবং সাংঘাতিক অবস্থায় আনীত—আমরা কোথায় আছি। উপদেশ দেওয়া বা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার দুঃসাহস আমার লেশমাত্র নেই। যে অল্প কয়দিন আমি বেঁচে আছি এই দুরূহ দায়িত্ব হতে নির্লিপ্ত থেকে শান্তিতে কাটিয়ে যেতে চাই। শান্তিই একমাত্র প্রার্থনীয় নয় যদি শক্তি থাকে, আমার শক্তি নেই। আমাকে ছুটি নিতেই হবে। তোমরাও সবাই এতে আমায় সহায়তা কর। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৮।৬।৪০

পুনঃ ॥ পারিবারিক দুর্ঘটনাবশত মন উদ্বিগ্ন আছে। সেই কারণে এ সময়ে তোমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না। কিছু মনে কর না। আশীর্বাদ গ্রহণ কর।'

কবির একদা সচিব ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী তখন থাকেন চৌরাঙ্গির ওয়াই. এম. সি. এ.-তে। গৌরীপুর হাউস, কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠি লেখেন তাতে বাঙালি স্বভাব সম্পর্কে কবির মনোভাব আবার প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া মৃচ্ছকটিকম্ নাটক সম্পর্কে তাঁর মতামতও জানা যায়। তিনি লিখছেন:

'তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর মুষড়ে পড়েছে। তারপর আবার আকাশ অত্যন্ত ভ্রুকুটিল ভঙ্গি ধারণ করেছিল। কি করা যায়, আমি খুচরো কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। তুমি জানো, আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব—সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে

ভেবড়ে যায়, কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিক্ষণ হলো সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল, সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্ছে কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন হিসেবি তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে। মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেন না তার মাপকাঠি বহু দূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্য সাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে, পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয় পতাকা অভ্রভেদ করে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁতখুঁতে ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালী নয়। তবু বাঙালিও হয়তো সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিছু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালি প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওর মনের মধ্যে উইয়ের বাসা, তৈরি জিনিসকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সবচেয়ে যে সুর অকৃত্রিম সে হচ্ছে দুয়ো দেবার সুর।

তোমার প্রেরিত মৃচ্ছকটিকম্ এইমাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করছে না আঁচড় কাটছে। যা হোক ভাল করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন আগে পড়ে দেখেছিলুম, ভাল লেগেছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবি করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়বস্তুকে যেমন করে আলগা করে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হতো। চেষ্টা করে দেখছি য়ুরোপের ইতিহাস পড়ে পড়ে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করছে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম বলেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করছে। এটা হচ্ছে দূর থেকে নিরাপদে দুয়ো দেবার প্রবৃত্তি। যখন গরম বোধ করবে এখানে এসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ো। ইতি ২৪।৫।৪০'

কালিম্পঙের মেঘলা আবহাওয়ার কথা দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার কিছু বড় চিঠি শুরু। সেই আবহাওয়াকে ধরতাই ধরে তিনি এগিয়ে যান অন্য গুরু প্রসঙ্গে। অমিয়বাবুকে চিঠি লেখার পরদিন ওই কালিম্পং থেকেই রাণী মহলানবিশকে লেখেন। রাণী দেবী তখন কাছেই, দার্জিলিঙে।

'আকাশ মাঝে মাঝে মুখ ভার করে, আবার তার মেজাজের বদল হতে থাকে, কাল সন্ধ্যের দিকে মনে হলো দক্ষিণ দিকের কোণ থেকে একটা নালিশ জমে উঠেছে, আজ সকালে দেখি সেটা বাতিল হয়েছে। কিন্তু এই দেখ, বলতে বলতে একরাশ কুয়াশা উঠে সকাল বেলাটাকে গিলতে আরম্ভ করে দিল—এই ব্যাপারটা চলবে বেলা দশটা পর্যন্ত—একেই বলে অ্যাও যায়, ব্যাঙ যায়, খলসে

বলে আমিও যাব—বৃষ্টি যায় বন্যা যায় কুয়াশা বলে আমিই বা বাকি থাকি কেন ? শহরের বাবু যারা পাহাড়ের রাস্তায় পদচারণ করে খিদে জমিয়ে চা-রসযুক্ত প্রাতরাশ সম্ভোগ করতে চায় তারা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ মনে বেরিয়ে পড়েছে—ছাতাটা বগলে আছে দুর্দিনের সঙ্গী। আপীসমেন্টের ব্যবস্থা রইল। তোমাদের দার্জিলিঙের রাস্তায় নিঃসন্দেহে এখন ম্যাকিনটশের আধিপত্য। যুদ্ধের অবস্থাটা মোটেই আশাজনক নয়। শুনতে পাই আমাদের স্বদেশীয় অনেকেই এই নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করছেন। ভীরুর আনন্দ এতেই, জগৎজোড়া বিভীষিকা তাদের কাছে মজার জিনিস হয়ে উঠেছে। কিছুকাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে, তার কারণ বোধহয় দূরের দুর্যোগ আমার মনের মধ্যে কুয়াশা জমিয়ে রেখেছে। জানি মানুষের বহুদিনের সঞ্চিত পাপ হঠাৎ প্রায়শ্চিত্তও আদায় করে নেয়। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার এবং নির্দয়তা সভ্য দেশের ইতিহাসে অন্তঃশীলা হয়ে বয়ে এসেছে, ঐশ্বর্যের মায়াজালে তাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ যখন হিসেব নেবার দিন আসে তখন আবরণ খুলে যায়। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আর এক রকমের, এ নিত্য, এর কোনো আব্রু নেই, পঙ্কিল জলের প্রবাহিনীর মতো জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন আবিলতা চলেছে, বৃহৎ সংসারে এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবহার-যোগ্যতা নেই, এই লজ্জার অবসান দেখিনে। আমাদের এখানকার দূরের বাণী ডাকের পেয়াদার হাতে—তার-বেতারের হাতে নেই। কেমন আছ ? ইতি ২৫।৫।৪০'

অজয় অট্টাচার্য ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য—দুই কবি-ভ্রাতাকে রবীন্দ্রনাথ একই দিনে ২৭ বৈশাখ, দুটি কবিতা পাঠান। দুটিই স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে আছে। একটি হল—'রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত বৈশাখে/মোর জন্মরবি দৌত্যে যদি এনে থাকে/নব আলোকের লিপিখানি/সে মোর সৌভাগ্য বলে জানি।' অন্য কবিতাটি হচ্ছে—'গাছ দেয় ফল/ঋণ বলে তাহা নহে/নিজের সে দান নিজেরই জীবনে বহে/পথিক আসিয়া লয় যদি ফলভার/প্রাপ্যের বেশি সে সৌভাগ্য তার।'

বুকল্যান্ড প্রকাশক সংস্থার অনিলকুমার বসুকে ডঃ আর ডি আলেকজান্ডার রচিত দি সার্চ ফর ট্রুথ বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন তাতে ভগবান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের পরিচয় মেলে।—'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যেখানে বিশ্বজনীনভাবে ভগবৎ প্রেমের আলোচনা করেছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মনের মিল আছে কিন্তু ভগবানকে যেখানে তিনি বিশেষ দেশকালে ও ব্যক্তিগত ইতিহাস-সীমায় আবদ্ধ করে দেখেছেন সেখানে আমি তাঁর চিন্তার ও ভক্তির অনুসরণ করতে অক্ষম। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে ভগবানের মানসিকতাকে যে রকম সংকীর্ণ করেছে তাতে আমি আনন্দ পাই নে। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩৪৭'

অরুণকুমার চন্দ শিলচরের বিখ্যাত চন্দভ্রাতাদের মধ্যম। এই পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। অরুণকুমার চন্দ তাঁর চেনা আর একজনের একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের মতামতের জন্যে পাঠান। তারই জবাবে

কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আগে তোমাদের জাহাজের রাস্তা খোলা হোক তারপর তোমাদের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়ে দিয়ো। এখানে ভাল আছি, শ্রীমতী বাণী রায়ের কবিতাটি ভাল লাগল। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।'

এই বাণী রায় সুপরিচিত লেখিকা বাণী রায় নন। এই ভদ্রমহিলাকে অরুণকুমার চন্দের ঠিকানায় আলাদা একটা চিঠিতে বলেন : 'তোমার কবিতাটি পেয়ে খুশি হলেম। তোমার সাহিত্য সাধনা সার্থক হোক এই আশীর্বাদ।'

ধীরানন্দ ঠাকুরকে লেখেন : 'তোমাদের অভিনন্দন পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি।' শিলঙের অনাথবন্ধু বেদজ্ঞকে : 'গিরিশ পত্রিকার উদ্দেশে আমার শুভকামনা রইল।' ময়মনসিংহের শাহ আলমকে : 'নববর্ষ' উপলক্ষে তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। সারস্বত সঙ্ঘের সদস্যদের আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাবে।' যাদবপুর কলোনীর শ্রীমতী অনিমাকে : 'আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।' কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচিকে : 'মন এখনো জেগে আছে কিন্তু তার বাহনগুলো অপটু। ক্লান্ত লেখনীতে আশীর্বাদ জানাই। তোমার সাহিত্য সাধনা সার্থকতার পথে এগিয়ে চলুক। ৩০শে বৈশাখ ১৩৪৭'

মধুপ্রাপ্তির স্বীকৃতি আছে আর একখানা চিঠিতে। প্রফুল্লনলিনী দেবীকে লিখছেন : 'তুমি যে আমার মধুলোভ স্মরণ করে আমাকে মধু পাঠিয়েছ আমি খুব খুশি হয়েছি। দূরে আছি দুর্গমে, তাই পেতে এবং প্রাপ্তি স্বীকার করতে দেরী হল। তোমার এই মধুটি সুস্বাদু, আমার নববর্ষের ভোগে লাগবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি। ২৮।৪।৪০।'

কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখছেন : 'পল্লীর উন্নতিসাধন উদ্দেশে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পুণ্যস্মৃতি সেই উপেন্দ্রনাথ সাউর জীবনচরিত রচনায় তোমার অধ্যবসায় পল্লীহিতৈষী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়। এই উপলক্ষে তোমাকে আমি আমার আশীর্বাদ জানালেম। ইতি ৩০।৪।৪০'

বনফুল সাহিত্য সমিতির পক্ষে শ্রীরামপুরের অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখছেন : 'আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশের আয়োজন করছ তা আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে গ্রহণ করলাম। তোমাদের আমার আশীর্বাদ জানাই। ইতি ৪।৫।৪০।'

রেঙ্গুন রবীন্দ্র পরিষদের সুনীলবরণ রায়, ভদ্রকালী সাহিত্য সম্পাদক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, পালিত স্ট্রিটের সুবোধ রায়, ব্রাহ্ম যুব সমিতির সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ দত্ত, হাওড়া শিবপুরের দীপশিখা সাহিত্য মন্দিরকে একই ধরনের চিঠি পাঠান।

১৯৪০ সালের ২৪ এপ্রিল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন একটি আশীর্বাদ-পত্র পাঠানোর জন্যে। একই চিঠিতে সম্মেলন কর্তৃক কবির জন্মদিনে গৃহীত প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই চিঠির এক কোণে একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দ সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে নোট দেন—গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

উত্তর দেওয়া উচিত। চিঠিখানা যায় শান্তিনিকেতন। অনিলকুমার চন্দ তাঁর নোট দিয়ে মংপুতে পাঠিয়ে দেন। ওই একই চিঠির অন্য কোণে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী নোট দেন—গুরুদেব জবাব দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দেবনারায়ণবাবুকে জবাবী চিঠিতে লেখেন: 'প্রথম হতেই আমাদের দেশে শিক্ষাবিধি চিন্তাশক্তির সকল প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে যন্ত্রের অধিকারে বন্দী হয়ে আছে। পরিবর্তনশীল কালের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা একে সজীব পদার্থের সম্মান দিয়ে যথাপথে প্রবর্তিত করে না, একে পৌত্তলিক চিত্ত-বৃত্তি আবহমান চালনা করে আসছে অনুকরণ এবং গতানুগতিক তামসিকতায়। আজ সভ্য জগতের সর্বত্রই শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের মন অনুসন্ধানপর চেতনার সচেষ্টতায় উদ্বুদ্ধ। কেবল আমাদের দেশের বিদ্যায়তনগুলির ভাণ্ডারে অন্য দেশের কোনো এক অতীত যুগের কোনো এক শিক্ষাপ্রথার আবর্জনাগুলি নির্বিচারে সঞ্চিত। মনের নূতন জীবিকার শস্য ফলিয়ে তোলবার অধ্যবসায়ে সাহসের অভাবে বর্জিত। এই লজ্জাজনক দীনতা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা-সাধনাকে উদ্ধার করার জন্যে তোমরা চিন্তাপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছ। এজন্যে তোমাদের আমি অভিনন্দন করি ও শুভকামনা জানাই। ইতি ২।৫।৪০।'

শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে এই চিঠিতে। মনে হচ্ছে, চিঠিটি এ যাবৎ অপ্রকাশিত।

দেখা যাচ্ছে ১৯৪০ সালে মৌমাছি পরিচালিত আনন্দমেলা প্রথম পূজা সংখ্যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা পাঠান, (মূর্তে তোরা বসন্তকাল মানস-লোকে) তা যায় সাগরময় ঘোষ মারফৎ বর্মন স্ট্রিটে।

একটি সার্টিফিকেট: 'কৃষ্ণনগরের মূর্তি শিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। য়ুরোপে আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি গড়িয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়া ছিলেন, ইঁহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।'

৪-এ বাওয়ালি মন্ডল রোডের শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী দেবকে লিখছেন: 'তোমার স্বামীর যে লেখাগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ পড়ে আনন্দলাভ করেছি। বিজ্ঞানে যেমন তাঁর অধিকার তেমনি তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল। জনসাধারণের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ও যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত করে বিবৃত করার ভার যদি তিনি গ্রহণ করেন তবে উপকার হবে। জুলাই মাসে আশ্রমের ছুটি শেষ হলে আমি সেখানে ফিরব। সেই সময়ে তোমরা যদি সেখানে গিয়ে দেখা করতে পার তা হলে কিছু কাজের কথা বলবার অবকাশ পাওয়া যাবে। ইতি ২৫।৫।৪০।'

জানি না, কে এই দুর্গেশনন্দিনী, কে তাঁর স্বামী তবে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছে, নইলে শান্তিনিকেতনে আবার

যেতে বলতেন না। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কী রকম হওয়া উচিত তার নির্দেশও আছে এই চিঠিতে।

এই একই দিনে ঢাকার কোন একজন অমিনুদ্দিন আহমেদকে লেখেন: 'তোমার মলয়পত্রে কাব্যে তুমি আমার উদ্দেশে যে অভিনন্দন প্রকাশ করিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং এই উপলক্ষে তোমাকে আমার শুভ-কামনা জানাইলাম। ইতি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।'

আর কয়েকখানা চিঠির নকল আছে, যা অখ্যাত কয়েকজনকে লেখা। যেমন কালিম্পঙের যোগীন্দ্র চক্রবর্তী: 'তোমাদের গৃহজাত যে মধু আমাকে পাঠিয়েছ তা পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আমার মধুলোভ খ্যাত হয়ে পড়েছে, এ খ্যাতি ব্যর্থ হয় নি। আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ কর।' ময়মনসিংহের মৌলবি কাজি আহমেদকে: 'তোমার পত্রখানি পেয়ে বড় আনন্দিত হলাম। ধর্ম যদি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে খর্ব করে তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। যারা সর্ব মানুষের এক ঈশ্বরে যথার্থ বিশ্বাস রাখেন, তাঁরা কোনো কারণেই মানবকে অপমান করে নিজের ধর্মকে অপমানিত করেন না। এই আমাব মত। ক্ষুদ্র হৃদয় যাদের, ঈশ্বরের সিংহাসনকে তারা সংকীর্ণ করে—এটা অপরাধ।'—রাঁচির ননী দত্তকে: 'তোমার হস্তলিখিত বীথি পত্রিকায় তোমরা যে সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছ তাতে তোমরা সিদ্ধিলাভ কর—এই কামনা করি। ইতি ৩১।৫।৪১।' পয়লা জুন আকাশবাণী শিশুমহলের ইন্দিরা দেবীকে একটা ছোট্ট কবিতা তিনি পাঠান। নির্বাক যে বাণী/ধ্বনিত বিশ্বের কেন্দ্রে/মর্ম মাঝে লহ তাহা জানি।

কেমব্রিজে আর এফ র‍্যাট্রে-কে যে চিঠি লেখেন, তাতে এলিয়টের কবিতার কথা আছে—

I am deeply touched by your friendly tribute and thank you for your kind thoughts which I very sincerely reciprocrate. It gives me profound pleasure to share with you happy memories of those happy days spent in Europe still unravaged by war passion. I am mierested to read what you say about our T. S. Eliot. Some of his poetry have moved me by their evocative power and consumate craftsmanship. I have translated that was some time ago—one of his lyrics called—"The Journey of the Magi".

নীলগিরিতে জে এইচ কাজিনকে লেখা চিঠিতে এন্ডরুজের অভাবের কথা আছে। তিনি লিখছেন—

I miss Charlie very much, his memory and all his good deed will continue in our lives in many ways. You will soon read the translation of the Sermon I gave at our Mandir on the 5th May. I shall eagerly expect to read your 'Duo-Autobiography' when it comes out.

৩ মে মংপ্‌ু থেকে মাদাম সোফিয়াওয়াদিয়াকে লেখা :

Dear Mame Wadia, As you will understand I do not care for 'Empire Verse' nor do I feel interested in being represented there in. But if you think there is any thing in the idea, please choose some poem Visva Bharati quarterly. They are not known outside and remain unpublished in book form and send it the proper quarters. The poem on the Japanese war-drums in Buddh's temple might do, or the one in propitiating war deities in the Church. I am spending a few quiet days in this mountain village away from locality. I hope this finds you well and active in the cause of peace.

ডঃ রঘ্‌ুবীর খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, হিন্দি ভাষার বড় প্রচারক। তাঁর সঙ্গেও যে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিল, তাব পরিচয় পাওয়া গেল বাতিল খাতায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

I want to recommend your book to readers, especially in the West—who take an interest in Indian philosophy and culture. Your interpretation of Vedic Mysticisim is sure to stimulate research and study of the subject both in scholarly circles and outside.....

বোম্বাইতে ইণ্ডিয়া লীগের কে এ ফিটার নামে যে পাশী ভদ্রলোক চিঠি লেখেন, তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাঁর বন্ধ্‌ু দীনশা ইরানি সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

কে ওয়াকিয়ামা নামে এক জাপানী ভদ্রলোক কবি নোগ্‌ুচির পরিচয়পত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলায় তিনি উচ্ছ্বসিত। রবীন্দ্রনাথকে তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেন, যে দ্‌ুটো ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছেন, তার একটি অটোগ্রাফ করে পাঠিয়ে দেবার অন্‌ুরোধ করেন। সেই সঙ্গে পাঠান কবির জন্যে নোগ্‌ুচির দেওয়া নিজের বই।

রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে ওয়াকিয়ামা-এর মারফৎ নোগ্‌ুচিকে ২।৫।৪০ যে চিঠি পাঠান তা এতদিন অপ্রকাশিত। কবি লেখেন—

I am delighted to receive your 'Harunobu' and am enjoying its pictures and interpretations of Japanese artistic traditions. You have sent me a precious gift and I can assure you that it will be preserved with care and studied in our Kala Bhavana—the Art Department of Visva Bharati. I am very glad to meet your friend Mr. K. Wakiyama the other day, etc. etc.

তিন

খাতা নয়, বাতিল ফাইল। উদয়ণের এক কোণে জঞ্জালের মধ্যে পড়েছিল কিছ্‌ু কাগজ। কিন্তু আস্তাকুঁড়েও ভুঁইচাঁপা ফোটে। ১৯০৯ সালের ৩ অক্টোবর জমিদারি ভাগাভাগির ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে লেখা একটি কীটদষ্ট

ছিন্নপত্র আছে। চিঠিটি মেজভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্থির করে গিয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পত্তি দেখা শোনা করবেন সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং লাভ হোক আর লোকসান হোক, দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রতি বছর দিতে হবে ৪৫ হাজার টাকা। মহর্ষি মারা যান ১৯০৫ সালে। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই চিঠি তার চার বছর পরে লেখা। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেট সম্পর্কে যেসব গবেষক আগ্রহী তাঁদের কাছে এই চিঠি মূল্যবান। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু—

তোমাদের ২৭-এ অগাস্ট তারিখের প্রস্তাব অনুসারে আমি আমাদের জমিদারির সম্পত্তি নিম্নলিখিত শর্তে বিভাগ করিতে সম্মত হইলাম। যথা ঃ—

(১) তোমরা উক্ত জমিদারি অর্থাৎ পরগণা কালিগ্রাম ও পরগণা বিরাহিমপুর এবং তৎ তৎ তহশিলের অন্তর্গত মহল সমুদায় এবং তৎসংক্রান্ত—(ক) যাহা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, (খ) বাকি বকেয়া ওয়াসিলাত ও সর্বপ্রকার পাওনা, (গ) কৃষিব্যাংক ও তদন্তর্গত যাহা কিছু প্রাপ্য—এক কথায় জমিদারি সম্বন্ধীয় এ পর্যন্ত আমার যাহা কিছু স্বত্ব ছিল তাহাতে তোমরা স্বত্ববান ও দাখিলদার হইবে।

(২) আমার অংশে আমি নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে বার্ষিক ৪৫০০০ টাকা তোমাদের নিকট হইতে পাইব ; যথা ভাদ্র বা তৎপূর্বে ১৩০০০ টাকা, আশ্বিন বা তৎপূর্বে ৯০০০ টাকা মাঘ বা তৎপূর্বে ১৩০০০ ফাল্গুন বা তৎপূর্বে ১০০০০ টাকা এবং এই সমস্ত টাকার জন্যে উক্ত জমিদারি আবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই দেয় টাকার কিস্তি খেলাপ হইলে কিস্তির পরিমাণ টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে আমি সুদের অধিকারী হইব।

(৪) গভর্নমেন্টের সদর খাজনার টাকা তোমাদিগকে শোধ করিতে হইবে।

(৫) সদর খাজনা দাখিলের নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখের অন্তত তিন সপ্তাহ পূর্বে তোমরা যথাস্থানে টাকা দাখিল করিয়া তাহার দাখিলা তোমাদের সদর কাছারিতে আমার পরিদর্শনের জন্য রাখিবে।

(৬) উক্ত তারিখের মধ্যে সদর খাজনা দাখিল না হওয়ার কারণে যদি দাখিলা প্রস্তুত না থাকে তবে আমি সদর খাজনা শোধ করিয়া দিয়া তোমাদের নিকট হইতে বার্ষিক শতকরা ১৮ টাকা হারে সুদ সমেত সেই টাকা আদায় করিতে অধিকারী হইব।

(৭) সদর খাজনা সময়মত দাখিলা না করার ত্রুটিতে যদি জমিদারি নিলাম হইয়া যায় অথবা যদি আদালতের মতে স্থির হয় যে তোমাদের নিজ কৃতকার্যের ফলে জমিদারির ক্ষতি ঘটিয়া আমার প্রাপ্য টাকা আদায়ের উপায়কে সংকটাপন্ন করিতেছে, তবে তোমাদের অন্যান্য সম্পত্তিকে আমি প্রাপ্য আদায়ের জামিনস্বরূপে দাবি করিতে অধিকারী হইব।

(৮) ক্যাডাস্ট্রাল সারভে ঘটিত খরচা এবং জমিদারের দেয় অন্য কোন প্রকার নূতন বা পুরাতন গবর্নমেণ্টের দাবির জন্য আমি কোন কালে দায়িক হইব না এবং সরকারের নিকট হইতে খেসারত বা অন্য কোন সূত্রে যে-কেনে টাকা জমিদার পাইতে পারেন, আমার তাহাতে দাবি থাকিবে না।

(৯) আমাদের পিতার উইল অনুযায়ী দেয় যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ আছে তন্মধ্যে আমার দেয় এক তৃতীয়াংশে তোমরা আমার পক্ষ হইতে যথাস্থানে যথা-সময়ে শোধ করিতে থাকিবে এবং তাহার রসিদ আমার পরিদর্শনের জন্য তোমাদের সদর কাছারিতে রক্ষা করিবে। উক্ত টাকা আমার প্রাপ্য কিস্তি হইতে কাটিয়া লইবে অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে বার্ষিক দেনার এক চতুর্থাংশ কাটিবে।

(১০) উক্ত দেয় টাকা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ত্রুটিতে আমার যদি কোন ক্ষতি ঘটে তবে তোমাদিগকে তাহা পূরণ করিতে হইবে।

(১১) বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম সংক্রান্ত কৃষি ব্যাঙ্কের দেনার জন্য আমি কোন প্রকারে দায়িক থাকিব না এবং উক্ত ব্যাঙ্কের পাওনা সম্বন্ধেও কোন দাবি করিব না।

(১২) বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমাদের তিনজনের নামে গত চৈত্র মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত যে-দেনা দাঁড়াইয়াছে তন্মধ্যে আমার ভাগের দেনা অর্থাৎ মোট দেনার তৃতীয়াংশ তোমরা শোধ করিবে, তোমাদিগকে আমি এই টাকা চার বৎসরে শোধ করিয়া দিব অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে তোমরা এই পরিমাণ মত টাকা আমার প্রাপ্য টাকা হইতে কাটিয়া লইবে। ওয়াসিল বাদে যে টাকা যখন বাকি থাকিবে তাহার উপর আমি বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা হারে সুদ দিব। বর্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে ব্যাঙ্কের দেনার হ্রাসবৃদ্ধি যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিবে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

(১৩) বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেনা শোধের ত্রুটিতে যদি আমার কোন ক্ষতি ঘটে তবে তোমাদিগকে তাহা পূরণ করিতে হইবে।

(১৪) নিম্নলিখিত কার্যগুলি সমাধা করিবার জন্যে আমার পক্ষ হইতে রিসীবর নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার বেতন দুই তৃতীয়াংশ (অনধিক বার্ষিক ৪০০ টাকা) তোমরা দিবে। রিসীবর নিযুক্ত করিবার অধিকার আমার থাকিবে। রিসীবরের কর্তব্য, যথা (ক) আমার প্রাপ্য কিস্তির টাকা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তিনি তোমাদিগকে রসিদ দিবেন এবং সেই রসিদ আমার দত্ত রসিদ বলিয়া গণ্য হইবে, (খ) সদর খাজনার দাখিলা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমাদের কাছারিতে গিয়া তিনি পরিদর্শন করিতে অধিকারী হইবেন, (গ) আমাদের পিতার উইলের বরাদ্দ দেয় টাকা পরিশোধের রসিদ তিনি পরিদর্শন করিবেন।

(১৫) বর্তমান বর্ষের আরম্ভ হইতেই এই বিভাগকে গণ্য করিয়া সেই হিসাব অনুসারে উভয়পক্ষের পরস্পরের নিকট দেয় ও প্রাপ্য নির্ধারিত হইবে।

(১৬) জমিদারি সংক্রান্ত মামলা মকদ্দমা প্রভৃতি আইনসঙ্গত আবশ্যক কাজে

আমার সহি স্বাক্ষর প্রয়োজন হইলে আমি তাহা করিতে আপত্তি করিব না, কিন্তু সেজন্য কোনপ্রকার আর্থিক ক্ষতি স্বীকার বা লাভের দাবিদাওয়া করিব না।

(১৭) এই সম্বন্ধে দলিল প্রস্তুত ও লেখাপড়ার সমাধা করিবার খরচার তৃতীয়াংশ আমি বহন করিব। তাহা তোমরা সরবরাহ করিয়া শতকরা বার্ষিক ৯ টাকা সুদসহ কিস্তি কিস্তি কাটিয়া লইবে।

(১৮) শ্রীমান সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত তোমরা মাসিক ১০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। আমিও তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা তাঁহাকে দিতে সম্মত আছি। তাহা তোমরা সরবরাহ করিয়া আমার কিস্তির প্রাপ্য টাকা হইতে কাটিয়া লইবে।

(১৯) লেখাপড়া যথাসাধ্য সত্বর সমাধা করিয়া দিবে।

(২০) জমিদারিতে এ পর্যন্ত আমার যে দখল ছিল তাহাতে এখন হইতে তোমরা অধিকারী হইতেছ। কিন্তু দাখিল প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হওয়ার কারণে কোন প্রকার কাজের বিঘ্ন না ঘটে এই উদ্দেশ্যে আমি এই পত্র আমলনামা স্বরূপে লিখিয়া দিয়া তোমাদিগকে জমিদারি সংক্রান্ত আমার সকলপ্রকার স্বত্বে স্বত্ববান ও দাখিলদার করিলাম। এবং এই পত্রে স্বীকৃত দায় ব্যতীত জমিদারি সংক্রান্ত অন্য কোন প্রকার দায় কিংবা দেনা আমার রহিল না। যে পর্যন্ত দলিল প্রস্তুত না হইতেছে সে পর্যন্ত এই পত্রের লিখিত সমস্ত শর্ত অনুসারে তোমরা ও তোমাদের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ ভোগদখল করিতে থাক এবং আমি ও আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ তাহাতে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না।

(২১) লেখাপড়া পাকা হইবার পূর্বে তোমরা আমার যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলিদার হইলে তাহার কোন প্রকার হানি ঘটাইতে পারিবে না এবং আমার অনুমতি ব্যতীত কোন কাজের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না। এবং উক্ত কার্য সমাধা পর্যন্ত সমস্ত হিসাবপত্র আমাদের পরিদর্শনযোগ্য করিয়া রাখিবে!—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারত সরকারের শীলমোহর করা কাগজে নয়াদিল্লি থেকে ১৯৩২ সালের ১৪ এপ্রিল গিরিজাশঙ্কর বাজপাই এফ এন্ডরুজকে একখানা চিঠি লেখেন। চিঠির বিষয় শ্রীনিকেতনের কৃষিকাজের জন্যে সরকারি সাহায্য। বাজপাই লিখেছেন—

Last August you wrote to the Hon'ble Member about a grant towards agricultural work which is being done at Santiniketan under the Poet. The application submitted by Dr. Tagore for a grant to his institute was in the first instance considered by the Bengal Provincial Committee which rejected it with the remark that it could not support a grant "till the institute was more completely organised for the purpose of research." Nevertheless, the possibilities of helping the poet was further investigated. These inquiries show that the Visva Bharati is dispensing with the service of

Babu Santosh Bihari Bose who was, to a great extent, responsible for working up the research schemes for which the grant was required. In the circumstances it seems best to let the matter drop for the present. I had intended to mention this to you personally, but unfortunately we never had time together to discuss anything except South Africa.

কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কি বাংলা কি ভারত সরকারের কাছ থেকে বিফল হওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত এই সরকারী চিঠি, যদিও বাজপাই এই চিঠি এফ এণ্ডরুজকে লিখেছেন ব্যক্তিগত ভাবে। শ্রীনিকেতনে বৃহৎ ভাবে কাজ তখনই চলছে। দেশ বিদেশের কৃষিবিদ্‌রা হাত লাগিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে অথচ বাজে অছিলায় অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। অর্থাৎ কারণ অন্যত্র।

এ তো গেল বৃটিশ সরকারের 'বদান্যতার' নমুনা। আর একটি চিঠি উদ্ধার করেছি বিড়লা বাড়ির শিল্পপতি বি এম বিড়লার। তিনিও একটি ধর্মীয় অছিলায় শান্তিনিকেতনে টাকা মঞ্জুর করতে অসম্মত হন। তিনি অবশ্য এই ব্যাপারে দোহাই পেড়েছেন তাঁর বড় ভাই জি ডি বিড়লার। ১৯৩৫ সালের ১৮ মার্চ বি এম বিড়লা লিখছেন—

My Dear Doctor Tagore,

I am in receipt of your letter of the 14th March and note what you write. As you know well the views of my brother, he is not inclined to agree to the place being utilised for non-Hindus and, therefore, I sorry the gift has to be restricted to that extent. In case you are likely to come to Calcutta in the near future, it may be advisable for you to have a talk with my brother about the restriction.

১৯১৯-'২০ সালে তাঁর বইয়ের প্রকাশকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু মনোমালিন্য ঘটেছিল বলে মনে হয় কয়েকখানি চিঠির নকলে। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ শুরু হয়। তার আগে ১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থাদি প্রকাশ করেন এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। তাঁদের সহযোগিতাতেই সব বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীতে বর্তায়। কিন্তু তারও আগে লেখা দুখানি চিঠি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৩২৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন, আপনাদের সহিত এত দিনের ব্যবহারে আপনাদের পক্ষ হইতে কখনই ব্যবসাদারির কার্পণ্য অনুভব করি নাই। সেইজন্য আপনাকে বন্ধু বলিয়া অনুভব করিয়াছি। এখন আপনি যে কোম্পানীর হাতে আপনাদের ব্যবসায় সমর্পণ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি সম্বন্ধ রাখিতে পারিব না। এ অবস্থায় কবে হইতে কোম্পানীর কাজ চলিবে এবং আপনাদের সহিত কীভাবে সম্বন্ধের অবসান করা হইবে দয়া করিয়া সত্বর তাহা জানাইবেন। কারণ তদনুসারে আমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি জানেন আমার পুস্তক বিক্রয়ের মুনাফা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পাইয়া থাকে।

তাহার ক্ষতি না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে কাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এই সঙ্গে প্রকাশককে লেখা আর একখানা চিঠি—

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

আমার যে গ্রন্থগুলির উপর আপনার আইনসঙ্গত অধিকার আছে সেগুলি আপনার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইব এমন সাধ্য আমার নাই এবং এমন দাবী করাও অসঙ্গত। যে গ্রন্থগুলির উপর আপনার সেরূপ অধিকার জন্মে নাই সেগুলিকে সম্পূর্ণই আমার বলিয়া গণ্য করিতে পারি। অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে আমি যে কোনো গ্রন্থ লিখিয়াছি লিখিতেছি ও লিখিব তাহা ছাপা বা না ছাপা একমাত্র আপনাদের ইচ্ছার অধীন—ইহার তুলনায় গ্রন্থকার হিসাবে আমার ইচ্ছার অধিকার নিরতিশয় সংকীর্ণ—আমি যে কয়দিন বাঁচি তাহার মধ্যে যে কয়টি বই লিখিব এবং যে কয়টি বই এগ্রিমেণ্টে ফর্দের বাহিরে পড়িয়াছে সেই কয়টি বই আপনাদের হাতে দিব কি না দিব আমার এইটুকু ইচ্ছা মাত্র মুক্ত থাকিবে। অতএব আমার এই সামান্য স্বাধীনতাটুকু আমি বিলুপ্ত করিতে চাই না।

পৃথিবীতে যে কোনো লেখকের কিছুমাত্র খ্যাতি আছে তাঁহার গ্রন্থাবলীর কোনো এক অংশ প্রকাশকের হাতে লুপ্ত হয় নাই। টেনিসন প্রভৃতি কবি, কার্লাইল প্রভৃতি গদ্যলেখক, মেরিডিথ প্রভৃতি উপন্যাসকার তাঁহাদের সকল গ্রন্থেই সমান আদর লাভ করেন নাই। তাঁহাদের কোনো কোনো গ্রন্থ অল্পই বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থের উপরেই সমগ্রভাবে প্রকাশকেরা তাঁহাদের লাভ লোকসানের হিসাব করিয়া থাকেন—বাছাই করিয়া বিচারের দ্বারা লেখকের প্রতি অসম্মান করেন না। আমার ইংরাজী গ্রন্থের দুই তিনটি এমন আছে যাহার বিক্রয় অতি সামান্য—ম্যাকমিলানের প্রদত্ত হিসাব হইতে তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু সে সকল বইকে তাঁহারা নির্বাসিত করেন নাই, করিবেনও না—শুধু তাই নহে, আমি যে কোনো বই বাহির করি তাঁহারা তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করেন।

কিন্তু আপনাদের ব্যবস্থা অনুসারে আমার যে কোনো বই আপনার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারেন, অর্থাৎ আপনারা একমাত্র ব্যবসায়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিতে চান। যাঁহার গ্রন্থ লইয়া ব্যবসায় করিবেন গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে চান না। আপনাদের কাছে গ্রন্থকারের কোনোই সম্মান থাকিবে না, কেবলমাত্র অর্থের সম্মান থাকিবে অন্তত গ্রন্থপ্রকাশকের ব্যবসায়ে জগতে অন্যত্র কোথাও এরূপ ব্যবস্থা নাই। কারণ পুস্তক জিনিসটা পাটের বস্তার সহিত তুলনীয় নহে। বর্তমান লাভ লোকসানের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া ইহার প্রতি ব্যবহার করিলে স্থায়ী ক্ষতি এবং গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হোক আমি খ্যাতি লাভ করিয়াছি—এমন একদল লোক

আছেন যাহারা যে কারণে হোক মনে করিয়া থাকেন আমার কিছু বলিবার কথা আছে এবং সে কথা যেমন করিয়া হোক বলা আবশ্যক—আমার প্রকাশকেরাও যদি তাহা মনে না করেন, অথবা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান পাঠকদের দরদের প্রতি দরদ না রাখেন তবে তাহার চেয়ে দুঃখের বিষয় কিছুই হতে পারে না। বস্তুত প্রকাশকের ব্যবসায় একান্তই লাভ লোকসানের ব্যবসায় নহে, কারণ তাঁহারা যে পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্যবহার করেন তাহা পণ্যদ্রব্যের চেয়ে অনেক বড়, এবং জগতের সকল বড় গ্রন্থ-প্রকাশকেরা তাঁহাদের ব্যবসায়ের সেই দায়িত্ব ও সম্মান স্বীকার করেন। এই জন্যেই এই সকল বড় বড় প্রকাশকদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গ্রন্থকারেরাও আনন্দ ও গৌরব বোধ করেন।

তর্কস্থলে বলিতে পারেন, 'আমরা নিজে যাহা প্রকাশ না করিলাম সে লেখা আপনি বা অন্য কোনো প্রকাশক বাহির করিতে পারেন।' একথা কার্যতঃ খাটে না, গ্রন্থকার যদি প্রকাশকের কার্য করিতে পারিতেন তবে প্রকাশকের দরকার থাকিত না। অন্য প্রকাশকই বা বাছিয়া বাছিয়া কেবল আমার অনাদৃত গ্রন্থই প্রকাশ করিতে সম্মত হইবে কেন? অতএব আমার কতকগুলি রচনা আপনাদের হাতে মৃত্যুদণ্ড লাভ করিতে পারে এরূপ আশঙ্কা আছে।

এই আশঙ্কা বিশেষভাবে কেন আমার মনে উদয় হইল সেকথা বলি। কিছুকাল ধরিয়া আপনারা রাজর্ষি প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগীয় রাজকর্মচারী এই বই বাজারে কিনিতে আসিয়া যখন খুঁজিয়া পাইলেন না তখন সন্ধান করিতে গিয়া এইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন যে, যে বই বিক্রি হয় না তাহা ছাপাইবার উৎসাহ নাই। অবশেষে, ত্রিপুরা রাজ্যে এই বই পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে আশ্বাস পাইয়া তবে তাহা মুদ্রিত হয়। জানি না আমার রচিত এরূপ আরো কোনো কোনো বই এরূপ নির্বাসন বা অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে কিনা।

কিন্তু আমার অনেক বই অনেক দিনই যে অপ্রকাশিতভাবে থাকে তাহা নিজেরাই বই কিনিতে গিয়া জানিতে পাই। অন্য দেশে কখনই এরূপ ঘটে না। সংস্করণ ফুরাইবার পূর্বেই যথাসময়ে বই ছাপা হইয়া থাকে। যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন ইহার নিদর্শন পাইয়াছিলাম। 'গোরা' 'নৌকাডুবির' মতো বই কিনিতে গিয়া ক্রেতা শুনিয়া আসিয়াছেন যে, ঐ সকল বই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—চয়নিকা বহুকাল হইতেই বাজারে নাই। আজই একজন অধ্যাপকের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি; তিনি লিখিতেছেনঃ "'জীবন স্মৃতি', 'ডাকঘর' প্রভৃতি আপনার অনেক পুস্তকই বাজারে পাওয়া যায় না। আর কি বাহির হইবে না? সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীও (ইংরেজি বাঁধাই) পাই না।"

'গোরা' প্রভৃতি বই বোধকরি এখনো ছাপানো আরম্ভও হয় নাই। কারণ ঐ সকল বইয়ের প্রুফ আমার নিতান্তই দেখা চাই। অল্পকাল হইল 'নৌকাডুবি' পড়িতে গিয়া দেখিলাম তাহাতে এমন সকল ভুল আছে যাহাতে বাক্যের অর্থই

হয় না, অথবা সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ হয়। এই সমস্ত দেখিয়া নূতন সংস্করণের প্রুফ নিজে দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং তদনুসারে কোনো কোনো বইয়ের প্রুফ পাইয়াও থাকি। গোরা, নৌকাডুবির প্রুফ এখনো পাই নাই, সুতরাং ধরিয়া লইতেছি তাহার ছাপা আরম্ভ হয় নাই।

আপনি জানেন আমার গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার তরফে ব্যক্তিগত স্বার্থ লেশমাত্র নাই। আমি যে কাজে ইহার উপস্বত্ব অর্পণ করিয়াছি তাহা দেশেরই কাজ। বই বিক্রয় সম্বন্ধে আমি পূর্বে অনেক ক্ষতি বহন করিয়াছি কিন্তু আপত্তি করি নাই—কারণ আমার ব্যবসায় বুদ্ধি কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের স্বার্থ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না—এইজন্যেই যেখানে ক্ষতির কারণ দেখিতেছি সেখানে আপনাদের কাছে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি সেই কারণে আমার নালিশ আপনারা উপেক্ষা করিতেও পারেন, তৎসত্ত্বেও আমি অব্যবসায়ীর বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি তাহা আপনাদের কাছে নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—মার্জনা করিবেন।

ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনাদের যাহা কর্তব্য তাহা পূর্বেই বোধহয় পাকাপাকি স্থির করিয়াছেন। আমার কথাগুলিকে আপনারা যাচাই করিয়া কতটুকু গ্রহণ করিবেন বা না করিবেন তাহা লইয়া মনের মধ্যে আন্দোলন করা অশান্তিকর—বিশেষত আমি যখন এগ্রিমেণ্টের জালে আপনার নিকট ও আপনার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের নিকটে চিরকাল, এমন কি মৃত্যুর পরে পর্যন্ত বদ্ধ। আমার যাহা বলিবার তাহা বলিলাম—ইহার পরে আপনারা যাহা কর্তব্য বোধ করেন করিবেন—আমি বৃথা আন্দোলন করিয়া আপনাদিগকে এবং নিজেকে ক্ষোভ দিব না। কেবল আপনাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা—আমার কোন্ কোন্ বই ক্ষতির আশঙ্কায় আপনারা ত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে চান তাহা সত্বর আমাকে জানাইবেন এবং বর্তমানে আমার কোন্ কোন্ বইয়ের সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত বা নিঃশেষিত-প্রায় তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

বর্মঘটিত কথাগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রুতিকটু হইয়া উঠে। যাঁহাদের সহিত আমার স্থায়ী ব্যবহারের সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে আমি বন্ধুরূপেই পাইতে ইচ্ছা করি—এই জন্যই এইরূপ পত্র ব্যবহার আমার পক্ষে একান্ত অপ্রীতিকর—কতকটা সেই কারণেই ইহা লিখিতে আমার বিলম্ব হইল। যাহা হউক ক্ষমা করিবেন : ইতি ৩রা মাঘ ১৩২৬ ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে রাধারাণী দেবীর লেখা সেকালের বাংলা সাহিত্যে তোলপাড় করেছিল। দুটি নাম যে আসলে এক নাম জানা যায় অনেক পরে। রাধারাণী দেবীর ১৩৪৪ সালের ২৯ চৈত্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি তুলে দিলাম—

শ্রীচরণকমলেষু, সম্প্রতি আমার একখানি বই (বনবিহগী) বেরিয়েছে। আমাদের জীবনের সুরুচি সৌন্দর্যজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা এ সমস্তই পেয়েছি আমরা আপনার কাছে। আজ আমরা জীবনে যা কিছু সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ করি তার জন্য বিপুল ঋণ আপনারই নিকট জমে উঠেছে। বিধাতার কাছে মানুষের ঋণের মতোই আপনার কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধের অতীত। সেই ঋণ-স্বীকৃতির তুচ্ছতম নিদর্শনস্বরূপ এই বইখানি আপনার কাছে পাঠালেম।

আমার সখী অপরাজিতা তাঁর একাধিক পুস্তক উৎসর্গে গুরুদক্ষিণা দানের প্রয়াস পেয়েছে। আমার সে স্পর্ধা সত্যই নেই। দয়া করে বইখানি পড়লেই আমি ধন্য হব। আমি জানি আমার এ রচনার কোনই মূল্য নেই, তাই মতামত চেয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে কুণ্ঠিত। আমাদের উভয়ের আন্তরিক ভক্তি প্রীতিবিমিশ্র নববর্ষের প্রণতি পাঠালাম। স্নেহানুরক্ত রাধারাণী।

বেলজিয়াম থেকে ৯-৮-১৯৩২ সালে ভিন্টারনিৎজের একখানা চিঠি আশ্চর্য-জনকভাবে থেকে গেছে। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপ থেকে প্রথম অতিথি অধ্যাপক হয়ে আসেন সিলভাঁ লেভি। তারপর ভিন্টারনিৎজ। সংস্কৃত সাহিত্যে এত বড় পণ্ডিত জন্মায়নি। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থেকে সকলের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং একে অন্যের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সে সময় ভিন্টারনিৎজের স্ত্রীবিয়োগ হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত শোকবার্তার জবাবে এই চিঠি। চিঠিতে শান্তিনিকেতনের প্রতি টান, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা, কাজের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় আছে। তিনি লিখেছেন—

I need not say how happy I should be to come once more to Santiniketan Ashram which has never ceased to be near and dear to my heart.

ভিন্টারনিৎজ চিঠি শেষ করেছেন 'নমস্কার' শব্দটি ইংরেজিতে লিখে। চিঠিটা দামী কাগজে কালো বর্ডারে ঘেরা। চিঠির কোণে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য আছে—"শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টির জন্য।"

টাকার নামে একজন ইউরোপীয় শ্রীনিকেতনে ছিলেন বহুদিন। ১৯৩১ সালের ২২ এপ্রিল বুদাপেস্ত থেকে টাকারকে লেখা জুলিয়াস জার্মানেসের—তিনিও শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন—একটি দীর্ঘ চিঠিতে দেশে ফেরার পর শান্তিনিকেতনের স্মৃতিতে তাঁর মন কেমন ভরপুর হয়ে আছে তার বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। ধানখেতের মাঝখানে দাঁড়ানো একা একটি গাছ, হাতে ধরে আনন্দিত সাঁওতালদের ঘরে ফেরা, নীল আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না ইত্যাদি দৃশ্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি বলেছেন—যেন তিনটি বছর একটা অন্য গ্রহে ছিলাম। নিজের দেশ সম্পর্কে বলছেন—**History restless vain and superficial world of earthly happiness.**

আর ভারতবর্ষে? শান্তিনিকেতন?

—No grudge no illwill no disappointment remained in our heart which forgot everything but the starry sky the placid moon and the human affection which often stumbles against its will.

১৯৩২ সালে লেখা এণ্ডরুজ সাহেবের কয়েকখানা চিঠিতে তখনকার ভারতবর্ষ ও তখনকার শান্তিনিকেতনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। লণ্ডন যাওয়ার পথে 'ক্যাথে' জাহাজে থেকে 'চার্লি' তাঁর 'প্রিয়তম গুরুদেবকে' লিখছেন,

I have cabled to Mahatmaji, asking him to take no irrevocable step before I come.

তিনি জানান বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সঙ্গে একই জাহাজে বিলেত যাচ্ছেন এবং

"I think the question of the Poona pact and Bengal was fully discussed and he himself took it up on the Committee."

লণ্ডনে পৌঁছেও বিশ্বভারতীর অর্থ চিন্তা এণ্ডরুজের মাথায় ঘোরে। ১১২ নং গাওয়ার স্ট্রিট থেকে ১৯৩২ সালের ৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথকে লেখেন বিশ্বভারতীর জন্যে ১২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫৮০ টাকা তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল আরো বেশি টাকা পাঠাবার। না পাঠাতে পেরে কুণ্ঠিত। তবে শীঘ্রই আরো টাকা পাঠাবার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর ছোটভাইয়ের মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার এবং সেই জন্যে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার কথাও চিঠিতে আছে।

১৬ জানুয়ারি কেপ টাউন থেকে রথীন্দ্রনাথকে আবার লেখেন, বিশ্বভারতীর জন্যে প্রতিশ্রুত টাকা তিনি সংগ্রহ করে চলেছেন। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস দিয়েছেন ৫ হাজার টাকা, ভবনগরের প্রধান মন্ত্রী পি ডি পট্টভি দেবেন আরো পাঁচ হাজার এবং স্যার ফিরোজ শেঠনা অর্থ সাহায্যে রাজি। ৪ মে লণ্ডন থেকে রথীবাবুকে আবার চিঠি, ২ হাজার টাকার চেক পাঠালাম। মহাত্মার অনশনে তিনি কত উদ্বিগ্ন তার কথাও আছে। বাকিংহাম থেকে একটা টেলিগ্রামও পাঠান—গ্ল্যাডলি সেনডিং টু থাউজেণ্ড রুপীজ।

এই হচ্ছেন চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ—রবীন্দ্রনাথের বড় ইংরেজ, সাধারণ মানুষের দীনবন্ধু, গান্ধীজির চার্লি—যিনি মৃত্যুর ঠিক আগে কলকাতার এক হাসপাতালে বন্ধু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হাত ধরে বলেছিলেন, "মোহন, স্বরাজ আসছে।" সাত বছর পর স্বরাজ এল, কিন্তু এণ্ডরুজের মতো অন্য কোন মহৎ মানুষ আর এলেন না।

———

সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়

এই রচনাটি প্রকাশিত হয় যুগান্তর পূজাসংখ্যায় (১৯৫৮)। রচনাটি লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য একজনেরই। তিনি প্রফুল্ল রায়। অন্য যাদের বই থেকে আমি তথ্য নিয়েছি, তাঁদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। অ. চৌ.

অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন। ছয়ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, সবল পেশী। আজানুলম্বিত মহাভুজ বৃষস্কন্ধ সিংহগ্রীবা। বিধাতা উজাড় করে দিয়েছেন স্বাস্থ্য, দিয়েছেন সৌন্দর্য। এমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, এমন রূপবান জীবনশিল্পী কোটিতে গোটিক।

ছেলেবেলা থেকে তিনি লড়েছেন কুস্তি, সাঁতরে এপার ওপার করেছেন পদ্মা, ঘোড়া ছুটিয়েছেন প্রবল আনন্দে। সংগীত ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সমানে চলেছে স্বাস্থ্যচর্চা। তাই এমন মজবুত 'শরীরে অসুখ সহজে এসে আক্রমণ করতে পারেনি। তিনি নিজেই বলছেন ঃ শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত, তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারত না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুসখুসনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর পেট কামড়ায়নি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাইনি পেটে, কেবল দরকারমত মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে।'

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের দৈবাৎ কখনো জ্বর হয়েছে। তাকে জ্বর না বলে বলা হত গা-গরম। বাড়ির ডাক্তার নীলমাধববাবু। তিনি এসে বিধান দিতেন উপোস আর ক্যাস্টর অয়েলের। তিনদিনের পরে পথ্য দেওয়া হত মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, তাঁর 'শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।' "ছেলেবেলা" বইয়ে তাঁর উক্তি ঃ 'জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা (ক্যাস্টর অয়েল)। কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোঁড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানিনে।'

সেই কারণেই সতেরো বছর বয়সে যখন তিনি বিলেত গেলেন, প্রতিদিন কাকভোরে বরফগলা জলে স্নান করতেন। গৃহকর্ত্রী মিসেস স্কট মানা করতেন, ভয় দেখাতেন অসুখের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন অসুখই করেনি। শীতের দেশের ভোরে বরফজলে রোজ স্নান করেও অসুখ না করায়, রবীন্দ্রনাথের

ভাষায়, কারণ একটিমাত্রই, 'ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ।'

তারও আগে উপনয়নের পর যখন বাবার সঙ্গে হিমালয় বেড়াতে যান, তখনও ভোরে ঠান্ডা জলে স্নান করতেন আর লাঠি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতেন। কিন্তু অসুখের বালাই ছিল না। শিলাইদা গিয়েও ঘুরে বেড়িয়েছেন যত্র-তত্র। নদী নালায় খালে বিলে মাঠে। কিন্তু রোগে ধরেনি তাঁকে। অতুলনীয় স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর দীর্ঘজীবন লাভের আর একটি কারণ ছিল পরিমিত আহার এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা। এই প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য নেওয়া যাক। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেনঃ ক্লান্তি শব্দটা বাবামশায়ের অভিধানে ছিল না। তাঁর ঘুম ছিল খুব কম। কখন যে তিনি ঘুমোতেন, আমরা কেউ জানতে পারতাম না। প্রতিদিন তিনটেয় তিনি উঠতেন। তারপর উপাসনায় বসতেন। তখনও পুব আকাশে একফোঁটা আলো দেখা যেত না। ঠিক চারটেয় চা। চারটে থেকে সাতটা এক নাগাড়ে লেখা। সাতটায় প্রাতরাশ সেরে আবার লেখা। লেখার ফাঁকে ফাঁকে চা বা কফি। একনা গাড়ে বেলা এগারোটা পর্যন্ত লিখে যেতেন স্নানে। স্নানের ফাঁকে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিতেন। স্নানের পরই বাবামশায় খেতে বসতেন। খাওয়ার পর ঘুম তো নয়ই, বিশ্রামও করতেন না। ঘন্টাখানেক কোন পত্রিকা বা বইয়ের পাতা উলটিয়ে আবার লিখতে বসতেন। বিকেল চারটেয় আসত চা। সঙ্গে নোনতা কিছু। রাতের খাবার সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে। রাতে বেশি পছন্দ করতেন ইংরেজি খাবার, দুপুরে পুরো স্বদেশী। রাত্রে খেয়েদেয়ে আবার একটানা রাত বারোটা পর্যন্ত লেখা বা পড়া। কেবল বিশিষ্ট অতিথি এলে নিয়ম-ভঙ্গ হত এই রুটিনের।

এলোপ্যাথির ধারেকাছেও তিনি যেতেন না। সামান্য কিছু হলে নিজেই নিজের ডাক্তার সেজে দিতেন বায়োকেমিক ওষুধ। কালি ফস বা অন্য কিছু। কবিরাজী পাচনাদিতে অনাসক্তি ছিল না। নিমের পাতার রস রোজ খেতেন। গ্লাসের পর গ্লাস। আমলকি হরিতকি খেতেও পছন্দ করতেন বেশ। স্বাস্থ্যের কারণে ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দেওয়া লুচি এবং কাঁচা সব্জিও খেয়েছেন কিছুদিন।

বসন্ত টাইফয়েড কলেরার টিকা বা ইনজেকশন রবীন্দ্রনাথ পরেও নেননি। এই সম্পর্কে "গুরুদেব" বইয়ে রাণী চন্দ লিখছেনঃ একবার বোলপুরে ও আশেপাশের গাঁয়ে বসন্ত, জলবসন্ত দেখা দিল। দেখতে দেখতে চারদিকের আব-হাওয়া আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। শান্তিনিকেতন একটুখানি পথ। রোগ চলে আসতে কতক্ষণ? ডাক্তারবাবু (ডাঃ শচীন মুখার্জি) আশ্রম ঘুরে ঘুরে সবাইকে টিকা দিয়ে শেষে এলেন গুরুদেবের কাছে। তিনিই একমাত্র বাকি এখন। তাঁকে টিকা দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এবারকার মতো। কিন্তু গুরুদেবকে রাজি করানোই এক সমস্যা। আড়াল থেকে সকলে ডাক্তারবাবুকে ইশারায় তাগিদ

দিতে লাগলেন, যে করেই হোক গুরুদেবকে টিকা দিয়ে দিতে। ডাক্তারবাবু ভয়ে ভয়ে গুরুদেবের কাছে এগিয়ে এলেন। গুরুদেব এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'আমার কাছে এসেছ কেন ডাক্তার? যাদের ফিরে ফিরে বসন্ত আসে, তাদের টিকা দাওগে যাও। আমার অত বছরে বছরে বসন্ত আসে না।' এই কথা বলে হেসে পাশে দাঁড়ানো সেক্রেটারীর (অনিলকুমার চন্দ) দিকে কটাক্ষ করে লেখায় মন দিলেন। ডাক্তারবাবু যে অবস্থায় ঢুকেছিলেন, সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও রক্তমাংসের মানুষ, ভঙ্গুর দেহধারী লৌকিক জীব। বার্ধক্যে জরা একদিন এসে আক্রমণ করে ওই অনিন্দ্যকান্তি বলিষ্ঠ দেহ। আরো পরিতাপ, যে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে তাঁর ছিল ভীতি, সেই অস্ত্রোপচারের জের হিসাবেই তিনি চিরবিদায় নিলেন, অমন রূপ-সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্য নশ্বর হয়ে গেল। যে এলোপ্যাথি চিকিৎসাকে তিনি চিরকাল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন প্রবল আপত্তিতে, সেই এলোপ্যাথি ওষুধের আশ্রয় নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁকে নিতে হয়েছিল শেষ বয়সে। তিনি বলতেন, 'বিদায় নেবার আগেই এই দেহখানা সুন্দর অবস্থাতেই বিধাতাকে ফিরিয়ে দিতে চাই।' কিন্তু তাঁর আরো দশটা ইচ্ছা যেমন অবহেলা করা হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর শেষ ইচ্ছাতেও আমরা কর্ণপাত করিনি। সারা জীবন যিনি জীবনশিল্পী সেজে সুন্দরের উপাসনা করলেন, যিনি শেষ দিন পর্যন্ত দু'চোখ ভরে পৃথিবীর আলো-বাতাস পরখ করতে চাইলেন, সেই তিনিই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আমাদের মাঝখানে।

কুমার জয়ন্তনাথ রায়কে ১৯৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন (দ্র. ভাদ্র ১৩৪৮ প্রবাসী): 'শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করিনি। ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে। যদি মৃত্যুর পূর্বে হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করি না।'

অস্ত্রাঘাত মানেই তো এক ধরনের অপঘাত। অস্ত্রাঘাতের জের হিসাবেই তো তিনি মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় করলেন। আর হাসিমুখে বিদায়? তাও হল না। কী নিদারুণ যন্ত্রণার ছাপ মুখে নিয়ে চলে গেলেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনে উপস্থিত সকলেই তা' দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাতবৌ অমিতা ঠাকুরের কাছে শোনা, প্রতিমাদেবী বারবার আক্ষেপ করতেন আর বলতেন, বাবামশায়ের যাবার সময়ও সেই যন্ত্রণার চিহ্ন চোখে মুখে থেকে গেল।

তাছাড়া অনেকেই জানেন না, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল ঠিক কিসে? কোন্ রোগে? ইউরিনের গণ্ডগোল, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ডের উৎপাত অসুখের মূল কারণ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে কালিম্পঙে ইউরিন বন্ধ হয়ে যে অসুখ বাধায়, তারই জের চলে ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট অবধি। তার আগেও মাঝে মাঝে একই গণ্ডগোল যদিও হত, ভীষণ রূপ কিন্তু নেয় পরে।

আর একটি ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়া দরকার। প্রোস্টেটের অপারেশন তাঁর

হয়নি। ১৯৪১ সালে ৩০ জুলাই যে ছোট অপারেশন হয় পঁচিশ মিনিটে, তার ডাক্তারী নাম সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমি। অর্থাৎ ফুটো করে আলাদা নল বসিয়ে ইউরিন বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু বড়ো অপারেশন দূরে থাক, ওই ছোটো অপারেশনেই হয়ে গেল সেপটিক, ইউরেমিয়া শরীরে বসল জাঁকিয়ে। ডাক্তাররা বলেছিলেন তিন দিন পার হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তিনি তিন দিনের মাথাতেই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর ৬ আগস্ট একুশে শ্রাবণ রাখী-পূর্ণিমার জোয়ারে শরীর আরো অবনতির দিকে যায়, তাঁকে আমরা আর ধরে রাখতে পারিনি। বাইশে শ্রাবণ সব শেষ।

তবে এমন সন্দেহ যেন কারো না জাগে যে, চিকিৎসায় ত্রুটি হয়েছিল। তাঁকে দেখেছেন সেকালের সব বড়ো বড়ো ডাক্তার। স্যার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, ললিতমোহন ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ বসু, অমিয় সেন, সত্যসখা মৈত্র, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, অমিয় বসু, জিতেন দত্ত, রামচন্দ্র অধিকারী, সত্যেন রায়, প্রেমনীহার দে, দীননাথ চ্যাটার্জি, অমর গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অপারেশন করেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক ললিত ব্যানার্জি। আর-একটি কথাও বলা দরকার। তখন পেনিসিলিন জাতীয় কোন ভালো এন্টি-বায়োটিক আবিষ্কার হয়নি। সম্বলের মধ্যে এম অ্যান্ড বি পিল। প্রোস্টেট অপারেশনও দিল্লি ছাড়া কোথাও বিশেষ হত না।

রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রাঘাতের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কবিরাজী করাতে। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ শুরু করেছিলেন চিকিৎসা। তার আগে চিকিৎসা করেন কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায়। স্যার নীলরতনও ছিলেন অপারেশন-বিরোধী, কিন্তু বিধান রায় ও অন্যান্য ডাক্তার অপারেশন চান। দ্বিমতে বিপন্ন পুত্র রথীন্দ্রনাথ শেষ মুহূর্তে অপারেশনে সায় দেন। ডাঃ রায়ের মত ছিল, অপারেশন ছাড়া এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। যদি না করা হয়, তাহলে পরে জাতির কাছে অপরাধী থাকতে হবে। আর রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'তার কী দরকার। এমনিতেই ক'টা দিন আর বাঁচব। যে ক'দিন বাঁচি, তাতে দৈহিক গ্লানি একটু কম থাকলেই ঢের।' কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা শোনে না। শোনা সম্ভবও নয়।

আমার আলোচ্য, রোগপীড়িত সেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্য দর্শন, সংগীত-চিন্তা, দেশপ্রেম নিয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। মানুষ রবীন্দ্রনাথ আর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অসংখ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দস্তাপহারক কীভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের সম্পদ হরণ করে নিলেন এবং তার আগে জীবনভর কী কী অসুখ-বিসুখ হয়েছে সেই কাহিনীই আজ সবিস্তারে লিখতে বসেছি।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হয়েছে ১৯৪১ সালে। তারপর দীর্ঘদিন পার। তাঁর অধিকাংশ চিকিৎসক ও নিকট আত্মীয় পরলোকে। চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু

তথ্যও বিস্মৃত। তবু বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনের সম্পদ সন্ধান করে আবিষ্কার করেছি অনেক অজানা দলিল, অনেক অজানা তথ্য। তাই দিয়ে এবার সাজালাম আমার রবীন্দ্র জীবন-চর্চার এই অভিনব উপহার। রবীন্দ্রসদনের অমূল্য নথি-পত্র ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়ার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. সুরজিতচন্দ্র সিংহের কাছে। আর কৃতজ্ঞ রবীন্দ্র অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত, অবেক্ষক সনৎকুমার বাগচি, সহকারী অবেক্ষক গৌরচন্দ্র সাহা এবং আলোকচিত্র-শিল্পী বিশু পালের কাছে।

রবীন্দ্রসদন থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন দলিল ছাড়াও আমি সাহায্য নিয়েছি প্রতিমাদেবী, রাণী চন্দ, রাণী মহলানবিশ, মৈত্রেয়ী দেবী, অমিতা ঠাকুর, ডাঃ অমিয়কুমার সেন, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের সাক্ষ্য থেকে। কখনও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে এবং কখনও তাঁদের লেখা স্মৃতিকথা থেকে সঞ্চয় করেছি তথ্যমালা। তাছাড়া রথীন্দ্রনাথ ও মীরাদেবীর পিতৃস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্র ইত্যাদি থেকেও প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছি। বিশেষভাবে ঋণী রাণী চন্দের "গুরুদেব" ও রাণী মহলানবিশের "বাইশে শ্রাবণ" বই দুখানির কাছে। এই দুখানি অপরিহার্য গ্রন্থের রচয়িত্রী-যুগলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই রচনায় এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের ইসিজি, ইউরিন ও ব্লাড রিপোর্ট, অসুস্থতার সময় টেম্পারেচার চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করে এক লোকোত্তর প্রতিভার নিদান শাস্ত্রমত শরীরের অবস্থাটা দেখাতে চেষ্টা করেছি। তাঁর হার্টের অবস্থা কেমন ছিল, ইউরিন বা ব্লাড কেমন, ক্লোরোস্টরাল কী রকম—সবই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে কে কী ওষুধের প্রেসক্রিপশন করেছেন, কোথা থেকে তা কেনা হয়েছে এবং সেবক-সেবিকারা কী পথ্য দিতেন, কী ওষুধ কখন খাওয়াতেন তার বিশেষ বিশেষ দিনের চার্ট তুলে দিয়েছি।

আর একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো। রবীন্দ্রনাথের চোখ কান ও দাঁত মজবুতই ছিল। তবে মধ্য তিরিশে চশমা নিয়েছিলেন। শিলাইদা যাবার পথে নবীন সেনের সঙ্গে যখন রানাঘাটে দেখা হয়, তখন তাঁর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। শেষ জীবনে কানে শুনতেন কম। তার জন্যে আক্ষেপও ছিল প্রচুর। দাঁতের মাড়ি দু-একবার ফুলেছে শেষ জীবনে।

আর ছোটোবেলার স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি যতোই বড়াই করুন না কেন, পরে মাঝে মাঝেই তাঁর সামান্য অসুখ করেছে। তবে ১৯৩৭ সালের ইরিসিপেলাসের আগে তেমন কিছু নয়। তবু সেই ইরিসিপেলাস এবং আশী বছর বয়সে তাঁর রোগশয্যার বিবরণ দেওয়ার আগে ছোটখাট অসুখের ধারাবাহিক বিবরণ এই রচনায় সংযুক্ত করেছি। অর্শ বাদ দিলে ১৯৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর অসুখ ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্দি বা পরিশ্রমজনিত অবসন্নতা। কিংবা জ্বর। তবে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল অর্শ রোগ। রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতিতে

বলছেন ঃ অপেক্ষাকৃত ও পরিণত বয়সেও এক অর্শের কষ্ট ছাড়া তাঁর শরীরে ব্যারামের কোন উপসর্গ ছিল না। ১৯১২ সালে (?) অস্ত্রোপচারের ফলে অর্শ থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। শেষ বয়সে জরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি এক প্রকার পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

কোমরেও ব্যথা হত মাঝে মাঝে। ১৮৮৭ সালে দার্জিলিং থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন তাঁর কোমরের ব্যথার কথা। ব্যথা উপলক্ষে সর্ষের তেল মালিশ করার আভাসও আছে। তাই নিয়ে ঠাট্টা করে কবিতাও লিখেছেন চিঠিতে ঃ

আমার কোমর আমারই কোমর
বোঁচনি তো তাহা কাহারও কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক, তা হোক
আমার কোমর আমারই আছে।

তবে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নশ্বর দেহে যতটুকু যন্ত্রণা হবার, ততটুকুই, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

।। দুই ।।

অসুখ-বিসুখের যথাসম্ভব ধারাবাহিক বর্ণনা দেবার সূচনায় প্রথমেই উল্লেখ করি কয়েকখানি চিঠির। এইসব চিঠিতে কিছু কিছু অসুখের বর্ণনা আছে। তাছাড়া অমলা দাশের জবানিতে জানতে পারি, একবার যৌবনে খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেওয়ায় এবং অত্যধিক পরিশ্রমে মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান। তার জন্যে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তাঁর কথা না শোনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বান্ধবী অমলা দাশের কাছে।

১৯০৪ সালের এপ্রিলে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন: ভাই, সেই ঔষধ তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ো। আমি কালই মজঃফরপুরে রওনা হব। অতএব সত্বর পেলে ভালো হয়।

কী অসুখ হয়েছিল তখন? আর ওষুধই বা কী? মনে হচ্ছে কবিরাজী। নইলে বড় শিশিতে তৈরি করে পাঠানোর অনুরোধ করতেন না। তার প্রমাণ মজঃফরপুরে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার শ্বশুরালয় থেকে পাঠানো প্রিয়নাথ সেনকে আর একখানা চিঠি। তিনি ১৯০৪ সালের ২৮ এপ্রিল বলছেন: 'ভাই, এখানে আসিয়া ভালো আছি। তাহার একটা কারণ কুঁড়েমি—আর একটা সূক্ষ্ম আয়ুর্বেদ। ওষুধগুলোর নাম করিতে পারিলাম না, শ. ছে বৃদ্ধ বয়সে জনসমাজে কলঙ্ক রটনা হয়।'

মনে হচ্ছে, শেষের বাক্যটি পরিহাস। তবু জানতে ইচ্ছে করে, ওষুধগুলোর নাম কী? কোন সালসা-টালসা নয়তো?

১৯১৫ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আর একখানা চিঠি: 'রথী, কিছুদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে উৎপাত দেখা দিয়েছে, সেটা শারীরিক ব্যামো। সে কথা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। তার দুটো কারণ আমার মনে আসছে। প্রথম, কিছুকাল থেকেই একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে তার সন্দেহ নেই। যখন আমার কানে এবং মাথার বাঁ দিকে ব্যথা করতে লাগল তখন বুঝেছিলুম সেটা ভালো লক্ষণ নয়। যে-কোন কাজ করতুম অত্যন্ত জোর করে করতে হত। আর মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি অকারণে লেগেই ছিল।

তারপর ইউনান ডাক্তার এর জন্যে যে ওষুধ দিলেন সেটা হচ্ছে খুব হাই ডাইলুশন। এটা কেন দিলেন আমি বুঝতে পারি নি। কানাইবাবু বলেছিলেন,

এতে আমার অনিষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস, এই ওষুধের ফলে আমার কানের ব্যথা সেরে গেল বটে, কিন্তু এই ওষুধের মেনটাল্ এফেকট, সে আমাকে চেপে ধরেছে। ওর মানসিক লক্ষণ নীচে লিখে দিচ্ছি—

Melancholy, with inquitude and desire to die.—Irresistable impulse to weep. Sees obstacles everywhere. Hopeless, suicidal, desperate. Great anguish excessive scruple with conscience. Despair of oneself and others. Grumbling quarrelsome humour. Alternate peevishness and cheerfulness.

মেটিরিয়া মেডিকাতে যা লিখেছে এর সব লক্ষণই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করছে।

এই ধরনের মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে বার বার এসেছে। ১৯১১ সালে "ডাকঘর" রচনার সময় এই ধরনের ভাবনা তাঁকে গ্রাস করেছিল। সেই সময় তিনি একটি উইলও রচনা করে ফেলেন। তবে লক্ষণীয়, কিছুদিন পরই তিনি আবার মৃত্যুচিন্তার কালো গুহা থেকে জীবনের আলোয় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১৯২৪ সালে মাদ্রাজ থেকে ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখছেন : 'এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁছেছি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হব। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আবর্তে দেহমন ভেসে ছিঁড়ে বেঁকে-চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়েছিলুম।' সেবার তাঁর পেরু যাওয়ার কথা।

১৯২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর 'পশ্চিমযাত্রার ডায়ারি'তে মন্তব্য : 'অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিনতলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি।'

কী অসুখ তার বর্ণনা দেন নি। তবে বড় রকমের কিছু যে নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পেরুর পথে আর্জেন্টিনা। আন্দেস জাহাজ থেকে লিখছেন : 'বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি। এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে। বিছানা ছাড়া গতি রইল না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত। আপনার বুকের উপর দুর্বলতার বিষয় একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে। মাঝে মাঝে মনে হত এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের ছাপ।

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনেস এয়ারসে এসে জাহাজ ভিড়ল। হোটেলে উঠলেন। সঙ্গী-সচিব এলমহার্স্ট কবির অসুস্থতা দেখে স্থানীয় ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার এসে বললেন, পেরু যাত্রা বন্ধ করতে হবে। কারণ আন্দেস গিরিপথ দিয়ে ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না। কবির হৃদযন্ত্রের যা অবস্থা তাতে সম্ভব নয় কিছুতেই। অসুস্থ কবি আতিথ্য নিলেন ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর। সান ইসিদ্রোর বাগান-বাড়িতে থেকে ওকাম্পোর সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলেন।

১৯২৫-২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার সামান্য অসুস্থ হয়েছিলেন। হার্টের গণ্ডগোল। সেবার ইউরোপে যাবার কথা। সঙ্গে যাবেন প্রশান্ত ও রাণী মহলানবিশ। যাবার মুখে বিপত্তি। "কবির সঙ্গে ইউরোপে" বইয়ে রাণী মহলানবিশ লিখছেন : বিকেলে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি তাঁর শরীর ভালো নেই। দৌড়লাম শর্ট স্ট্রীটে মেজমামাকে (নীলরতন সরকার) ধরব বলে। আমি পৌঁছবার আগেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। রাত পর্যন্ত বসে থেকে মেজমামাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম জোড়াসাঁকোতে। মেজমামা বললেন, কবির হার্টের এই রকম দুর্বলতা নিয়ে এখন বিদেশে যাওয়া ঠিক হবে না। কাজেই কাল তাঁর যাওয়া বাতিল হয়ে গেল।

১৯২৬ সালের মে মাসে কবি আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। এবার প্রোগ্রাম আরো বেশি। বিলাতের পথে মাদ্রাজ পৌঁছবার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৭ মে জাহাজ ছাড়ার কথা। কিন্তু ছেড়ে দিলেন। বিশ্রাম নেবার জন্যে অ্যানি বেশান্তের অতিথি হয়ে গেলেন আডিয়ারে। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীর মন ভালো হল।

তারপর ইউরোপ যাত্রা। বিরাট সফর। প্রতিদিন প্রোগ্রামে ঠাসা। বক্তৃতা সম্বর্ধনা আর ঘোরাঘুরিতে তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে ১৯২৬ সালের ১৬ অক্টোবর তাঁর খুব সর্দি ও অল্প জ্বর হল এবং বাতিল করা হল সব এনগেজমেন্ট। তাঁকে দেখতে আসেন ভিয়েনার বড় ডাক্তার ডক্টর ভেংকেবাক। রাণী মহলানবিশ লিখছেন : ডাক্তার প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন পাছে কবির এই জ্বরটা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে দাঁড়ায়। এদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা বেজায় আতঙ্ক। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। পরের দিন সকালে জ্বর ছেড়ে গেল। যদিও বিকেলে অল্পক্ষণের জন্যে একবার ৯৯ ডিগ্রি হয়েছিল। কাল আবার তাও হয়নি। ডাক্তার কবিকে একেবারে শুইয়ে রেখেছেন এবং এ সপ্তাহটা লোকজন ক[illegible]া সাথেই দেখা করতে বিশেষ করে বারণ। ডাক্তার বলেছেন একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম করবার জন্যেই এটা হয়েছে। দেশে ফিরবার আগে ওঁর কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার—দক্ষিণ ফ্রান্সে কিম্বা সুইজারল্যান্ডের কোন জায়গায় গিয়ে। হার্টের কোন গোলমাল নেই। নার্ভের উপর স্ট্রেইন হয়ে এটা হয়েছে।

বিশ্রাম নিতে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যান হাঙ্গেরির ব্যালাতোন ফ্যুরেড বলে এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়। সেখানে তাঁর ডাক্তার ছিলেন ব্যারন কোরানি। সেখানে স্পেশাল বাথ, থার্মাল বাথ নিয়ে কবি বিশেষ উপকার পান।

অসুস্থতার জন্য কবি সেবার পোল্যান্ড ও রাশিয়া যেতে পারেন নি। বুদাপেস্টের কাছে ব্যালাতোনে বিশ্রাম নিয়ে যুগোস্লাভিয়া চলে যান।

১৯২৮ সালে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'ডায়াথার্মিক' চিকিৎসা হয়। এই সম্পর্কে ৯ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ডায়াথার্মিক চিকিৎসা শুরু হল। মাসখানেক লাগবে। কিছুদিন গেলে বোঝা যাবে কেমন থাকি।'

৩০ আগস্ট লিখছেন আর একখানা : আজ ডাক্তারের ডায়াথার্মিক থেকে ছুটি পেয়েছি। সুতরাং কাল যাব জোড়াসাঁকোয়। তার দুই একদিন পরেই শান্তিনিকেতন রওনা হব। এখানে আমাকে যে ডায়াথার্মিক দিচ্ছে, সেটা আমার দুর্বলতার জন্যে নয়, আমার যে প্রস্রাবের একটু উৎপাত ছিল, তারই জন্যে। গ্ল্যাণ্ডটা এখন কমে গেছে।

১৯৩০ সালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারকে দিয়ে শরীর পরীক্ষা করান। বিদেশে গেলেই চেকআপ করিয়ে নিতেন। ১৯৩০ সালের ২৪ অক্টোবর কানেকটিকাট থেকে রথীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন : 'ডাক্তারের কাছ থেকে ছুটিপেলেই ফিলাডেলফিয়াতে যাব। সেখানে কোয়েকারদের সহযোগে কিছু কাজ করতে পারব। আমার ডাক্তার খুব জবরদস্ত লোক। প্রথমেই এ পাড়া থেকে এণ্ডরুজকে নির্বাসিত করে দিয়েছে। বললে, ঐ মানুষটা যখন তখন ঘরে ঢোকে, আর বকর বকর করে তোমাকে ক্লান্ত করে দেয়। তা কিছুতেই চলবে না।'

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রাখা আছে রবীন্দ্রনাথের একমেব ই সি জি রিপোর্ট। নথি সংখ্যা ৪৯১। এই ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম করা হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৭ মে, প্যারিসে। ডাক্তার ছিলেন জে ওয়ালজের। ঠিকানা ১৪৮ বুলেভাদ মালেশেরে, প্যারিস, ওয়াগবান ৩৪৫৮।

কবির হৃদয় কেমন ছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর রচনায় আর তাঁর আচরণে। হৃদয়ের কথা বলতেও তিনি বরাবর ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তাঁর হৃদয়ের অবস্থা উনসত্তর বছরের জন্মদিনে কেমন ছিল, তার একমাত্র সাক্ষী এযাবৎ অগোচর এই রিপোর্টটি। ডাক্তারদের মতে রিপোর্ট অনুযায়ী হার্টের অবস্থা ভালোই।

সম্ভবত সেই সময় প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি দাঁতও তুলিয়েছিলেন অন্য এক ডাক্তারের কাছে। দাঁত তুলতে গিয়ে তিনি বিষম বিরক্তও হয়েছিলেন। চেম্বারে ঢুকে ফরাসীতে টুকিটাকি কথাবার্তা বলা শেষ হতে না হতেই ডাক্তার তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে হঠাৎ একটা দাঁত তুলে দেন। রবীন্দ্রনাথ রেগেমেগে বেরিয়ে সোজা চলে যান হোটেলে। বাইরে অপেক্ষমান রথীন্দ্রনাথ ও লেনার্ড এলমহার্স্ট টের পান কিছু একটা ঘটেছে। হোটেলে ফিরে রবীন্দ্রনাথ কারো সঙ্গে একটি কথাও নাকি বলেন নি। পরদিন যন্ত্রণা থামলে বলেন, এতদিন জানতুম ফরাসীরা ভদ্রতা জানে, কিন্তু এ কী রকমের ভদ্রতা, আমাকে না বলে টলে ডাক্তার আচমকা দাঁত তুলে নিলে! রাণী চন্দের কাছে শুনেছি, রথীন্দ্রনাথ তাঁদের অনেক বছর পরে বলেন, ওই ফরাসী দাঁতের ডাক্তার ভুল করে অন্য ভালো দাঁত তুলে ফেলেন।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের দাঁত তোলার এই একটিই ঘটনা জেনেছি। মোটামুটি তাঁর দাঁত মজবুতই ছিল। সেবার প্যারিসে তাঁর দাঁতের মাড়ি নাকি ভীষণ ফুলে গিয়েছিল।

পারস্য যাওয়ার মুখে ১৯৩২ সালে সামান্য অসুখে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। রথীবাবুকে পরিহাসের সুরে লিখছেন : 'রথী, অল্প কিছুদিনের জন্যে অসুখ বাধিয়ে ঠিক পারস্যে যাওয়াটাকে কাঁচিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু লোকের মুখে ও কাগজপত্রে যতটা রটে গেছে আমার শরীর সে পরিমাণে খারাপ হয়নি। বরঞ্চ এখন ব্যামো কাটিয়ে উঠে শরীরটা মোটের উপর ভালোই বোধ হচ্ছে।'

১৯৩২ সালে তিনি প্রথম বিমানে পারস্য যাত্রা করেন। তখনও ছিলেন ক্লান্ত ও অসুস্থ। "পারস্যযাত্রী" বইয়ে লিখছেন : '১৯৩২ সালের ১৬ এপ্রিল। সকালে শিরাজ যাওয়ার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত, তবু অভ্যাসমত ভোরে উঠে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যান। শরীরের সামান্য গোলযোগ থাকলেও তাঁর কার্যসূচীর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সব ধকল সহ্য করেছেন সেই বয়সে।'

শান্তা দেবীকে লেখা আর একখানা চিঠি : 'শান্তা, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোন কাজ অত্যল্প মাত্রেও করা আমার পক্ষে একান্ত অরুচিকর ও শ্রান্তিজনক হয়েছে।'

রাণী চন্দকে ১৯৩৫-৩৬ সালে লেখা একখানা চিঠি : 'বর্ধমান থেকে ফিরে আসার পর থেকে শরীরটা একটুও ভালো বোধ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন স্বাস্থ্যের ভিত গেছে ভেঙে। রোজ বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি, তারপর সেটা কেটে যায়। হয়ত দলবল নিয়ে পশ্চিম প্রদেশে গেলে সেই উপলক্ষে হাওয়া বদল হতে পারবে। ডাক্তারের মত এই, যকৃৎটা অসদ্ব্যবহার করছে।

আগেই বলেছি, যে রোগ রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল তার নাম অর্শ। প্রথম জীবনে অর্শ রোগে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। নানা রকম চিকিৎসা করেও সুফল পান নি। এমনকি হোমিওপ্যাথি বায়োকেমিক ওষুধেও না। অবশেষে স্থির করেন অপারেশন করাই ভালো।

১৯১২ সালে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে যখন লণ্ডনে, তখন অর্শের উৎপাত বাড়ে, রক্ত পড়া চলতে থাকে। বিলাতে সেবার যাওয়ার অন্যতম কারণ অর্শের চিকিৎসা। তবে অপারেশন করতে আপত্তি। প্রবাসীতে চৈত্র মাসে প্রকাশিত একটি চিঠিতে লিখছেন : 'অ্যালোপ্যাথদের মতে এ রোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। তাহলে অন্তত একমাস হাসপাতালে শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেটা আমার ভালো লাগছে না। তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন আমেরিকার ডাক্তার ন্যাসের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্র চিকিৎসা করালেই হবে।'

আমেরিকায় গেলেন। রইলেন ছয় মাস। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও হল। কিন্তু বিশেষ ফল পেলেন না। এলেন আবার লণ্ডনে। ১৯১৩ সালের এপ্রিলে। এসেই অর্শ অপারেশন করাতে হল। গোড়ায় তিনি তখনও রাজি

হন নি। শেষে রোটেনস্টাইনের বিশেষ অনুরোধে সম্মতি দিলেন। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় শল্য-চিকিৎসককে রোটেনস্টাইনই নিয়ে এলেন এবং জুন মাসের শেষ দিকে ভর্তি হলেন ডাচেস নার্সিং হোমে। অপারেশন হল। দু সপ্তাহ থাকলেন হাসপাতালে। এই তাঁর প্রথম ও শেষ হাসপাতাল প্রবাস। হাস-পাতাল থেকে বেরিয়ে কবি চেইনি ওয়াক-এর বাসায় থাকেন। সেই সময় তাঁকে দেখতে আসতেন কালীমোহন ঘোষ, সুকুমার রায়, সুরেন ঠাকুর। এঁরা সবাই তখন লণ্ডনে। অপারেশনে কাজ হয়।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বড় অসুখ ১৯৩৭ সালে। ৭৬ বছর বয়সে। ইরিসিপেলাস। রাণী চন্দ জানাচ্ছেন: অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কখনো কারও সেবাশুশ্রূষা নিতে চান নি। দেহে কারও হাতের স্পর্শ তিনি পছন্দ করতেন না। বড় জোর পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছি আমরা, কি, লিখতে লিখতে ধরে গেছে আঙুল—দিনান্তে কখনো হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন—দে দেখি আঙুলগুলি একটু টেনে—ঐ পর্যন্ত। দেহ তাঁর এত কোমল ছিল যে, প্রায় সবারই হাত তাঁর গায়ে কড়া লাগত, তাঁর কষ্ট হত। বলতেন, কেবল বৌমার হাতই নরম, অন্যদের হাতে ব্যথা পাই।···

সেবার মাদ্রাজে গেলেন গুরুদেব, কোমরে খুব ব্যথা। সেখানকার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য একটা মালিশের তেল দিলেন। সেই তেল তেমনই পড়ে রইল, মালিশ করাতে রাজি হলেন না। শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখনো ব্যথা তেমনি। বৌঠানই (প্রতিমাদেবী) অনেক কাকুতি করলেন, রাণী দিক একটু মালিশ করে। দেখুনই না একটু উপকার পান কি না। কয়দিন সমানে বলতে বলতে শেষে তিনি রাজি হলেন। কোনার্কের পশ্চিমের ঘরে বসে তখন গুরুদেব লেখেন দিনভর। জানালা দিয়ে রোদ আসে ঘরে। গুরুদেব রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন, মালিশ করে দিলাম। তার পরদিনও গেলাম। ঐ হয়ে গেল। আর বসলেন না মালিশ করাতে। বললেন, বৃথা সময়ের অপব্যয় রে। ও সময়টায় আমার অনেকটা লেখা হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না অসুস্থ হলেও কেউ তার ঘরে থাকুক। সামান্য জ্বর ফ্লু বা সর্দি তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। ১৯৩৭ সালের ইরিসিপেলাসে বা ১৯৪০/৪১ সালে শেষবারের অসুখের আগে তিনি অসুস্থ হলে কদাচিৎ বিছানায় শুয়ে থাকতেন। কেউ কাছাকাছি থেকে হা-হুতাশ করুক, তাও পছন্দ করতেন না। রাণী চন্দ "গুরুদেব" বইয়ে লিখছেন: একবার শ্যামলীতে একদিন গুরুদেবের জ্বর হল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। বৌঠান মীরাদি সবাই ভাবিত হলেন, গুরুদেব অসুস্থ, একা থাকবেন রাত্রে, এ কেমন কথা? অথচ তাঁর বারণ না মেনে কেউ যে কাছে থাকবে, এমন সাহস কারও নেই। কী উপায় করা যায়? অনেক ভেবে ঠিক হল গুরুদেব ওদিকের ঘরে ঘুমিয়ে পড়বার পর সামনের খোলা

উঠোনে পালা করে তাঁরা বসে থাকবেন। তাই হল। গুরুদেব মশারির ভিতর ঢুকবার বেশ খানিক পর মীরাদি এসে চুপি চুপি উঠোনে একটা মোড়া পেতে বসলেন। গুরুদেব ঠিক টের পেয়ে গেলেন। একটু পরে তিনিও একটা মোড়া হাতে করে এনে মীরাদির পাশে বসলেন। বললেন, মীরু, দু'জন জেগে থেকে কি লাভ আছে কিছু? মীরাদি উঠে চলে গেলেন।

তবে এই সময়েই তাঁর একটা চমৎকার উক্তি আছে। রাণী মহলানবিশকে একদিন বললেন, 'দৈহিক সেবা নিতান্ত অবান্তর। আসল জিনিস হচ্ছে স্নিগ্ধ সঙ্গ। যতক্ষণ পাই, ততক্ষণ লাভ।'

মনের উপর আশ্চর্য রকমের অধিকার ছিল তাঁর। শেষদিকে লিখতে বসে বলতেন, 'মাথাটা একটু টলমল করছে, নয়তো ভালই আছি এমনিতে।' জ্বরটর হলে নিত্যকাজে ব্যাঘাত ঘটত না। রাণী চন্দ জানাচ্ছেন: জ্বর হয়েছে গুরুদেবের, তাই নিয়েই কলকাতা এলেন। জ্বর বাড়ল, জ্বরের প্রকোপও বাড়ল। গুরুদেব উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। সেইদিনই বিকেলে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা। কাছে যাঁরা ছিলেন, ভাবলেন খবর পাঠিয়ে দেওয়া হোক, আজ বক্তৃতা হবে না। গুরুদেব বললেন, 'সে হয় না, ব্যবস্থা হয়ে আছে, সকলে অপেক্ষায় থাকবে, আমি যাব।'

শারীরিক কষ্ট তিনি সব সময় ভুলে থাকতে চাইতেন। যৌবনে একবার তাঁকে বিছে কামড়েছিল। যন্ত্রণা প্রবল হতেই ভাবতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ নামে আলাদা এক ব্যক্তিকে বিছে কামড়েছে। এই বলে তিনি নিজেকে আলাদা করে দেখতে লাগলেন। যন্ত্রণাও কমে গেল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার শারীরিক কষ্ট হলে যে-আমি কষ্ট পাচ্ছি, তাকে দূরে সরিয়ে রাখি, কাছে আসতে দিই না।'

ইরিসিপেলাসের আক্রমণের আগের বছর ১৯৩৬ সালের ২১ জুলাই রাণী মহলানবিশকে শরীরের অবস্থা বিস্তারিত লিখছেন: 'শরীর সম্বন্ধে খবর এক এক সময়ে প্রধান খবর হয়ে ওঠে। নইলে সাধারণত ও কথাটা আলোচ্য মনে করিনে। খবরের কাগজে বোধ করি কিছু আভাস পেয়েছিলে। এবার টাউন হলে আমাকে গুরুতর জখম করেছিল। নীলরতনবাবু যদি আগে থাকতে অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত না থাকতেন, তাহলে আমি বোধহয় মূর্ছিত হয়ে পড়তুম। বৃহস্পতিবার এই অত্যাচারের স্মৃতিটা ছিল না। কিন্তু শুক্রবারে বুকের মধ্যে খুব একটা দুর্বলতার আক্রমণ অনুভব করলুম। বিশেষত রাত্রে। মনে করলুম, তার পরদিনই শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব। কিন্তু বিরলার সঙ্গে জরুরি কাজের কথা ছিল, তাই যেতে পারি নি। বুকের কষ্ট ও দুর্বলতা চলল। আমার কেমন মনে হল হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে, কিন্তু কলকাতায় আমার দিন শেষ হবে একথা মনে করতে ভাল লাগে না। রবিবারে যাওয়া ঠিক ছিল। কিন্তু সোম-বারে তোমরা আসবে জেনে একটা দিন রয়ে গেলুম। তুলসী গোঁসাইয়ের মোটরে

যাওয়ার ব্যবস্থা হল। সকালবেলায় ভাল লাগছিল না। নীলরতনবাবুকে খবর দেবার চেষ্টা করেছিলুম, তিনি বাড়ি ছিলেন না। চলে এলুম। সেই অবধি চুপচাপ আছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার জের আছে। তবু বোধ হচ্ছে, ছিয়াত্তরটা পার হয়ে যেতেও পারি। নাইবা পারলুম।

কবি তখন কলকাতায় এসেছিলেন টাউন হলে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সভায় বক্তৃতা দিতে। দেহ ক্লান্ত ছিল, তার উপর প্রতিদিন ছিল প্রোগ্রামঠাসা। তাই শরীরের ওই অবস্থা।

১৯৩৬ সালের ৩০ জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরে রাণী মহলানবিশকে আর একখানা চিঠি পাঠান। তিনি বলছেনঃ শাস্ত্রে দেহাত্মবোধের নিন্দা করেছে। আমিও করি। কিন্তু রোগের দুর্বলতাকে বাহন করে দেহটার খবর আর সব খবরের চেয়ে এগিয়ে চলে। আর বারবার চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সে জন্যে অনুতপ্ত আছি।

॥ চার ॥

১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। একদিন শান্তিনিকেতনে সকলের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে বলতে কবি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ইরিসিপেলাসের আক্রমণ। কীভাবে আক্রান্ত হলেন, তার বর্ণনা আছে তাঁরই লেখা এক চিঠিতে।

১৯৩৭ সালের ৯ অক্টোবর হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন: 'বারান্দায় বসে সন্ধ্যার সময় সুনন্দা সুধাকান্ত ও ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে একটা দীর্ঘ গল্প শুনিয়ে তারপরে বাদলা বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে ঘরে গিয়ে কেদারাতে বসেছিলুম। শরীরে কোনপ্রকার কষ্ট বোধ করিনি। অন্তত মনে নেই। কখন মূর্ছা এসে আক্রমণ করল কিছুই জানিনে। রাত ন-টার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা। পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটেছে অজ্ঞান অবস্থায়। কোনোরকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে রক্ত নিয়েছে, গ্লুকোজ শরীরে চালনা করেছে, কিন্তু আমার কোন ক্লেশবোধ ছিল না। জ্ঞান যখন ফিরে আসছিল, তখন চৈতন্যের আবিল অবস্থায় ডাক্তারদের কৃত উপ-দ্রব্যের কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। দীর্ঘকাল পরে মন মোহমুক্ত হল। তোমরা দূরে বসে আমার রোগের যেসব বিভীষিকা কল্পনা করছিলে তার সমস্তই অমূলক। রোগের আকস্মিক আবির্ভাব হয়ত সাংঘাতিক, কিন্তু তারি আদি অন্তে মধ্যে লেশ মাত্র দুঃখ আমি পাই নি।…কিছুকালের জন্য মৃত্যুদণ্ড এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করছি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হল। অনবরত তুচ্ছ দাবির শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে। স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত এই রকমই যেন চলে, এই আমি কামনা করছি।'

১৯৩৭ সালের ৩ অক্টোবর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে এই একই ইরিসি-পেলাসের আক্রমণ নিয়ে আর একখানা চিঠি ঃ

'মীরু, আমার জন্যে একটুমাত্র ব্যস্ত হোস্ না। আমি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে উঠেছি। এবার শাসন থেকে ছুটি পাবার সময় এসেছে। পানাহারের তুই যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিস, তিনজনে মিলে উঠে পড়ে সেটা চালাতে লেগে গেছে। আমার প্রাণপুরুষ সর্বত-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওষুধ পথ্য কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না।'

১৩৪৪ সালের আশ্বিনে, অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে শান্তা দেবীকে

লিখছেন : 'শান্তা, হাবুডুবু দেহটাকে পাঁচ-দশটা ডাক্তার জাল ফেলে অতলের থেকে টেনে তুলেছে। বোধ হয় মনটা এখনো সম্পূর্ণ ডাঙায় ওঠেনি। তার কাজ চলছে না পুরো পরিমাণে। থাক কিছুদিন জলে স্থলে বন্যা নেমে যাওয়া ঘাটের কাছটায়। পরশু দিন এক জ্যোতিষী গণনা করে লিখছেন যে, ৯২ বছর আমার আয়ু। শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কিছুদিন দেহটার উপর কড়া চিকিৎসা চালালে গ্রহ-নক্ষত্ররা আশাকরি হঠে যাবে।'

এই জ্যোতিষী ও পরমায়ুর প্রসঙ্গ আছে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতেও [দ্র. চিঠিপত্র, প্রথম খন্ড]।

১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাণী মহলানবিশকে চিঠি। বিষয় সেই ইরিসি-পেলাস : 'এখন উদ্বেগের কোন কারণ নেই। কিন্তু মৃত্যুর ধাক্কা খেয়ে কলকব্জা নড়বড়ে হয়ে রয়েছে। এতকাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ বোধ করিনি। এখন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ করে অবারিত কুশ্রীতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। নরসমাজে এরকম রূপবিকৃতি অভদ্রতা। এই দুই কারণে আমি এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরটাকে নিয়ে কারো দুঃখ উৎপাদন করতে ইচ্ছা করিনে। দেহটাকে ছেড়ে নিজের নিরাসক্ত মনটাকে নিয়ে আছি।'

সেই বছরই অক্টোবর মাসে ৪, ৮ ও ১৪ তারিখে পর পর আরো তিনখানি চিঠি রাণী মহলানবিশকে—

'স্নানের পর ক্লান্তিতে হাত কাঁপে। চিঠিতে তার পরিচয় পাচ্ছ।'

'মস্তিষ্ক কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে। সব কথা স্পষ্ট কানে যায় না। চিন্তা-গুলোও কিছু অসংলগ্ন হয়ে পড়ে।'

'আজ এখনই ডাক্তারবাড়ি যেতে হবে। শরীর মন সংকুচিত হয়ে আছে।'

অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারকে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু টেলিগ্রামে সব কথা ঠিক বোঝানো যায়নি। তাই শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ ডি এম সেন রাত্রে বোলপুর থেকে এক মাল-গাড়িতে খানা জংশন চলে যান। সেখান থেকে হেঁটে ওই রাত্রেই বর্ধমান যান এবং সেখান থেকে টেলিফোনে স্যার নীলরতনকে খবর দেন। সেই টেলিফোন পেয়েই স্যার নীলরতন সরকার পরদিনের ভোরের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। তার আগে আশ্রমের দুই প্রাক্তন ছাত্র বুলা মহলানবিশ ও প্রমোদ রায় মোটরে বোলপুর রওনা হয়ে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই দুর্ঘটনার পরই শান্তিনিকেতনে টেলিফোন চালু হয়।

নীলরতন সরকারের সঙ্গে আসেন আরো কয়েকজন ডাক্তার। জিতেন দত্ত, সত্যসখা মৈত্র, অমিয় সেন, সত্যেন রায়, অমর গুপ্ত, রাম অধিকারী। ইরিসি-পেলাসে অজ্ঞান হওয়া ছাড়াও প্রোস্টেটের উপসর্গজনিত মূত্রাশয়ের কষ্ট ছিল। স্যার নীলরতনের অক্লান্ত চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু থেকে রক্ষা পান পুরো ৫০ ঘন্টা অচৈতন্য থাকা সত্ত্বেও।

সেই সময় প্রথম চার্ট করে অসুস্থ কবির পথ্য, ওষুধ, জ্বর, নাড়ি ইত্যাদি রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা হয়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত আছে। এই প্রথম কবির বড় অসুখ, তাই সেবাশুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের অপারেশনে ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারী ছিলেন দু'জন—ডাঃ সত্যসখা মৈত্র ও ডাঃ অমিয়কুমার সেন। ১৯৩৭ সালে ইরিসিপেলাস রোগের সময়ও ডাঃ সেন কবির অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন। কবির চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ সেনের স্মৃতি টেপবন্ধ করে রাখা আছে। ক্ষিতীশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এইরকম :

"অতুলনীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন যে ক্ষয় হবে আমরা ভাবতে পারিনি। কিন্তু তিনিই তো বলেছেন, এ আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে। তাঁর বেলায়ও ব্যতিক্রম হয়নি। তাই বেঁচে রইলেন না। অনেক সুকৃতির ফলেই এই মহাপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। প্রথমবার তাঁর প্রাণ সংশয় হয় ১৯৩৭ সালে। সূচনা ১০ সেপ্টেম্বর। তাঁর ডাক্তারিও শুরু করি সে সময়। ইরিসিপেলাসে অজ্ঞান। ঐ সঙ্গে প্রোস্টেটের উপসর্গজনিত মূত্রাশয়েরও কষ্ট ছিল। স্যার নীলরতন অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও শল্য ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এসেছিলেন জিতেন দত্ত, সত্যসখা মৈত্র, সত্যেন রায়। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অমর গুপ্ত আসেন পরে। রাম অধিকারীও ছিলেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় উত্তরায়ণে।

"গভীর রাত্রে উঠেও আমি দেখেছি স্যার নীলরতন গুরুদেবের শয্যাপার্শ্বে একমনে রোগীর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ওটাই একটা বড় গুণ ছিল স্যার নীলরতনের। রোগীর পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন রোগ নির্ণয়ের জন্যে। তাড়াহুড়ো কখনো করতেন না।

"সেবার ভগবদকৃপায় গুরুদেব নিরাময় হয়ে গেলেন। আমরাও মহানন্দে কলকাতা ফিরে গেলাম। এরপর মাঝে মাঝে ডাক পড়েছে, শান্তিনিকেতনে আসতে হয়েছে। প্রোস্টেটে ইউরিনারি ইনফেকশনের জন্যে গুরুদেব কষ্ট পাচ্ছিলেন। কলকাতার ডাক্তাররা চলে যেতে না যেতেই দু' সপ্তাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আবার কাজকর্মে মন দিলেন। আশ্চর্য তাঁর জীবনীশক্তি।"

এই সময়ই তিনি বিশ্বপরিচয় আর ছড়ার ছবির ভূমিকা লিখে দিলেন। শুধু তাই নয় 'অকস্মাৎ হতচৈতন্যলোক' থেকে প্রত্যাবর্তনকে কবি নবজীবনের সহিত তুলনা করে লিখলেন অসাধারণ একখানা কাব্যগ্রন্থ। প্রান্তিক। আলো আর ছায়ার মেশা রহস্যময় এক জগৎ থেকে যেন নিয়ে এলেন বার্তা, বললেন, 'দেখলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ। কারণ মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।'

সুপ্তিগুহা থেকে চৈতন্যের এই মুক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আট মাস পরে নববর্ষের ভাষণে (১৩৪৫) বলেন, 'কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবন-লোকে ফিরে এসেছি। যে মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে'।

সুস্থ হওয়ার একমাস পরে ১২ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসার জন্য কলকাতা যান। থাকেন বরানগরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে। রাণী মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে। সেই সময় অসুস্থ কবিকে দেখতে আসেন জওহরলাল, সুভাষ বসু, সরোজিনী নাইডু, আচার্য কৃপালনি। গান্ধীজিও দেখা করতে রওনা হন, কিন্তু মোটরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। শরৎচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে এই সংবাদ দিলে তিনি নিজেই গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যান।

তারপর ১৯৪০ সাল অবধি পর পর কতকগুলি মৃত্যুর ঘটনা। সবাই অন্তরঙ্গজন। জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ, এন্ডরুজ। কবির মন অবসন্ন, ভারাক্রান্ত। তবু একই সঙ্গে চলছে লেখার কাজ। নতুন নতুন গান, কবিতা, গল্প, গীতবিতান সম্পাদনা। কলকাতার ছায়াতে হল অভিনয়। তাছাড়া গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল প্রমুখদের সঙ্গে চলেছে রাজনৈতিক সলাপরামর্শ।

১৯৩৮ সালের ২৫ এপ্রিল রওনা হলেন কালিম্পং। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়। শরীর তেমন সুস্থ নয় বলে কালিম্পং থেকে জনসাধারণের কাছে একটি আবেদন প্রচার করেন বাংলা ও ইংরেজির খবরের কাগজে। ইংরেজির জন্যে লেখেন ঃ

The growing infirmity of my age compels me at last to appeal to the public kindly to release me from the responsibility of correspondence and numerous other claims causing constant strain upon my body and mind when they urgently need rest.

কালিম্পংয়ে একমাস থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে গেলেন মংপু। সেখানে লেখা চলছে সেঁজুতি, নবজাতক বইয়ের কবিতা। মংপু থেকে আবার কালিম্পং এবং দু'মাস দু'জায়গায় কাটিয়ে শান্তিনিকেতন ফিরলেন জুলাই মাসে। লেখা চলছে সানাই ও খাপছাড়ার কবিতা, শ্যামা নৃত্যনাট্য। জওহরলাল ও সুভাষ বসু একসঙ্গে এলেন শান্তিনিকেতনে উপদেশ নিতে। তিনজনের বৈঠক চলে দেশের অবস্থা নিয়ে।

১৯৩৯ সালে এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথ গেলেন পুরী। সেখানে তিন মাস কাটিয়ে আবার মংপু। থাকলেন ১৭ মে থেকে ১৭ জুন—পুরো এক মাস।

১৯৩৯ সালের মে। আছেন মংপুতে। মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে। শরীর

সব সময় ভাল থাকে না। ঠান্ডা লেগে যায়। ইদানীং কানেও শোনেন কম। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে অসুস্থতা বিষয়ে সংলাপ—

আজ তো আপনার শরীরটা বিশেষ ভাল নয় দেখছি।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কলটা আজ বিগড়েছে।

কী করা যায় ?

বিশেষ কিছুই নয়, পায়ের কাছে মোড়াটা অনায়াসে এগিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি খুব কষ্ট না হয়, তাহলে চাদরটাকেও পায়ের উপর চাপা দেওয়া যায়। শিথিল জীর্ণ শরীর আজ পড়ে যেতে চায় পথের মাঝখানে। কান তো প্রায় গেল, কিন্তু সেও সহ্য হবে, শুধু চোখটা না যায়। তাহলে এই আনন্দময় ভুবন, তোমাকে কে দেখবে ?

কবির অন্যতম সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের নবেম্বর মাসে তিনি কবিরাজী ওষুধ খেতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে ভিনকারনিস টনিক আনিয়ে দেওয়া হয়। তবে কবি স্যানাটোজেন খেতে খুব ভালবাসতেন।

মংপু থেকে ফিরে এই সময় কবি থাকেন শ্রীনিকেতনে। সম্পূর্ণ সুস্থ নন, তবু লেখালেখির কাজ চলছে। মহাজাতিসদনের শিলান্যাসে যান এই সময়েই। গান লিখছেন প্রচুর। তারপর আবার মংপুতে। এই অসুস্থতার মধ্যেও পরিশ্রমের অন্ত নেই। গল্প গান কবিতা প্রবন্ধ রচনা অজস্র অজস্র। মংপু থেকে ফিরে গেলেন মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির উদ্বোধন করতে। ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন গান্ধীজি। সঙ্গে কস্তুরবা। সেই আনন্দময় রূপ, সেই অনাবিল হাস্য—কে বলবে কবি অসুস্থ। তারই মধ্যে গেলেন সিউড়ি, গেলেন বাঁকুড়ায়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে।

১৯৪০ সালে ৭৯তম জন্মোৎসবের পর কবি কলকাতায় গেলেন। সেখান থেকে ২০ এপ্রিল যাত্রা করলেন কালিম্পং। সেখান থেকে মংপু। ১৭ দিন মংপুতে থেকে ৭ মে ফের কালিম্পং। লেখা চলছে ছড়া ও জন্মদিন বইয়ের কবিতা। কালিম্পং থেকে ফিরলেন ২৯ জুন। কাজের ও লেখার অন্ত নেই।

আবার কালিম্পং যাত্রা। ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সেবারই পড়লেন আবার বড় অসুখে। অথচ সেই সময়ই (২৫।৯।৪০) অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন ঃ 'কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন।' তাছাড়া কবিতায় বলেছেন—

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার
শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী।

২৫ সেপ্টেম্বরেই হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে যায়। পরদিন অজ্ঞান ভাব। এই আকস্মিক ঘটনায় সবাই বিমূঢ়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় হাসপাতাল? সেক্রেটারি কেউ নেই পাশে। রথীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখতে পূর্ববঙ্গে। ঠিক কোথায় কেউ জানে না। থাকার মধ্যে প্রতিমা দেবী ও পুরাতন ভৃত্য বনমালী। আর আছেন সচিব সচ্চিদানন্দ রায়। খবর পেয়ে মংপু থেকে এলেন মৈত্রেয়ী দেবী। কিন্তু উদ্বেগ কাটে না, সংশয় যায় না। বরং রবীন্দ্রনাথের অবস্থা খারাপের দিকে যায়, আর প্রতিমা দেবী চোখে অন্ধকার দেখেন। মূত্রাশয়ের গুরুতর পীড়া। ইউরিন বন্ধ। ইউরেমিয়া হয় হয়।

কাছাকাছি ছিলেন দার্জিলিংয়ের এক ইংরেজ সিভিল সার্জেন। তাঁকে আনা হল। তিনি এসেই প্রতিমা দেবীকে বললেন, মিসেস টেগর, তোমার ফাদার-ইন-ল-কে এখনি আজ রাত্রেই অপারেশন করা দরকার। নইলে ঘোর বিপদ।

প্রতিমা দেবী জানেন অপারেশনে রবীন্দ্রনাথের অমত। এখন তিনি অজ্ঞান। এই অবস্থায় অপারেশন করানো ঠিক হবে না। তাছাড়া রথীন্দ্রনাথ কাছে নেই। তাঁকে ওয়ারলেসে খবর পাঠানো হয়েছে পূর্ববঙ্গে। ছেলে কাছে নেই, অপারেশনের সিদ্ধান্ত তিনি একা নিতে পারেন না। তবু তিনি ডাক্তার নিয়ে দ্রুত আসার জন্যে প্রশান্ত মহলানবিশকে টেলিগ্রাম করলেন। শান্তিনিকেতনেও টেলিগ্রাম গেল।

প্রতিমা দেবী 'নির্বাণ' নামক গ্রন্থে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাছাড়া রাণী মহলানবিশকে এক চিঠিতে লিখেছেন: সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে, সে অপারেশন করে। এতবড় একটা নামজাদা রোগী তো সহজে পাবে না। কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, তুমি যদি অপারেশনে মত না দাও, তাহলে জেনো যে, ওঁর মৃত্যুর কারণ তুমি হবে। বললাম, হ্যাঁ, সে দায় আমি নিচ্ছি। তা সত্ত্বেও অপারেশনে মত দেব না। আজ রাত্রেই কলকাতা থেকে আমাদের বন্ধু ডাক্তার নিয়ে রওনা হচ্ছেন। যদি অপারেশন করতে হয় তাঁরাই ঠিক করবেন। তাঁদের মত না নিয়ে আমি কিছু করব না। কোনমতে তো সাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম। সারারাত সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। ভাবছি কখন কলকাতার দল আসবে। তাঁরা এলে যে বাঁচি। অবশেষে তোমার সত্যসখাদাদা, জ্যোতিবাবু আর অমিয় বোসকে নিয়ে প্রশান্ত পেঁৗছলেন। এদিকে শান্তিনিকেতন থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরে সুরেনবাবুরাও এলেন। তোমার সত্যসখাদাদা দেখে বললেন, অপারেশন করতে দেননি, খুব ভাল কাজ করেছেন। আজ এখনই ওঁকে নাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বলে গ্লুকোজ ইনজেক্‌শন দিলেন এবং তার একটু পরেই অনেকখানি ইউরিন হয়ে গেল। আজ সকালে আমরা এসেছি। উনিও রেডিও মারফৎ খবর পেয়ে চলে এসেছেন।

রাণী মহলানবিশ তখন গিরিডিতে। ২৮ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহলানবিশ

কালিম্পং থেকে টেলিগ্রাম করলেন স্ত্রীকে ঃ পোয়েট সিরিয়াসলি ইল। এরাইভড্ উইথ ডক্টরস্। রিমোভিং ক্যালকাটা টু ডে অর টুমরো।

অতি কষ্টে বিস্তর দুর্ভোগ সহ্য করে প্রায়-অজ্ঞান রবীন্দ্রনাথকে শিলিগুড়িতে নামিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে আনা হয় কলকাতা। সেখান থেকে জোড়াসাঁকো এলেন ২৯ সেপ্টেম্বর। স্যার নীলরতন সরকার ও অন্য বড় বড় ডাক্তার নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। এই সময়ই ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজি বার্তা পাঠান মহাদেব দেশাইকে দিয়ে। প্রতিমা দেবী 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

মহাদেব দেশাই অনিলকুমার চন্দের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে মহাত্মাজীর সহানুভূতি আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার জোরে জোরে মহাদেব দেশাইয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলেন না। চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল তাঁর, এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে, অতি বড় শোকেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখিনি, আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।

কবি রোগশয্যায় শয়ান। নীলরতন সরকার আসেন, বিধান রায় আসেন। ফিসফিস পরামর্শ চলে। কবির আয়ু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। কিন্তু তখনও মুখে মুখে কবিতা আওড়ান—

কী আছে জানি না দিন অবসানে
　　মৃত্যুর অবশেষে।
এ পথের কোন্ ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং
　　অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোন মায়া?

সেই সঙ্গে মনে মনে বলেন, মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়িয়ে যাব। আর লিখে চলেন একটার পর একটা কবিতা। লিখতে পারেন না, মুখে মুখে আওড়ে যান, সেবিকারা লিখে রাখেন। ক্ষীণকণ্ঠ নিয়ে তিনি বলেন—

অজস্র দিনের আলো
জানি একদিন
দু' চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ,
তুমি মহারাজ।

সেই সময় তিনি সহসা দেখতে পান, গহনরজনীমাঝে রোগীর আবিল দৃষ্টি-তলে সেই মহারাজের জাগ্রত আবির্ভাব। কারণ অনিঃশেষ প্রাণ অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান। অনিদ্রাতে তখন দুঃখের রাত কাটে, দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশে যায় মূলতানে, মনে হয় অদৃষ্ট শরীরখানা কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে রোগের তীব্রতায় আবিল দৃষ্টি নিয়ে 'অপটু এ

লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা' রচনা করেন কবিতায় যা পরে প্রকাশিত হয় রোগশয্যায় নাম দিয়ে, এবং সেই সময়ই বলেন, 'আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস। জানি কালসিন্ধু তারে নিয়ত তরঙ্গাঘাতে, দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।'

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জোড়াসাঁকো বাড়িতে রোগীর বিবরণের চার্ট রাখা শুরু হয়। পথ্য, ওষুধ ইত্যাদি চার্টের ঘরে ঘরে ভর্তি করে রাখতে হয়েছে প্রহরে প্রহরে। ডাঃ রাম অধিকারী সেই চার্ট দেখে রিপোর্ট তৈরী করে বড় ডাক্তারদের দেখাতেন। পালা করে যেসব সেবক-সেবিকারা থাকতেন, তাঁদের তদারকিতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। এই চার্ট মৃত্যুদিন পর্যন্ত রাখা হয়। সূর্যাস্তের সময় রোগী রবীন্দ্রনাথের বিশদ বিবরণ জানতে হলে ওই রোজনামচার চার্ট ছাড়া গতি নেই।

অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সেবা করতে ডাক্তার এবং নার্সরা তো ছিলেনই। তাছাড়া পালা করে অনবরত ছিলেন ঘনিষ্ঠ আরো প্রিয়জন। যেমন রাণী চন্দ, অমিতা ঠাকুর, রাণী মহলানবিশ, মৈত্রেয়ী দেবী, নন্দিতা কৃপালনি, শ্রীমতী ঠাকুর, সুরেন কর, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ রায়, বিশ্বরূপ বসু, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। ১৯৩৭ সালে ইরিসিপেলাসের আক্রমণের সময় এবং ১৯২০ সালেও এঁরা অক্লান্ত সেবা করেছেন কবিকে। মুষ্টিমেয় যে কয়জনের সেবা তিনি গ্রহণ করতেন, তাঁদের মধ্যে এঁরা সকলেই ছিলেন।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রাখা একটি কাগজে এই রকম কয়েকজনের নাম ও তাঁদের কী করণীয়—বিশ্বভারতীর প্যাডে লিখে রাখা আছে। ১৯৪০ সালের এক নির্দেশে বলা হয়েছে সেবক-সেবিকাদের কাজ হচ্ছে—

(১) চার্ট লেখা, সব ঘর ফিল-আপ করা, প্রস্রাব মাপা টেম্পারেচার দেখা।

(২) ঔষধ এবং খাবার গ্লুকোজ ও হরলিকস্ খাওয়ানো।

(৩) মূত্র পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া বারবার।

(৪) সময় হবার ১০/১৫ মিনিট আগে-পরের ব্যাচকে জানিয়ে দেওয়া।

(৫) পুরুষ নার্স পাশের ঘরে থাকবেন। প্রয়োজন হলেই ডাকতে পারেন। মেয়েরা তার পাশের ঘরে আছেন।

(৬) ডাঃ অধিকারী লালবাড়ির কোণের ঘরে থাকবেন। যদি প্রয়োজন পড়ে ডাকবেন।

ডাঃ অধিকারী মানে, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। ইনি বিভিন্ন সময়ে কবির শেষজীবনের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন. লালবাড়ি অর্থে জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনের লাগোয়া 'বিচিত্রা' বাড়ি।

১৯৪০ সালের ১ অক্টোবরে ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর একটি রিপোর্ট পেয়েছি। তাতে তিনি নিজের হাতে রোগীর একটি রাত সম্পর্কে যে বিবরণ রেখেছেন, তা নিচে দিলাম।—

২৯-৯-৪০ থেকে ৩০-৯-৪০

(রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা)

টেম্পারেচার : ফ্রম নাইনটিএইট টু নাইনটিসেভেন (ইন দি মর্নিং)।

পাল্‌স্‌ : হাণ্ড্রেড টুয়েণ্টি টু হাণ্ড্রেড এইট পার মিনিট।

ইউরিন : ফিফটিন আউন্স ফ্রম এইট পি এম টু এইট এ এম।

ফীড্‌স্‌ : টোয়েণ্টিএইট আউন্স (মেইনলি গ্লুকোজ ডি অ্যাণ্ড হরলিক্‌স্‌ মলটেড মিল্ক)।

স্লীপ্‌স : ফ্রম ইলেভেন পি এম টু ফোর এ এম সেভেন থার্টি এ এম।

স্টুল : পাসড হিমসেলফ, ফেয়ার কোয়ান্টিটি, নো মিউকাস।

ইনফ্রা রেড রে-জ এপলায়েড ২ সিসি।

পেইন : মাচ লেস।

মাউথ পার্টস : ক্লীনড্‌।

চীয়ারফুল।

আর সি অধিকারী
৩০।৯।৪০
সকাল ৯টা

৩০-৯-৪০ থেকে ১-১০-৪০

(রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা)

টেম্পারেচার : ১০১ ৬° টু ৯৮ ফাঃ (৭-৪৫ এ এম)

পেইন : লিউকোপ্লাস্ট এপলায়েড (ভিব্রিয়েশন অভ আ ফরেন বডি) মাচ লেস আফটার ২ এ এম

পালস্‌ : ১২০ থ্রু আউট দি নাইট ১৩০ এট ১২-৩০ এ এম

রেস্পিরেসন : লেবার্ড। ওয়ার্স্ট এট ১২ মিডনাইট (আফটার দি ডোজ অব ব্রমাইড) ইজিয়ার রেট ফার্টিফোর পার মিনিট।

(হায়েস্ট অবজার্ভড উইদিন দীজ ডেজ)

ইউরিন : মোস্টলি পাসড্‌ ইন রেড ক্লোদস

কালেকটেড এবাউট সিক্স আউন্স

(সেণ্ট ফর একজামিনেশন)

স্লিপস . (১) নীল টিল থ্রি এ এম। নো স্লীপ ডিউরিং দি ডে (২) ইন স্ল্যাবেস ফ্রম থ্রি ফিফটিন এ এম টু ফোর এ এম। আফটার মাউথওয়াশ ফোর ফিফটিন এ এম টু ফাইভ এ এম—ন্যাচারাল ফীডস : ২২ আউন্স উইথ ডিফিকালটি।

আর সি অধিকারী
১।১০।৪০

তার তলায় নোট আছে : ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সেই সময় শেষ দেখার পর সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে মোট বারো ঘণ্টা ইউরিন হয়েছে সাড়ে তেইশ আউন্স, খাবার দেওয়া হয়েছে ২২ আউন্স, তাপমাত্রা মাঝরাত অবধি ছিল ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তারপর শেষ রাত ৩টায় ৯৮'৭। নাড়ির গতি সকালে ছিল প্রতি মিনিটে ৮৪। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত না ঘুমিয়ে ছটফট করছেন। রাত ১১টায় দেওয়া হয় পীকক্স ব্রমাইড। তারপর সকাল ৬টা পর্যন্ত ভাল ঘুম হয়। ছোট এনিমাও দেওয়া হয় সকালে। অতি অল্প পায়খানা হয়। সেই সময়ই হেঁচকি উঠছে খুব। তাতে খুব লাগত পেটে।

পুরোনো চার্ট থেকে আরো দু একটি ইংরেজি উধৃতির বাংলা অনুবাদ
।

৫ অক্টোবর ১৯৪০ : আধঘণ্টা চিত্রলিপি পড়লেন। ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকারকে চিঠি লিখলেন।

৬ অক্টোবর ১৯৪০ : আর একটি 'মেসেজ' ১২ মিনিট ডিকটেশন দিলেন। খিচুড়ি ও মাগুর মাছের ঝোল খেলেন আট চামচ।

৭ অক্টোবর ১৯৪০ : সারাক্ষণ অস্থির, ঘুম মাত্র পনেরো মিনিট। ইউরিনের সময় ভীষণ কষ্ট। মুখ পরিষ্কার করা হল। মিকশ্চার খেতে আপত্তি—রিফিউজ টু টেক মিকশ্চার।

১৭ নবেম্বর পর্যন্ত অসুস্থ কবি ছিলেন জোড়াসাঁকোয়। রাণী মহলানবিশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে বলছেন :

কবির শরীরে কী রকম যন্ত্রণা। তেমনি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথাটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কী রকম ঘুমে জড়ানো অবস্থা।... ডাক্তারদের মধ্যে তখন আলাপ আলোচনা চলছে, অপারেশন হবে কিনা। নীলরতন আপত্তি জানালেন। মাথাটা তখন থেকে খুব ঝাপসা! জ্বরও অত্যন্ত বেশি। যুদ্ধ চলছে। ছটফট করেন ভাব প্রকাশের জন্যে।

৬ অক্টোবর দুপুর বেলা রাণী মহলানবিশকে বললেন, 'একটা কাগজ নিয়ে এসো। যা বলছি তা লেখ—'

We have known the Primitive Mongols, the most terrible cruel horde of mankiller and we have the habit of calling them barbarous, but the unalloyed sign of barbarism is revived, when all through the trapping of so-called civilization comes out of the treason against humanity and that has been shown in the late history. We, who stand by the side of humanity, we may be victimised by the satanic power, we may be defeated in our enjoyment of human rights and yet we have the consolation

to realise that man is great. And the time may or may not come, when man will assert the dignity of freedom, but we have the consolation to proclaim the man is great.

অনেকক্ষণ এইভাবে একটানা কথা বলে শ্রান্ত হয়ে পড়েন।

যখন নানা মাপের শিশি হল জড়, ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়, ওষুধে ডাক্তারে জোড়াসাঁকো বাড়ি জমজমাট, তখনও রবীন্দ্রনাথ হাতের কাছে রাখতেন বায়োকেমিক ওষুধ। মাঝে মাঝে নিজেই বের করে খেয়ে নিতেন।

তারই মধ্যে রাণী মহলানবিশ অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন গিড়িডি। প্রতিমা দেবী ৯।১০।৪০ তারিখে তাঁকে লিখছেন: ভাই রাণী, বাবামশায়ের এখন ৯৯.৪ টেম্পারেচার আছে। এখন বেলা ৩টা। তার মানে যেমন রোজ জ্বর আসে, তেমনি আসছে। কাল রাত্রে ডায়াথার্মিক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশি কিছু কম দেখছি না। কণ্ঠ সমভাবে আছে। বায়োকেমিক ওষুধও খাচ্ছেন।

২৯।১০।৪০ তারিখে মীরা দেবীর আর একখান চিঠি: ভাই রাণী, বাবা বেশ ভালো ছিলেন। তবে পরশু থেকে শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়। পরশুর আগের রাত্তিরে বুকে একটা ব্যথা ব্যথা বলছেন। রাত্তিরে সেঁক দেওয়া হয়েছিল। তারপর পরশু সকালেই জ্বর ৯৯.০ এর উপরে ছিল। অন্যদিন জ্বর থাকে না। তাছাড়া সেদিন থেকে ভাল করে খাচ্ছেন না। কী হয়েছে ঠিক বলতে পারিনে। এক রকম খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগছে না বলেই খাচ্ছেন না, কিংবা খিদে হচ্ছে না বলে খাচ্ছেন না, তা বলা শক্ত। কাল দাদাকে বলছিলেন মাঝে মাঝে ফাস্ট করা শরীরের পক্ষে ভাল। তাতে দাদা বললেন, তুমি তো অনেকদিন ফাস্ট করেছ, তার আর কী দরকার। নেপালবাবুর ভাই দক্ষিণাবাবুকে (কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায়) ক'দিন থেকে আসতে দেখছি। তিনি দু-একটা ওষুধ পথ্যি বলে গেছেন। পথ্যি মানে মাংসটা খেতে বারণ করেছেন। আর দু-একটা তরকারি—যেমন মুলো কচু পেঁপে এইগুলো বেশি খেতে বলেছেন। গাছ থেকে পেড়ে তখনি সেই ডাব খেতে বলেছেন। অর্থাৎ এলোপ্যাথি কবিরাজী বায়োকেমিক তিনটিই একসঙ্গে চলছে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। প্রস্রাবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা, প্রস্রাব ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। তদুপরি জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা।

ওদিকে ডাক্তাররা মিলে সলা পরামর্শ করছেন কী করা যায়। বিধানবাবুর দৃঢ় অভিমত অপারেশন করতেই হবে। নীলরতন সরকার অপারেশনের বিরুদ্ধে। মাঝখানে বিপন্ন বোধ করেন রথীন্দ্রনাথ। তিনি ভাল করেই জানেন পিতা অপারেশনে অনিচ্ছুক, অথচ অপারেশন না করলেই নয়।

কালিম্পংয়ে অসুখের খবর পেয়েই ওদিকে সারা শান্তিনিকেতনে শোকের ছায়া নামে। সুরেন কর, অনিল চন্দ, প্রতিমা দেবী, রথীন্দ্রনাথ মীরা দেবী তো আছেনই, শান্তিনিকেতন থেকে রাণী চন্দ চলে যান জোড়াসাঁকোয়। তিনি

'গুরুদেব' বইয়ে লিখেছেন—

জোড়াসাঁকোয় দোতলায় পাথরের ঘরে তাঁকে এনে তোলা হল। সেই ঘরেই থাকেন। কয়দিন খুব আশংকায় কাটল। ধীরে ধীরে ভালোর দিকে মোড় ঘুরতে লাগল। গুরুদেব সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তখনও তাঁকে বিছানায় উঠিয়ে বসাবার অবস্থা আসেনি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এল। গুরুদেবের এক দিদিই জীবিত তখন—বর্ণকুমারী দেবী। তিনি এলেন আশি বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজও ভাসে ছবি চোখের সামনে—গৌরবরণ একখানি শীর্ণ হাতের শীর্ণতর আঙুলে চন্দন নিয়ে গুরুদেবের কপালে কাঁপতে কাঁপতে ফোঁটা কেটে দিলেন। দুজন দুপাশে হাত ধরে রেখেছি বর্ণকুমারী দেবীকে। ফোঁটা কেটে তিনি বসলেন বিছানার পাশে চেয়ারে। ভাইয়ের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। খুব রাগ হয়েছে দিদির ভাইয়ের উপরে। কালিম্পংয়ে গিয়েই তো ভাই অসুস্থ হয়ে এলেন, নয়তো হতেন না—এই ভাব দিদির। ভাইকে বকলেন, বললেন, দেখো রবি, তোমার এখন বয়স হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনও বুঝলে? গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, না, কক্‌খনো আর ছুটে ছুটে যাব না, বসে বসে যাব এবার থেকে।

সকলের খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে উঠল। দিদি যত বলতে লাগলেন, না রবি, যা বলছি শোন ছুটে ছুটে আর কোথাও যাবে না তুমি। গুরুদেব ততই বলছেন, না, বসে বসেই যাব।

সেদিন দিদির সঙ্গে তাঁর এই কথা রোগশয্যায় যেন উৎসবের আমেজ এনে দিল। গুরুদেব বললেন, দেখি, তোমার পা দুটি তুলে ধর উপরে, নয়তো প্রণাম করব কী করে? দিদি বললেন, থাক, এমনিতেই হবে, তোমার আর পেন্নাম করতে হবে না কষ্ট করে। বলে ভাইকে আরও আরও আদর করে, আরও বুঝিয়ে দুপাশে দুজনের হাতে হাতের ভর রেখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

ওদিকে রবীন্দ্রনাথের মন শান্তিনিকেতনে ফিরবার জন্যে উতলা হয়ে আছে। ১৮ নবেম্বর চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। এবার ঠিক এক মাস পর। অসুখ সারেনি। জ্বর নিত্যসঙ্গী। অতি সাবধানে আনা হল উদয়ন বাড়িতে। শুইয়ে রাখা হল একতলায় জাপানী ঘরে। এই সময়ই তাঁর চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়।

এই জাপানী ঘরের গোল জানালার পাশে লম্বা কৌচে তিনি প্রায়ই বসে থাকেন। লেখেন, পড়েন, ছবি আঁকেন, মুখে মুখে গল্প বানান। আর অতিথি অভ্যাগতের ভিড় আর বায়না তো আছেই। ঐ জানালার কাছে বসেই তিনি লিখলেন, ঐ মহামানব আসে। সুরও দিলেন তাতে। ইতিমধ্যে রোগশয্যায় বইয়ের ছাপা চলছে। উৎসর্গ করলেন দুই সেবিকা নন্দিতা কৃপালনি ও অমিতা ঠাকুরকে। আরোগ্য বই উৎসর্গ অন্যতম সেবক সুরেন করকে। নারী নাম দিয়ে আর একজন সেবিকা রাণী চন্দকে উৎসর্গ করলেন একটি কবিতা। ওদিকে মুখে মুখে বানানো গল্প ও কবিতা নিয়ে তৈরি হচ্ছে গল্পসল্প।

এল পৌষ মাস। সাতুই পৌষের উৎসব। তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ পৌষ উৎসব। কিন্তু দীর্ঘদিন পর উপাসনায় নিজে যেতে পারলেন না এই প্রথম। চব্বিশে ডিসেম্বর খৃস্টোৎসব উপলক্ষে লিখলেন 'প্রচ্ছন্ন পশু' নামে কবিতা। 'জন্মদিন' নামে বইয়ের রচনাও চলছে। জীবনের আশীবর্ষে প্রবেশ করে বিশ্ব-পথিক কবি বলেন, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

গেল শেষ মাঘোৎসব। এল জীবনের শেষ বসন্তোৎসব। নটীর পূজা অভিনয় দেখলেন। জ্বর নিয়ে কাশি নিয়ে মাথায় যন্ত্রণা 'নিয়ে। রোগজীর্ণ জীবনের শেষ নববর্ষ এল। ভাষণ দিলেন সভ্যতার সংকট। তারপর শেষ পঁচিশে বৈশাখ। অসুস্থ শরীর। বহু দিন পর মিষ্টি খেলেন। জন্মদিনের মিষ্টি। তারই মধ্যে কবিতায় বললেন: 'নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ, নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।'

শেষ জন্মদিন, শেষ পঁচিশে বৈশাখে ১৯৪১ সালের ৮ মে তারিখের চার্টে দেখছি লেখা আছে: ভাল ঘুম হচ্ছে না। কালি ফস খেলেন। অডিকলোন মাথায় দিলেন। কফি ও ডাবের জল খেলেন। দুপুর ১১টা ৪০ মিনিটে খেলেন

ভাত তরকারি অল্প মাছ, ডাব, মিষ্টি একটু। তাপমাত্রা : ৯৮'৫, নাড়ির গতি ৭৭।

ঠিক সেই সময় আসেন বুদ্ধদেব বসু। সস্ত্রীক। অসুস্থ কবির একটু বর্ণনা শোনা যাক (দ্র.—সবপেয়েছির দেশে): মুখ তার শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কবজির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামত, তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে তখন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন করে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথ আগে কখনো ছিলেন না। এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগ দুঃখ ভোগের দরকার ছিল।

কবির কথা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেন: "যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিস্বন, যেন গীতধ্বনিত ইন্দ্রধনু।" বহু বছর আগে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রূপ ও কণ্ঠস্বরে ঠিক এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন আর এক কবি—নবীনচন্দ্র সেন।

অসুস্থতায় আধ ঘুম আধ জাগরণের অবস্থা তাঁর সারাদিন। সারা রাত। তবু তারই মাঝখানে কবিতা রচনা চলছে। কাছে যাঁরা থাকেন বলেন: "লিখে নাও।"

১৩ মে ১৯৪১। কিছুদিন আগে হয়ে গেছে শেষ পঁচিশে বৈশাখ। তারপরই প্রথম কবিতার ডাক। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে গায়ে জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে হঠাৎ বললেন—'রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।'

খানিক বলেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। কথা খুঁজছেন। তারপর আবার শুরু করলেন: "রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিল আপনারে আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায়।"

আবার বিরতি। বেদনায় চোখ বুজলেন। বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত। এই জীর্ণ দেহকে আর টানতে পারছেন না, চিন্তার ধারা বড় ঝাপসা। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ জেগে উঠলেন রাত ৬টা ১৫ মিনিটে। জেগেই বললেন: 'বাকিটা লেখ।' সেবক-সেবিকারা রোগীর চার্টের কাছাকাছি লেখার কাগজ রাখতেন। রাণী চন্দের ডিউটি তখন। রবীন্দ্রনাথ বলে চললেন: "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন, সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

আবার ক্লান্তি। আবার নিদ্রা। ইতিমধ্যে জন্ম হয়ে গেল একটি আশ্চর্য কবিতার।

ওই সময়েই তাঁর আর এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ মিস রাথবোনের খোলা চিঠির

জবাবে খোলা চিঠি। পাণ্ডুর রোগজীর্ণ দেহ নিয়েও তিনি রুখে দাঁড়ালেন ওই ভারতনিন্দুকে বিদেশিনীর বিরুদ্ধে। রাথবোনের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জওহরলাল। তিনি তখন জেলে। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের হয়ে উত্তর দিতে এত বেশি তৎপর হন। সেই সঙ্গে লিখে ফেললেন গল্পসল্পের ভূমিকা। বড় করুণ, বড় মায়াময়।

সাঙ্গ হয়ে এল পালা
নাট্য শেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উড়ছে জমে।

সত্যিই পালা সাঙ্গ হয়ে আসছে। জীবনপ্রদীপ নিবু-নিবু। কিন্তু বাইরে থেকে কে বলবে, তাঁকে অনবরত নিতে হচ্ছে ইনজেকশন, গিলতে হচ্ছে ওষুধ, গ্লুকোজ আর বার্লিজলে চলছে পথ্য। ইউরিনের অসহ্য কষ্ট, গায়ে জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, পালা করে চলছে সেবা, কিন্তু ছবি আঁকার আর লেখার বিরাম নেই। লিখলেন গল্প ল্যাবরেটরি, তারই মধ্যে ঘরোয়া বইখানা ছাপানোর ব্যবস্থা করেন, আর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 'প্রিয় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হোক।' তাছাড়া লিখে যাচ্ছেন একটার পর একটা ছড়া—মাথার ভারী কাজ নয়, হালকা মেজাজের ছড়া, সেটাই হয়ত তাঁর মানসিক বিশ্রাম।—গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি ইত্যাদি।

কিন্তু যতই লিখুন, যতই আঁকুন, যতই হাস্য পরিহাসে অন্তরঙ্গদের সরস রাখুন, ভিতরে ভিতরে ক্ষয় দ্রুত থেকে দ্রুততর। 'নির্বাণ' গ্রন্থে প্রতিমা দেবী বলেছেন: আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। তখন তাঁকে উত্তরায়ণের (উদয়নের) দোতলায় নিয়ে আসা হলো। প্রথমটা কিছুতেই আসতে চাইলেন না, অনেক করে রাজী করানো হলো।

ওদিকে ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশ মতো বিরাট এক চিকিৎসকমণ্ডলী এলোপ্যাথি চালিয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ এ্যালোপ্যাথিতে নারাজ। কিন্তু উপায় নেই। ডাঃ দীননাথ চ্যাটার্জি শান্তিনিকেতনেই থাকেন। তিনি রোজ রিপোর্ট পাঠান কলকাতায়। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হলো। মৈত্রেয়ী দেবীর পরামর্শ মতো নিয়ে আসা হলো শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে।

কবিরাজ মশাইকে ৩ জুলাই শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন ডাঃ রাম অধিকারী। রোগী তখন দোতলায় সেই ছোট পশ্চিমের ঘরখানাতে। রবীন্দ্রনাথ

যেমন চান, তেমনি রবীন্দ্রনাথও চান কবিরাজী চিকিৎসা পরীক্ষা করে দেখা হোক।

বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে দেখেই কবি উল্লসিত।

রবীন্দ্রনাথ ঃ দ্যাখো হে, তোমরা আমার কিছু করতে পার কিনা। শেষকালে ওরা কি আমায় ছেঁড়াখোঁড়া করে দেবে?

কবিরাজ ঃ দেখুন এমনি আমি আপনাকে কিছু আশা দিচ্ছি না। আমি আগে এক সপ্তাহ ধরে সবরকম পরীক্ষা করে দেখতে চাই কোন্ দিক দিয়ে চিকিৎসা করলে সব থেকে উপকার পাবার সম্ভাবনা। সেটা জানতেই আমাদের কিছু সময় লাগবে। তারপর আমি চিকিৎসা আরম্ভ করব। তবে আপনার নাড়ি খুবই ভাল দেখছি। আমার তো খুবই আশা যে আপনার উপকার আমি করতে পারব। এরকম রোগের চিকিৎসা আমি আগেও করেছি। আমার খুবই বিশ্বাস যে অস্ত্রাঘাত থেকে আপনাকে বাঁচানো যাবে। এ রোগ অবশ্য সম্পূর্ণ সারে না। তবে এতটা কমিয়ে দেওয়া যায়, যাতে শরীরের গ্লানি চলে যাবে, জ্বর থাকবে না, খিদে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তা হলেই হলো, এই বয়সে আমি তো আর লাফালাফি করতে চাচ্ছি না। শুধু শরীরের গ্লানিটা একটু কম থাক এবং অন্যের উপর নির্ভর করতে না হয়। একটু লিখতেও চাই।

তারপর পাশে দাঁড়ানো ডাঃ রাম অধিকারীকে দেখিয়ে কবি বলেন, "এঁদের মতে অপারেশন ছাড়া গতি নেই। তুমি বললে নাড়ি ভাল, ওষুধে ভাল হবে। কার কথা মানি বল? আমার তো কিছুতেই মনে নিচ্ছে না যে ওষুধে এর চিকিৎসা নেই।"

অধিকারী ঃ কাটিয়ে ফেললে বরাবরের মতো ভয় কেটে যাবে। কালিম্পঙে কী বিপদ হয়েছিল মনে আছে?

কবিরাজ ঃ আমি খুবই বিশ্বাস করি আপনি আমার চিকিৎসায় ফল পাবেন, আর অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হবে না।

অধিকারী ঃ আপনি কি বলতে পারেন যে, হঠাৎ বিপদের সম্ভাবনা একেবারে চলে যাবে?

কবিরাজ ঃ সেকথা কেমন করে বলব। ওঁর শরীর যে রকম অন্যান্য বিষয়ে শক্ত আছে, তাতে মনে করি উনি এতটা ভাল হয়ে উঠবেন যে অপারেশনের প্রশ্নই থাকবে না। তবে এটা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই ব্যামোতে ভয়ংকর আক্রমণের আশংকা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অধিকারী ঃ গুরুদেব, অন্যায় করেছি অপারেশনের কথা বলে। আমি ক্ষমা চাইছি সেজন্যে। কবিরাজ মশাই যা বললেন সেটা তো খুব আশার কথা।

রবীন্দ্রনাথও আশ্বস্ত হলেন। ভাবলেন অপারেশনের ফাঁড়া কাটল। কিছুতেই তাঁর মন সায় দিচ্ছে না অস্ত্রাঘাতে, এখন ভরসা কবিরাজ মশাই।

কবিরাজ মশাইও পুরো সাতদিন ভাল করে রোগীকে পরীক্ষা করলেন শান্তিনিকেতনে একটানা থেকে। তারপর ১১ জুলাই এক ব্যবস্থাপত্র দেন। সেখানা আমি উদ্ধার করেছি।

(১) ইন্দুজ্যোতি : শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর মধুরিকাদি পাচন ভিজানো জলের সঙ্গে (মিশ্রিসহ) একদিন অন্তর গোক্ষুরাদি পাচনসহ।

(২) বৃহৎ কস্তুরীভৈরব : প্রাতে ৬টায় মধু ও শশার রসসহ।

(৩) বজ্রবিদ্রুম : দুপুরে আহারের পর গোক্ষুর ভিজানো জলসহ ও রাত্রিতে সুষনি শাকের ঝোলসহ।

(৪) বৃহৎ বাত চিন্তামণি : বড় এলাচ চূর্ণ ও মধুসহ — বৈকালে।

(৫) মহানারায়ণ তৈল : সর্বাঙ্গে মালিশ।

(৬) পামাহর তৈল : আক্রান্ত স্থানে মালিশ।

(৭) বিদারি দারুণ মহাপিন্ড : কটি দেশে মালিশ।

গোক্ষুর অন্তত তিন ঘন্টা ভিজানো চাই। গোক্ষুরাদি পাচন আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধ পো জল থাকতে নামানো হবে।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ
শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

তাছাড়া সবলা নামে একটি ওষুধও কবিরাজ মশাই দেন। সেটি মৃত্যুর কয়েক দিন আগে অন্যান্য এলোপ্যাথিক ওষুধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই খাওয়ানো হয়।

তর্কতীর্থ মশাই কবিরাজী ওষুধ খাওয়ার যেমন চার্ট করে দিয়েছিলেন, তেমনি খাওয়া-দাওয়ারও একটা ব্যবস্থাপত্র দেন।—'কফি, শশার রস, পেঁপে, খই-দুধ, ৬ চামচ ভাত, পোনা মাছের ঝোল দিয়ে একখানা রুটি এবং মধু দিয়ে পায়েস। তাছাড়া চালকুমড়োর পায়েস। মাছ মাংস বন্ধ। ব্যবস্থাপত্র ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্যে শান্তিনিকেতনে থেকে যান তাঁর সহকারী কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ।

দিন যায়। ওদিকে কিন্তু অপারেশনের প্রস্তাব দানা বাঁধে। কলকাতাতে ডাক্তারদের বৈঠক বসে ঘন ঘন। কখনো স্যার নীলরতন সরকারের বাড়িতে, কখনো বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে। অপারেশন হবে কি হবে না—তাই নিয়ে পরিষ্কার দুটি মত। স্যার নীলরতন অপারেশনের বিপক্ষে, ডাঃ রায় পক্ষে। ডাক্তারদের দু' ভাগ। তবে অপারেশনের দলটাই ভারী।

বিপদে পড়লেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। বিশ্বখ্যাত পিতার একমাত্র জীবিত পুত্র হওয়ার বিপদ। তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথ অপারেশনের বিরুদ্ধে, আবার নিজে বিজ্ঞানী হিসাবে এও জানেন, বিজ্ঞান মানলে অপারেশন ছাড়া গতি নেই। মেডিকেল বোর্ডের বড় বড় ডাক্তারই যখন দ্বিমত, তখন পুত্রের দ্বিধা অনুমান করা যায়।

পরামর্শের বড় ভরসা প্রশান্ত মহলানবিশ। রথীন্দ্রনাথ পয়লা এপ্রিল একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছেন : প্রশান্ত, অমিয় সেনের কাছে বাবার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সব খবর পেয়েছ। তিনি বেশ ভাল করেই সব বিষয়ে জেনে গেছেন, বলেছিলেন কলকাতায় গিয়ে অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তারপর আর কোন খবর পাই নি। এমন কোন সিম্পটম নেই, যা থেকে কোন বিশেষ গোলযোগ আছে বোঝা যায়। কিন্তু জ্বর রোজই আসছে এবং খাওয়া খুব কমে গেছে। ডাক্তারদের কথার ভাবে মনে হচ্ছে ট্রিটমেন্টের দিক থেকে করবার কিছু নেই। অপারেশন সম্বন্ধেও সকলে একমত নয়।

রথীন্দ্রনাথের আর একখানা চিঠি। তারিখ ৩১ মে : প্রশান্ত, জিতেনবাবু আজ ভোরে চলে গেছেন। তাঁকে বলে দিয়েছি কলকাতায় পেঁছেই তোমাকে ফোন করে বাবার খবর দিতে। এবার ইনফেকশনটা ভাল রকমই জাগবার চেষ্টা করছে। সময়মতো এম অ্যান্ড বি খাওযানোতে মনে হচ্ছে 'চেক্‌ড' হয়েছে। ইউরিন কাল বিকেল থেকে আবার ঠিকমত হচ্ছে। আজ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকেই ঝিমোচ্ছেন। তবে পালস্‌ বা হার্ট ঠিক আছে। তাই কোন ভয় নেই। জিতেনবাবুও এবার কনভিন্‌সড হয়ে গেছেন যে, অপারেশনের আর দেরি করা উচিত নয়। ব্লাডার যথেষ্ট এনলার্জ্‌ড। উনি বলছেন কলকাতায় গিয়ে জ্যোতিবাবুকে বলে ললিতবাবুকে শিলঙে চিঠি লিখে দেবেন, যাতে সেখান থেকে ফিরেই অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হয়ে এখানে আসেন। আমারও মনে হয় এ বিষয় স্থির করে ফেলবার সময় এসেছে। বার বার এম অ্যান্ড বি ঠেকিয়ে না রাখতেও পারে। তখন দ্বিতীয় কোন প্রতিকার থাকবে না—রথীন্দ্র।

২৪ জুনের আর একখানা চিঠি : প্রশান্ত, জ্যোতিবাবু ইন্দুবাবুকে নিয়ে বোধহয় কাল এখানে আসবেন। কী কথাবার্তা হয় পরে তোমাকে জানাব। —রথীন্দ্র।

প্রশান্তবাবু গিরিডিতে ১ জুলাই চিঠি পেলেন : ইন্দুবাবুরা বুধবার দিন এসেছিলেন। ওদের তিনজনেরই অর্থাৎ রামবাবু, জ্যোতিবাবু ও ইন্দুবাবুর মত যে অপারেশন করা উচিত। ইন্দুবাবু ভার নিয়েছেন যে, ললিতবাবু শিলং থেকে ফিরলেই তাকে এখানে নিয়ে আসবেন পরীক্ষা করবার জন্যে। তারপর অপারেশনের দিন স্থির হবে। ইতিমধ্যে জ্বরটা কমবার জন্যে অটো-ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ইউরিনে গতবার 'কোলি' পাওয়া গেছে। রামবাবু আবার কাল আসছেন। সম্ভবত ভ্যাকসিন নিয়ে আসবেন। বাবার শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছে। জ্বর রোজই ১০০'৪ উঠছে। এখন সব সময় শুয়ে থাকতে হয়—এতো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই বিশেষ রকম চিন্তিত হয়ে গেছি। —রথীন্দ্র

ওদিকে প্রশান্ত মহলানবিশও যথাকর্তব্য করে যাচ্ছেন। তাঁর মত হলো, অপারেশন যদি করতেই হয় তো দেরি করে লাভ নেই। শরীর আরো দুর্বল

হওয়ার আগেই করা হোক, কলকাতার ডাক্তাররা সকলে যদি একবার একত্র হয়ে পরামর্শ করেন, তাঁদের মত নেবেন রথীন্দ্রনাথ।

১৫ এপ্রিল তিনি স্ত্রী রানী দেবীকে লেখেন: কবি কেমন থাকেন তা লিখো। সত্যেন রায় বা জিতেন দত্ত কারোরই তো অপারেশন করার ইচ্ছে নয়। যা মনে হচ্ছে, তাতে অপারেশনের দিকে যাওয়ার মতো নয়। এই বয়সে এতটা রিস্ক নেওয়া কোন কাজের কথা নয়।

অর্থাৎ দোটানায় দুলছেন প্রশান্ত মহলানবিশও। স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না কেউ। বিধান রায় অপারেশন চান, চান ডাঃ প্রেমনীহার দে। তাঁদের বক্তব্য, নইলে পরে কিছু করার থাকবে না। স্যার নীলরতন চান না। কী অসহায় অবস্থা। ওদিকে কবিরাজীতে কিছু ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

ডাক্তারদের বৈঠক আবার বসল। স্যার নীলরতন সরকার ভারী গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাদের কথা ঠিক যে এ অপারেশন খুব সহজ। কিন্তু মনে রাখবেন রোগী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণলোকের মতো ওঁর নার্ভ সিস্টেম নয়। সুকুমার দেহ ওঁর। কাজেই অন্য লোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। অন্যের ক্ষেত্রে যা ফোঁড়া কাটা মাত্র, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা না-ও হতে পারে। আমার মনে হয় না, এই রিস্ক নেওয়া উচিত। ওষুধ দিয়েই এখন চিকিৎসা হোক।

সব ডাক্তার চুপ। রথীবাবুও বেঁচে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি। কিন্তু শরীর আবার অবনতির দিকে চলতে লাগল। রথীবাবু আবার বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। ৪ জুলাই তিনি আবার ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে চললেন। রবীন্দ্রনাথ করুণ হেসে আকুল স্বরে শেষবারের মতো বললেন, 'রথী, কবিরাজমশাই তো বলছেন, তিনি খুবই আশা করেন তাঁর ওষুধেই আমাকে ভাল করে তুলবেন। তবে একটু সময় লাগবে। আঃ বাঁচি, যদি কাটা-ছেঁড়া না-করতে হয়।'

বিধান রায় কিছুদিন ছিলেন দিল্লিতে। কলকাতা ফিরে এসেই যখন অপারেশন না-করানোর কথা শুনলেন, অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন, না, কিছুতেই নয়, অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। নইলে সারা দেশ আমাদের অপরাধী বানাবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে অপারেশনই এই অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার।

ডাঃ রায় ললিত ব্যানার্জিকে শিলং থেকে আনিয়ে নিলেন। রথীন্দ্রনাথ ডাঃ রায়ের কথায় আস্থা রেখে ৮ জুলাই সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। অন্য ডাক্তারদের সঙ্গেও পরামর্শ করে এবার তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত অপারেশন হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিজে একথা জানানোর সাহস তাঁর নেই। তাই এই অপ্রিয় সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে দেবার জন্যে সঙ্গে এসেছেন জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। কিন্তু অপারেশনে রবীন্দ্রনাথের তখনও ঘোর আপত্তি। তিনি বলেন, "শনি যদি একটা-কিছু ছিদ্র খোঁজে, সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে—তাকে স্বীকার

করে নাও। মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছিঁড় করার কী প্রয়োজন। দেহ অক্ষতভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো।"

কিন্তু অপারেশন যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, যখন তিনি বুঝতে পারলেন যন্ত্রণা হতে রক্ষার একমাত্র পথ অপারেশন বলে সবাই ধরে নিয়েছেন, তখন তিনি আর হাঁ-ও বললেন না, না-ও বললেন না, চুপ করে গেলেন।

জ্যোতিবাবু যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে খুব হালকা গলায় বললেন, বুঝলেন, সামান্য ব্যাপার, ফোঁড়া কাটার মতো। এ হামেশাই আমরা করে থাকি। তাই বিধানবাবুরা রথীবাবুকে বলেছেন এটা কাটিয়ে নিতে। রবীন্দ্রনাথ বিমূঢ়। চুপ করে গেলেন। তবু শেষ চেষ্টার জন্যে ক্ষীণ স্বরে বললেন, "কিন্তু কবিরাজ তো মনে করছেন অপারেশন ছাড়া সারাতে পারবেন। তবে?"

জ্যোতি : বেশতো, আজই তো আপনার অপারেশন হচ্ছে না। আপনি কবিরাজী খেয়ে যান, কেউ আপত্তি করবে না।

রবীন্দ্রনাথ সব বুঝলেন। চুপ করে গেলেন।

১৬ জুলাই বিধান রায়, ললিত ব্যানার্জি ও ইন্দু বসু শান্তিনিকেতনে এলেন। পরীক্ষা করে সোজা বললেন, এখন শরীর ভাল। অপারেশন তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। মাছ মাংস সু্যপ ভাল করে খাওয়ান।

১৯৪১ সালের ১৬ জুলাই চৌরঙ্গি রোডের ক্যালকাটা ক্লিনিকেল রিসার্চ এসোসিয়েসন লিমিটেড ল্যাবরেটরি থেকে ডাঃ সি বি বোস রবীন্দ্রনাথের রক্ত পরীক্ষা করেন। জিজ্ঞাসুদের সুবিধার জন্যে সেই দিনের ব্লাড রিপোর্টই হুবহু তুলে দিলাম।

তাছাড়া তারও আগে ১৭।৯।৪০ তারিখে রক্ত পরীক্ষা করাতে পাঠান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, এবং ২৯।৯।৪০ তারিখে রক্ত পরীক্ষা করাতে পাঠান ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। এই তিনটি ব্লাড রিপোর্টই রবীন্দ্র সদনে রাখা আছে। নীচের রিপোর্ট ১৬।৭।৪১ তারিখের।

ব্লাড রিপোর্ট

হিমোগ্লোবিন :—সিক্সটি পারসেন্ট (সাহলি) (১০-৫০ গ্রামস পার ১০০ সি সি)

এনুমারেশন অফ ব্লাড কর্পাসলস রেড : ৩,৯৬০,০০০ পার সি এম এম। হোয়াইট :—৪,১৪৪ পার সি এম এম।

ডিফারেনশিয়াল কাউন্ট

মাইক্রোসাইটিস : নীল

নিউট্রোফিটস : ৭৩ শতাংশ

লিমপোসাইটিস ঃ	২১ শতাংশ
মোনোসাইটিস ঃ	৬ শতাংশ
ইসানোফিলস ঃ	নীল
বাজোফিলস ঃ	নীল

এবনরম্যাল রেড সেলস

নেকলিটেড রেড ব্লাড সেলস ঃ	নীল
পালফিলোসাইলোসিস ঃ	নীল
এনেসোয়েটিসিস ঃ	নীল
পেলি ক্রোমোটাফিটিয়া ঃ	নীল

কেমিক্যাল একজামিনেশন

রেসিডুয়েল পি এইচ ঃ	৮'৫ শতাংশ
ব্লাড শুগার ঃ	০.১৩০ শতাংশ
ননপ্রোটিন নাইট্রোজেন ঃ	০.০৪৪ শতাংশ
ইউরিয়া নাইট্রোজেন ঃ	০.০২১ শতাংশ
ইউরিক এসিড ঃ	২.২৮ মিলিগ্রামস পার ১০০ সি সি
ক্রীটিনিন ঃ	১.৩৬ মিলিগ্রামস পার ১০০ সি সি
কোলেস্টরাল ঃ	১৪৫ মিলিগ্রামস পার ১০০ সিসি অফ হোল ব্লাড
ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটিস :	নট ফাউন্ড

১।১০।৪০ তারিখের ব্লাড ও ইউরিন রিপোর্টের একটি সারাংশ আছে।

ব্লাড রিপোর্ট

আর বি সি ৪৪৬০০০০, ডবল্যু বি সি ১২২১৬, পলি ৭৪ শতাংশ, এস এম ২০ শতাংশ, এল এম ৫ শতাংশ, ই এস ১ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন হয়েছে।

ইউরিন

এসপি—১০১১, রিঅ্যাকশন—এ্যাসিড এলবুমিনি মার্কড ট্রেস, ক্লোরাইডস ২, পাস সেলস—লার্জ নাম্বার আর বি সি এ কিউ। অর্থাৎ কিডনির অবস্থা ভাল নয়।

স্থির হলো শ্রাবণেই অপারেশন। ব্যবস্থা চলতে লাগল শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার। ই আই রেল কর্তৃপক্ষ এন সি ঘোষের উৎসাহে সুন্দর করে তৈরী করলেন রোগীর বিশেষ সেলুন। শেষ যাত্রার ট্রেন। চারদিকে সাজ সাজ রব।

যাঁকে নিয়ে এত তোড়জোড়, তিনি নীরব। শুধু মাঝে মাঝে কবিতার ডাক

আসে। শান্তিনিকেতনে বসে লেখা শেষ কবিতা ১৩ জুলাই। সকালে বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের নির্মল আকাশ—'তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে বিচিত্র সজ্জিত আজি এই প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ।'

খোলা জানালায় চোখ মেলে দেখেন শান্তিনিকেতনের আকাশ, বুক ভরে নেন শান্তিনিকেতনের বাতাস। প্রায় সত্তর বৎসরের সম্পর্ক—বাল্য যৌবন প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের কত স্মৃতি।

এলো ৯ শ্রাবণ। পঁচিশে জুলাই। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। ধীরে ধীরে তাঁকে তোলা হলো আশ্রমের নীল বাসে। পড়ে রইলো আম্রকুঞ্জ, পড়ে রইলো শালবীথি, খোয়াই কোপাই শ্যামলী দেহলী। সুরেন কর অনিল চন্দ ক্ষিতীশ রায় নীল বাসের ভিতরে উঁচু আসনে বসালেন কবিকে। স্ট্রেচারে নামিয়ে। কোন ঘোষণা নেই, কোন রটনা নেই, আশ্রমবাসী সবাই জড় হয়েছেন উত্তরায়ণের চত্বরে, সার বেঁধে দাঁড়িয়েছেন পথের দু'পাশে।

রবীন্দ্রনাথ নীরব। কোলের উপর দু'হাত জড়ো করা। চোখে কালো চশমা। বুঝি চোখের জল আড়াল করতে। নইলে কোনদিন তো তা পরেন না। বাস চলল। গানও চলল — 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।'

তখনও আশ্রমের মধ্যে গাড়ি। শান্তিনিকেতনের ডাক্তার শচীনবাবুকে যাবার সময় বললেন, 'ডাক্তার, তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলাম।' হঠাৎ দূরে থেকে একদল ছেলেমেয়ে কান্নাজড়ানো গলায় বাসের চালককে বলল — 'নীলমণিদা, গাড়ি থামাও।' ছুটে এল তাঁরা, প্রণাম জানাল গুরুদেবকে। শেষ প্রণাম। আশ্রমগুরুর চোখও ছলছল। শেষ দেখা! শেষ যাত্রা!

বাস এগিয়ে চলল। বিদায় আশ্রমগুরু, বিদায়। বাঁয়ে ছাতিমতলা, সেগুন গাছ, গৌরপ্রাঙ্গণ, ডাইনে চৈত্য, বাঁয়ে বেণুকুঞ্জ, দিনান্তিকা, ডাইনে খেলার মাঠ, একটু দূরে শ্রীনিকেতন। গান ভেসে আসছে — 'তার আকাশভরা কোলে, মোদের দোলে হৃদয় দোলে।' বিদায় আশ্রমগুরু বিদায়। বাস এগিয়ে চলল। আশ্রমগুরুর চোখ ঝাপসা। চীনভবন হিন্দীভবন ছাড়িয়ে বোলপুরের পথ। গানের আওয়াজ ক্ষীণ — 'শালের ছায়াবীথি, বাজায় বনের কলগীতি।' বাস ভুবনডাঙার পথ পেরোলো। আবার গানের রেশ — 'পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী কানন।' — সেই রেশও হারিয়ে যায়। পিছনে পড়ে রইল পাখিডাকা আলোজাগা স্বপ্নের শান্তিনিকেতন।

॥ ছয় ॥

পঁচিশে জুলাই। শুক্রবার। বেলা তিনটে পনেরো। আশী বছর আগে পঁচিশে বৈশাখ যে বাড়িতে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানেই তাঁকে শেষবারের মত আনা হল স্ট্রেচারে। বেজুত শরীরে রাস্তার ধকল, বড় ক্লান্ত তিনি। যে স্ট্রেচারে হাওড়া থেকে তাঁকে অনা হয়েছিল, তাতেই শুয়ে রইলেন মহর্ষি ভবনের দোতলার সেই পাথরের ঘরে।

অপারেশন হবে বলে আগে থেকেই ঘর খালি করে রাখা হয়েছিল। সরিয়ে দেপয়া হয় দুই দেওয়ালের দুই বড় ছবি—পিতা দেবেন্দ্রনাথ আর পিতামহ দ্বারকানাথের। চারদিক লাইজলে ধুয়ে ঝকঝক।

সারা বিকেল ঐ স্ট্রেচারেই বেশ ঘুমোলেন তিনি। ইতিমধ্যে ডাক্তারদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশে একঠায় দাঁড়ানো রাণী চন্দকে রাত সাড়ে সাতটায় বললেন, কী জানি, ভালো লাগছে না আমার। রাণী চন্দ এক ফাঁকে উঠে রথীন্দ্রনাথকে গিয়ে বললেন, গুরুদেব বলছেন, তাঁর ভাল লাগছে না, একবার আসুন।

রথীন্দ্রনাথ আর ডাঃ রাম অধিকারী এলেন রোগীর ঘরে। ডাক্তার নাড়ি দেখলেন, ওষুধ খাওয়ালেন, বললেন, ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু বড় দুর্বল। মেডিকেল বোর্ডে আর স্যার নীলরতন নেই, আছেন ললিত ব্যানার্জি, বিধান রায়, অমিয় সেন, সত্যসখা মৈত্র ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার।

খানিক বাদে এলেন মীরাদেবী। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তুমি কেমন আছ? রাণী চন্দ পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রাত্রে খাটে শোয়ানো হলো স্ট্রেচার থেকে তুলে। ঘুমোলেন বেশ ভালই।

২৬ জুলাই। শনিবার। রোগীর চেহারা বেশ ভালই। অনেক কথা বললেন, ঠাট্টাতামাসাও চলল। দেখতে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, চারু ভট্টাচার্য, অমিয় সেন। রবিকা-কে হাসিমুখে দেখে ভাইপো অবন খুব খুশি। খুড়ো ভাইপোতে তারপর কত গল্প, কত স্মৃতিচারণ।

দুপুর। ভালোই আছেন। বিকেল সাড়ে চারটেয় পঞ্চাশ সি সি গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হলো ডান হাতের শিরায়। রাণী মহলানবিশ সূঁচ ফুটানোর জায়গায় নুনের পুঁটুলির সেঁক দিলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ সারা শরীরে কাঁপুনি।

জবর উঠল ১০২'৪। আধ ঘণ্টা ঠকঠক কেঁপে ঘুমিয়ে পড়লেন আচ্ছন্ন অবস্থায়।

২৭ জুলাই। রবিবার। ভোর হতে না হতেই কবিতার কলি এলো মাথায়। রাণী চন্দকে বললেন, 'সকালবেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন —লিখে রাখ, নয়তো হারিয়ে ফেলব—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে—'

একটু থামেন, আবার বলেন। থামেন, আবার বলেন—

'কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।'

তারপর বলেন, 'প্রত্যেকবারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল। এবার চুপচাপ থাকি, পারিনে। লিখে রাখ—

বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।'

রাণী চন্দ লিখেছেন : 'কবিতার কয়েকটা জায়গায় বলে বলে কাটাকুটি করালেন। ফিরে আর একটা কাগজে তা লিখে দিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব শুয়ে শুয়েই বুকের উপরে কবিতার কাগজটি ধরে আরও তিন জায়গায় নিজের হাতে কেটে অন্য কথা বসালেন।'

রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আছেন রাণী চন্দ, রাণী মহলানবিশ, অমিতা ঠাকুর, নন্দিনী কৃপালনী। নেই একজন—প্রতিমা দেবী। এত অসুস্থ যে শান্তিনিকেতন থেকে রোগীর সঙ্গে আসতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ শুনতে চাইলেন 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' কবিতাটি। নিজেই বলতে লাগলেন, 'দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

ডাক্তারদের আসা-যাওয়া ওষুধ খাওয়ানো চলছে। কফি বার্লিজল গ্লুকোজ হরলিকসও দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হচ্ছে রক্ত ও ইউরিন। দেবেন্দ্রমোহন বসু সস্ত্রীক বিকেলে এলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ডাক্তাররা বড় বিপদে পড়েছে। কতভাবে রক্ত নিচ্ছে, পরীক্ষা করছে, কিন্তু কোন দোষই পাচ্ছে না তাতে। এতো বড় বিপদ হলো হে ডাক্তারদের। রোগী আছে রোগ নেই। এতে ডাক্তাররা ক্ষুব্ধ হবে না তো, কি, বল ?'

২৮ জুলাই। সোমবার। রোগীর অবস্থা একই রকম। কোন উন্নতির লক্ষণ নেই। বড় চুপচাপ।

২৯ জুলাই। মঙ্গলবার। রবীন্দ্রনাথ একটু বিমর্ষ। অপারেশন নিয়েই ভাবনা। রোজ গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। তিনি ডাক্তারকে বললেন, 'বড় খোঁচার ভূমিকাস্বরূপ এই ছোট ছোট খোঁচা আর কতদিন চালাবে?'

পরদিন অপারেশন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জানতে দেওয়া হয় নি। জ্যোতিপ্রকাশ সরকারকে দেখে তিনি নানা প্রশ্ন করেন। জ্যোতিবাবু এড়িয়ে যান। হঠাৎ বলেন, আচ্ছা জ্যোতি, আমাকে বুঝিয়ে বল তো, এই ব্যাপারে আমার কতদূর কী লাগবে? আমি সব বুঝে রাখতে চাই আগে থেকে।

জ্যোতিবাবু বললেন, আপনি টেরও পাবেন না কিছু। একটু খোঁচার মত হয়ত একবার একটু লাগবে। এমনও হতে পারে যে অপারেশন টেবিলে এক দিকে অপারেশন হচ্ছে, আর একদিকে আপনি কবিতা বলে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে, আমার কিছুই লাগবে না।

জ্যোতিবাবুর জবাব: একটুও না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ওদিকে বাড়ির মধ্যেই বারান্দায় অপারেশন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ধোয়া মোছা যন্ত্রপাতি সাজানো ইত্যাদি। ডাক্তাররা নানা পরীক্ষা করে যাচ্ছেন রোগীকে। তবে তখনও তিনি জানেন না কবে অপারেশন।

অপারেশনের আগের দিন কবির অবস্থা কেমন ছিল, তার একটি পূর্ণ বিবরণ তুলে দিচ্ছি চার্ট থেকে।—

২৯-৭-৪১ ॥ মঙ্গলবার ॥ অপারেশনের আগের দিন

তাপ: সকাল ৬টা—৯৯·৭, ৭টা ১৫ মিঃ—৯৯·৪, দুপুর ২টা ৫৫ মিঃ—৯৯·৬, রাত ৮টা ৪০ মিঃ ৯৯·৭।

নাড়ি: সকাল সাতটা ১৫ মিঃ—১০০, বিকেল ৪টা ১০ মিঃ—৯৮, রাত ৮টা ৪০ মিঃ—১০০।

ইউরিন: সকাল ৬টা ৪০ মিঃ—৩ আউন্স, সকাল ৭টা ১৫ মিঃ—৪½ আঃ, দুপুর ১২টা ১৫ মিঃ—৪½ আঃ, ২টা ৩০ মিঃ—৪½ আঃ, ২টা ৫৫ মিঃ—৪½ আঃ, ৩টা ৩৫ মিঃ—৫½ আঃ, ৪টা ১০ মিঃ—৫ আঃ, ৪টা ৫০ মিঃ—৩½ আঃ, ৫টা ১৫ মিঃ—৪ আঃ, সন্ধ্যে ৬টা—২½ আঃ, রাত ৭টা ৩০ মিঃ—৩ আঃ, ৯টা ২৫ মিঃ—৫ আঃ, ১১টা ১০ মিঃ—৪½ আঃ, ১টা ১৫ মিঃ—৩ আঃ, ২টা ৩৫ মিঃ—৪ আঃ, ভোর ৫টা—৪½ আঃ। অর্থাৎ ১৬ বারে মোট ৬৫½ আউন্স।

খাওয়াদাওয়া: সকাল ৬টা ২৫ মিঃ—৮ আউন্স কফি ও দু টুকরো রুটি। ৭টা ২০ মিঃ—খই-দুধ ৪ আঃ, ৭টা ৪০ মিঃ—কফি ৮ আঃ, ১০টা ১৫ মিঃ—আঙুরের রস ৫ আঃ ও সব্জিস্যুপ ২ আঃ, দুটো ডিম, ১ খানা রুটি, তরকারি ও ২ চামচ পায়েস।

দ্পুর ২টা ৩০ মিঃ—যবের মণ্ড ও দুধ ৮ আঃ, ২টা ৫৫ মিঃ বাদাম ও মনাক্কার রস ২½ আঃ, জল ৩ আঃ, সন্ধে ৬টা ৪৫ মিঃ—যবের মণ্ড ও সুষনির রস ৮ আঃ, ১১টা ১০ মিঃ—যবের মণ্ড ৬ আঃ, গ্লুকোজ জল ৪ আঃ, রাত ৩টা ১৫ মিঃ—গ্লুকোজ ৩ আঃ, ভোর ৫টা গ্লুকোজ ৬ আঃ। সব মিলিয়ে সারাদিনে রাতে মোট ৭২ আউন্স খাবার।

এতো গেল ইউরিন মাপা, তাপ আর নাড়ি দেখা এবং খাওয়া-দাওয়ার চার্ট। সেবক-সেবিকাদের ওষুধ খাওয়ানোরও আলাদা একটি চার্ট রাখতে হতো। যেমন অপারেশনের আগের দিন ২৯ জুলাইয়ে।

২৯ জুলাই ॥ মঙ্গলবার ॥ অপারেশনের আগের দিন ঔষধ ঃ

সকাল ৮টা ৩০ মিঃ—সিসটোপিউরিন, ১০টা ১৫ মিঃ—সাইট্রোকার্ব, ১১টা ৫০ মিঃ—ইনজেকশন, ২টা ৩০ মিঃ—সিসটোপিউরিন ১টি বড়ি, ২টা ৫৫ মিঃ—সাইট্রোকার্ব, ৩টা ৩৫ মিঃ—সবলা (সম্ভবত কবিরাজী ওষুধ), পাশে লেখা প্রস্রাবে জ্বালা। ৫টা ১৫ মিঃ—সোডিবাইকার্ব, প্রটসাইট্রাস, রাত ৭টা—সিসটো-পিউরিন, ১১টা ১০ মিঃ—টনিক হয়োজেমস, ১১টা ১৫ মিঃ—সিসটোপিউরিন।

এই যখন শরীরের অবস্থা, তখনও কবির মাথায় কবিতা ঘুরছে। বিকেলে মুখে মুখে বললেন, রাণী চন্দ লিখে নিলেন,—'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে।' তারপর মুখে মুখে বলেই সংশোধনও করলেন অনেক জায়গায়। তারপর যেন আপন মনেই বলে চললেন, 'ভয়কে ভয় করলেই ভয়।'

৩০ জুলাই। বুধবার। আজ সেই ভয়ংকর দিন। অপারেশন হবে। সকাল থেকেই তোড়জোড়। পাথরের ঘরের পূর্ব দিকের লম্বা বারান্দায় দক্ষিণ দিকে ঘেঁষে অপারেশন টেবিল বসানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখনও জানেন না খানিক বাদেই অপারেশন।

সেদিন তাঁর গায়ে জ্বর—৯৮·৮। নাড়ির গতি ৯২। সকাল ৬টা, ৯টা ৪৫ মিঃ ও সকাল ১০টা ২০ মিঃ—এই তিনবারে ইউরিন হয়েছে সাড়ে চৌদ্দ আউন্স। খেয়েছেন সকাল আটটায় পেঁপে আর কফি—মোট আট আউন্স।

রবীন্দ্রনাথ তারই মধ্যে হঠাৎ জ্যোতিবাবুকে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা বলতো, ব্যাপরটা কবে করছ তোমরা ?' জ্যোতিবাবু জানালেন, কাল কি পরশু—ললিত-বাবু যেদিন ভালো বুঝবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জেগেছে।

সকাল ন'টা নাগাদ রাণী চন্দকে ইসারায় ডাকলেন। কাগজ কলম নিয়ে রাণী চন্দ কাছে আসতেই বললেন, লেখ—

তোমার সৃষ্টির পথ
রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী—

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে—

এতটুকু বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বুকের উপর দু'হাত জড়ো করে সাড়ে ন'টার সময় আবার বলতে শুরু করলেন—

'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

তার খানিক্ষণ পর একটা শব্দ পাল্টালেন। কিন্তু পুরোটা সংশোধন করতে পারেন নি। কবিতাটি পড়ে শোনালে বললেন, 'কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করব'খন। কিন্তু কে জানত সে-ই তাঁর শেষ রচনা, সংশোধন করার আর সুযোগ পাবেন না।

বেলা দশটা। রাণী চন্দকে বললেন, 'একটা চিঠি লেখ বৌমাকে।' তিনি বলে গেলেন, রাণী চন্দ লিখতে লাগলেন। পরে চিঠির নীচে কাঁপা কাঁপা হাতে অতি কষ্টে সই করলেন—বাবামশায়। কে জানত, এই তাঁর শেষ চিঠি। শেষ সই।

১০টা ৩০ মিঃ। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন ললিতবাবু। ভারতের পয়লা নম্বর শল্যচিকিৎসক ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জি। বললেন, আজ দিনটা ভালো আছে। তাহলে আজই সেরে ফেলি? কী বলেন?

রবীন্দ্রনাথ একটু চমকে বললেন, 'আজই? তা ভাল, এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভাল।'

১১টা। স্ট্রেচারে করে বাইরের বারান্দায় তাঁকে আনা হলো। চারদিকে থমথমে ভাব। মুখের সামনে একটা স্ক্রীন দেওয়া আছে, যাতে কিছু দেখতে না পান। আসল অপারেশন—প্রস্টেট কাটা নয়, শুধু একটা জায়গা ফুটো করে ইউরিন বেরোনোর রাস্তা করে দেওয়া। ডাক্তারীশাস্ত্রে যাকে বলে সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্কপি। এটা ভালোয় ভালোয় কাটলে পরে আসল এনলার্জড প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের অপারেশন।

নিঝুম বাড়ি। সবার মুখে আতঙ্কের ছায়া। চারদিকে সূচীপতন নৈঃশব্দ্য। ১১টা ২০ মিনিটে অপারেশন শুরু, ১১টা ৪৫ মিনিটে শেষ। মাত্র ২৫ মিনিট। সব ভালোয় ভালোয় কাটল। তবে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করানো হয় নি। লোক্যাল এনাস্থেশিয়া।

ছুরি ধরেছিলেন ললিতবাবুই। তাঁর সহকারী ছিলেন সত্যসখা মৈত্র ও অমিয়কুমার সেন। ঘেরা জায়গার ভিতর ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। সহকারী অমিয়কুমার সেন সেই সময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে—

সত্যসখা মৈত্র ও আমি ললিতবাবুর সহকারী। পূর্বের বারান্দায় অপারেশন ঘরের পাশে জ্যোতিপ্রকাশ সরকার কবির মাথার দিকে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা তামাসা

করতে লাগলেন। দু'একটা ঠাট্টা তামাসা কবি আমাদের সঙ্গেও করছিলেন। তবে বেশি করছিলেন না। কারণ তাঁর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। লোক্যাল এনাস্থেশিয়ায় রোগী কাটাকাটির কষ্ট বোঝে না বটে, কিন্তু কোন জিনিস টানা বা চাপ বোঝা যায়। সেই কষ্টটা বুঝছিলেন। ভয়ানক সেনসিটিভ ছিলেন তো উনি। সেই কষ্টটা বড্ড পাচ্ছিলেন। অপারেশনতো হয়ে গেল। বেশিক্ষণ লাগল না। তাঁর বিছানায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ভালোই ছিলেন। বেশ হাসিখুশি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৩ আগস্ট থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে লাগল। ৫ আগস্ট থেকে তাঁর খুব একটা জ্ঞান ছিল না। একটা ঘোরের ভাব। আমার উপর অপারেশনে সহযোগিতা করা ছাড়াও দিবারাত্র উপস্থিত থেকে চিকিৎসার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তা করার ভার ছিল। নয় দিন অহরহ শয্যাপার্শ্বে থেকে সেবা করেছি। সিনিয়র যাঁরা, তাঁরাই সিদ্ধান্ত নিতেন। আমি সেগুলি কাজে লাগাতাম—এই পর্যন্ত। ওই সময় নিজের কাজে পর্যন্ত যাই নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মহাগুরু নিপাত হলো।

অপারেশনের পরে ঃ রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমোলেন। সেদিনের চার্টে লেখা আছে ঃ **তাপ ঃ** দুপুর ১টা ৫০ মিঃ—৯৮·২, ৪টা ১৫ মিঃ—৯৮·৮, রাত ৮টা ১৫ মিঃ—৯৯·৩, শেষ রাত ৪টা ৪০ মিঃ—৯৯। **নাড়ি ঃ** দুপুর ১টা ৫০ মিঃ—৯৬, ৪টা ১৫ মিঃ—১০০, ৮টা ১৫ মিঃ—১০০, রাত ১টা ১০ মিঃ—১০৪, শেষ রাত ৪টা ৪০ মিঃ—১০৮। **ইউরিন ঃ** দুপুর ১২টা থেকে রাত ৭টা ৩০ মিঃ—১৪ আউন্স, রাত ৭টা ৩০ মিঃ থেকে ভোর ৭টা ৩০ মিঃ—১৪ আউন্স। অর্থাৎ অপারেশনের পরে দুপুর ১২টা থেকে ভোর ৭টা ৩০ মিঃ—ইউরিনের মোট পরিমাণ ২৮ আউন্স।

খাবার ঃ বিকেল ৪টা ১০ মিঃ—জল ৪ আউন্স, ৫টা—জল ১ আঃ., ৫টা ৪০ মিঃ—গ্লুকোজ ½ আঃ, সন্ধে ৬টা—জল ৪ আঃ, ৬টা ১০ মিঃ—জল ২ আঃ, রাত ৭টা ৪০ মিঃ—যবের মণ্ড ১ আউন্স, ৮টা ৪৫ মিঃ—গ্লুকোজ ২ আঃ, ১০টা ৪৫ মিঃ—বার্লি ৪ আঃ, ১১টা—বার্লি, ১২টা ৪৫ মিঃ—বার্লি, ১টা ২০ মিঃ—বার্লি, ২টা ২০ মিঃ—গ্লুকোজ ও বার্লি, ২টা ৫৫ মিঃ—গ্লুকোজ ও বার্লি, ৩টা ১৫ মিঃ—গ্লুকোজ, শেষ রাত ৪টা ৪০ মিঃ—গ্লুকোজ। অপারেশনের পর সব মিলিয়ে মোট খাবার ৪৫ আউন্স।

ঔষধ ঃ সকাল ৮টা ৩০—সিসটোপিউরিন ২টা বড়ি, ১০টা ১০ মিঃ—কার্ডিওজল, রাত ৮টা ১৫ মিঃ—সিসটোপিউরিন ১টা বড়ি, ৯টা ৪০ মিঃ—সিসট্রোকার্বোনেট, ১০টা ৪৫ মিঃ—ব্রমাইড (দ্বিতীয় বোতল পাল্টানো হলো), ১টা ২০ মিঃ—ব্রমাইড, শেষ রাত ৪টা ৪০ মিঃ—গায়ে ঘাম, সকাল ৬টা ৪০ মিঃ—গায়ে ঘাম।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙার পর বারবার বলতে থাকেন, জ্বালা করছে, ব্যথা করছে! সেবিকা অমিতা ঠাকুরকে বলেন, 'অপারেশনের সময় আমি সব টের পেয়েছি। বড় কষ্ট পেয়েছি।' সন্ধে সাতটায় ললিতবাবু বললেন, অপারেশনের

সময় আপনার কি লেগেছিল ? রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কেন মিছে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে ? আর জ্যোতিকে একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই, সে যে আমাকে বোঝালে যে একটুও লাগবে না, তার মানে কী ?'

ললিতবাবু বললেন, এক রকম ভালোয় ভালোয় সব হয়ে গেল, কেবল জ্যোতির দুঃখ রয়ে গেল, আপনার কবিতাই বলা হলো না অপারেশনের সময়।

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন। রাণী চন্দ আর একটি নতুন কবিতা লেখার জন্যে তৈরী হতেই বললেন, 'খেপেছিস তুই, এখন কবিতা লিখব ?' তবে বিবেলে আগের দিন্ লেখা 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' কবিতাটি আলাদা কাগজে লিখিয়ে বললেন, 'জ্যোতিকে দিয়ে আয়।'

৩১ জুলাই। বৃহস্পতিবার। অপারেশনের পরদিনের চার্টে দেখা যাচ্ছে, সারা গায়ে অসহ্য জ্বালা।

তাপ ঃ সকাল ৬টা ৩০ মিঃ—১০০'২, ৮টা ১৫ মিঃ—১০০'৬, ১০টা ৫০ মিঃ —১০০'২, দুপুর ১২টা ৫০ মিঃ—১০০'২, ২টা ৭ মিঃ—১০১'২, ৩টা ১৫ মিঃ —১০১'৬, ৪টা ৩০ মিঃ—১০১'৮, রাত ৭টা ২৫ মিঃ—১০০.৮, শেষ রাত ২টা ৫৫—১০০'৮।

নাড়ি ঃ দুপুর ২টা ৭ মিঃ—১২০, ৩টা ১৫ মিঃ—১২০, ৪টা ৩০ মিঃ—১২২ রাত ৭টা ২৫ মিঃ—১০৮, ২টা ৫৫ মিঃ—১০০।

ইউরিন সারা দিনে ৩০ আউন্স।

খাবার ঃ গ্লুকোজ মনক্কার রস ব্র্যান্ডস এসেন্স অফ চিকেন ও জল মিলিয়ে মোট ৪১½ আউন্স।

দুপুর ২টা থেকে ৭টা—ড্রেসিং বদল। সেলাইয়ের ঘা শুকনো, সন্ধে ৭টা —ইউরিন ৪ আউন্স, বোতল বদল, রাত ১১টা ১৫মি.—গরম বোধ করছেন, রাত ১১টা ৪৫ মিঃ—সারা গায়ে অসহ্য জ্বালা (বার্নিং সেনসেশন)।

রাত ৯টা ২০ মিঃ—এম বি ৬১৩ গ্লুকোজ ইনট্রা মাসকুলার ইনজেকশন ১০০ সি সি।

রাত ১০টা—ক্যালসিয়াম স্যানডোজ ১টা বড়ি।

এক ফোঁটা ঘুম হয় নি।

৩নং বোতল বদল, তুলো প্যাড বদল। তুলো ভেজা।

১ আগস্ট। শুক্রবার। অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতরোক্তি। জল ও ফলের রস দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা বার বার পরীক্ষা করছেন। আলোচনা সলাপরামর্শ চলছে। সেবক-সেবিকারা আশঙ্কিত। পাশের ঘরে বসে রথীন্দ্রনাথ ছটফট করছেন। সবার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। সারাদিন সারারাত আচ্ছন্ন হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিনের চার্ট বলছে ঃ

ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট অরেঞ্জ জুসের সঙ্গে মিশিয়ে—২২ গ্রাম।

দুপুর ১২টায় ইনজেকশন ১০০ সি সি। বোতল বদল। বায়ু নিঃসরণ রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে।

২ আগস্ট। শনিবার। সেই একই আচ্ছন্ন অবস্থা। ডাক্তাররা বলেছিলেন তিন দিন কাটলে বিপদ কাটবে। কিন্তু তার মধ্যেই সঙ্গীন অবস্থা। শরীরে জ্বালা। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। অসহ্য কষ্টে এপাশ-ওপাশ করেন। কিছু খাওয়াতে গেলে বলেন, 'আঃ, আর জ্বালিও না।' কেউ যদি বলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?' জবাব দেন বিরক্তিতে—'কী, কী করতে পার তুমি? চুপ করে থাকো।'

একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, কী রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে জবাব দেন, 'এর কি কোনো বর্ণনা আছে।'

দুপুর থেকে আচ্ছন্ন অবস্থা। সংকট বাড়ছে। সারাদিন সারারাত এই ভাবে কাটে। তার উপর হিক্কা উঠছে। কী কষ্ট, কী কষ্ট। বিধানবাবু এসে দেখে মুখ গম্ভীর করে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিনের চার্টের বিবরণ এই রকম ঃ—শেষ রাত ২টা ৪৫ মিঃ—৮ মিনিট হিক্কা, ৩টা ৩০ মিঃ—৫ মিনিট হিক্কা, ১০ মিনিট হিক্কা। রাত ১২টা ২০ মিঃ থেকে রাত ১টা—মাত্র ৪০ মিনিট সামান্য ঘুম। রাত ১টা থেকে আবার ১৬ মিনিট হিক্কা।

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনে আনা হচ্ছে কাছেই জোড়াসাঁকো এলাকার একটি দোকান থেকে। দোকানের নাম 'মহাত্মা অ্যান্ড কোং।' ডাঃ ডি এন চ্যাটার্জি ও ডাঃ জে পি সরকারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওই দোকান থেকে ওষুধ কেনার একগাদা রসিদ আমি সংগ্রহ করেছি। তবে শুধু ২ আগস্ট দুই কিস্তিতে ও ৪ আগস্ট দুই কিস্তিতে—মোট চার কিস্তিতে কেনা ওষুধের বিবরণ মাত্র দিলাম। ডাক্তারদের কাজে লাগতে পারে।

মহাত্মা অ্যান্ড কোং
নং ১৩৩০
২।৮।৪১
ফর ডঃ আর এন টেগোর

পিল সাইট্রাস
সোডি বাই কার্ব
পট এসিডাস
সিরাপ রোজ
এজেন এড
মিকশ্চার ফর ওআন ডোজ
সেন্ড এইট সাচওয়ান ডোজ এভরি ফোর আওয়ার্স

জে পি সরকার, ২।৮।৪১

মহাত্মা অ্যান্ড কোং

নং ১৩৪৬

২।৮।৪১

ফর ডঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোর

হাইড্রাগ—½ গ্রেন
মেনথল—½ গ্রেন
একুল বেলাডোনা—½ গ্রেন
নাসি ভোম—½ গ্রেন
জেনাটিয়েন—কিউ এস

প্লীজ সেণ্ড এইট সাচ ওয়ান টু বি টেকেন অ্যাজ ডিরেকটেড। ডাক্তারের নাম অস্পষ্ট, তারিখ ২।৮।৪১

৩ আগস্ট। রবিবার। অবস্থা আরও খারাপের দিকে। শান্তিনিকেতনে ফোন করে অসুস্থ প্রতিমাদেবীকে আনা হলো। ওষুধ বা খাবার খেতে ভীষণ অনিচ্ছা। বিরক্তি। দুপুর থেকে সারা রাত একইভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটালেন। হিক্কাও তদ্রূপ। চার্টের ভাষ্য ঃ

ঔষধ ঃ হাইড্রাগ পিল। বিশপস ম্যাগনেশিয়া সাইট্রেট মিকশ্চার। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে বিছানা নষ্ট। **খাবার ঃ** কফি, ফলের মণ্ড, কমলার রস।

আর একটি খাতায় দেখছি ওষুধ খাওয়ার আলাদা নির্দেশ রয়েছে। তাতে লেখা—ডিরেকশন গিভেন বাই ডকটর ব্যানার্জি'। অর্থাৎ সার্জন ললিতমোহন ব্যানার্জি। (১) ক্লোরেটন ইনহ্যালেণ্ট টু স্প্রে এভরি ফোর আওয়ার্স, (২) গ্লাইকো থাইমোলিন ও মেল বোরোসিস—টু পেইণ্ট দি টাংগ্ এভরি ফোর আওয়ার্স, (৩) বেল্লাগোল—ওয়ান ট্যাবলেট অ্যাট নাইট। ইফ নেসেসারি টু বি ফলোড বাই পিঙ্ক ব্রমাইড ওয়ান টি স্পুনফুল, (৪) হাইড্রাগ পিল—ওয়ান পিল, (৫) ইউরিন টু বি সেণ্ট ফর একজামিনেশন (আলকালিন ১০০৫, ক্লোরাইড ৪, পাসসেল আর বি সি এ ফিউ)।

রবীন্দ্রনাথের ইউরিন পরীক্ষা করা হয় ৬ চৌরঙ্গী রোডের সেই ক্যালক্যাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এসোসিয়েশন লিমিটেডে। ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে পর পর অনেকবার ইউরিন পরীক্ষা করানো হয়। মৃত্যুর চার দিন আগে শেষ যে রিপোর্ট পেয়েছি, তার হুবহু বিবরণ নিচে তুলে দিলাম। পরীক্ষক ডাক্তার ছিলেন ডাঃ এস কে রায়। তারিখ ৩ আগস্ট ১৯৪১। তার আগে ইউরিন পরীক্ষা একই জায়গা থেকে হয় ২৬ জুলাই ১৯৪১। পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত।

৩।৮।৪১ তারিখের রিপোর্টটি এই রকম। মনে রাখতে হবে, তার আগে রবীন্দ্রনাথের অপারেশন হয়ে গেছে।

ফিজিক্যাল এগজামিনেশন

কালার ঃ—পেইল ইয়েলো
ট্রান্স পেরেন্সি ঃ—হ্যাজি
ওডার ঃ—নর্মাল
স্পেসিফিক গ্রেভিটি ঃ—১০০৭
(২৬ জুলাই তারিখে ছিল ১০০৮)
সেডিমেণ্ট অন স্ট্যানডিং ঃ—নীল
(২৬ জুলাই তারিখে বলা ছিল—স্লাইট)
সেডিমেণ্ট আফটার সেনট্রিফ্যুগেলাইজেশন ঃ—প্রেজেণ্ট

কোয়ালিটেটিভ

রিঅ্যাকশন ঃ—ফেইণ্টলি আলকালিন
আলবুমিন ঃ—প্রেজেণ্ট। আ ট্রেস ওনলি
শুগার ঃ—নীল
হিমোগেল্লাবিন ঃ—নীল
ব্লাইট ঃ—নীল
চাইল ঃ—নীল
এসিটোন ঃ—নীল
ডায়াসেটিক এসিড ঃ—নীল
ইণ্ডিক্যান ঃ—প্রেজেণ্ট ঃ আ ট্রেস ওনলি
ইউরোবোলিজ ঃ—×
এলবুমিন ঃ—×
শুগার ঃ— ×
ক্লোরাইডস ঃ—০'৩ শতাংশ
ইউরিয়া ঃ—০'৭ শতাংশ

কাস্ট

এপিথেলিয়াল হায়ালিন গ্র্যানুলার ব্লাড ফলস কাস্টস সাইলিন ড্রয়েডস ঃ—নীল
এপিথেল্লা ঃ—আ ফিউ প্রেজেণ্ট
লেনকোসাইটিস ঃ—×
পাস সেলস ঃ –প্রেজেণ্ট ইন ফেয়ার নাম্বার
রেড ব্লাড সেলস ঃ—আ ফিউ প্রেজেণ্ট
আদার প্রডাক্টস ঃ—নীল।

আন অরগ্যানাইজড সেডিমেণ্ট

ক্রাইস্টালিন
ইডারক এসিড ক্যালসিয়াম অক্সালেট ট্রিপল ফসফেট আদার ফর্মস ঃ—নীল

ইউরেটস ফসফেটস আদার ফর্ম ঃ—নীল

মাইক্রো অর্গাজিম ঃ—প্রেজেন্ট।

অর্থাৎ কিডনি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন ৬ আগস্ট তারিখে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে ইউরিন শেষবারের মত পরীক্ষা করা হয়। পাস সেল আরো বেড়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তুলে দিলাম—

কালচার রিপোর্ট অব ইউরিন সেন্ট ইয়েস্টারডে

পাস সেল—+ +

হাপ—×

অপ্‌ট—১০০৫

এলবুমিন—×

হ্যাজি ইউরিয়া—·৩ শতাংশ

ডেলোরিড—·৪ শতাংশ।

৪ আগস্ট। সোমবার। সংকট বাড়ছে, পরমায়ু কমছে। ফিডিং কাপে কফি। চার আউন্স মত খেলেন। প্রতিমা দেবী কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, বাবামশায় আমি এসেছি, আমি বউমা, বাবামশায়।

রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, দুটো চোখে স্নেহমমতা ঢেলে ভালো করে তাকালেন, মাথা নাড়লেন। তারপর আবার এলিয়ে পড়লেন।

ডাক্তার কয়েকজন বাড়িতেই আছেন। কেউ কেউ আসছেন বাইরে থেকে। রাত দশটায় ভয়ানক অবস্থা। ডাঃ ইন্দুমাধব বসু এলেন। জ্বর বাড়ছে, উপসর্গ বাড়ছে। রাত এগারোটার সময় ডান হাত তুলে আঙুল ঘুরিয়ে আবছা স্বরে বলেন, 'কী হবে কিছু বুঝতে পারছি নে—কী হবে।' কাশি হিক্কা দুই-ই সমান তালে চলছে। সবাই আন্দাজ করতে পেরেছেন দ্রুত কী ঘটতে চলেছে। সেদিনের চার্ট বলছে—

কাশি বেড়েছে। হিক্কা। ক্লোরেটোন মিশিয়ে টিউরোনেট স্প্রে করা হলো।

ঔষধ ঃ মরিচপোড়া জহলাতু

ভ্যালিডল ১০ ডেফ

অ্যান্ট্রিজহেন ইনজেকশন

খাবার ঃ মৌরীর জল, মুড়ির জল।

তাছাড়া ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মত দোকান থেকে ওষুধ আনার হিসাব হলো ঃ

মহাত্মা অ্যান্ড কোং

নং ১৩৯৭

৪।৮।৪১

ফর ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসিড হাইড্রোসাইমিডিল—এম
লিগ বিসমাথ
সিরাপ ক্লোরাল ভিগ
আকুয়া—এড জেড আই
সেন্ড ফোর সাচ। টু বি টেকেন অ্যাজ ডিরেকটেড।

ডি এন চ্যাটার্জি।

মহাত্মা অ্যান্ড কোং
নং ১৪০৩।
৪।৮।৪১
ফর ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাইড্রোগ—৮ গ্রেন
মেনথল—৮ গ্রেন
একজল বেল্লাডোনা—৮ গ্রেন
একজল নসিঙ্গ ভোম —৮ গ্রেন
একজল জ্রেনটিন—কিউ এস গ্রেন
এস টি পিল্লুলা ফর ডোজ ওনলি সেন্ড এইট সাচ।
টু বি টেকেন অ্যাজ ডিরেকটেড।

ডি এন চ্যাটার্জি

৫ আগস্ট। মঙ্গলবার। অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। ডাকলেও সাড়া নেই। ইউরোমিয়া প্রবলভাবে জেঁকে বসেছে। নীলরতন সরকার এলেন, বিধান রায় এলেন। দেখলেন। স্যার নীলরতন রোগীর পাশে বসে অনেকক্ষণ দেখলেন, অবস্থা শুনলেন অন্য ডাক্তারের কাছ থেকে। কিছু বললেন না। শুধু রোগীর ডান হাতখানায় বার বার হাত বুলোলেন। স্যার নীলরতন স্থির দৃষ্টিতে রোগীর দিকে অনেকক্ষণ তাকালেন। যাবার জন্যে উঠলেন। রোগীর মাথার কাছ পর্যন্ত এসে ঘুরে দাঁড়ালেন। আবার দেখলেন। তারপর দরজা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। বড় বিষণ্ণ, বড় ক্লান্ত পদক্ষেপ। খানিক পরে আর একজন ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে। বলিষ্ঠ দেহ, তবু বড় মন্থর তাঁর গতি। তিনি বিধানচন্দ্র রায়। পরাজিত চিকিৎসক!

রাত্রে দেওয়া হল স্যালাইন। অক্সিজেনও রাখা আছে। নাক বাঁ দিকে হেলে গেছে, গাল দুটি ফোলা, বাঁ চোখ ছোট এবং লাল। পায়ের ও হাতের আঙুলে ঘাম। সেদিন খেতে দেওয়া হল হরলিকস, বেদানার রস, কফি।

ললিত ব্যানার্জি এলেন। অপারেশনের সেলাই খুলে দিয়ে গেলেন। মুখ গম্ভীর।

ডাঃ জে এন দত্ত এবং ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকারও ওষুধের প্রেসক্রিপশন করেছেন। ৫ আগস্ট, ১৯৪১ তারিখে লেখা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটা প্রেসক্রিপশনে তিনি লিখেছেন—

স্টপ এম, বি অ্যান্ড প্রতারটাজিল টিল সেভেন পি এম্‌। নো অ্যাট্রোপিন ওর ক্যালসিয়াম ইনজেকশন টিল সেভেন পি এম।

কনটিনিউ (১) মিকশ্চার (অ্যালক্যালিন) থিু ডোজেজ, (২) পিল হাইড্রাগ থিু ডোজেজ, (৩) ফর হিককাফ।

৬ আগস্ট। বুধবার। রবীন্দ্রনাথ অচেতন। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতরোক্তি। বেলা সাড়ে দশটায় ডাঃ ললিত ব্যানার্জি এলেন। ম্লান মুখ। বিষণ্ণ দৃষ্টি। কবির ঘরে তিনি গেলেন। বাইরে বারান্দায় ও বসবার ঘরে অজস্র প্রিয়জন অপেক্ষায়।

ললিতবাবু বেরিয়ে এলেন। মৃদুস্বরে বললেন, উই আর নট হ্যাপি। একথা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা ভালো।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে নেমে, ধীরপদে গাড়িতে উঠে ঠাকুরবাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন পরাজিত চিকিৎসক।

দুপুর ১২টা। একই অবস্থা। মুখে দেওয়া জল বা ফলের রস গড়িয়ে পড়ছে মুখ থেকে। বিকেল কাটল একইভাবে। সন্ধ্যেও তাই। বর্ণকুমারী দেবী ভাইকে দেখতে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢোকেন আর ফিরে যান। বার বার।

রাণী চন্দ লিখছেন: গুরুদেবের শিয়র বরাবর বাইরে পুবের আকাশে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে দেখি, পরিপূর্ণ ছবি একখানি। এই ছবিখানি যেন আজকের জন্যই দরকার ছিল। এমনটিই হবার কথা ছিল।

রাত বারোটায় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সবাই আশা ছেড়ে দিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান তিনি। অনেকে ভেবেছিলেন, রাত তিনটে কাটলে সংকট কাটবে। তিনটে বাজল। সংকট কাটল না। তার আগে এই মর্তজীবনে তাঁর শেষ খাবার: সন্ধে ৬টায় দেড় আউন্স আখের রস এবং রাত সাড়ে ৯টায় বার্লি আধ আউন্স। কিছু মুখে যায়, কিছু গড়িয়ে পড়ে গেল।

সেদিনের তাপ: বিকেল ৪টা—১০১·৪, ৬টা ১৫ মিঃ—১০২·৭, রাত ৮টা ২০ মিঃ—১০১·৮, ৯টা ৩১ মিঃ—১০১·৮, ১১টা ২৫ মিঃ—১০২·৮, ২টা ১৫ মিঃ—১০২ (আর্মপিট)। নাড়ির গতি: বিকেল ৩টা ৫৫ মিঃ—১১৫।২১, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিঃ—১১৬।২২, রাত ৭টা ৩৫ মিঃ—১২৮।৩২, ৭টা ৪৫ মিঃ—১৬০।৭০, ৮টা ২০ মিঃ—১৩০।৩৬, ৯টা ৩১ মিঃ—১৩০।৩৬, ১১টা ২৫ মিঃ—১২৪।৩৬, ১টা ৪১ মিঃ ১২২, ৩টা ৪০ মিঃ—১৩৪।৩৮।

খাবার: দুপুর ২টা ৫০ মিঃ—গ্ল্যাকসো ১½ আউন্স, ৩টা ২৮ মিঃ—গ্ল্যাকসো ১½ আউন্স, সন্ধে ৬টা আখের রস ১½ আউন্স, রাত ৯টা ৩০ মিঃ—

বার্লি ½ আউন্স। এই বার্লিই তাঁর মর্তজীবনের শেষ খাবার। তাও মাত্র আধ আউন্স।

দুপুর ৩টা ৫৫ মিনিটে ওষুধ দেওয়া হলো মিকশ্চার, বিকেল ৫ টায়—৩ আড্রেনালিন ১০ ফোঁটা। ৩-৩০ মিনিটে ৩০ মিনিট ধরে হিক্‌কা শুরু। কাশি উঠেছে। আবার ওষুধ পড়ে। স্টিফপার্স: বিকেল ৫টা থেকে ৬টা ৪০ রিল্যাকসন এম এস।

গলা সাফ করে দেওয়া হল ওষুধ স্প্রে করে। রেকটাম স্যালাইন শুরু। ৩০ ফোঁটা প্রতি মিনিট।

সেদিন সকালবেলার জন্যে তাঁর প্রেসক্রিপশন—(১) গ্লুকোজ- ৫০ সি সি সকাল-বিকাল, (২) ইন অ্যান্ড বি ৬৯৩ ফোর ট্যাবলেট, (৩) আল্‌কালিন মিকশ্চার ফোর টাইমস আ ডে, (৪) রেকট্যাম স্যালাইন—ওজে ৪০ ড্রপস আ মিনিট, (৫) হিক্‌কার জন্য বেনজিল বেনজনস—অ্যাজ নেসেসারি, (৬) হিক্‌কার জন্য ড্রপ ডোজ অফ টিংচার আয়োডিন—অ্যাজ নেসেসারি, (৭) থ্রোট টু বি ক্লীনড অ্যান্ড স্প্রেইড।

বিকেলবেলার জন্যে প্রেসক্রিপশন—(১) আড্রেনালিন—ফিফটিন এম থ্রি আওয়ার্স, (২) ৭টা ১৫ মিঃ কার্ডিওজল—ওয়ান ট্যাবলেট অ্যান্ড ওআন সিকস আওয়ার্স আফটার, (৩) অ্যাট্রোপিন ১।১০০ ইনজেকশন, (৭) রেকট্যাম স্যালাইন জে থার্টি ড্রপস পার মিনিট, (৫) গ্লুকোজ—৭৫ সি সি ৪, (৬) থ্রোট টু বি স্প্রেইড বাইক্লোরেটোন, (৭) মাউথ টু বি পেইন্টেড উইথ মেল বোরাসিস।

রাত্রিবেলার প্রেসক্রিপশন—(১) আড্রেনালিন—১৫ ড্রপ (রাত ১টা), (২) কার্ডিওজল ট্যাবলেট—ওআন অ্যাট (রাত ২টা), (৩) স্প্রেয়িং দি থ্রোট অ্যান্ড পেইন্টিং মাউথ বাই মেল বোরাসিস অ্যাট রাত ১০টা, রাত ১টা, রাত ৪টা।

ওদিকে বাড়ি থমথমে। রাখী পূর্ণিমার জোয়াব আকাশে। কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে, কলকাতায়, বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।

কাশি আর হিক্‌কার জোর প্রবল। রোগী নিঃসাড়। প্রতিমা দেবী কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন—বাবামশায়, বাবামশায়। তাকালেন। কিন্তু ব্যথার জন্যে ভুরু কুঁচকে আসছে।

কালরাত্রি কাটে অসহ্য যন্ত্রণায়। রোগীর। রোগীর প্রিয়জনের। পূর্ণিমায় প্লাবিত জোড়াসাঁকো। তারই মাঝখানে শেষ শয্যায় শয়ান রবীন্দ্রনাথ। হঠাৎ কখন পূর্ণিমা ফিকে হয়ে যায়, পূবের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। ভোর হলো বিভাবরী, পথ হলো অবসান।

॥ সাত ॥

বাইশে শ্রাবণ। সকাল। অমিয়া ঠাকুর কিছু চাঁপাফুল অঞ্জলি ভরে এনে শাদা শালে ঢাকা পা দু'খানির উপর ছড়িয়ে দিলেন।

সাতটায় এলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করলেন। পায়ের কাছে বসে বিধুশেখর শাস্ত্রী মন্ত্র পড়লেন—ওঁ পিতা নো হসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী—

অমিতা ঠাকুর মুখে জল দিচ্ছেন। প্রথমে চামচেতে, পরে তুলো ভিজিয়ে। কী রকম যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন। বেঁকে যাচ্ছে শরীর। ডাঃ জ্যোতিষ-চন্দ্র রায় নাড়ি ধরে বসে আছেন।

অমিতা ঠাকুর জানাচ্ছেন ঃ কাকী (প্রতিমা দেবী) তখন আমাকে ডাকলেন। বল্‌তো বাবামশায়ের মন্ত্রটা যেন কী?—বললাম—শান্তম শিবম অদ্বৈতম। আমি কানের কাছে গিয়ে বললাম—শান্তম শিবম অদ্বৈতম।

এমন সময়ে এলেন চীনা অধ্যাপক তান য়ুন শান। পাশে বসে মালা জপতে লাগলেন। এলেন হেমন্তবালা দেবী। সন্ন্যাসিনী বেশ। মাথায় কপালে তুলসীর মালা গঙ্গামাটি ছুঁইয়ে চলে গেলেন। ডাঃ অমিয় সেন এসে নাড়ি দেখলেন। হাতের কব্জিতে নাড়ি নেই। কনুইয়ে অতি কষ্টে পেলেন। ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে এবং ক্ষতাবরক সংস্থান করে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গেলেন আর এক পরাজিত চিকিৎসক।

ওদিকে মন্ত্রপাঠ চলছে—নমঃ শংকরায় চ, নমস্কারায় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ। বেলা ৯টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলো। তখনও ক্ষীণ শব্দ নিঃশ্বাসে। সেই সময় তাঁর নাড়ির গতি ঃ সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে ১৪০, শ্বাস ৪৬, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে ১৩০, শ্বাস ৪৪, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ৭৮, শ্বাস ৪৪। খানিক বাদে কোরামিন ইনজেকশন দেওয়া হলো।

মন্ত্রপাঠ তখনো চলছে।—নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ। কানের কাছে শান্তম শিবম অদ্বৈতম। বার বার, অনেক বার। নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। হৃদস্পন্দন থামে নি। পায়ের উষ্ণতা কমে আসছে। ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দা থেকে মৃদু কণ্ঠে ভেসে আসছে গান —কে যায় অমৃতধাম যাত্রী। মন্ত্র চলছে শান্তম শিবম অদ্বৈতম।

দুপুর ১২টা। পা আরো ঠান্ডা। হৃদস্পন্দন থামল বলে। বাইরে জনতার ভিড়। কোলাহল। গান চলছে. মন্ত্র চলছে। শান্তম শিবম অদ্বৈতম। শান্তম শিবম অদ্বৈতম।

১২টা ১০ মিঃ। সব স্তব্ধ হয়ে গেল। মহাগুরু নিপাত। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মহাকবির মহানির্বাণ। বাইশে শ্রাবণ হয়ে গেল ইতিহাস।

———